ভারতীয় জাতিবর্ণপ্রথা

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা * * * ১৯৮৭

উৎসর্গ

অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন রায়

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু

সূচীপত্র

ভূমিকা

বর্তমান শতকের তিনের দশকে জে. এইচ. হাটন জানান যে ওই সময়ের মধ্যেই ইংরাজী ও অপরাপর বিদেশী ভাষায় জাতিবর্ণপ্রথার উপর রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সংখ্যা পাঁচ হাজারেরও বেশি, এবং তার সঙ্গে বিগত পঞ্চাশ বছরে এই বিষয়ের উপর যত লেখা হয়েছে সেগুলিকে যুক্ত করলে যে সংখ্যাটা দাঁড়ায় সেটাকে ভয়াবহ বললে মোটেই বাড়িয়ে বলা হয় না। ছয়ের দশক পর্যন্ত জাতিবর্ণপ্রথার উপর প্রতিনিধিত্বমূলক প্রকাশিত রচনার পরিচয় হাইমেনডোর্ফ কৃত দক্ষিণ এশিয়ার নৃতাত্ত্বিক গ্রন্থপঞ্জী এবং শ্রীনিবাস ও তাঁর সহযোগীদের দ্বারা প্রস্তুত জাতিবর্ণপ্রথার উপর কাজকর্মের সমীক্ষা ও গ্রন্থপঞ্জীতে পাওয়া যায়। বর্তমান গ্রন্থের শেষে প্রদত্ত গ্রন্থপঞ্জীতে আরও পরবর্তীকালের কাজের উল্লেখ আছে। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে ভারতীয় জাতিবর্ণপ্রথা নিয়ে বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত যা লেখা হয়েছে তা খুবই সামান্য। কোন পূর্ণাঙ্গ ও বিশদ আলোচনা নেই বললেই চলে।

জাতিবর্ণপ্রথার উপর এত অসংখ্য রচনা নিঃসন্দেহে বিষয়টির গুরুত্ব, সমস্যা ও জটিলতার কথাই ব্যক্ত করে। এই প্রথা নিয়ে আলোচনার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় অসুবিধা এই যে এক্ষেত্রে লেখকগণ কিছুটা পূর্ব-ধারণার বশবর্তী হয়ে অগ্রসর হতে বাধ্য হন, যার ফলে শেষ পর্যন্ত তাঁদের সিদ্ধান্ত বিষয়নির্ভর না হয়ে ব্যক্তিনির্ভর হয়ে ওঠে। জাতিবর্ণপ্রথা নিয়ে চর্চার প্রথম যুগে যাঁরা এই প্রথার উপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার কৃতিত্বের অধিকারী—যেমন সেনার্ত, রিজলী, নেসফীলড, ইবুবেটসন, কেটকার প্রভৃতি—তাঁরা প্রত্যেকেই এই প্রথা গড়ে ওঠার পিছনে একটি মূল কারণকে সনাক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন এবং জাতিবর্ণপ্রথার অপরাপর বিষয়কে সেই মূল কারণেরই বিভিন্ন গৌণ তথা উপজাত অভিব্যক্তি বলে বর্ণনা করেছিলেন। অবশ্য এই মূল কারণটির বিষয়ে কোন ঐকমত্য ছিল না। প্রত্যেকেই পূর্ব-কল্পিত কোন তত্ত্ব বা ধারণাকে সম্বল করে অগ্রসর হয়েছিলেন, কেলেস্টিন বোগলের ভাষায় একটিমাত্র চাবি দিয়ে সকল তালা খোলার মত। লুই দুমঁ বলেন যে এই সকল লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী একদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল্যবোধ-সমূহের দ্বারা এবং অপরদিকে উনিশ শতকের বিবর্তনবাদী নৃতাত্ত্বিক চর্চার

ফলে গড়ে ওঠা ধারণাসমূহের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল যার ফলে বিষয়টিকে কখনওই তার প্রকৃত প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত করা হয়নি। এই কথা মার্কস-বাদী লেখকগণের ক্ষেত্রেও সত্য যাঁরা তাঁদের শ্রেণীতত্ত্বের কাঠামোয় জাতিবর্ণ-প্রথাকে খাপ খাওয়ানোর দুঃসাধ্য প্রচেষ্টায় এই প্রথার স্বীকৃত বৈশিষ্ট্যগুলিকে হিসাবের মধ্যে আনেননি।

তথাপি দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে পরবর্তীকালের লেখকগণও এই পূর্বসংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারেননি, এমনকি লুই দুমঁ প্রমুখ আধুনিক লেখকদের রচনাতেও দৃষ্টিভঙ্গীগত পূর্বোক্ত উভয় ধরনের ভ্রান্তিই বিদ্যমান। বিষয়নির্ভর বিশ্লেষণের নামে তাঁরা এমন এক ধরনের জটিল ও পল্লবিত সমাজতাত্ত্বিক পরিভাষা ব্যবহার করেন যেগুলির দ্বারা ব্যক্ত ধারণাসমূহের প্রাসঙ্গিকতা কোন ক্ষুদ্র বা স্থানীয় পরিসরে থাকলেও জাতিবর্ণপ্রথার মত একটা ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী ব্যবস্থাকে যথাযথভাবে অনুধাবন ও ব্যাখ্যার পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ হয় না। এমন কি কোন নির্দিষ্ট বা স্থানীয় পরিসরেও এই প্রথা কোন এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নেই, যেখানে নিয়তই নূতন জাতি ও শাখাজাতির আবির্ভাব হয়, পুরাতনেরা অবলুপ্ত হয়, রীতিনীতি ও পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে। যা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, জাতি-বর্ণপ্রথার ভিতরের দিকটা সর্বদাই পরিবর্তনশীল ও নমনীয়, অথচ এই সকল রূপান্তর বাইরের দিক থেকে বাঁধা গন্ডী কোনক্রমেই অতিক্রম করতে পারে না। এই দ্বৈধীভাবের ব্যাখ্যা এই প্রথার ক্রমবিকাশ ও ধারাবাহিকতার বিষয়টিকে উপেক্ষা করা সম্ভবপর নয়, কিন্তু আধুনিক গবেষণা, চর্চা ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে জাতিপ্রথার ঐতিহাসিক দিকটি একান্তই অবহেলিত। তৃতীয়ত, নৃতত্ত্ববিদ ও সমাজতত্ত্ববিদরা বহুক্ষেত্রে সচেতনভাবে অথবা নিজেদের অজ্ঞাতে গূঢ় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের শিকার হন। বস্তুত ইংরাজ আমল থেকে আজ পর্যন্ত জাতিপ্রথাকে রাজনৈতিক স্বার্থে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। জাতিপ্রথা সংক্রান্ত গবেষণা যে বহুক্ষেত্রেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, প্রতিটি আদমসুমারির পিছনেই যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বর্তমান ছিল, হিন্দু সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করার মতলব নিয়েই যে বহু শাখাজাতি ও উপশাখাজাতির সৃষ্টি বৃটিশ শাসকদের মগজ থেকেই হয়েছিল, একথা স্বয়ং হাটন সাহেবই স্বীকার করেছিলেন এবং এই কাজের ক্ষেত্রে তাঁর নিজের ভূমিকার কথাও সাড়ম্বরে ঘোষণা করতে দ্বিধা-বোধ করেন নি। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক

সহায়তায় জাতিপ্রথার উপর যে সকল তথাকথিত মাইক্রো-স্টাডি চালানো হয় সেগুলির পিছনে যে কোন অভিসন্ধি নেই সে কথা হলফ করে বলা যায় না।

বর্তমান গ্রন্থটি আপাতদৃষ্টিতে খুব সরলভঙ্গীতে লিখিত হলেও মনোযোগী পাঠকেরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন যে লেখককে এখানে একটি খুবই দুরূহ কর্তব্য সাধন করতে হয়েছে, যা হচ্ছে একদিকে জাতিবর্ণপ্রথার মত একটি জীবন্ত অথচ সুপ্রাচীন, জটিল এবং নানা ঐতিহাসিক পরিস্থিতির দ্বারা পল্লবিত, বিষয়কে যথার্থভাবে পরিচিত ও উপস্থাপিত করা এবং অন্য দিকে এই বিষয় নিয়ে বিগত দেড়শো বছরে যে পর্বতপ্রমাণ কাজকর্ম হয়েছে তার সারমর্ম পরিবেশন করা। অন্যভাবে বলতে গেলে জাতিবর্ণপ্রথার উপর এ পর্যন্ত আমাদের অর্জিত সামগ্রিক জ্ঞানের এটি হচ্ছে একটি পেশাদারী মূল্যায়ন। এই কাজটা আরও ভালভাবে করা যেত যদি বাংলা ভাষায় জাতিবর্ণপ্রথার উপর আরও কয়েকটি নির্ভরযোগ্য বই থাকত। সেক্ষেত্রে প্রথাটিকে বোঝানোর জন্য এবং তার বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করার জন্য যতগুলি পৃষ্ঠা এখানে ব্যয় করা হয়েছে সেগুলিকে রক্ষা করা যেত এবং সেখানে অন্য ধরনের আলোচনার সুযোগ থাকত। জাতিবর্ণপ্রথা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য সকল প্রধান বিষয় প্রতিটি অধ্যায়ের অন্তর্গত নানা উপ-অধ্যায়ে পরিবেশিত হয়েছে, যদিও এগুলির কোন কোনটির উপর আরও গভীরতর আলোচনার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু একটি গ্রন্থের পরিসরে সব কিছুই সর্বতোভাবে সম্ভবপর নয়। বস্তুত প্রতিটি অধ্যায়ের উপ-অধ্যায়গুলির যে কোন একটিকে নিয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করা যায়।

প্রসঙ্গত একথাও বলা প্রয়োজন যে বর্তমান গ্রন্থে লেখকের কোন ব্যক্তিগত মতামত নেই, এবং এখানে কোন তত্ত্বেরও উপস্থাপনা করা হয়নি। জাতি-বর্ণপ্রথা আমাদের সমাজজীবনে খুবই জীবন্ত হলেও, এবং এই প্রথা সম্পর্কে প্রত্যেকের নিজস্ব অভিমত থাকলেও, প্রথাটির স্বরূপ কি এবং একটি প্রদত্ত সমাজব্যবস্থায় তা কিভাবে ক্রিয়াশীল, একজন ব্যক্তির নিকট তার জাতির গুরুত্ব কতখানি, এই সকল বিষয়ে হয়ত অনেকেরই সুস্পষ্ট ধারণা নেই। এমন অনেক মনগড়া ধারণাকে সত্য বলে চালানো হয় যেগুলি কোনদিনই প্রমাণসিদ্ধ নয়। যেমন, সমাজে ব্রাহ্মণ্যপ্রাধান্য ও ব্রাহ্মণদের শোষকবৃত্তি ও অত্যাচারী ভূমিকার কথা বহুকাল ধরেই খুব উচ্চকণ্ঠে প্রচারিত, কিন্তু জাতিকাঠামোয় বরাবরই মধ্যশ্রেণীর জাতিগুলিই ক্ষমতার দিক থেকে ডমিনান্ট কাস্ট বা প্রভাবশালী জাতি, ব্রাহ্মণ নয়। সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের সামাজিক

মর্যাদাও সমান নয়। এমন কি প্রাচীন যুগেও মগধের শুঙ্গ ও কান্ব এবং পশ্চিম মহারাষ্ট্রের কদম্বদের বাদ দিলে, সকল রাজবংশের রাজারা ছিলেন শূদ্র পর্যায়ের জাতিভুক্ত। নিম্ন পর্যায়ের জাতিগুলি সম্পর্কেও প্রচুর ভুল ধারণা বর্তমান। এই প্রথার দ্বারা তাদের জীবিকা ও সমাজজীবন যতটা সুরক্ষিত, তার বিকল্প কোন ব্যবস্থা আজও পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। জাতিপ্রথা বজায় রাখার ব্যাপারে নিম্নপর্যায়ের জাতিদের উৎসাহের অভাব নেই, এবং এই পর্যায়ের জাতিরা তাদের পরস্পরের মধ্যে পুরাতন সম্পর্কের পরিবর্তন করতে আগ্রহান্বিত নয়। তপশিলী জাতি বলে যাদের চিহ্নিত করা হয় তাদের নিয়েও বিভ্রান্তি আছে। সকল অনগ্রসর জাতিই তফশিলী নয়, তফশিলীরা অনগ্রসর জাতিদের একটি ভগ্নাংশমাত্র। বৃটিশ আমলে সেই ধরনের জাতিগুলিকেই এই তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল যারা অনগ্রসরদের মধ্যে অগ্রসর এবং নিজেদের দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য আন্দোলন করার মত সামর্থ্যের অধিকারী। স্বাধীন ভারতে এই তালিকার কিছুটা প্রসারণ ঘটলেও, সকল নিম্নপর্যায়ের জাতিকে এই তালিকায় আনা হয়নি। ইদানীং বহু প্রভাবশালী জাতিও তফশিলী তালিকায় স্থান পেয়ে যাচ্ছে, বলাই বাহুল্য রাজনৈতিক প্রয়োজনে। জাতি বৈষম্যের সঙ্গে শ্রেণী বৈষম্যকে গুলিয়ে ফেলাও এক ধরনের ভ্রান্তি, কেননা কোন জাতিই কোন জাতির অধীন নয়, সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন। এছাড়া এমনও দেখা গেছে যে আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ বহু জাতির স্থান জাতিকাঠামোর বেশ নীচের দিকে, অনেক ক্ষেত্রে পতিত পর্যায়ে। বর্তমান গ্রন্থটি এই জাতীয় বহু ভ্রান্তি অপনোদনের কাজেও সহায়ক হবে।

আমার বন্ধু ও ছাত্র শ্রীসন্তোষ কুমার বিশ্বাস পরম উৎসাহে অসংখ্য বই ও প্রবন্ধ সংগ্রহ করে না দিলে এই গ্রন্থটি রচনায় সাহসী হতাম না। ফার্মা কেএলএম-এর প্রয়াত স্বত্বাধিকারী আমার অগ্রজতুল্য কানাইলাল মুখোপাধ্যায় আমাকে দিয়ে পূর্বে অনেক কাজ করিয়ে নিয়েছেন এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র রথীন্দ্রনাথ সেই ধারা অব্যাহত রেখেছেন। ওই প্রতিষ্ঠানের শ্রীপতি ঘোষ ও তাঁর সহকর্মীরা বইটির প্রকাশের ব্যাপারে প্রচুর সাহায্য করেছেন। সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

জোড়াঘাট
চুঁচুড়া
১ জুলাই ১৯৮৭

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম অধ্যায়

গঠনগত উপাদানসমূহ

১ ॥ জাতিপ্রথা ও বর্ণভেদ : সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ

ভারতীয় সমাজকাঠামোর মূল ভিত্তি জাতিপ্রথা ও বর্ণভেদ আসলে একই মুদ্রার দুই দিক, একই ব্যবস্থার প্রয়োগমূলক ও তাত্ত্বিক অভিব্যক্তি। বর্ণভেদ বলতে বোঝায় একটি বিশেষ আদর্শগত দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র জনসমাজকে কয়েকটি বিভিন্ন মর্যাদার শ্রেণীতে বিভাজন। বর্ণ চারটি, যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে নিষাদদের পঞ্চম বর্ণ বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে জাতির ধারণাটি অধিকতর বাস্তবতাসম্পন্ন। জাতি বলতে সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী বোঝায়, সেনার্তের মতে যা বংশপরম্পরায় একই উদ্ভবসূত্রে গ্রথিত, প্রধান ও পরিষদ সহ কয়েকটি প্রথাগত অথচ স্বাধীন সংগঠন দ্বারা পরিচালিত এবং নির্দিষ্ট পেশা ও আচরিত রীতিনীতিসমূহের ভিত্তিতে একতাবদ্ধ। রিজলী বলেন, জাতি বলতে বোঝায় কয়েকটি পরিবার বা পারিবারিক গোষ্ঠীর সমবায় যারা প্রত্যেকেই একই জাতিনামের অন্তর্গত, একই পৌরাণিক পূর্ব-পুরুষ থেকে উদ্ভূত বলে নিজেদের পরিচয় দেয়, একটি নির্দিষ্ট কৌলিক বৃত্তির অনুসরণ করে, নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যেই অন্তর্বিবাহ করে এবং অনুরূপ অন্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সামাজিক স্বাতন্ত্র বজায় রাখে। আরও বহু লেখক জাতি প্রথার নানা বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করেছেন। সকলের বক্তব্যের সার সংকলন করলে যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে এই যে জাতি বলতো বোঝায় একটি বিশেষ পেশার ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠী, যারা নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যেই অন্তর্বিবাহ করে, সমাজকাঠামোয় ছোট বড় যেমনই হোক না কেন যাদের একটি নির্দিষ্ট স্থান ও ভূমিকা আছে, যাদের অধিকার ও কর্তব্যের ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যারা তাদের নিজস্ব সামাজিক আইনের দ্বারা পরিচালিত, এবং যারা পেশাগত ও অপরাপর ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ধরনের সার্বভৌমত্ব ভোগ করে। একটি জাতির কর্ম বা অধিকারের ক্ষেত্রে অপর জাতির হস্তক্ষেপ বা অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ যদিও বিশেষ পরিস্থিতিতে কৌলিক বৃত্তির পরিবর্তন ঘটতে পারে, অথবা কৃষিকর্মের মত ব্যাপক বৃত্তির ক্ষেত্রে একাধিক জাতি আসতে পারে।

ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতার বিচারে জাতিপ্রথা বর্ণভেদের চেয়ে অনেক প্রাচীন। বিভিন্ন পেশা ও সামাজিক আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বিভিন্ন সংস্কৃতিভুক্ত অসংখ্য জনগোষ্ঠীকে চারটি কি পাঁচটি ব্যাপক সামাজিক শ্রেণীতে বিভক্ত করার প্রচেষ্টাই বর্ণভেদের মূল কথা, এবং সেজন্যই প্রাচীন গ্রন্থসমূহে জাতিকে বর্ণের উপবিভাগ বলে গণ্য করা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনু চারটি মূল বর্ণ এবং তা থেকে উপজাত অন্যূন পঞ্চাশটি জাতির উল্লেখ করেছেন। তৎসত্ত্বেও প্রাচীন শাস্ত্রকারকদের চোখে জাতি ও বর্ণের সীমারেখা খুব স্পষ্ট নয়। এমনকি মনুও জাতি ও বর্ণের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে গুলিয়ে ফেলেছেন। দ্রষ্টব্য মনুস্মৃতি ৩।১৫, ৮।১৭৭, ৯।৮৬, ৯।৩৩৫, ১০।২৭, ১০।৩১, ১০।৪১ ইত্যাদি। বস্তুত নানা ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে জাতি ও বর্ণ শব্দ দুটি বহু ক্ষেত্রেই সমার্থক হয়ে গেছে, এবং শব্দ দুটির দ্বারা সূচিত দুটি পরস্পরের পরিপূরক ধারণা একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। ভারতবর্ষে ইংরাজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর ইংরাজ লেখক ও ঐতিহাসিকেরা জাতিবর্ণ প্রথাকে বোঝাবার জন্য কাস্ট সিস্টেম নামক শব্দটির ব্যবহার শুরু করেন। কাস্ট শব্দটি পর্তুগীজ 'কাস্তা' থেকে গৃহীত। পর্তুগীজরা ভারতীয় সমাজের শ্রেণীবিভাগ বোঝানোর জন্য 'কাস্তা' শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করে। শব্দটির উদ্ভব হয়েছে ল্যাটিন 'কাস্তুস' থেকে যার অর্থ 'পবিত্রতা'। পোর্তুগীজরা ওই শব্দটির দ্বারা এমন একটি প্রথাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল যার উদ্দেশ্য রক্তের পবিত্রতা বজায় রাখা। জাতিপ্রথা অর্থে গার্সিয়া দে ওর্তা কাস্তা শব্দটি ব্যবহার করেন ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে।

জাতিপ্রথার উদ্ভব সম্পর্কে নানা পণ্ডিত নানা মত পোষণ করেন, এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে প্রচলিত সামাজিক শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে জাতিপ্রথা ও বর্ণভেদপ্রথার তুলনা করেন। রিজলী এবং সেনার্ত উভয়েই চাতুর্বর্ণে সমাজকে বিভক্ত করার পিছনে ইরানীয় সমাজব্যবস্থার প্রভাব লক্ষ্য করেছেন এবং বর্ণভেদ পরিকল্পনা মূলত আর্যসভ্যতার বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেছেন। ইরানেও চারটি সামাজিক শ্রেণীর পরিচয় পাওয়া যায়, যথা অথর্বন বা পুরোহিত শ্রেণী, রথএস্থ বা যোদ্ধাশ্রেণী বাস্ত্রয় ফ্শূয়ন্ত বা কৃষক শ্রেণী এবং হুইতি বা কারিগর শ্রেণী। সেনার্ত আরও অগ্রসর হয়ে গ্রীক ও রোমক সমাজব্যবস্থার সঙ্গে ভারতের সাদৃশ্য অন্বেষণ করেছেন। তাঁর মতে গ্রীসের পরিবার, ফ্রাত্রিয়া এবং ফাইলি, রোমের জেনস, কুরিয়া এবং ট্রাইবের সঙ্গে ভারতীয় পরিবার গোত্র এবং জাতির সাদৃশ্য আছে। এটা অবশ্য খুবই সত্য যে অনেক প্রাচীন সমাজে

এমনকি আধুনিক সমাজেও বিভিন্ন মর্যাদার চারটি কি পাঁচটি শ্রেণীবিভাগ বর্তমান ; বিবাহ, ভোজন আচার-অনুষ্ঠান ও মেলামেশার ক্ষেত্রে এই শ্রেণীগুলি একে অপরের সংগে কিছু সামাজিক স্বাতন্ত্রও বজায় রাখে, কিন্তু এই আপাত সাদৃশ্য কিছুই প্রমাণ করে না। ভারতীয় জাতিপ্রথা অপরাপর দেশের সামাজিক ভেদাভেদের চেয়ে চরিত্রের দিক থেকে গুণগতভাবে পৃথক। ভারতবর্ষে জাতির সংখ্যা তিন সহস্রাধিক। সামাজিক কাঠামোয় তাদের স্থান ও মর্যাদা যেমনই হোক না কেন প্রতিটি জাতিই এক একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ সার্বভৌম গোষ্ঠী, যে সার্বভৌমত্বের প্রয়োগ দেখা যায় তাদের পেশা, সামাজিক আইন কানুন এবং প্রদত্ত বা প্রাপ্ত অধিকারসমূহের ক্ষেত্রে, যেখানে এমনকি রাজাও হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। রাজার কর্তব্য বর্ণাশ্রম ও জাতিধর্ম রক্ষা, এই জাতিধর্ম যে শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা নয়, দেবতারা এবং ইতর প্রাণীরাও এর অন্তর্গত।

মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরং বমন কানে বৈদিক সাহিত্য সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে এসেছেন। ঋগ্বেদের সাক্ষ্য অনুযায়ী আদিতে দুটি বর্ণের অস্তিত্ব ছিল, আর্য এবং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দাস বা দস্যু। এদের পার্থক্যের ভিত্তি ছিল দেহের রঙ ও সামাজিক রীতিনীতি, অর্থাৎ নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক। সংহিতার যুগের সমাপ্তির পূর্বেই দস্যুরা সম্পূর্ণভাবে বিজিত হয় এবং তারা শূদ্র হিসাবে পরিগণিত হয়। ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহের যুগে আর্যবর্ণের মধ্যেও জন্ম ও পেশার ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ ঘটে। আর্যবর্ণ ত্রিবর্ণে রূপান্তরিত হয়, যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। বৈদিক যুগের শেষের দিকেই চণ্ডাল, পৌল্কস প্রমুখ নিম্নজাতির পরিচয় পাওয়া যায়। আরও পরবর্তীকালে শ্রমবিভাগের প্রয়োজনে নানাপ্রকার পেশাদার শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে, এবং এই সকল পেশাদার গোষ্ঠীগুলি নানা উপবর্ণ বা বিভিন্ন মর্যাদার জাতিতে পরিণত হয়। জাতিপ্রথা নিয়ে যাঁরাই গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁদের প্রত্যেকের লেখাতেই মোটামুটি এই রকম একটা বিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। জাতিপ্রথা গঠনের মূলে নানা উপাদান ও ধারা আছে যেখানে নৃতাত্ত্বিক বর্ণভেদ, বংশধারা, পেশা সবকিছুরই যথাযোগ্য ভূমিকা আছে যা আমরা পরে আলোচনা করব। তবে দুটি বিষয়ে নূতন করে চিন্তা করার দরকার। প্রথমটি হচ্ছে সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও উৎখননের ফলে এটা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে প্রাক্‌বৈদিক যুগে ভারতের সর্বত্রই জনবসতি ছিল, যাদের মধ্যে নানা ধরনের পেশাদারী গড়ে উঠেছিল। অর্থাৎ

পেশাগত জাতিবিভাগের কাঠামোটা বৈদিক আমলের বহু পূর্বেই গড়ে উঠেছিল। দ্বিতীয়টি হচ্ছে যে জাতিপ্রথা ও বর্ণভেদকে আর্যসংস্কৃতির দান হিসাবে গণ্য করার যে চেষ্টা বরাবর চলে এসেছে, সেই আর্যদের প্রকৃত অস্তিত্ব আদৌ ছিল কিনা, তা নিয়ে বর্তমানে সংশয় দেখা গেছে।

আমরা আগেই বলেছি যে ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতার বিচারে জাতিপ্রথা বর্ণভেদের চেয়ে প্রাচীনতর হতে বাধ্য। এই প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায়ের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ "বর্ণাশ্রম প্রথা ও অভ্যাস যুক্তিপদ্ধতিবদ্ধ করিয়াছিলেন প্রাচীন ধর্মসূত্র ও স্মৃতিগ্রন্থের লেখকেরা। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চাতুর্বর্ণের কাঠামোর মধ্যে তাঁহারা সমস্ত ভারতীয় সমাজব্যবস্থাকে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই চাতুর্বর্ণপ্রথা অলীক উপন্যাস এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কারণ ভারতবর্ষে এই চাতুর্বর্ণের বাহিরে অসংখ্য বর্ণ, জন ও কৌম ছিল। প্রত্যেক বর্ণ জন ও কৌমের ভিতর আবার ছিল অসংখ্য স্তর-উপস্তর। ধর্মসূত্র ও স্মৃতিকারেরা নানা অভিনব অবাস্তব উপায়ে এই সব বিচিত্র বর্ণ জন ও কৌমের স্তর, উপস্তর ইত্যাদি ব্যাখ্যা করিতে এবং সব কিছুকেই আদি চাতুর্বর্ণের কাঠামোর যুক্তিপদ্ধতিতে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে রঘুনন্দন পর্যন্ত এই চেষ্টার কখনও বিরাম হয় নাই। একথা অনস্বীকার্য যে স্মৃতিকারদের রচনার মধ্যে সমসাময়িক বাস্তব সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন আছে, সেই অবস্থার বাস্তব ব্যাখ্যার একটা চেষ্টা আছে ; কিন্তু যে যুক্তিপদ্ধতির আশ্রয়ে তাহা করা হইয়াছে, অর্থাৎ চাতুর্বর্ণের বহির্ভূত অসংখ্য বর্ণ, জন ও কৌমের নরনারীর সঙ্গে চাতুর্বর্ণধৃত নরনারীর যৌনমিলনের ফলে সমাজের যে বিচিত্র বর্ণ ও উপবর্ণের, বিচিত্রতর সংকর বর্ণের সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা একান্তই অনৈতিহাসিক এবং সেই হেতু অলীক। তৎসত্ত্বেও স্বীকার করিতেই হয় আর্য-ব্রাহ্মণ্য ভারতীয় সমাজ আজও এই যুক্তিপদ্ধতিতে বিশ্বাসী এবং সুদূর প্রাচীনকাল হইতে আদি চাতুর্বর্ণের যে কাঠামো ও যুক্তিপদ্ধতি অনুযায়ী বর্ণব্যাখ্যা হইয়া আসিতেছে, সেই ব্যাখ্যা প্রয়োগ করিয়া হিন্দুসমাজ আজও বিচিত্র বর্ণ, উপবর্ণ ও সংকরবর্ণের সামাজিক স্থান নির্ণয় করিয়া থাকেন।"

যে যুক্তিপদ্ধতিকে নীহাররঞ্জন অলীক ও অবাস্তব বলেছেন, এবং অলীক ও অবাস্তব হওয়া সত্ত্বেও যে যুক্তিপদ্ধতিকে শাস্ত্রকারেরা বরাবর ব্যবহার করেছেন, তা হল বর্ণসংকর-তত্ত্ব। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে মনু বলেছেন যে বিশ্বস্রষ্টার মুখ, বাহু, উরুদেশ ও পাদদ্বয় থেকে যথা-

ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণের উৎপত্তি হয়েছে। এই চার বর্ণের মধ্যে পারস্পরিক অনুলোম (উচ্চবর্ণের পুরুষ ও নিম্নবর্ণের স্ত্রী) এবং প্রতিলোম (নিম্নবর্ণের পুরুষ ও উচ্চবর্ণের স্ত্রী) বিবাহের ফলে নানা সংকর জাতির উদ্ভব হয়েছে, যেমন মূর্ধাভিষিক্ত (ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়), মাহিষ্য (ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য), করণ (বৈশ্য ও শূদ্র), অম্বষ্ট (ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য), নিষাদ বা পারশব (ব্রাহ্মণ ও শূদ্র), উগ্র (ক্ষত্রিয় ও শূদ্র) ইত্যাদি। এভাবে উদ্ভূত সংকর জাতিসমূহ পুনরায় পারস্পরিক অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের দ্বারা দ্বিতীয় পর্যায়ের সংকর জাতিসমূহকে উৎপন্ন করেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের সংকর জাতিরা আবার তৃতীয় পর্যায়ের সংকর জাতিদের উৎপন্ন করেছে। এই পদ্ধতি অনুসরণে অসংখ্য জাতিকে বিভিন্ন পর্যায়ের সংকর জাতি হিসাবে চাতুর্বর্ণের মূল কাঠামোর মধ্যে ধরিয়ে দেওয়া যায়। এই পদ্ধতিটি শাস্ত্রকারদের উদ্দেশ্যের অনুকূল হলেও বাস্তব হতে পারে না। গৌতম বুদ্ধ যথার্থই বলেছেন যে অসবর্ণ বিবাহজাত সন্তান পিতারই বর্ণ পায়। নিজ জাতির বাইরে বিবাহ নিষিদ্ধ—জাতিপ্রথার এটা একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। আজকের যুগেও যেমন নিজ জাতির বাইরে সচরাচর বিবাহ করা চলে না, প্রাচীন যুগে তা আরও চলত না, কেন না কোন ব্যক্তির পক্ষে তার জাতির পেশাগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ত্যাগ করা কার্যত অসম্ভব ছিল, বিশেষ করে নিম্নবর্ণের জাতিসমূহের ক্ষেত্রে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অসবর্ণ বিবাহ যে একেবারে হত না তা নয়। উচ্চ তিন বর্ণের পুরুষদের অসবর্ণ অনুলোম বিবাহ করার শাস্ত্রীয় স্বীকৃতিও ছিল, কিন্তু তাদের সন্তান-সন্ততিরা কোন পৃথক জাতিতে পরিণত হত বা তারা নিজস্ব সমাজ গঠন করত, এরকম কোন সম্ভাবনা বাস্তবতার দিক থেকে দুরূহ ছিল। শাস্ত্রকারদের দ্বিতীয় যুক্তি-পদ্ধতিটি অবশ্য অধিকতর বাস্তবতাসম্পন্ন, যা হচ্ছে ব্রাত্যত্ব বা পতিত হয়ে যাওয়া। যদি কোন জাতি বা বর্ণের অন্তর্গত কিছু মানুষ তাদের শাস্ত্রনির্দিষ্ট জাতিধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়, কোন সামাজিক বা ঐতিহাসিক কারণে, তাহলে তারা পতিত হয়ে নিম্নতর কম মর্যাদার ভিন্ন একটি জাতিতে কালক্রমে পর্যবসিত হয়। বর্ণসংকর ও পতিতত্ব প্রসঙ্গে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করব।

রিজলী জাতিপ্রথা গড়ে ওঠার কয়েকটি উপাদানকে বর্তমানকালে টিঁকে থাকা জাতিসমূহকে পর্যবেক্ষণ করে নির্দিষ্ট করেছেন। প্রথমটি হচ্ছে উপজাতীয় উপাদান। বহুক্ষেত্রেই দেখা গেছে একটা গোটা ট্রাইব বা উপজাতি বা

তার উল্লেখযোগ্য একটি অংশ কোন পেশাকে অবলম্বন করে বৃহত্তর হিন্দু-সমাজের আশ্রয়ে নিজস্ব উপজাতীয় নামে অথবা কোন গৃহীত নামে একটি জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে, যেমন উত্তরবঙ্গের রাজবংশী, পশ্চিমবঙ্গের ভূমিজ, মধ্য ভারতের গোন্দ প্রভৃতি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে পেশাগত উপাদান। এমন কোন জাতি নেই যার কোন জাতব্যবসা বা কৌলিক বৃত্তি নেই। আজও পর্যন্ত ভারতের অধিকাংশ জাতি স্বয়ং-নিযুক্ত ও কৌলিক বৃত্তির অনুসারী। কৌলিক বৃত্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এক জাতির মানুষ যে ভিন্ন জাতিতে পরিণত হয় তারও নিদর্শন আছে, যেমন সদ্গোপ, যারা আগে গোপ বা গোয়ালা ছিল পরে কৃষিকর্মকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছে, বা চাষাধোপা যারা আগে রজকতা করত পরে পেশা বদলে কৃষিজীবী হয়েছে। তৃতীয়টি হচ্ছে ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক উপাদান। ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে বিভিন্ন যুগে নানা ধর্মগুরুর আবির্ভাব হয়েছে যাঁদের ভক্তদের নিয়ে অনেক সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। কালক্রমে এই সম্প্রদায়গুলি জাতিবর্ণকাঠামোয় জাতি হিসাবে স্থান পেয়েছে। বহু ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে যে এই সকল ধর্মমতের প্রবক্তারা জাতিবর্ণপ্রথার বিরোধী হিসাবেই উদার ধর্মমত প্রচার করেছিলেন এবং বিভিন্ন জাতির লোক সেই সকল ধর্মমতে দীক্ষা নিয়ে এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছিলেন তাদের পূর্বেকার জাতিগত পরিচয়কে লোপ করে। কিন্তু এই সম্প্রদায়গুলিই ধীরে ধীরে আবার জাতি হয়ে উঠেছে। ধর্মীয় সম্প্রদায়কে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা অসংখ্য জাতির পরিচয় অক্ষয় কুমার দত্ত রচিত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে দেওয়া আছে। চতুর্থত, কোন বিশেষ ভাষাগোষ্ঠীরও স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে পরিচিতি ঘটে, যেমন নেপালের নেওয়ার। স্থানান্তরগমন এবং প্রথাবদলের মধ্য দিয়েও জাতি বা জাতিগত মর্যাদার বদল হয়। যেমন বিহারের অযোধ্যা কুর্মী এবং উত্তরপ্রদেশের কনৌজীয় কুর্মীরা বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ করে অন্যান্য কুর্মীদের চেয়ে জাতিকাঠামোর উচ্চতর পর্যায়ে স্থান পেয়েছে, পক্ষান্তরে গুরগাঁও অঞ্চলের রাজপুতেরা বিধবাবিবাহে সম্মতি দিয়ে অন্য রাজপুতদের তুলনায় নিম্ন জাতিতে নেমে গেছে।

ব্যক্তির জীবনে তার জাতির প্রভাব বর্ণনা প্রসঙ্গে জে. এইচ. হাটন বলেন যে জাতিপ্রথা একজন ব্যক্তিকে তার জন্ম থেকেই একটি নির্দিষ্ট সামাজিক পরিবেশে আনয়ন করে। সম্পদ বা দারিদ্র, সাফল্য বা বিপর্যয়, যাই হোক না কেন, জাতির আশ্রয় থেকে সে কখনোই বঞ্চিত হয় না, যদি না সে তার জাতি-প্রবর্তিত ব্যবহারের মান লংঘন করে। জাতি তার অন্তর্গত ব্যক্তিকে বরাবরের

সাহচর্য দেয়, তার সমস্ত ব্যবহার ও যোগাযোগকে নিয়ন্ত্রণ করে, বিবাহক্ষেত্রে তার পছন্দকে প্রণালীবদ্ধ করে, তার ট্রেড-ইউনিয়ন, বান্ধব-সমাজ, সাহচর্যকেন্দ্র ও আতুরাশ্রমের ভূমিকা পালন করে। জাতিই তার স্বাস্থ্যবীমার প্রতিষ্ঠান, প্রয়োজন হলে অন্ত্যেষ্টিরও অবলম্বন। ফার্ণিভ্যাল বলেন যে ভারতে এক-জাতীয় প্লুরাল বা বহুত্ববাদী সমাজ একমাত্র জাতিপ্রথার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অসাম্যমূলক হলেও প্রতিটি জনগোষ্ঠী নিজস্ব সামাজিক, নৃতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ অক্ষুন্ন রেখে এই ব্যবস্থায় স্থান পেতে পারে। এই কারণে জাতিপ্রথা শুধু ভারতীয় হিন্দুসমাজেরই বৈশিষ্ট্য নয়, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও খ্রীষ্টান সমাজেও এই প্রথা কার্যকরভাবে বর্তমান। মুসলমান সমাজে জাতিপ্রথার কথা আমরা একটি পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করব। ভারতবর্ষে বৌদ্ধ বাসিন্দা বড় একটা নেই, তবে চট্টগ্রাম অঞ্চলের বৌদ্ধরা সপ্তদশ থেকে ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত একটি নিম্ন মর্যাদার জাতি হিসাবেই পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে কয়েকজন আচার্যের প্রচেষ্টায় চট্টগ্রামী বৌদ্ধ-দের মধ্যে ধর্মীয় নবজাগরণের সূত্রপাত হয় এবং জাতির পরিবর্তে তারা ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসাবেই নিজেদের পরিচিত করতে সমর্থ হয়। জৈনধর্ম কঠোরভাবে জাতিপ্রথা বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও জৈন সমাজে জাতির সংখ্যা একশোর কাছা-কাছি। ভারতীয় খ্রীষ্টানরা বহু ক্ষেত্রেই হিন্দুদের মত জাতিপ্রথা মেনে চলার ক্ষেত্রে উৎসাহী। দক্ষিণ ভারতের খ্রীষ্টানদের জীবনে জাতিপ্রথার প্রভাব বর্ণনা করতে গিয়ে অনন্তকৃষ্ণ আয়ার লিখেছেন: "সাধারণ ভারতীয় খ্রীষ্টান কঠোর-ভাবে জাতিপ্রথার অনুসরণ করে। এটাও বিচার্য বিষয় যে এক্ষেত্রে সাধারণ হিন্দুদের চেয়ে তারা গোঁড়া কিনা। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির দক্ষিণের জেলাগুলির খ্রীষ্টানরা এমনকি গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করে যে তারা হিন্দুদের চেয়ে অধিক-তর নিষ্ঠাভরে জাতিপ্রথা মেনে চলে।"

জাতিপ্রথার অন্ধকার দিকও অনেক আছে যেগুলি নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। কিন্তু এই প্রথার সবচেয়ে বড় কার্যকারিতার দিক হচ্ছে এই যে এই প্রথা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নিজস্বতা ও স্বাতন্ত্র ক্ষুন্ন না করে একটা বিরাট দেশের জনসমাজের মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয় বিধান করেছে। দ্বিতীয়ত, জাতিপ্রথা এমন একটি পরিকল্পিত সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে যার মূলে কোন বলপ্রয়োগ নেই। গিলবার্ট ইউরোপ ও আমেরিকার উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে সেখানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বদাই রক্তাক্ত সংঘর্ষ হয়েছে এবং অধিকতর শক্তিশালী দুর্বলতরদের একেবারে গ্রাস ও আত্মসাৎ করে

নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করেছে, কিন্তু জাতিপ্রথা বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর 'জাতীয়-তার' সংঘর্ষকে এড়িয়ে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে সমাজ সংস্থাপন করেছে। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচারী শাসনের বিকল্প হিসাবে জাতিপ্রথা সামাজিক শাসনের কার্যকারিতা, উপযোগিতা ও সম্ভাবনার বিষয়গুলি তুলে ধরেছে। চতুর্থত, এই প্রথা ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন নিরাপত্তা বিধান করতে সমর্থ হয়েছে। এই বিষয়ে হাটন বলেছেন যে জাতিপ্রথা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে একটি সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর দক্ষতা, জ্ঞান ও ব্যবহারের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে। একদিকে যেমন পেশাদার জাতিসমূহের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার মাধ্যমেই উৎপাদন কৌশলের গোপনীয়তা রক্ষিত হয়েছে অপরদিকে তেমনই এই প্রথা ট্রেড ইউনিয়ন বা গিল্ড হিসাবে কাজ করে বিভিন্ন জাতির অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করেছে। সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে এই প্রথার ভূমিকা আরও প্রশংসনীয়। প্রত্যেক মানুষই কোন না কোন জাতির অন্তর্গত, প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব সমাজ বর্তমান এবং জাতিগত সমস্যার আলোচনা, বিচারকার্য, শাস্তিদান প্রভৃতি বিষয় সংশ্লিষ্ট জাতির পঞ্চায়েত দ্বারাই বরাবর পরিচালিত হয়ে এসেছে, যার ফলে আইন-শৃংখলা সংক্রান্ত সমস্যাবলীরও অনেক সুরাহা হয়েছে। জাতিপ্রথার অসংখ্য ত্রুটি থাকলেও এই কার্যকর দিকগুলিকে স্বীকার না করলে এই প্রথার প্রবল দীর্ঘস্থায়িত্বের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, এমন কি যে সকল ধর্মীয় এবং সামাজিক আদর্শ প্রত্যক্ষভাবে এই প্রথার বিরোধী সেগুলিও কিভাবে এই প্রথার কবলিত হয়েছে তারও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

২ ॥ নৃতাত্ত্বিক বর্ণভেদ : জাতিবর্ণপ্রথার অন্যতম উপাদান

বর্ণ কথাটির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে রঙ, মানুষের ক্ষেত্রে দেহের রঙ, যার ভিত্তিতে একটি নৃতাত্ত্বিক-জনগোষ্ঠী বা রেসের সংগে অপরের পার্থক্য করা হয়। নৃতত্ত্ববিদরা এই পিগমেণ্টেশন বা ত্বক, চক্ষু ও চুলের রঙ বিচারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আগে খালি চোখেই এই বর্ণবিচার করা হত, ইদানীং স্পেকট্রোফটোমিটার যন্ত্র এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। অনুমান করতে অসুবিধা নেই যে প্রাচীন যুগেও এক নরগোষ্ঠীর সংগে অন্য নর-গোষ্ঠীর পার্থক্য দেহের রঙ ও অপরাপর দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই করা হত। ঋগ্বেদে একটি জনগোষ্ঠীকে বর্ণনা করা হয়েছে কৃষ্ণত্বক, মৃধ্রবাক্ (ভিন্ন ভাষা) এবং অনাস (চ্যাপ্টা নাক) বলে। এই রেস বা নৃগোষ্ঠীগত পার্থক্য জাতিবর্ণপ্রথার একটি প্রাথমিক ও প্রধান উপাদান সন্দেহ নেই।

রেস বা নৃগোষ্ঠীর কোন সর্বজনসম্মত সংজ্ঞা নেই। আগেকার নৃতত্ত্ববিদরা, যেমন টোপিনার্ড, নৃতাত্ত্বিক-জনগোষ্ঠী বলতে বংশধারার উপর জোর দিয়েছেন। হুটনের মতে নৃগোষ্ঠী বলতে মানবজাতির এমন এক বিভাগকে বোঝায় যার অন্তর্গত মানুষদের ব্যক্তিগত পার্থক্য থাকলেও সামগ্রিকভাবে যাদের দৈহিক গঠন ও অপরাপর বিষয়ে একটি বিশেষ ঐক্যভাব পরিলক্ষিত হয় এবং যাদের একটি সাধারণ উদ্ভব থাকে। হুটন প্রাথমিক ও রূপান্তরিত দুই ধরনের নৃগোষ্ঠীর উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে প্রাথমিক জনগোষ্ঠীসমূহ আদিম ভৌগোলিক এবং জৈব ব্যবধানের দ্বারা বিচ্ছিন্ন, যেখানে রূপান্তরিত জনগোষ্ঠীগুলি বিভিন্ন প্রাথমিক গোষ্ঠীর মিলনজাত।

বিরজাশংকর গুহ দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ভারতবাসীদের ছয়টি প্রধান নৃগোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছেন, যথা নেগ্রিটো, প্রোটো-অস্ট্রালয়েড, মঙ্গোলয়েড (তিন শ্রেণীর), মেডিটারেনিয়ান (তিন শ্রেণীর), ওয়েস্টার্ণ ব্রাকিসেফাল (তিন শ্রেণীর) এবং নর্ডিক।

নেগ্রিটো ধরনের মানুষেরা খর্বাকার, গোল ধরনের মাথা, গভীর কৃষ্ণবর্ণের ত্বক, উলের মত চুল ও প্রলম্বিত পশ্চাদ্দেশ যুক্ত। বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে শেষোক্ত লক্ষণটি প্রকটিত। এই জাতীয় মানুষদের পরিচয় পাওয়া যায় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের ওঙ্গে ও জারোয়াদের মধ্যে। কেরালার কাদার এবং পুলায়ান এবং তৎসহ ইরুলা ও ওয়েনাদ অঞ্চলের কিছু উপজাতির মধ্যে নেগ্রিটো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রোটো-অস্ট্রালয়েড বা অস্ট্রালয়েড ধরনের মানুষেরা খর্বাকার ও কৃষ্ণবর্ণ, যাদের চোখের ভুরু খাঁজকাটা, নাকের গোড়ার দিকটা চাপা অথচ অগ্রভাগ পুরু ও চওড়া, মুখের অংশ একটু বেশি সম্মুখ-প্রসারিত, পুরু ঠোঁট এবং ঢেউ খেলানো থেকে কুঞ্চিত চুল। দক্ষিণ ভারতের চেঞ্চু, মালায়ান, কুরুম্ব, যেরুবা প্রভৃতির মধ্যে এবং মধ্যভারত, বিহার, বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যার মুণ্ডা, সাঁওতাল ও কোল শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে এবং সর্বোপরি ভারতীয় বর্ণ-ব্যবস্থার নিম্নতর পর্যায়গুলিতে অবস্থিত নানা জাতির মধ্যে প্রোটো-অস্ট্রালয়েড ধরনটি বিশেষভাবে বর্তমান।

মঙ্গোলয়েডদের মুখে দাঁড়ি-গোঁফের স্বল্পতা লক্ষ্য করা যায়। তাদের চোয়ালের উপরাংশ উদ্গত, চওড়া মুখ, চোখে এপিকান্থিক ভাঁজ ও চাপা নাক, শেষোক্ত অঙ্গটির বৃদ্ধি যেন মধ্যপথে স্থগিত হয়ে আছে। মঙ্গোলয়েড তিন শ্রেণীর: (ক) লম্বা-মাথা প্যালি-মঙ্গোলয়েড যারা মধ্যম আকার,

যাদের গায়ের রঙ হাল্কা বাদামী থেকে কালো, ছোট মুখ, চোয়ালের হাড় উঁচু, মাঝারি মাপের চ্যাপ্টা নাক, চোখের উপর ত্বকের বাড়তি ভাঁজ থাকলেও তা অপরাপর মঙ্গোলয়েডদের মত গভীর নয়। এই বিশেষ ধরনটি পূর্ব-হিমালয় অঞ্চলে, বিশেষ করে উত্তর পূর্বাঞ্চলের নাগাদের মধ্যে দেখা যায়। গুহের মতে এরাই সবচেয়ে প্রাচীন মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর মানুষ। (খ) গোল-মাথা প্যালি মঙ্গোলয়েড, যারা খর্বাকার এবং যাদের গায়ের রঙ অধিকতর কালো, গোল মুখ এবং চোখের ত্বকের উপর বাড়তি ভাঁজ স্পষ্টতর। এই ধরনটি চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা অঞ্চলের চাকমা ও মগদের মধ্যে পাওয়া যায়। (গ) টিবেটো-মঙ্গোলয়েড, যারা তুলনামূলকভাবে দীর্ঘাকার এবং যাদের চোখের উপর ত্বকের বাড়তি ভাঁজ খুবই স্পষ্ট, চওড়া মুখ ও মাথা, নাক দীর্ঘ হলেও অগ্রভাগ চাপা। এই ধরনটি সিকিম, ভুটান ও দার্জিলিং জেলায় পাওয়া যায়।

মেডিটারেনিয়ান বা ভূমধ্যসাগরীয় জনগোষ্ঠী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (ক) প্যালি-মেডিটারেনিয়ান, যাদের মধ্যম আকার, লম্বা মাথা, একহারা শরীর, ছোট অথচ চওড়া নাক, দেহে ও মুখে চুলের ভাগ কম এবং কালো-অভিমুখী গায়ের রঙ। এই ধরনটি দক্ষিণ ভারতের তামিল ভাষীদের মধ্যে পাওয়া যায়। (খ) যথার্থ-মেডিটারেনিয়ান, যাদের মধ্যম থেকে দীর্ঘ আকার, লম্বা মাথা, ছোট অথচ চওড়া নাক, ধনুরাকার ভুরু, উপবৃত্তাকার কপাল, লম্বাটে মুখের গড়ন, সুগঠিত চিবুক, দীর্ঘ চোখ, চোখের তারার রঙ গাঢ় বাদামী থেকে কালো এবং ত্বকের বর্ণ হাল্কা কালো থেকে অলিভ বাদামী। এই ধরনটি উত্তর ভারতের সর্বত্র উপজাতীয় নয় এমন মানুষের মধ্যে ব্যাপক-ভাবে বর্তমান। (গ) ওরিয়েন্টাল, যাদের দৈহিক লক্ষণ যথার্থ-মেডিটারে-নিয়ানদের অনুরূপ, কেবল নাসিকা দীর্ঘ ও উত্তল। সিন্ধু, পাঞ্জাব ও রাজস্থানে এই ধরনটি পাওয়া যায়।

ওয়েস্টার্ন ব্রাকিসেফাল বা পশ্চিমী গোলমুণ্ডরা তিন শ্রেণীর। (ক) আল্পিনয়েড, যারা মধ্যম আকার এবং যাদের ছোট ও চওড়া ধরনের মাথা, গোল মুখ, প্রকট নাক, মুখে দাড়িগোঁফ এবং দেহে কেশ পর্যাপ্ত। এই ধরনটির পরিচয় পাওয়া যায় গুজরাত ও বঙ্গদেশে। (খ) দিনারিক, যারা তুলনামূলকভাবে দীর্ঘাকার এবং যাদের মাথা আল্পিনয়েডদের তুলনায় কম চওড়া, ঢালু কপাল, লম্বাটে মুখ, নাসিকামূল ঈষৎ চওড়া এবং কপাল থেকে অনেকটা সোজাসুজি প্রলম্বিত, ত্বক, কেশ ও চক্ষু আল্পিনয়েডদের তুলনায় কালো। এই ধরনটি কুর্গ অঞ্চলে. কাথিয়াবাড়, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকে

দেখা যায়। বঙ্গদেশ, বিহার ও উড়িষ্যায় এই ধরনটির সঙ্গে মেডিটারেনিয়ানদের সংমিশ্রণ ঘটেছে এবং গুজরাতে আল্পিনয়েডদের। (গ) আর্মিনয়েড, যাদের আকার দিনারিকদের চেয়ে ছোট, ভারি ধরনের গড়ন এবং নাকের উত্তলতা এত বেশি প্রকট যে এটাই দিনারিকদের সঙ্গে এদের পার্থক্যের পরিচায়ক। আর্মিনয়েড উপাদানটি মোটামুটি বোম্বাই অঞ্চলের পাশীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

নর্ডিক জনগোষ্ঠীর মানুষদের সুসংবদ্ধ দৃঢ় দেহ, দীর্ঘ আকার, লম্বা মাথা, উপবৃত্তাকার কপাল, সুচিহ্নিত ভুরু, লম্বাটে মুখ, শক্ত চিবুক, সরু নাক কপাল থেকে সোজাসুজি প্রলম্বিত, গায়ের রঙ গোলাপী সাদা থেকে হাল্কা বাদামী, চোখের তারা হাল্কা বাদামী থেকে নীল, চুলের রঙ বাদামী থেকে •সামান্য লালের দিকে। নর্ডিকদের পরিচয় পাওয়া যায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কাফিরিস্তান ও চিত্রলে। এই নৃগোষ্ঠীকে আর্য হিসাবে গণ্য করার একটা সংস্কার পণ্ডিত এবং অপণ্ডিত উভয় মহলেই বর্তমান। আর্য সমস্যা নিয়ে আমরা পরে বিস্তৃত আলোচনা করব।

বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর দৈহিক পার্থক্য সুপ্রাচীনকালের জাতিবর্ণপ্রথার একটা বড় উপাদান হিসাবে কাজ করেছে। এই নৃগোষ্ঠীগুলির পারস্পরিক সংঘাত ও জয়পরাজয় জাতিবর্ণপ্রথার কাঠামোয় বিভিন্ন জাতির স্থান নির্দিষ্ট করার পক্ষে সহায়ক হয়েছে। ভারতের প্রাগৈতিহাসিক ও প্রায়-ঐতিহাসিক যুগের মানুষদের নৃগোষ্ঠী নির্ণয়ের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে প্রাপ্ত কংকালগুলিই আমাদের একমাত্র সম্বল। গুজরাতের লংঘনজ থেকে প্রাপ্ত কংকালসমূহ দুটি জনগোষ্ঠীর পরিচয় দেয়—প্যালি-মেডিটারেনিয়ান এবং প্রোটো-অস্ট্রালয়েড। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে সিউএল এবং গুহ মোহেঞ্জোদরোর ২৬টি কংকাল পরীক্ষা করে চারটি ধরন চিহ্নিত করেন—প্রোটো-অস্ট্রালয়েড, মেডিটারেনিয়ান, আল্পাইন গোষ্ঠীর মঙ্গোলীয় শাখা এবং আল্পাইন। ১৯৩৮-এ গুহ এবং বসু ১৫টি কংকাল পরীক্ষা করে প্রোটো-অস্ট্রালয়েড ও মেডিটারেনিয়ান উপাদান পান। ১৯৭০-এ কাম্পিয়েরি মোহেঞ্জোদরোর অধিকাংশ কংকালকেই মেডিটারেনিয়ান বলে সনাক্ত করেন। হরপ্পার সিমেট্রি-এইচ, সিমেট্রি আর-৩৭, ঢিবি-এলাকা এ-বি এবং জি ২৮৯ এলাকা থেকে প্রাপ্ত কংকালগুলিও মেডিটারেনিয়ান ধর্মী, কিছু প্রোটো-অস্ট্রালয়েড উপাদানও আছে, সামান্য কিছু চওড়া মাথা বিশিষ্ট আল্পোদিনারিকও আছে। লোথালে প্রাপ্ত কংকালসমূহ তিন ধরনের—প্রোটো নর্ডিক, মেডিটারেনিয়ান এবং আল্পিনো-আর্মিনয়েড। মহারাষ্ট্রের নেভাসা,

অন্ধ্রপ্রদেশের পিকলিহাল, মাস্কি, রাইগির ও এল্লেশ্বরম, কর্ণাটকের তেক্কল-কোটা ও ব্রহ্মগিরি, তামিলনাড়ুর আদিত্যনাল্লুর প্রভৃতি স্থান থেকে প্রাপ্ত কংকালসমূহ প্রধানত মেডিটারেনিয়ান ও প্রোটো-অস্ট্রালয়েড নৃগোষ্ঠীর পরিচয় দেয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে পূর্বোক্তরাঞ্চলের মঙ্গোলয়েড ছাড়া অবশিষ্ট ভারতে বেশ কয়েকটি নৃগোষ্ঠী প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই বর্তমান ছিল, যাদের মধ্যে দুটি ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। সম্ভবত এই নৃগোষ্ঠীগুলিকে কেন্দ্র করেই প্রাচীনতম বর্ণভেদপ্রথা গড়ে উঠেছিল।

৩ ॥ ভাষাগত শ্রেণীবিভাগ

জাতিবর্ণপ্রথার ক্ষেত্রে নৃগোষ্ঠীগত উপাদান যতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে, ততটা না হলেও এই প্রথার বিকাশের মূলে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর এবং সেগুলির অন্তর্গত ভাষা ও উপভাষাসমূহের দান বড় কম নয়। ভারতে প্রচলিত ভাষা ও উপভাষার সংখ্যা ৮৪৫। যদিও ভাষার সঙ্গে জাতিবর্ণের কোন অনিবার্য কার্যকারণ সম্পর্ক নেই, এবং একই ভাষায় কথা বলে এরকম জনসমাজের মধ্যে বহু জাতি সমন্বিত জাতিকাঠামো বর্তমান (বঙ্গভাষী, ওড়িয়া ভাষী, তামিল ভাষী যে কোন জনসমাজের ক্ষেত্রেই যা দেখানো যায়), তৎসত্ত্বেও ভারতীয় ভাষাসমূহের বিবর্তন, জনজীবনে সেগুলির বিশেষ ভূমিকা, ভৌগোলিক বন্টন এবং সাংস্কৃতিক বিষয়বস্তু জাতিপ্রথার বিবর্তনের উপর বিশেষ আলোকপাত করে। প্রতিটি প্রধান ভাষারই একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল আছে, এবং সেগুলি থেকে নিষ্পন্ন উপভাষাসমূহের অন্তর্গত জনগোষ্ঠীসমূহ তাদের জীবনচর্যার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতি হিসাবে পরিগণিত হয়েছে এবং জাতিকাঠামোয় স্থান পেয়েছে। এছাড়া ভারতের ভাষাসমূহ যে চারিটি মূল পরিবার থেকে উদ্ভূত—যথা আর্য, দ্রাবিড়, কোল বা অস্ট্রিক এবং ভোটব্রহ্ম বা তিব্বতী-চৈনিক বা মঙ্গোলীয়—প্রতিটি পরিবারেরই কিছু না কিছু সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সংশ্লিষ্ট জাতিসমূহের আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয়ত, এটাও লক্ষণীয় যে জাতিকাঠামোর উপরের স্তরগুলিতে আর্যভাষাসমূহেরই অধিকতর প্রাধান্য। এছাড়া সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই ব্রাহ্মণ্য ধ্যানধারণা ও জীবনাদর্শের বিকাশ ঘটেছে. শাস্ত্রচর্চা ও জ্ঞানানুশীলনের ভাষা হিসাবে সংস্কৃতভাষাই নিজেকে সর্বাত্মকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে, শুধু তাই নয় অপরাপর পরিবারের ভাষাসমূহের ক্ষেত্রেও সংস্কৃতের অনুপ্রবেশ হয়েছে। জাতিকাঠামোয় ব্রাহ্মণপ্রাধান্যর মূলে সংস্কৃত ভাষার দান কম নয়।

সংস্কৃত প্রাচীন আর্যভাষার একটি পরিশুদ্ধ রূপ যা কোন দিনই কথ্য ভাষা রূপে ব্যবহৃত না হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞানচর্চা ও ভাবের আদান-প্রদানের ভাষা হিসাবে যুগের পর যুগ ধরে সারা ভারতের শিক্ষিত মানুষদের একসূত্রে গ্রথিত করেছে। জাতিকাঠামোর সর্বোচ্চ ও সবচেয়ে শক্তিমান ও প্রভাবশালী স্তরটি বহুলাংশে সংস্কৃত ভাষার দৌলতেই গড়ে উঠেছে। জাতিপ্রথা নিয়ে যাঁরাই কাজ করেছেন তাঁরাই স্যাংস্কৃটাইজেসন বা সংস্কৃতকরণের প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। জাতিপ্রথার উদ্ভবের সঙ্গে সম্পর্কিত না হলেও প্রচলিত জাতি-কাঠমোয় মর্যাদার মাত্রা কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সংস্কৃতকরণের মাত্রার নিরিখেই নির্দিষ্ট হয়েছে। কিন্তু এই কাঠামোর উপরের সোপানটির ভাষাগত সম্পর্কের ব্যাপারে আমরা যতটা স্থির-নিশ্চয়, নিম্নতর সোপানগুলির ক্ষেত্রে ততটা নয়। প্রাচীন আর্য ভাষার ব্যবহারিক দিকসমূহ ও ভৌগোলিক বিন্যাস-জাত যে সকল প্রাকৃত ও অপভ্রংশ গড়ে উঠেছিল (যেমন শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধমাগধী, আবন্তী, টাক্কী, কেকয়া, ব্রাচড়, গৌড়, উড্রী প্রভৃতি) সেগুলিকে অবলম্বন করেই আঞ্চলিক ভাষাসমূহের বিকাশ ঘটেছিল। এই সকল আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে যেগুলি প্রধান সেগুলি ব্যাপকভাবে বহু জাতিবর্ণকে অন্তর্ভুক্ত করলেও, যেগুলি অপ্রধান ও বিচ্ছিন্ন সেই সকল ভাষা দু'একটি উপজাতি বা দু'একটি জাতির ক্ষেত্রেই একান্তভাবে সীমাবদ্ধ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হিমালয় অঞ্চলের চামেয়ালী, কুলুই, সিরমৌরি, জৌনসারি, কিউন্থলী, মান্দেয়ালী, গাহ্‌রবালী, কুমায়ুনী, গোর্খালী বস্তার জেলার হালবি, উত্তর-পশ্চিমের হিন্দকী বা লহন্দ, রাজস্থানের কয়েকটি ভীল উপভাষা আর্য পরিবারের অন্ত-র্গত হলেও এগুলি একান্তভাবেই এক একটি বিশেষ উপজাতিনির্ভর ভাষা হিসাবেই গড়ে উঠেছিল। আমরা পরে দেখব যে এদেশে বহুক্ষেত্রেই জাতির সঙ্গে উপজাতির, বিশেষ করে জাতিকাঠামোর নীচের তলায়, ব্যবধান খুব স্পষ্ট নয়। বাইরের প্রভাবে উপজাতিদের মধ্যেও জাতি বর্ণ প্রথা গড়ে উঠলেও তার কাঠামোটা বৃহত্তর জনসমাজের জাতিকাঠামোর মত সুবিস্তৃত কোন দিনই নয়। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, একটি বিশেষ ভাষাভিত্তিক উপজাতি, যখন জাতিপ্রথার আওতায় আসে, হয় গোটা উপজাতিটাই একটি জাতি হয়ে যায়, না হয় তারা এমন একটি জাতিকাঠামো গঠন করে যেখানে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষেরাই প্রধান জাতি, অল্প কিছু কয়েকটি উচ্চতর মর্যাদার জাতি, এবং অল্প কিছু নিম্নতর মর্যাদার জাতিতে পরিণত হয়।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌, নৃতত্ত্ববিদ্‌ এবং ভাষাতত্ত্ববিদদের একাংশ তাঁদের গবেষণার

মাধ্যমে এমন একটি ধারণা গড়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন যে ভারতবর্ষের মত একটি বিরাট উপমহাদেশ আদিতে জনশূন্য ছিল যেখানে বিভিন্ন যুগে নানা জনগোষ্ঠীর মানুষেরা বাইরে থেকে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। এঁদের উদ্দেশে একটু ব্যঙ্গের ছলেই সার আর্থার কীথ একদা বলেছিলেন : এটা বলতে বড় অদ্ভুত লাগে যে যাঁরা ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যকার পার্থক্য-সমূহকে জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করতে চান তাঁদের সকলেই এই সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন এই উপমহাদেশের বাইরে। তাঁরা এই অনুমানের ভিত্তিতে অগ্রসর হয়েছেন যে মানবজাতির বিবর্তন বহু পূর্বকালে ও বহু দূরবর্তী স্থানে শুরু হয়েছিল, কিন্তু নৃতত্ত্বের স্বর্গরাজ্য ভারতবর্ষে কদাচ হয়নি। যদিও ভাষার সঙ্গে কোন নৃগোষ্টীর কোন অনিবার্য কার্যকারণ সম্পর্ক নেই (যেমন দ্রাবিড়ভাষী ওঁরাও ও অস্ট্রিকভাষী মুন্ডারা একই নৃতাত্ত্বিক-জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত, উভয়কেই সামাজিক অবস্থা, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির সাদৃশ্য প্রচুর, কিন্তু ভাষা পৃথক) তথাপি বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর সঙ্গে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মানুষদের সম্পর্কিত করার চেষ্টা হয়েছে, যেমন মঙ্গোলয়েডদের সঙ্গে ভোটব্রহ্ম বা তিব্বতী-চৈনিক ভাষী মানুষদের, প্রোটো-অস্ট্রালয়েডদের সঙ্গে অস্ট্রিকভাষী মানুষদের, মেডিটারে-নিয়ানদের সঙ্গে দ্রাবিড়ভাষী মানুষদের এবং নর্ডিকদের সঙ্গে আর্যভাষী মানুষদের। বলা হয়েছে যে আর্যরা এসেছে দক্ষিণ রাশিয়া বা মধ্য এশিয়ার কোন অঞ্চল থেকে, দ্রাবিড়রা এসেছে ভূমধ্য সাগর ও ঈজিয়ান সাগরের পূর্বাঞ্চল থেকে, অস্ট্রিকরা ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চল থেকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মারফৎ এবং মঙ্গোলীয়রা দক্ষিণ চীন থেকে ব্রহ্মদেশ ও অপরাপর স্থান দিয়ে। এই সকল অনুমানকে অবশ্য এখনও পর্যন্ত প্রমাণসিদ্ধ করা যায়নি।

আর্য ভাষা পরিবারের অন্তর্গত কচ্ছী, কনৌজী, ব্রজ, বুন্দেলী, জাতু, বা বঙ্গারু, খরিবলী, মীরাটী রোহিলখন্ডী, মারবারী, ধুন্ধরী বা জয়পুরী, মেবারী, মালবী, অবধী, বাঘেলী, ছাত্তশগড়ী, মৈথিলী, মাগহী, ভোজপুরী প্রভৃতি ভাষার ক্ষেত্রে ব্যাপক হলেও এবং সেগুলির মধ্যে বহু জাতিবর্ণ অন্তর্ভুক্ত হলেও, এই সকল ভাষায় যারা কথা বলে তাদের অধিকাংশই জাতি-কাঠামোর মাঝের পর্যায়ের অন্তর্গত। পক্ষান্তরে বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া, কাশ্মীরী, গুজরাতী ও মারাঠী ভাষার ক্ষেত্র এত ব্যাপক যে এগুলির সঙ্গে জাতি কাঠামোর কোন পর্যায়কেই বিশেষভাবে সম্পর্কিত করা যায় না।

সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন সকল জাতির মানুষই এই ভাষাগুলির অন্তর্গত। এই বক্তব্য দক্ষিণের চারটি প্রধান দ্রাবিড় পরিবারের ভাষার ক্ষেত্রেও সত্য যেগুলি হল তামিল, তেলুগু, মালয়ালম ও কন্নড়। এই ভাষাগুলির ভৌগোলিক বণ্টনও মোটামুটি সুনির্দিষ্ট। কিন্তু দ্রাবিড় সম্ভূত নানা উপ-ভাষাকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, জাতি ও উপজাতির সংগে বিশেষভাবে সম্পর্কিত করা যায়, যেমন কন্নড়জাত তুলু, কুর্গ অঞ্চলের কোদগু, দক্ষিণাপথের উত্তরাঞ্চলের গোন্দী, উড়িষ্যার কুই বা কন্ধ, ছোটনাগপুরের কুরুখ বা ওরাওঁ, রাজমহল পর্বতাঞ্চলের মালের বা মালপাহাড়ী, বালুচিস্তানের ব্রাহুই প্রভৃতি। একথা অস্ট্রিক বা কোল-মুণ্ডা এবং ভোটব্রহ্ম বা তিব্বতী-চৈনিক ভাষা পরিবারের ক্ষেত্রেও ঘটে। অস্ট্রিক পরিবারের সাঁওতালী, মুণ্ডারী, হো, বিরহোর, ভূমিজ, কুর্কু, শবর, গদাবা প্রভৃতির সংগে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী সমূহকে সনাক্ত করা যায়, যেমন সনাক্ত করা যায় বোদো, নাগা, কুকি-চিন, মিকির প্রভৃতি উপভাষার সংগে পূর্বোত্তরাঞ্চলের নানা জনগোষ্ঠীকে। এই উপভাষা ছাড়াও ভারতে এগুলি থেকে নিষ্পন্ন অনেক বাগ্‌ধারা বর্তমান যেগুলি অনিবার্যভাবেই কোন-না-কোন উপজাতি বা জাতির সংগে একান্ত-ভাবেই সম্পর্কিত। কাজেই এটুকু বলা চলে যে ভাষাভেদ জাতিবর্ণপ্রথার গঠনকারী উপাদান সর্বাংশে না হলেও এই প্রথার ভৌগোলিক ও আঞ্চলিক বণ্টনকে সুনির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে প্রভূত সাহায্য করেছে।

৪॥ পেশা ও বৃত্তিভেদ : উপজাতীয় সমাজের অসমাপ্ত বিলোপ

জাতিপ্রথার যে বৈশিষ্ট্যটি সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে তা হচ্ছে এই যে প্রত্যেক জাতিই কোন না কোন বিশেষ পেশার সংগে সংযুক্ত, এমন কোন জাতি নেই যার কোন জাত ব্যবসা নেই। এই কারণেই নেসফীল্‌ড পেশা-দারীকেই জাতিপ্রথার একমাত্র কারণ বলেছেন। তাঁর মতে বিভিন্ন পেশা-ভিত্তিক গোষ্ঠী জাতিপ্রথার প্রাথমিক ভিত্তি রচনা করেছিল। এই গোষ্ঠীগুলি নিজেদের মধ্যে অন্তর্বিবাহ ও অপরাপর গোষ্ঠীর সংগে খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে কিছুটা স্বাতন্ত্র বজায় রেখে ধীরে ধীরে স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতি হয়ে ওঠে। পেশার গুরুত্ব অনুযায়ী সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে আরও পরে বিভিন্ন স্তর-উপস্তর যুক্ত জাতি কাঠামো গড়ে ওঠে। নেসফীল্‌ড সংগত কারণেই চাতুর্বর্ণের ধারণাকে বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্করহিত কেতাবী ধারণা বলে আখ্যা দিয়েছেন। জাতিপ্রথার উৎস অনুসন্ধানে তিনি সঠিক পদক্ষেপই

করেছিলেন, তবে তাঁর বক্তব্য কিছুটা একপেশে। পেশাভেদ জাতিপ্রথা গঠনের একটি প্রধান, এমনকি সর্বপ্রধান উপাদান হলেও, এই প্রথার আরও কয়েকটি গঠনকারী উপাদান আছে যেগুলিকে নেসফীল্ড হিসাবের মধ্যে আনেননি।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন পেশাদার গোষ্ঠীর পরিচয় প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে ফেক বা পাতশিল্পের নিদর্শনসহ নিম্ন প্রত্নাশ্মীয় সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া গেছে পাঞ্জাবে ও কাশ্মীরে। এছাড়া সিন্ধু ও কেরালা ব্যতিরেকে নিম্ন প্রত্নাশ্মীয় কোপানি (চপার-চপিং) ও হাতকুড়াল শিল্পের বিকাশ দেখা যায় ভারতের সর্বত্র। বাটালি (স্ক্রেপার) ও ভোমর (বোরার) শিল্পের নিদর্শন সহ মধ্য প্রত্নাশ্মীয় সংস্কৃতির ব্যাপক পরিচয় পাওয়া যায় কেরালা ছাড়া ভারতের সর্বত্র। ফলা (ব্লেড) ও খোদক (বুরিন) শিল্পের নিদর্শনসহ উচ্চ প্রত্নাশ্মীয় সংস্কৃতির বিকাশ দেখা যায় অন্ধ্র, কর্ণাটক, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাত, মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশে। ক্ষুদ্রাশ্ম বা মাইক্রোলিথের প্রাধান্যযুক্ত মধ্যাশ্মীয় (মেসোলিথিক) সংস্কৃতি সমূহের নিদর্শন পাওযা গেছে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, কর্ণাটক, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু ও গুজরাতে।

এদেশের নবাশ্মীয়-তাম্রাশ্মীয় পর্যায়েই পেশাদারী-প্রথা গড়ে ওঠে। ভারতে প্রাপ্ত অবিমিশ্র নবাশ্মীয় সংস্কৃতির সংখ্যা বেশি নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পালিশ করা নবাশ্মের সঙ্গে ধাতুর নিদর্শন পাওয়া গেছে, তামা তো বটেই এমনকি লোহা পর্যন্ত। অধ্যাপক সাংকালিয়া ভারতবর্ষের নাবাশ্মীয়-তাম্রাশ্মীয় এলাকাগুলির নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ করেছেন। (১) বিশুদ্ধ-নবাশ্মীয়—আসাম, বঙ্গদেশ, বিহার, কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের কয়েকটি কেন্দ্র যেগুলির বৈশিষ্ট্য প্রস্তর ও অস্থিনির্মিত ভূমিতে ব্যবহারের উপযোগী হাতিয়ার, হস্তনির্মিত মৃৎপাত্র ও কাশ্মীরে বিবরনিবাস। (২) নবাশ্মীয়-তাম্রাশ্মীয়—পশ্চিম অন্ধ্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, বালুচিস্তান ও পূর্ব রাজস্থানের কয়েকটি কেন্দ্র যেখানে পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও ফলাশিল্প, ক্ষুদ্রাশ্ম, তাম্রনির্মিত হাতিয়ার ও কাঠের খুঁটিওয়ালা চালাঘর বর্তমান। (৩) তাম্রাশ্মীয়—অন্ধ্র, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি কেন্দ্র যেগুলির বৈশিষ্ট্য পাথরের ফলাশিল্প, চক্রনির্মিত মৃৎপাত্র, কাঠের খুঁটি-ওয়ালা চালাঘর, তাম্রের উপকরণ, খাদ্য হিসাবে গম, চাল, যব, কলাই, তৈলবীজ প্রভৃতির নিদর্শন। (৪) তাম্রাশ্মীয় ও ব্রোঞ্জ—সিন্ধু, পাঞ্জাব, কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র

ও উত্তর রাজস্থানের কয়েকটি কেন্দ্র যেখানে উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও ব্রোঞ্জের হাতিয়ার ও পাকা ইটের বাড়ির নিদর্শন বর্তমান। (৫) তাম্র-ব্রোঞ্জ— গঙ্গাযমুনা দোয়াব ও দক্ষিণপূর্ব রাজস্থানের কয়েকটি কেন্দ্র যেগুলির বৈশিষ্ট্য চক্রনির্মিত মৃৎপাত্র, তাম্র ও ব্রোঞ্জনির্মিত হাতিয়ার এবং পাথরের ভিত্তির উপর মাটির দেওয়ালযুক্ত আবাস।

তাম্রাশ্মীয় ও ব্রোঞ্জ পর্যায়ের প্রাচীনতম বিশিষ্ট নিদর্শন হরপ্পা সংস্কৃতি যার নানা কেন্দ্র সিন্ধু, পাঞ্জাব, বালুচিস্তান, পশ্চিম-উত্তরপ্রদেশ, উত্তর-রাজস্থান ও গুজরাতে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সংস্কৃতির বিকাশকাল ২৩৫০ থেকে ১৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। এই সংস্কৃতির ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক হবার জন্য এবং বিস্তীর্ণ এলাকার নিদর্শনসমূহের মধ্যে চাঞ্চল্যকর সমজাতীয়তার জন্য, একে সভ্যতা আখ্যাও দেওয়া হয়। এই সভ্যতার আবিষ্কৃত কেন্দ্রের সংখ্যা সত্তরেরও বেশি। এই এলাকার সবটুকু যে একই শাসনব্যবস্থার অন্তর্গত ছিল এটা না মানলে বিভিন্ন দূরবর্তী স্থানসমূহ থেকে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির সাদৃশ্যের ব্যাখ্যা করা যায় না। নগর পরিকল্পনার দিক থেকে হরপ্পা ও মোহেঞ্জোদরোর সাদৃশ্য প্রমাণ করে যে নগর দুটি যুগ্ম রাজধানী হিসাবে ব্যবহৃত হত। ওই নগর দুটি ছাড়া ওই রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্তর্গত ছিল কিছু ছোট নগর এবং অসংখ্য গ্রাম। ওই গ্রামগুলির উদ্বৃত্তে নগরগুলি জীবিত ছিল। অত্যন্ত সুবিস্তৃত কৃষিকাজের পটভূমিকা ছাড়া এই নগর সভ্যতার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভবপর নয়। খাদ্য-উৎপাদনের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব থেকে বহুসংখ্যক মানুষ মুক্ত না পেলে নগরজীবন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। দৃশ্যতই হরপ্পা ও মোহেঞ্জোদরো নগরদ্বয় ঘনবসতিপূর্ণ ছিল। নগরবাসী বলতে শাসক সম্প্রদায়, পুরোহিত, সওদাগর, দোকানদার, কারিগর ও শ্রমিকদের বোঝাত। হরপ্পার সমাজ ছিল শ্রেণীবিভক্ত, যা স্পষ্টতই ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রমাণিত হয়। অভিজাত ও সমৃদ্ধিশালী লোকদের সারিবদ্ধ প্রাসাদসমূহ যেমন দেখা গেছে, তেমনই দেখা গেছে নগরীর উপকণ্ঠে শ্রমিকদের বস্তি।

গর্ডন চাইল্ডের মতে নবাশ্মীয় পর্যায় থেকেই উৎপাদন ক্ষেত্রে উদ্বৃত্তের সূত্রপাত ঘটেছে। পাকাপোক্ত গ্রামনিবেশ মানব-ইতিহাসের এই পর্যায়েই হয়েছিল এবং ভূমির উদ্বৃত্ত ব্যবহৃত হতে শুরু করেছিল কয়েকটি নূতন অর্থনৈতিক শ্রেণীর দ্বারা যারা প্রত্যক্ষভাবে খাদ্য-উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত ছিল না। এই শ্রেণীগুলি ছিল কারিগর, পুরোহিত, পরিচালক, বণিক প্রভৃতি

যাদের হাতে সামাজিক জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল। এই গুণগত পরিবর্তনটি ত্বরান্বিত হয়েছিল তামা ও ব্রোঞ্জ ও পরবর্তীকালে লোহের আবিষ্কারের পর। হরপ্পা-উত্তর তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতি কেন্দ্রগুলিতে হরপ্পার মতই বিভিন্ন পেশাদারীর পরিচয় পাওয়া যায়। হরপ্পা সভ্যতায় প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহের বৈচিত্র দেখে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না যে ভারত ও ভারতের বাইরের নানা দেশের সংগে এই সভ্যতার বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। ইরাকে প্রাপ্ত প্রায় তিরিশটি হরপ্পীয় সীল ওই দেশের সংগে হরপ্পীয়দের বাণিজ্য সূচিত করে। মেসোপোটামীয় লিখিত উপাদানসমূহে উরের তৃতীয় বংশের এবং পরবর্তী লারসা বংশের সমকালীন হরপ্পার সংগে ওই অঞ্চলের বাণিজ্য সম্পর্কের ইংগিত পাওয়া যায়। হরপ্পা সভ্যতায় বিভিন্ন পেশাদারীর উত্তম বিকাশ না ঘটলে এত দূরবর্তী দেশের সংগে বহির্বাণিজ্যের সম্পর্ক স্থাপন অসম্ভব।

প্রাচীন তামিল ভাষায় আদি দ্রাবিড় যে কয়েকটি শব্দ টিঁকে আছে তা থেকে ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে সুপ্রাচীনকালে রাষ্ট্র ব্যবস্থা, শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ও নানা ধরনের পেশাদারীর পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন দ্রাবিড়ভাষী মানুষেরা রাজাদের (কো, বেন্তান, মন্নন) অধীনে বাস করত, যে রাজাদের নিবাস ছিল দুর্গ (কোট্টই, অরণ) এবং যাদের রাজত্ব ছোট ছোট অঞ্চল বা জেলায় (নাটু) বিভক্ত ছিল। তাদের সমাজে চারণ কবি (পুড়বন) ছিল যারা বিভিন্ন উৎসবে (কোল্টাত্তম, তিরুভিজ) গান (চেম্মাল) গাইত। তাদের লিখনভংগী (ইরুকু), লেখার বিষয়বস্তু (বরই) এবং বর্ণমালা (এরুট্টু) ছিল, লেখার ক্ষেত্র ছিল তালপাতা (ওড়ই) এবং সেগুলি একত্রে সংগ্রহ করে পুস্তক (এটু) গ্রন্থনা করা হত। তারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করত যাঁকে তারা সম্বোধন করত রাজার উপাধি (কো) দিয়ে এবং যাঁর সম্মানে তারা মন্দির (কোইল, কোবিল) নির্মাণ করত। তাদের আইন ও রীতিনীতি (কট্টলই, পঝক্কম) ছিল এবং তাদের মধ্যে বিবাহপ্রথা বর্তমান ছিল। তারা প্রচলিত ধাতুসমূহের ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল। অনেকগুলি গ্রহও তাদের পরিচিত ছিল যেমন শুক্র (বেৰ্ঢ়ি) মংগল (চেম্বয়) এবং বৃহস্পতি (বিয়াঝম)। তারা ঔষধের (মরুন্ত) ব্যবহার জানত, বাস করত গ্রামে (পড়্ড়ি) অথবা নগরে (উর, কোট্টই'), নৌকা এমনকি জাহাজেরও (তোনি, ওটম, বল্লম, কপ্পড়, পটবু) ব্যবহার জানত, লাংগল (এন্ন) এবং কৃষির (বেলন-মই) সংগে পরিচিত ছিল। যুদ্ধে তারা ধনুক (বিল), তীর (অম্পু), বর্শা (বেড়) এবং তরবারি (বাড়) ব্যবহার করত। তারা সুতো কাটতে (নুল), বস্ত্রবয়ন (নেয়্) করতে

এবং কাপড় রঙ করতে (নিরম) অভ্যস্ত ছিল। উল্লিখিত সামান্য কয়টি শব্দ থেকেই প্রাচীন দ্রাবিড় সমাজে পেশাদারী ভেদের পরিচয় পাওয়া যায়।

বৈদিক সাহিত্যে নানাপ্রকার পেশার উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে সূত্রধর (১।১৬১।৯, ৩।৬০।২, ১০।৮৬।৫), ধাতুশিল্পী, কুম্ভকার, চর্মকার (চর্মম্না ৮ ৫ ৩৮), নাপিত (বপতৃ), শিকারী, কসাই (শমিতৃ), পুরোহিত, কুসীদ-জীবী ও রথকারের (কৃষক, পশুপালক, শ্রমজীবী, কর্মচারী ও যোদ্ধা ছাড়াও) উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয় (৩।৪) ও বাজসনেয়ী (৩০) সংহিতায় পুরুষমেধ যজ্ঞ প্রসঙ্গে নানা পেশার মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় যথা পরিচারক (অনু-ক্ষতৃ অনুচর), বাদক, যারা কাঁটা ও কাঠি দিয়ে মাদুর প্রভৃতি তৈরি করে, জ্যোতিষী, কসাই, কৃষক, পশুপালক, শিকারী, ধাতুশিল্পী, সূত্রধর কাষ্ঠ-সংগ্রাহক, অগ্নি-দর্শক (দাবপা), সূচীশিল্পী, মুক্তিপ্রস্তুতকারী, স্বর্ণকার, মণিকার, অশ্ব ও হস্তী প্রতিপালক, নৌকার মাঝি, রজক, যারা আবর্জনা সাফ করে, কুম্ভকার, কুসীদজীবী, বংশীবাদক, নাপিত, রাঁধুনি, দূত প্রভৃতি। কাঠক সংহিতা (১৭/১৩), তাণ্ডব্রাহ্মণ (৩/৪) ও অপরাপর বৈদিক গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন পেশার নিম্নোক্ত তালিকা পাওয়া যায়—অজপাল, অয়স্তাপ, অযোগা, অবিপাল, আন্দ, ইষুকার, উগ্র, কণ্টক (কণ্টকীকারী), কর্মার, কারি, কিতব, কিরাত, কিনাস, কুলাল (কৌলাল), কেবর্ত, কোশকারী, ক্ষতৃ, গোপাল, চর্মম্না, চণ্ডাল, জম্ভক, জ্যাকার, তক্ষণ, দাস, ধনুষ্কার (ধন্বকার, ধন্বকৃত), ধৈবত, নিষাদ, (নৈষাদ), পুংশ্চলূ, পুঞ্জিষ্ট (পুঞ্জিষ্ঠ), পৌল্কস, বৈন্দ, ভিষক, ভিমল, মণিকার, মাগধ, মার্গার, মৃগায়ু, মৈনাল, রজয়িত্রী, রজ্জুসর্গ (রজ্জুসর্জ), রথকার, রাজপুত্র, রেভ, বংশনর্তী, বাপ, বাণিজ, বাস-পল্পলী, বিদলকারী, শবর, সাবল্য, শৈলষ, স্বনিন্ (স্বনিত), সংগ্রহিতৃ, সুরাকার, সূত, সেলগ এবং হিরণ্যকার।

বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত বিভিন্ন বৃত্তির তালিকায় এমন কয়েকটি বৃত্তির নাম আছে যেগুলি আসলে কোন উপজাতি বা ভূখণ্ডের নামের দ্যোতক যেমন অন্ধ্র, পৌণ্ড্র, পুলিন্দ ইত্যাদি। এই বৃত্তিগুলি সঠিক কি ছিল তা জানার উপায় নেই, তবে অনুমান করতে অসুবিধা নেই যে এগুলি এমন কোন পেশা বা বৃত্তি ছিল যা ওই সকল উপজাতির একচেটিয়া ছিল এবং তাদেরই নামে বৃত্তিগুলির পরিচিতি ঘটেছিল। ঋগ্বেদে উল্লিখিত 'পঞ্চকৃষ্টির' ব্যাখ্যা যাস্ক করেছেন 'পঞ্চমনুষ্যজাতানি' বলে, যার অর্থ চাতুর্বর্ণ সহ পঞ্চমবর্ণ নিষাদ (নিরুক্ত ৩ ৮, ১০।১৩, বৃহদ্দেবতা ৭।৬৯)। টীকাকার মহীধর বাজসনেয়ী

সংহিতায় (১৬।২৭, ৩০।৮) বর্ণিত নিষাদদের ভীল্ল বা ভীল বলে উল্লেখ করেছেন। মহাভারতে নিষাদদের বিন্ধ্য অঞ্চলের অধার্মিক বাসিন্দা বলে উল্লেখ করা হয়েছে (১২।৫৯।৯৪-৯৭)। পুরাণসমূহে তারা বর্ণিত হয়েছে কৃষ্ণকায়, ক্ষুদ্রাকার, কঠিন চোয়াল, চাপা নাক, লাল চোখ ও তাম্রাভ কেশযুক্ত হিসাবে (বিষ্ণু ১।১৩, ভাগবত ৪।১৪ ৪৪)। এই নিষাদদের বংশধর হিসাবে ভারতের মধ্যাঞ্চলের উপজাতিদের উল্লেখ করা যায় যাদের মধ্যে ভীল ও লম্বাদিদের এলাকা মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান জুড়ে। ভীলরা পূর্বে শিকার ও লুণ্ঠনজীবী ছিল, পরে কৃষিবৃত্তিকে অবলম্বন করে জাতিকাঠামোয় স্থান পায়। লম্বাদিরা পশুপালক, যাযাবরধর্মী, বণিকবৃত্তি ও চুরিডাকাতি করে থাকে। রাজস্থানের মীনা উপজাতি মূলত দস্যুবৃত্তির উপর নির্ভরশীল। মেও, মের এবং মেরাটরা কৃষিজীবী। পশ্চিম ভারতের আরণ্যক উপজাতিদের মধ্যে চোধ্রা, কটকরি প্রভৃতিরা পেশার দিক থেকে সংগ্রহজীবী। সাতপুরা পর্বতমালার উভয় দিকে এবং মৈকাল পার্বত্য অঞ্চলে কোর্কু, আগারিয়া, পরধান, বাইগা প্রভৃতিদের সাক্ষাৎ মেলে। মধ্যভারতের গোন্দ, কাওয়ার ও আরও একটু পূর্বদিকের ওরাওঁ, মুণ্ডা, খারিয়া, হো, ভুইয়া, সাঁওতাল, মালের প্রভৃতি উপজাতি পাকাপোক্ত কৃষিজীবী। ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার সংগে পরিচিত হবার ফলে মুণ্ডা ও অপরাপর কোলভাষী উপজাতিসমূহের জীবনে জাতিপ্রথার প্রভাব দেখা যায়। মুণ্ডা রাজারা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবি করে।

শবরেরা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৭।১৮) ও শাংখায়ন শ্রৌতসূত্রে (২৫।২৬ ৬) শিকারজীবী উপজাতি হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে, এবং অন্ধ্র, পুলিন্দ, মূতিব ও পুণ্ড্রদের সংগে তাদেরও দস্যু আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বাণভট্টের হর্ষচরিতে শবর যুবকের চমৎকার দৈহিক বর্ণনা আছে। পুরাণসমূহের জনপদতালিকায় শবরদের বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণাঞ্চলের বাসিন্দা বলা হয়েছে। টলেমি (৭।১।৮০) শবরদের উল্লেখ করেছেন বিন্ধ্যের উপরে গংগাভিমুখী অঞ্চলের বাসিন্দা হিসাবে। শবরদের মত পুলিন্দদেরও দাক্ষিণাত্যের শিকারজীবী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে (মহাভারত ১২।২০৭।৪২, মৎস্য ১১৪।৪৬-৪৮, বায়ু ৪৫।৪৮) যারা কাঁচা মাংস ও বন্যফলভোজী (টলেমি ৬।১।৬৪) এবং বিশুদ্ধ উপজাতীয় পর্যায়ভুক্ত (বৃহৎ সংহিতা ৪।২২ ; ৫।৩৯, ৭৭-৮৮ ; ৯।১৭, ২৯, ৪০ ; ১৬।২, ৩৩)। পুরাণসমূহের জনপদতালিকায় কিরাতদের উত্তরাপথ-বাসী ও পর্বতাশ্রয়ী হিমালয় অঞ্চলের বাসিন্দা বলা হয়েছে। বাজসনেয়ী

সংহিতা ৩০।১৬, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩।৪।১২।১, পেরিপ্লাস ৬২, টলেমি ৭।২।২ প্রভৃতিও দ্রষ্টব্য। বস্তুত কিরাত বলতে হিমালয় ও পূর্বোত্তরাঞ্চলের নানা উপজাতিকে বোঝায় যারা উৎপাদন ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে আটকে আছে। শবর ও পুলিন্দ বলতে বিন্ধ্যের দক্ষিণাঞ্চল ও উপকূলবর্তী অঞ্চল সমূহের উপজাতিদের বোঝায়, যদিও শবর, পুলিন্দ ও কিরাত শব্দত্রয় ব্যাপকতর উপজাতীয় সমাজ অর্থেও প্রযুক্ত হয়।

শবর বা শাওরা নামে একটি উপজাতি আজও বাস করে পূর্বঘাট অঞ্চলে, মধ্যপ্রদেশে ও উড়িষ্যায়। এরা কৃষিজীবী এবং সোজাসুজি জাতিকাঠামোর স্থান পেয়ে গেছে। শবর পর্যায়ের অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যে ছোটনাগপুরের বিরহোররা আজও সংগ্রহজীবী, কৃষিকাজ ও পশুপালনে অনভ্যস্ত। পূর্বঘাট ও উড়িষ্যার পার্বত্য অঞ্চলের খন্দ, ভুইয়া ও ভূমিজরা কৃষিজীবী। উড়িষ্যার জুয়াংগদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা নিম্নধরনের কৃষিজীবী হওয়া সত্ত্বেও সেই বৃত্তি থেকে তাদের উৎখাত ঘটেছে, কেননা অগ্রসর মানুষেরা তাদের জমিজমা কেড়ে নেওয়ার ফলে, পিছু হটতে হটতে তারা ঝুড়ি তৈরিকেই বৃত্তি হিসাবে নিয়েছে। মালাবার জেলার আরনাদানরা বহুলাংশে শিকারজীবী ও সংগ্রাহক। ওয়েনাদ তালুকের পানিয়ারা মূলত শিকার ও সংগ্রহজীবী হলেও বিভিন্ন সময়ে তারা উন্নততর জনসমাজের কাছে শ্রম বিক্রয় করে। মুথুবান, কান্নিকর, ইরুলা, সোলাগা, মালাসের, কাদার প্রভৃতি দক্ষিণের উপজাতিরা শিকার ও সংগ্রহের পাশাপাশি জুমজাতীয় চাষ করে ও নৈমিত্তিক কৃষিকাজ করে। অন্ধ্রপ্রদেশের চেঞ্চুদের ক্ষেত্রে সংগ্রহ ও শিকারজীবী পর্যায় থেকে কৃষিজীবী পর্যায়ে উত্তরণের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের একটা বড় অংশ এই পরিবর্তনকে মেনে নিতে না পেরে দুর্গমতম অঞ্চলসমূহে পশ্চাদপসরণ করে এবং ইয়েনাদি নামে পরিচিত হয়। নীলগিরি পাহাড়ের উপজাতিদের মধ্যে টোডারা বিশুদ্ধ পশুপালনজীবী। পার্শ্ববর্তী কোটারাও মুখ্যত পশুপালক। কিন্তু তারা অপরাপর বৃত্তিতেও অভ্যস্ত। ওই একই অঞ্চলের বাদাগারা উৎকৃষ্ট কৃষিজীবী। এই তিনটি উপজাতিই নিজস্ব উৎপাদিত পণ্য একে অপরের সঙ্গে বিনিময় করে, এবং এইভাবে তারা একটা এলাকাভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। কোটারা কারিগরী শিল্পসমূহের ক্ষেত্রে রীতিমত দক্ষ এবং তাদের মধ্যে বেশ উঁচুমানের কর্মকার, কুম্ভকার ও সূত্রধরের পরিচয় পাওয়া যায়। ওয়েনাদ অঞ্চলের উরালি-কুরুম্বরা লোহার কাজে দক্ষ। এছাড়া কাঠের কাজ, মাটির পাত্র তৈরি এবং ঝুড়ি তৈরির

পেশাও তাদের মধ্যে বর্তমান। অন্ধ্র ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের গদাবা উপজাতির মেয়েরা বৃক্ষজাত তন্তু দিয়ে বস্ত্রবয়ন করে। তামিলদের মধ্যে কম্মালন বা পঞ্চাল জাতি কারিগরি দক্ষতার জন্য প্রসিদ্ধ। অন্ধ্র ও কর্ণাটকের কুরুবরা মেষপালন ও পশমজাত সামগ্রী প্রস্তুত করে। মালাবার অঞ্চলের টিয়ার ও তামিল শাননরা তাড়ি-নিষ্কাষণ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। পামান, মালয়ার ও পারোবাদের বৃত্তি টোটকা চিকিৎসা।

প্রাচীন সাহিত্যে বর্ণিত সংস্কৃতির নিম্নতর পর্যায়ে আবদ্ধ জনগোষ্ঠী-সমূহের এবং তাদের বংশধর হিসাবে যে সকল উপজাতীয় জনগোষ্ঠী আজও ভারতের নানাস্থানে ছড়িয়ে আছে তাদের উৎপাদন ব্যবস্থা ও বৃত্তিসমূহের একটি রূপরেখা এখানে দেওয়া হল। আমরা পরে দেখব যে জাতিপ্রথা, বিশেষ করে জাতি কাঠামোর মধ্য ও নিম্নস্তরের সোপানাবলী আসলে উপ-জাতীয় সমাজের অসমাপ্ত বিলোপের পরিণাম এবং বহুক্ষেত্রেই উপজাতীয় ব্যবস্থা ও জাতিব্যবস্থার মধ্যকার সীমারেখা মোটেই স্পষ্ট নয়। বিভিন্ন উপ-জাতির অনুসৃত বৃত্তি থেকেই বৃত্তিনির্ভর নানা জাতি গড়ে উঠেছে। উপজাতীয় কারিগরি-শিল্পের ক্ষেত্র খুবই সীমাবদ্ধ হবার দরুন নিত্য প্রয়োজনীয় সকল ধরনের পণ্যোৎপাদন স্বাভাবিকভাবেই তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই কারণেই বাইরের বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে তাদের কিছু সংযোগ রাখতেই হয়। উড়িষ্যার জুয়াঙরা গ্রামের হাটে মাটির বাসন, কাপড়, লবণ প্রভৃতি খরিদ করার জন্য আসে। পরিবর্তে তারা অরণ্য থেকে সংগ্রহ করা জ্বালানি কাঠ, অথবা বাঁশের তৈরি চুপড়ি, কুলা প্রভৃতি বিক্রয় করে। ছোটনাগপুরের বিরহোরদের মত উড়িষ্যার মাকড়খিয়া কুলহরা, দড়ি বা শিকা তৈরি করে গ্রামাঞ্চলে বিক্রয় করে। ময়ূরভঞ্জের খাড়িয়ারা বনজ ধুনা, মোম, মধু প্রভৃতি বিক্রয় করে। এইভাবে অরণ্যবাসী উপজাতি বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে সহ-যোগিতার সূত্রে যখন বাঁধা পড়ে তখন তারা কোন-না-কোন বিশেষ বৃত্তিকে আশ্রয় করে এবং সম্ভব হলে পুরুষানুক্রমে সেই বৃত্তি অবলম্বন করে জীবিকা-নির্বাহ করে।

বহুপূর্বে কৌটিল্য বলেছিলেন যে, যেকোন উপায়েই হোক গণ বা সংঘগুলিকে, অর্থাৎ উপজাতীয় বা কৌম সমাজগুলিকে, ভেঙে ফেলা রাজার অবশ্য কর্তব্যসমূহের একটি কর্তব্য এবং তারপর তাদের গণবন্ধন ও গোষ্ঠীগত পরিবেশ থেকে মুক্ত করে কৃষিকাজের ক্ষেত্রে, বৃত্তিমূলক কর্মে এবং সৈন্য-বাহিনীতে নিয়োগ করতে হবে। এই ডি-ট্রাইবালাইজেশন বা উপজাতীয়তা

বিলোপকরণ পদ্ধতি যুগের পর যুগ ধরে সমানে চলেছে এবং তা আজও চলছে। তৎসত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত ভারতবর্ষে উপজাতীয়দের সংখ্যা চার কোটির মত। এ ছাড়া আরও যে কোটি কোটি মানুষ ভারতীয় সমাজব্যবস্থার নিম্নতর স্তরগুলিতে অবস্থান করছে, নিম্ন বলে কথিত অসংখ্য বৃত্তির একটিকে অবলম্বন করেছে, তারাও নিঃসন্দেহে পূর্বোক্ত উপজাতীয়তাবিলোপ পদ্ধতির পরিণাম। নানা প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্ন উপজাতি থেকে মানুষ এনে তাদের গ্রামে জনপদে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং তাদের উপর নির্দিষ্ট পেশা আরোপ করা হয়েছে। এইভাবে উপজাতীয় পরিবেশ থেকে বিযুক্ত হয়ে তারা পরিণত হয়েছে পেশাদার গোষ্ঠীতে, এবং পরে এই পেশাদার গোষ্ঠীগুলি, তাদের পেশার গুরুত্ব অনুযায়ী, বৃহত্তর হিন্দুসমাজের আওতায় বিভিন্ন মর্যাদার জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। অবশ্য ব্যাপারটি যে একতরফা ঘটেছে তা নয়। বহু ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে যে নিজেদের অভ্যস্ত পরিবেশে জীবিকাসংস্থানে ব্যর্থ হয়ে, উপজাতীয় মানুষেরা নিজেরাই লোকালয়ের দিকে এগিয়েছে, অপেক্ষাকৃত উন্নততর মানবগোষ্ঠীর সম্পর্কে এসে বিভিন্ন পেশা অবলম্বনে টিঁকে থাকতে চেয়েছে এবং কালক্রমে বৃহত্তর হিন্দুসমাজের অংগীভূত হয়ে গেছে। অধিকতর আদিম উপজাতিসমূহ, যারা কোন উৎপাদনব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি, অন্যকথায় যাদের মধ্যে উৎপাদন মনস্কতা গড়ে ওঠেনি, যারা ছিল মূলত শিকার ও সংগ্রহজীবী, বহুক্ষেত্রে এমন অবস্থাও ঘটেছে যে নিজেদের আরণ্যক পরিবেশে খাদ্যসংস্থানে ব্যর্থ হয়ে তারা বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু কোন উৎপাদনমূলক বৃত্তি অবলম্বন করতে না পেরে তারা ভিক্ষুক ও চোর ডাকাতে পরিণত হয়েছে, যেমন দক্ষিণ ভারতের কোরাবা, কাল্লার, মারাবার, রাজস্থানের সনসিয়া, উত্তর ও মধ্যভারতের কঞ্জর, নট প্রভৃতি।

উপজাতীয় পরিবেশ থেকে বিযুক্ত হয়ে এইভাবে যারা হিন্দুসমাজের আওতায় এসেছে, এবং বিভিন্ন পেশার ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে, তাদের নিয়ে শাস্ত্রকারদের দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। আমরা আগেই বলেছি যে প্রাচীন পুঁথিপত্রে যে চাতুর্বর্ণভিত্তিক সমাজব্যবস্থার কথা উল্লিখিত হয়েছে তা একটা কল্পিত সামাজিক আদর্শ, যার বাস্তব অস্তিত্ব কোনদিনই ছিল না, আজও নেই, যা আছে তা হচ্ছে নির্দিষ্ট পেশাসহ অসংখ্য জাতি সমন্বিত সুবিস্তৃত জাতি কাঠামো। শাস্ত্রকারদের সমস্যা ছিল এই হাজার হাজার জাতিকে চাতুর্বর্ণের কাঠামোর মধ্যে ঢোকাবার এবং তা ব্যাখ্যা করার

সমস্যা, আর তা করতে গিয়ে তাঁরা বর্ণসংকর তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন। আমরা আগেই দেখেছি যে অনুলোম-প্রতিলোম বিবাহের সম্ভাবনা থাকলেও সেই বিবাহজাত সন্তানদের ভিন্ন জাতিতে স্থান দিলে ব্যাপারটা কার্যত অবাস্তব হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণত পুত্রের জাতি পিতার জাতি দ্বারাই নির্ধারিত, এবং সেই হিসাবে বর্ণসংকর তত্ত্বের মধ্যে অনেক গোলমাল আছে। রিচার্ড ফিক দেখিয়েছেন, যে সকল জাতিকে বর্ণসংকর আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং যেগুলির উৎস সম্পর্কে নানাপ্রকার কাল্পনিক কাহিনী প্রচার করা হয়েছে সেগুলির অধিকাংশেরই নাম স্থানবাচক বা উপজাতিবাচক।

আমাদের দেশে পিছিয়ে-পড়ে-থাকা মানুষদের মধ্যে বাস্তবে উপজাতীয় ব্যবস্থা ও জাতব্যবস্থার সীমারেখা যে মোটেই স্পষ্ট নয়, বিভিন্ন সূত্র থেকে সাক্ষ্য সংগ্রহ করে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এই বক্তব্যের যথার্থতা প্রতিপাদন করেছেন এবং সুনিশ্চিতভাবে দেখিয়েছেন যে জাতিপ্রথা আসলে উপজাতীয় সমাজের অসমাপ্ত বিলোপের পরিণাম—উপজাতীয় সমাজের ধ্বংসাবশেষ এরই মধ্যে টিঁকে আছে, যদিও উপজাতীয় সমাজের মূল প্রাণশক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধ্বংসাবশেষটির আদি তাৎপর্য বিপরীতে পর্যবসিত হয়েছে। আমাদের দেশে উৎপাদন কৌশলের উন্নতির উপর নির্ভর করে উপজাতীয় সমাজ ভিতর থেকে ভেঙে সর্বক্ষেত্রে নূতন সমাজের পথ করে দেয়নি। এখানে স্থানে স্থানে রাষ্ট্রশক্তি দেখা দিয়েছিল, কিন্তু তাদের ঘিরে ছিল পুরোনো উপজাতীয় সমাজ, যেগুলির উপর আক্রমণ চালিয়ে রাষ্ট্রশক্তির অধিনায়কেরা এই সমাজগুলিকে ধ্বংস করেছিলেন, এবং এই সমাজের মানুষগুলিকে নিয়ে গ্রামনিবেশ করেছিলেন। আর এই পদ্ধতিরই অনুসরণ চলেছে দীর্ঘকাল ধরে। স্বভাবতই ভারতের গ্রামজীবনের মধ্যে উপজাতীয় সমাজের চিহ্ন অনেক স্পষ্টভাবে টিঁকে আছে, যেমন জাতিভেদ, গ্রামসমবায়, লোকন্যায়মূলক আইন, লোকায়তিক ধর্ম-আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি, যেগুলির সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটেনি। যদিও এই স্মারকগুলির আদি তাৎপর্যের রূপান্তর ঘটেছে।

একশো বছরেরও আগে হান্টার মন্তব্য করেছিলেন যে ভারতবর্ষ যেন নৃগোষ্ঠী, ভাষাগোষ্ঠী, বিভিন্ন পেশাদারী ও উৎপাদন ব্যবস্থার নানা পর্যায়ে আটকে থাকা বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর একটি বিরাট জাদুঘর যেখানে মানুষকে তার সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করা যায়। ভারতীয় জনসমাজের উচ্চবর্ণের মানুষদের এবং এখনও পর্যন্ত টিঁকে থাকা চারকোটির মত উপজাতীয় মানুষদের বাদ দিলে যে বিপুল সংখ্যক মানুষ, যারা ভারতীয়

জনসমাজের সর্বাধিক অংশ, অবশিষ্ট থাকে তারা সকলেই কোন-না-কোন বৃত্তিজীবী এবং তাদের উদ্ভব উপজাতি থেকেই। এই বিপুল জনসমাজ আসলে উপজাতিবিলোপকরণ পদ্ধতিরই পরিণাম। অসংখ্য উপজাতি তাদের উপজাতীয় পরিবেশ থেকে বিযুক্ত হয়ে কোন বিশেষ বৃত্তিকে অবলম্বন করে বৃহত্তর হিন্দুসমাজে স্থান করে নিয়েছে এবং সেই বৃত্তির গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুযায়ী জাতিকাঠামোয় স্থান পেয়েছে। বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে উপজাতীয় নামই কার্যত জাতিনামে পর্যবসিত হয়েছে যেমন আগারিয়া, অম্বট্টন, আন্দে-কোরাগা, বাদাগা, ভীল, চুহরা, এরনাদান, হাসালা, কাছারি, কোদাগা, কোরা, মীনা, পালিয়ান, রাভা, উল্লাদন, উরালি প্রভৃতি। একটি উদাহরণ দিলে পূর্বোক্তটি বোঝার পক্ষে সুবিধা হবে। অম্বষ্ঠ নামে বার্তা-শস্ত্রোপজীবী একটি গণ বা উপজাতি পাঞ্জাব অঞ্চলে বাস করত যারা আলেকজান্দারের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। এই উপজাতির উল্লেখ প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থসমূহেও পাওয়া যায়। যে কোন কারণেই হোক তারা তাদের মূল অঞ্চল থেকে সরে আসতে বাধ্য হয় এবং ভারতের নানাস্থানে তারা ছড়িয়ে পড়ে। এক এক অঞ্চলে তারা এক একটি বৃত্তিকে অবলম্বন করে জীবিকানির্বাহ শুরু করে, যেমন দক্ষিণ-ভারতে নাপিতের বৃত্তি, বঙ্গদেশে বৈদ্যের বৃত্তি, ইত্যাদি। ধর্মশাস্ত্রকাররা তাদের অনুলোম-সংকর জাতি হিসাবে জাতিকাঠামোর স্থান দেন এবং তাদের সম্বন্ধে বলা হয় যে তারা ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্য মাতার মিলনজাত।

তৃতীয় অধ্যায় আমরা বিভিন্ন পেশাদার জাতির বিস্তৃত পরিচয় দেব। ভারতবর্ষে শুধু কৃষিজীবী জাতি ও তাদের শাখা প্রশাখার সংখ্যা কয়েকশত যেগুলির মধ্যে প্রধান কুর্মি, জাঠ, কুনবি কোয়েরি, মালি, কছি, লোধা, লোধি, কুম্ভো, আরাইন, সৈনি, দিরথ, তাগু, কৈবর্ত, সদেগাপ, কোচ, আগুরি, পুয়ার, মালি কিরাত, কোল্টা, তেলেগা, বেল্লামা, কাম্মা, কাপু, নাগ, গঙ্গাধিকরা, কুণ্ডিতিগা, মোরাসু, রেড্ডি, হাল্লিকারা, দাস, হালু-মুসাকু, ভোক্কালিগা, বেলল্লার, বাদুগা, মারাভান, বালিগা, তোতিয়ার, কাম্পিলিয়ান, বুম্রিয়া, ওড্ডার, উম্পরবা, পাল্লান, নাথম্বাদয়ন, উরালি প্রভৃতি। এই সকল কৃষিজীবী জাতির অধিকাংশই উপজাতি থেকে জাতিতে পরিণত হয়েছে। পশুপালকদের ক্ষেত্রে আভীর বা আহির, গুজর, গোপ, গদারিয়া, দঙ্গর, গোল্লালু, গোল্ল, মাত্তু-এড়িয়া প্রভৃতির উপজাতীয় পশ্চাদ-ভূমি খুবই স্পষ্ট। এই সকল পেশাদার জাতিদের ক্ষেত্রে ভিন্ন ধর্মের মানুষও

আছে, কিন্তু সেখানে ধর্মের পরিচয় গৌণ, জাতিগত পরিচয়ই আসল। যেমন মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারী জাতিদের মধ্যে উত্তর-ভারতের হালুইদের কয়েকটি শাখা, মৎস্যজীবীদের মধ্যে বঙ্গদেশের নিকারীরা, যারা নাপিতের কাজ করে তাদের মধ্যে উত্তর-ভারতের হাজমদের কয়েকটি শাখা মুসলমান। আবার উত্তর-ভারতের বানিয়াদের মধ্যে আগরবাল, ওসবাল, খাণ্ডেলবাল, শ্রীমালী প্রভৃতিরা জৈন। মুসলমান সমাজে জাতিপ্রথার বিষয়টি আমরা পৃথক আলোচনা করব। জাতিপ্রথায় উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর আগমন ও গৃহীত হবার একটি বিশেষ পদ্ধতি যে কোন জাতিরই শাখা-প্রশাখার তালিকায় দৃষ্ট হয়। আসলে এই শাখা-প্রশাখাগুলি কোন জাতির বিস্তৃতি ও খণ্ডীকরণের পরিণাম ততটা নয় যতটা সেই বিশেষ জাতির সাহচর্যে বাইরের উপজাতীয় উপাদান আসার ফল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রসমূহে বর্ণিত জাতিপ্রথা ও বর্ণসংকরতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে এই ঐতিহাসিক পদ্ধতিটি আরও স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে।

৫ ॥ জাতিকাঠামোয় বহিরাগত জনগোষ্ঠী

ঐতিহাসিক যুগের সূত্রপাত থেকেই ভারতে বহিরাগত নানা জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি এবং বসতির সংবাদ পাওয়া যায়, যারা কালক্রমে বৃহত্তর ভারতীয় বা হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে জাতিকাঠামোয় স্থান পেয়েছে। ভারতবর্ষের দুটি প্রদেশ, সিন্ধু ও গান্ধার, সুপ্রাচীনকালে ইরানের আখিমিনীয় রাজবংশের অধীন ছিল। এই সূত্রে অনেক ইরানীয় এদেশে বসতি স্থাপন করেছিল। পরবর্তীকালেও ইরান থেকে ভারতে নানা জনগোষ্ঠী এসেছে। আলেকজান্দারের ভারত অভিযানের সময় থেকেই এদেশে গ্রীক বা যবনদের আগমন হতে শুরু করে। ভারতসীমান্তে ও উত্তর-ভারতে কালক্রমে কয়েকটি ছোট ছোট গ্রীকরাজত্ব ও গ্রীক বসতি গড়ে ওঠে। এই যবন নৃপতি বা রাজপুরুষদের মধ্যে দুজন ইতিহাসে খুবই বিখ্যাত। প্রথমজন, রাজা মেনান্দোর যিনি বৌদ্ধ হয়েছিলেন এবং যাঁকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধ মিলিন্দপঞহো গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। দ্বিতীয়জন, গ্রীক রাজদূত হেলিওদোরস যিনি ভাগবতধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং গোয়ালিয়রের অন্তর্গত বেসনগর নামক স্থানে বাসুদেবের সম্মানে গরুড়ধ্বজ নামক একটি স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। এই যবন বা গ্রীকরা হিন্দু জাতি কাঠামোয় প্রতিলোম সংকর জাতি হিসাবে স্থান পেয়েছে। গৌতম ধর্মসূত্রে (৪।১৭) বলা হয়েছে যে যবনরা শূদ্র

পুরুষ এবং ক্ষত্রিয় নারীর মিলনজাত। মনুর (১০।৪৩-৪৪) মতে যবনরা পূর্বে ক্ষত্রিয় ছিল এবং পরে তাদের শূদ্রত্বে অবনতি ঘটে।

গ্রীকদের পর শক, পহ্লব বা পারদ এবং কুষানরা ভারতে আগমন করে ও নানাস্থানে রাজ্য ও বসতি স্থাপন করে এবং কালক্রমে বৃহত্তর ভারতীয় জনসমাজের অংগীভূত হয়ে যায়। পাণিনি শকদের কম্বোজজাতিগণের (৪।১।১৭৫) অন্তর্গত করেন। মহাভারতে শকেরা যবনদের সংগে একত্রে উল্লিখিত হয়েছে। মনু শকদের যবনদের মতই ক্ষত্রিয় থেকে অধঃপতিত শূদ্র হিসাবে উল্লেখ করেছেন। মনু পহ্লব এবং পারদদের পৃথক জাতি বলেছেন এবং শক ও যবনদের মত তাদেরও অধঃপতিত ক্ষত্রিয় হিসাবে জাতিকাঠামোয় স্থান দিয়েছেন। মহাভারতে (২।২।১৬, ২।৫১।১২, ২।৫২।৩, ৭।৯৩।৪২, ৭।১২১।১৩) পারদরা আচারবিহীন ম্লেচ্ছ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে নানা বহিরাগত জাতিই নিজেদের শক বলে পরিচয় দিত এমনকি বহু পরবর্তীকালেও দিল্লীর মামেলুক সুলতানদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের শক হিসাবে পরিচিত করেছেন। যবন-শক-পারদ-পহ্লবদের পাশাপাশি চীনরাও শূদ্রে অধঃপতিত ক্ষত্রিয় হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে। এরা সম্ভবত লদাখ, লাহুল, তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চলের মংগোলীয় জনগোষ্ঠী।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে গ্রীক, শক, কুষান প্রভৃতির মত আভীররাও বহিরাগত। আভীরদের নামের সংগে সম্পর্কিত অনেকগুলি স্থাননাম উত্তর-ভারতে পাওয়া যায়। ভারতের পশ্চিম উপকূলেও আভীর বসতি বিদ্যমান। একটি আভীর রাজবংশেরও পরিচয় নাসিক অঞ্চলে প্রাপ্ত লেখ থেকে পাওয়া যায়। কামসূত্রে (৫।৫।৩০) কোট্ট নামক জনৈক আভীর রাজা উল্লিখিত হয়েছেন। দণ্ডীর কাব্যাদর্শে (১।৩৬) আভীরদের ব্যবহৃত অপভ্রংশে ভাষার তারিফ করা হয়েছে। মনুর মতে (১০।১৫) আভীররা সংকরজাতি, ব্রাহ্মণ পিতা এবং অম্বষ্ঠ মাতার মিলনোদ্ভূত। মহাভারতের মৌসল পর্বে আভীরদের দস্যু এবং ম্লেচ্ছ আখ্যা দেওয়া হয়েছে, অন্যত্র (২।৫১।১২) তাদের সংগে পারদদের সম্পর্কিত করা হয়েছে। আভীররাই বর্তমানের আহির জাতি যাদের জাতিগত পেশা প্রধানত গোপবৃত্তি।

মগদ্বিজ বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণরাও বহিরাগত। এরা ইরানীয় ম্যাগি বা পুরোহিতশ্রেণীর লোক, যারা প্রধানত সূর্যেরই উপাসনা করত। পুরাণে বলা হয়েছে যে সূর্যপূজার প্রবর্তন এবং মগদ্বিজদের এদেশে আনার জন্য দায়ী কৃষ্ণপুত্র শাম্ব। গয়া জেলার অন্তর্গত গোবিন্দপুর থেকে প্রাপ্ত একটি

লেখেও এই বক্তব্য সমর্থিত হয়েছে। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বা মগদ্বিজরা মিহির গোত্রধারী। বরাহমিহিরও এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। রাজস্থানের যোধপুর অঞ্চলের সেবক বা ভোজক ব্রাহ্মণরা নিজেদের শাকদ্বীপী বলে পরিচয় দেয়। তারা সূর্যের উপাসনা করে এবং রবিবারে একবারমাত্র আহার করে। পুষ্কর অঞ্চলের পরাশরী ব্রাহ্মণরাও নিজেদের শাকদ্বীপী বলে পরিচয় দেয়। ভারতের নানা স্থানেই শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণরা ছড়িয়ে আছে। কোন কোন স্থানে এরা গ্রহবিপ্র নামে পরিচিত। জ্যোতিষ গণনা, শুভাশুভ নির্ণয় ইত্যাদি নানা ধরনের কাজ এরা করে থাকে।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকেই এদেশে হূণদের আগমন ঘটে। হূণ রাজাদের মধ্যে তোরমাণের ভারতীয়করণ কতদূর হয়েছিল বলা শক্ত, তবে মিহিরকুল যে শিবভক্ত ছিলেন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর মুদ্রায় শিবের প্রতীক বৃষ উৎকীর্ণ আছে। মান্দাশোর লেখে বলা হয়েছে যে তিনি শিব ছাড়া আর কারো নিকট মাথা নত করেননি। একাদশ শতকের মধ্যেই হূণদের ভারতীয়-করণ সম্পূর্ণ হয়েছিল এবং তারা ক্ষত্রিয় হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। একটি লেখের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে চেদিরাজ যশঃকর্ণ আহল্লদেবী নামক হূণ রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। হূণরা কালক্রমে রাজপুতদের ছত্রিশটি বিশুদ্ধ শাখার একটি হিসাবে পরিগণিত হয়। হূণদের মত গুর্জররাও ছিল বহিরাগত জনগোষ্ঠী যারা পাঞ্জাব, রাজস্থান ও ভারতের পশ্চিম উপকূলে বসতি স্থাপন করে। বহু জাতিনামের পূর্বপদ হিসাবে গুর্জর বা গুজর শব্দটি বর্তমান, যেমন গুজর-সোনার, গুজর-বানিয়া, গুজর-কুম্ভার, গুজর-সলাট, গুজর-কুনবি ইত্যাদি।

বিশেষ করে রাজপুতদের মধ্যেই বহিরাগত জনগোষ্ঠীসমূহের মিশ্রণ ঘটেছে। রাজপুত পরম্পরা অনুযায়ী তাদের মধ্যে তিনটি কুল—সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি। অগ্নিকুল বলতে তাদেরই বোঝায় যাদের অগ্নিশুদ্ধির দ্বারা নবজন্ম হয়েছে, অর্থাৎ যারা বহিরাগত এবং রাজপুত বলে গণ্য হয়েছে। সূর্যকুলের প্রধান শাখা শিশোদিয়া, কছওয়াহা এবং রাঠোর, চন্দ্রকুলের যাদব ও টনওয়ার এবং অগ্নিকুলের পনওয়ার, চৌবে,' পরিহার ও সোলাংকি। মধ্যযুগে আরও নানা বহিরাগত জনগোষ্ঠী ভারতের নানা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল, বেশিরভাগই ইরান ও মধ্য এশিয়া থেকে। তারা মূলত ইসলামধর্মী হবার দরুন হিন্দু জাতিকাঠামোয় স্থান পায়নি, তবে বহুক্ষেত্রেই তারা উপজাতি হিসাবে স্বকীয়ত্ব বজায় রেখেছিল এবং নিজেদের মধ্যে জাতিত্ববাচক বৈশিষ্ট্য

গড়ে তুলেছিল, যেমন অন্তর্বিবাহ, বিশেষ ধরনের পেশা ইত্যাদি। সিন্ধু-প্রদেশের মাহার জাতি ইরান থেকে এসে বসতি করেছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের উপজাতিদের মধ্যে কিছু কিছু বহিরাগত জনগোষ্ঠীও আছে। মালাবার উপকূলের মোপলা বা মাপ্পিলা উপজাতি বহিরাগত ও ইসলাম ধর্মাবলম্বী। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি উপজাতি বহিরাগত, যেমন অহোমরা ব্রহ্মদেশের শানদের সংগে সম্পর্কিত। পূর্ববংগের সমুদ্রোপকূলের বদ্বীপ অঞ্চল সমূহে ফিরংগী নামে কথিত একটি কৃষিজীবী জাতি বর্তমান যাদের উদ্ভব পোর্তুগীজদের থেকে। এই সকল জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষভাবে জাতিপ্রথার অন্তর্গত না হলেও বাস্তবজীবনে জাতিপ্রথার ধরনটিই মেনে চলে। মুসলমান সমাজের জাতিকাঠামোর উপরের স্তরটি আফগান, তুর্কী (ভারত-ইতিহাসের প্রসিদ্ধ মুঘলরাও আসলে চাঘতাই-তুর্ক) এবং পারসিক বহিরাগতদের দ্বারা গঠিত।

৬ ॥ জাতিপ্রথার ধর্মীয় ও সাংপ্রদায়িক উপস্তর

যে সকল দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ধারণা, যাগযজ্ঞ, সাধনপদ্ধতি, পূজার্চনা, সংস্কার ও আচার অনুষ্ঠান হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত তার সংগে একটি গহন অরণ্যের তুলনা করা চলে যেখানে নানা জাতের গাছের ন্যায় অজস্র মত ও পথ বর্তমান, যেখানে আদিম মানসিকতা, অগ্রসর মানসিকতা ও পরম পরিশীলিত মানসিকতা পাশাপাশি সহাবস্থান করে, যেখানে উপজাতীয়, আরণ্যক, গ্রাম্য, লৌকিক ও আঞ্চলিক নানাপ্রকার বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের পাশাপাশি জগত ও জীবন সম্পর্কে নানা জটিল প্রশ্ন, নানা পরীক্ষামূলক চিন্তাভাবনা, নানা উৎসের বিভিন্ন ধরনের সাধনপদ্ধতি ও নানা প্রকার তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা স্থান পেয়েছে। বস্তুত হিন্দু শব্দটির মূল তাৎপর্য ভৌগোলিক এবং তা ভারতবর্ষের সমার্থবাচক। হিন্দুধর্ম আসলে ভারতে উদ্ভূত অসংখ্য ধর্মমতের সমন্বয়, এমনকি নিরীশ্বরবাদও এখানে অপাঙ্‌ক্তেয় নয়। কিন্তু মত ও পথের বিভিন্নতা এবং যে কোন মত বা পথ অবলম্বনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির সর্বপ্রকার স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নিলেও হিন্দুশাস্ত্র কয়েকটি সামাজিক নিয়ম ও আদর্শকে অলংঘনীয় বলে ঘোষণা করে যেগুলির মধ্যে জাতিপ্রথা একটি। এই কারণেই অনেক পণ্ডিত জাতিপ্রথার উদ্ভব হিন্দুধর্মের বিশেষ চরিত্রের মধ্যেই অনুসন্ধান করেন। কিন্তু হিন্দুধর্মের কোন তত্ত্ব বা সাধন-পদ্ধতির সংগে জাতিপ্রথার ক্ষীণতম সম্পর্কও নেই। লতা যেমন গাছকে

অবলম্বন করে বেড়ে ওঠে জাতিপ্রথ ও তেমন প্রধানত হিন্দুধর্ম ও জীবনচর্যাকে অবলম্বন করে বেড়ে উঠলেও উভয়ের মূল একান্তই পৃথক। জাতিপ্রথা কোন বিশেষ ব্যক্তি বা শাস্ত্রকারের মস্তিষ্কপ্রসূত নয়, কোন বিশেষ সময় থেকেও এইপ্রথার প্রবর্তন ঘটেনি। এই প্রথা নানা ঐতিহাসিক ঘাতপ্রতিঘাত ও সামাজিক বিবর্তনের পরিণাম যার পিছনে বিভিন্নপ্রকার চালিকাশক্তি ক্রিয়াশীল। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ জাতিপ্রথার সৃষ্টি করেননি, যা বাস্তব, যা অস্তিত্ববান, যা বিশাল ভারতীয় সমাজজীবনের একটি ক্রিয়াশীল পদ্ধতি তাকেই বিচক্ষণতার সঙ্গে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বিচক্ষণতা শব্দটি এই অর্থে ব্যবহার করা হল যে এই প্রথার ঔচিত্য, ভালমন্দ বা নৈতিকতা-অনৈতিকতা নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামাননি। তাঁরা যে সকলেই ব্যক্তিগতভাবে এই প্রথার সমর্থক ছিলেন তা নয়, তবে তাঁরা এটুকু বুঝতেন যে তাঁদের ভাল-মন্দ বোধের উপর এই ব্যবস্থা নির্ভরশীল নয়।

অথচ জাতিবর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আজকের নয়। এই প্রতিবাদেরও দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে যার সূত্রপাত বুদ্ধ বা মহাবীরের যুগ থেকে, হয়ত বা তারও আগে থেকে। যাঁরা এই প্রথার প্রতিবাদ করেছিলেন, তাঁরা তা করেছিলেন নৈতিক দিক থেকে, সকল মানুষই সমান এই আদর্শচালিত হয়ে। কিন্তু তাঁরা সফল হননি কেন না তাঁরা বাস্তববিমুখ ছিলেন। এই প্রথার সামাজিক কার্যকারিতার দিকটিকে তারা উপেক্ষা করেছিলেন। ফলে জাতিপ্রথাবিরোধী আন্দোলন করে তাঁরা যদিও মাঝে মাঝে বহুসংখ্যক মানুষকে জাতিপ্রথার নিগড় থেকে মুক্ত করে তাদের নিয়ে সাম্য ও সমমর্যাদার ভিত্তিতে ধর্মীয় সম্প্রদায় গঠন করেছিলেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়নি। প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই বহুক্ষেত্রে জাতিবর্ণপ্রথা নূতনভাবে গড়ে উঠেছে। আবার বহুক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়টি একটি জাতিতে পরিণত হয়ে জাতিকাঠামোয় স্থান করে নিয়েছে। ফলে জাতিতালিকা আরও স্ফীততর হয়েছে।

বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে ব্রাহ্মণপ্রাধান্য ও জাতিপ্রথা অস্বীকৃত। বুদ্ধ ও মহাবীর উভয়েই উপজাতি-উদ্ভূত। প্রাচীন ভারতে যারা বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেছিল তাদের সামাজিক জীবন সম্পর্কে বিশেষ তথ্য আমাদের হাতে নেই। পালি জাতকসমূহে অবশ্য জাতিপ্রথার প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায় যা আমরা পরে দেখব। তবে সে-জাতিপ্রথা বৌদ্ধ জনসমাজের ক্ষেত্রে কতদূর সত্য ছিল তা বলা কঠিন কেননা এখানে বর্তমানে এমন কোন বৌদ্ধ জনসমাজ নেই যা প্রাচীন যুগের ধারাবাহিকতা বহন করে। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলের চাকমা

এবং চট্টগ্রামের স্থায়ী জনসমাজের একটা অংশ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও তাদের বর্তমান সামাজিক জীবন প্রাচীন অবস্থাকে বোঝার পক্ষে অনুকূল নয়। লদাখ, লাহুল ও স্পিতির বৌদ্ধ উপজাতিদের ক্ষেত্রেও একথা খাটে। অশোক, কণিষ্ক প্রভৃতি বৌদ্ধ সম্রাটদের আমলে জনসমাজের কতটা অংশ বৌদ্ধ ছিল তার যেমন কোন খবর নেই, এই সকল রাজারা বৌদ্ধ আদর্শ অনুযায়ী জাতিপ্রথাবিরোধী হওয়া সত্ত্বেও রাজ্যশাসন-ক্ষেত্রে কোন্ আদর্শ অনুসরণ করতেন তাও জানা যায়না। ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাস্ত্রের মত সামাজিক বিধানাবলী সংক্রান্ত কোন বৌদ্ধ স্মৃতিগ্রন্থের অস্তিত্বের খবর নেই। পালরাজারা বৌদ্ধ ছিলেন, তবে তাঁদের কোন কোন লেখ থেকে জানা যায় যে তাঁরা বর্ণাশ্রম রক্ষাকেই শাসনের আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিলেন।

তবে জৈন ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় থাকার দরুন জৈন সমাজের নানা বৈশিষ্ট্যকে জানার অনেক সুবিধা আছে। জৈনধর্ম জাতিপ্রথা-বিরোধী হলেও কালক্রমে জৈন সমাজে অন্যূন চুরাশীটি জাতির উদ্ভব ঘটে। এই জাতিগুলির মধ্যে অগ্রবাল ওসবাল, শ্রীমালী, পোরাবাড়, খাণ্ডেলবালা, পরবার, হুম্বড, শেতবাল, চতুর্থ, বোগার, উপাধ্যায় প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জৈন জাতিসমূহের ধরন, গঠন ও কার্যকর দিকগুলির সংগে হিন্দুসমাজের জাতিসমূহের কোন পার্থক্য নেই। তবে হিন্দু সমাজভুক্ত জাতিদের ক্ষেত্রে ছোটবড়ভেদ যেমন তীব্র, জৈন সমাজের ক্ষেত্রে ততটা নয়। জৈন জাতিভেদের উঁচুনীচু পর্যায়ভেদ বহুলাংশে অঞ্চলভিত্তিক। পেশার তারতম্য এবং সামাজিক রীতিনীতি জৈন জাতিগত মর্যাদাভেদের আরও একটি কারণ। যাদের মধ্যে বিধবাবিবাহের প্রচলন আছে তারা অপরের চোখে নীচ জাতি বলে গণ্য হয়। কাজেই এটা বুঝতে কোন অসুবিধা নেই যে জৈনধর্ম তত্ত্বের দিক থেকে জাতিপ্রথার একান্ত বিরোধী হলেও ওই ধর্মের অভ্যন্তরে জাতিপ্রথার বিকাশ ঘটেছে। একথা বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রেও সম্ভবত সত্য।

আদি-মধ্যযুগে ও মধ্যযুগে যে সকল সংস্কারবাদী ও বৈপ্লবিক ধর্মমত সমূহের উদ্ভব হয়েছিল সেগুলির প্রবক্তাদের এবং পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের লোক কেউ কেউ থাকলেও সেগুলি মূলত ছিল অব্রাহ্মণ প্রণোদিত। এই ধর্মমতগুলির মূল কথা মানবহৃদয়ই হচ্ছে দেবতার আবাস, প্রেম ও ভক্তির দ্বারাই তাঁকে উপলব্ধি করা যায়, বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান মিথ্যা এবং জাতিবর্ণপ্রথা ঘোরতর অনৈতিক কেননা সকল মানুষই সমান। বিভিন্ন ধর্মমতের ভেদও কাল্পনিক। এই আদর্শগুলি অবশ্য নূতন নয়।

বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি ধর্মের কোন কোন আচার্য জাতিপ্রথা বিরোধী ছিলেন এবং জাতিপ্রথার কাঠামোটাকে ভাঙবার চেষ্টা করেছিলেন। ফলে বৈষ্ণব ও শৈবদের মধ্যে অনেকগুলি জাতিপ্রথাবিরোধী উপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। শাক্ত ও গাণপত্যদের মধ্যেও বেশ কয়েকটি সম্প্রদায় বর্ণভেদ ও স্মৃতিশাস্ত্র প্রস্তাবিত জীবনচর্যার বিরোধী ছিল। দক্ষিণ ভারতের শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় দুটি উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল, বড়কলই ও তেনকলই। বড়কলইয়া ছিল জাতিপ্রথা ও ব্রাহ্মণ্যবাদের সমর্থক। পক্ষান্তরে তেনকলইরা ছিল জাতিপ্রথা বিরোধী। শ্রীচৈতন্যের অনেক অব্রাহ্মণ অনুগামী ব্রাহ্মণদেরও দীক্ষা দিয়েছিলেন, যেমন নরহরি সরকার, নরোত্তম ঠাকুর, প্রভৃতি। আসামের শংকরদেব ও তাঁর প্রধান শিষ্য মাধবদেব কায়স্থ ছিলেন। মহারাষ্ট্রের তুকারাম শূদ্র হয়েও ব্রাহ্মণদের গুরু ছিলেন। দশম ও একাদশ শতকে সিদ্ধাচার্য নামে পরিচিত একশ্রেণীর বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্মগুরু জনজীবনে তাঁদের প্রভাব সঞ্চার করতে পেরেছিলেন। তিব্বতী তান্ত্রিক গ্রন্থসমূহে এই রকম চুরাশীজন সিদ্ধের জীবনী লিখিত আছে। এঁদের মধ্যে যে অনেকেই নীচজাতীয় ছিলেন যা তাঁদের নাম থেকেই বোঝা যায়, কেউ ডোম, কেউ শবর, কেউ ধোপা, কেউ তেলী, কেউ তাঁতী।

অনেক ক্ষেত্রে যেখানে নবধর্ম আন্দোলনের প্রবক্তারা ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের মানুষ ছিলেন, তাঁরা জাতিপ্রথা-বিরোধিতা দিয়ে শুরু করলেও তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের উত্তরাধিকারীরা ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন, এবং এই উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়টি কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। কালক্রমে এই সম্প্রদায়-উপসম্প্রদায়গুলির আবার জাতিতে পরিণতি ঘটেছিল, প্রচলিত জাতিপ্রথার কাঠামোর মধ্যেই। কিন্তু নেতৃত্ব যেখানে বরাবর নিম্নবর্ণের অধিকারে ছিল, যেমন নাথ ধর্মের ক্ষেত্রে, সেখানে সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র দীর্ঘকাল বজায় ছিল। বঙ্গদেশ ও আসামের নাথগণ যুগী বা যোগী নামে পরিচিত, যাদের প্রধান জীবিকা, কিছুকাল আগে পর্যন্ত ছিল, তাঁত বোনা। জাতিপ্রথা বিরোধী হলেও নাথ সম্প্রদায় জাতিকাঠামোর নীচের তলার জাতি হিসাবেই বর্তমান ছিল। সম্প্রতি নাথ সম্প্রদায় অধিকতর সামাজিক মর্যাদা চান এবং রুদ্রজ ব্রাহ্মণ রূপে নিজেদের পরিচিত করার অভিলাষী, কিন্তু জাতিকাঠামোর বাইরে যাবার কথা তাঁরা ভাবতে পারেন না। যে সব ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে হিন্দুধর্ম ও সমাজ থেকে সরে যাবার ঘটনা ঘটেছে, যেমন শিখধর্মে, সেখানেও কিন্তু নূতনভাবে

জাতিপ্রথা সংক্রামিত হয়েছে, যদিও তার মাত্রা কিছুটা কম। পাঞ্জাব অঞ্চলের অধিবাসীদের ধর্মের দিক থেকে তিনভাগে ভাগ করা যায়—হিন্দু, মুসলমান ও শিখ। কিন্তু জাতিগত দিক থেকে তাদের মধ্যে রাজপুত ও জাঠ উপাদান বেশি। জাঠরাই শিখ সমাজের সবচেয়ে প্রভাবশালী জাতি, রাজনৈতিক নেতৃত্ব স্বাধীনতা-উত্তর যুগে যাদের করতলগত। পাঞ্জাবী মুসলমানদের একটা বড় অংশই রাজপুত, তবে তাদের মধ্যে জাঠ উপাদানও আছে। শিখদের মধ্যে জাঠ উপাদানের প্রাধান্য, তবে রাজপুতও আছে, এবং হিন্দুদের মধ্যে উপরিউক্ত দুটি উপাদান ছাড়াও আরও কয়েকটি জাতিগত উপাদান আছে। জাঠরা কট্টর কৃষিজীবী, তবে রাজপুতদের তুলনায় তারা মর্যাদায় খাটো। এছাড়া আরও দুটি জাতির পাঞ্জাব অঞ্চলে প্রাধান্য আছে, ক্ষত্রি এবং অরোরা, যাদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু এবং যারা বাণিজ্যো-পজীবী। শিখদের মধ্যেও অরোরা ও ক্ষত্রি বর্তমান। ক্ষত্রি মুসলমান হলে খোজা বলে পরিচিত হয়। পাঞ্জাবের খোজারা সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান, কিন্তু বোম্বাই-এর খোজারা, যারা প্রধানত সিন্ধুর লোহানাজাতি থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছে শিয়া এবং আগাখানের সম্প্রদায়ভুক্ত। জাঠদের চেয়ে কিছুটা নিম্ন মর্যাদার অধিকারী গুজর জাতি, যাদের মূল আবাস পাঞ্জাবের গুজরাত জেলায়। পঞ্জাব অঞ্চলের জাতি-কাঠামোর নিম্নতম পর্যায়ে অবস্থান করে চুহরা জাতি, যারা আবর্জনা পরিষ্কার ও অপরাপর নিম্ন ধরনের কাজ করে। এদের মধ্যে যারা শিখধর্মে দীক্ষীত তারা মাঝবি বলে পরিচিত এবং যারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষীত তারা মুসল্লি বলে পরিচিত। ধর্মান্তর সত্ত্বেও ইসলাম ও শিখ উভয় সমাজেই তারা অন্ত্যজ বলে গণ্য।

ভক্তকবি তুলসীদাস পুরোদস্তুর ব্রাহ্মণ্যবাদের সমর্থক ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত রামচরিতমানসে তিনি কলিযুগের রীতিনীতি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন যে শূদ্ররা বলতে শুরু করেছে যে তারা ব্রাহ্মণদের চেয়ে ছোট নয়; তারা শিক্ষাদাতা গুরুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে; ব্রাহ্মণরাও তাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করছে; তেলী, কুমোর, চন্ডাল, কিরাত, ডোম, কালোয়ার সকলেই মাথা কামিয়ে গুরু হয়ে বসেছে; তারা জপ করছে, ব্রতপালন করছে, পুরাণ পাঠ করছে, ব্রাহ্মণরা তাদের পায়ের ধুলো নিচ্ছে; ঘোর কলি। স্পষ্টতই এটা রবিদাস, ধর্ণা, সেনা প্রভৃতি ধর্মগুরুদের জনপ্রিয়তার প্রতি কটাক্ষপাত, যাঁরা জাতিতে ছিলেন যথাক্রমে চর্মকার, জাঠ ও নাপিত। এই সকল মুক্তমন সাধকরা প্রত্যেকেই জাতিপ্রথা বিরোধী সাম্যমূলক উদার ধর্ম-

মতের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যাঁদের অনুগামীরা ওই সকল মহৎ আদর্শের ভিত্তিতে নানা সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায় গড়ে তোলেন। কবীরের মুসলমান শিষ্যরা মঘর নামক স্থানে ও হিন্দু শিষ্যরা বারাণসীতে সুরতগোপালের নেতৃত্বে একটি সম্প্রদায় চালু করেন। অনন্তানন্দ-কৃষ্ণদাস পন্থীরা উত্তর পশ্চিম ভারতে খাকী নামক একটি সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন। কবীরের অপরাপর অনুগামীদের মধ্যে মলুকদাস উত্তর ভারতে মলুকদাসী সম্প্রদায়, দাদু পরব্রহ্ম সম্প্রদায়, লালদাস লালদাসী সম্প্রদায়, প্রাণনাথ ধামী সম্প্রদায় ও রামচন্দ্র রাম-সাহেনী সম্প্রদায় স্থাপন করেন। সপ্তদশ শতকের জগজীবন সৎনামী বা সত্যনামী নামক সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন। এই সকল সম্প্রদায়ের নানা উপসম্প্রদায়ও ছিল।

আসামে শংকরদেব ও তাঁর উত্তরাধিকারী মাধবদেবের মৃত্যুর পর তাঁদের প্রবর্তিত মহাপুরুষিয়া সম্প্রদায় কয়েকটি উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়। দামোদরদেব ব্রহ্মসংহতি বা বামুনিয়া নামে একটি উপসম্প্রদায়ের পত্তন করেন। মৎস্যজীবীদের নিয়ে অনিরুদ্ধদেব স্থাপন করেন মোয়ামারিয়া সম্প্রদায়। শংকরদেবের নাতি পুরুষোত্তম ঠাকুর স্থাপন করেন ঠাকুরিয়া সম্প্রদায় এবং গোপালদেব স্থাপন করেন কালসংহতি সম্প্রদায়। বঙ্গদেশে চৈতন্য সম্প্রদায়ও অনেকগুলি উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়। বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যায় নাথপন্থা ও নিরঞ্জনী পন্থার প্রচলন দশম-একাদশ শতকেই হয়েছিল। উড়িষ্যায় পরবর্তী-কালে মহিমাপন্থা ও কুম্ভীপাটিয়া-পন্থার উদ্ভব হয়। সংস্কারবাদী ধর্মীয় আন্দোলনসমূহের প্রভাবে বঙ্গদেশে খুশি-বিশ্বাসী, সাহেবধনী, রামবল্লভী, জগমোহিনী, বলরামী, নেড়া, আউল-বাউল, দরবেশ-সাঁই, সংযোগী, কর্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। দক্ষিণ ভারতের দাসকূট সম্প্রদায় জাতিবর্ণ-প্রথা বিরোধী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। মহারাষ্ট্রে ওই ভূমিকা পালন করেছিল মহানুভবপন্থীরা।

সংস্কারপন্থী ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের সংখ্যা ভারতবর্ষে অসংখ্য যার বিস্তারিত তালিকা দেবার প্রয়োজন এখানে নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে যেটা লক্ষণীয় তা হচ্ছে এই যে এই সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়গুলির অধিকাংশ জাতি-প্রথা বিরোধিতা দিয়ে শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত সেই জাতিপ্রথার কাছেই আত্মসমর্পণ করেছিল। এক্ষেত্রে একটি ভাল দৃষ্টান্ত কর্ণাটকের বীরশৈব সম্প্রদায়, যার প্রবক্তা ছিলেন বসব। বীরশৈব বা লিঙ্গায়েৎরা সমাজসংস্কারের উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। এই সম্প্রদায় ছিল জাতিপ্রথার ঘোরতর

বিরোধী, মদ্যপান ও মাংস ভক্ষণের বিরোধী, বাল্যবিবাহ বিরোধী এবং বিধবা বিবাহের সমর্থক। বসবের শিক্ষার গুণে এবং নিজেদের মধ্যে প্রচণ্ড ঐক্য ও সহযোগিতার কল্যাণে মধ্যযুগেই তারা একটি সমৃদ্ধ সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিল এবং বোধ হয় সেই কারণেই তাদের চরিত্রের পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। অবহেলিত উৎপীড়িত নিম্নবর্ণের মানুষদের টেনে তোলার ঘোষিত আদর্শ থেকে লিঙ্গায়ৎ বা বীরশৈব সম্প্রদায় বিচ্যুত হয়েছিল, এবং নিজেদের জীবন-চর্যা, সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতি নিয়ে এই সম্প্রদায় একটি উচ্চবর্ণের জাতিতে পরিণত হয়েছিল। জাতিপ্রথা বিরোধিতা দিয়ে শুরু করে অবশেষে তারা জাতি হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই রূপান্তরের কারণ ব্যাখ্যা করা খুব সহজ নয়। তবে মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে ভারতের উৎপাদনব্যবস্থার অপরিবর্তনীয়তা এর জন্য কিয়দংশে দায়ী। ধর্মীয় আদর্শের ক্ষেত্রে যে রূপান্তর আদি-মধ্য ও মধ্যযুগে ঘটেছিল তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উৎপাদন ব্যবস্থায় কোন গুণগত পরিবর্তন আসেনি যার ফলে সেইরকম কোন সামাজিক পরিবর্তন ঘটেনি যেখানে নূতন ধর্মীয় আদর্শগুলি কার্যকর হবার ক্ষেত্র পেতে পারে।

৭ ॥ গোত্র এবং প্রবর : শ্রেণী, বর্গ প্রভৃতি

কোন বাঙালী উচ্চবর্ণের ভদ্রলোক নিজেকে এভাবে পরিচিত করেন : আমার জাতি অমুক, গোত্র অমুক, প্রবর অমুক,-অমুক-অমুক, শাখা অমুক এবং গাঁঞি অমুক। আসলে এই বিভাগগুলি পূর্বতন উপজাতীয় বা কৌম-জীবনের স্মারক, যার সঙ্গে ময়্যাটি, ফ্রাত্রি, ক্লান, লিনিয়েজ প্রভৃতি উপজাতীয় বিভাজনের সাদৃশ্য আছে। আমরা আগে দেখেছি, জাতিপ্রথার ভিত্তি অন্ত-র্বিবাহ, এক জাতির লোক অন্যজাতির মেয়েকে বিবাহ করতে পারে না। স্বজাতির মধ্যেই সে বিবাহ করতে বাধ্য। কিন্তু স্বজাতির মধ্যে সে বিবাহ করলেও, স্বগোত্র বিবাহ করা তার পক্ষে নিষিদ্ধ। কাজেই গোত্র বলতে যে কোন জাতির উপবিভাগকে বোঝায়, প্রবর ও শাখা উপবিভাগের উপবিভাগ, গাঁঞি শব্দটি গ্রাম বা এলাকাবাচক।

গোত্রব্যবস্থার সঙ্গে অনেকেই উপজাতীয় টোটেম বিশ্বাসের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। নানা স্থানে দেখা গেছে যে একটি ট্রাইবের অন্তর্গত ক্লানসমূহ কোন প্রতীকী বস্তু, গাছ, ফল, পশু, পাখি ইত্যাদি থেকে নিজেদের উদ্ভব ঘোষণা করে, যে প্রতীকটি টোটেম নামে পরিচিত। ওই টোটেমটি তাদের কাছে

পবিত্র ও পূজ্য। সচরাচর তাদের কাছে টোটেম পশু বা ফল ভক্ষ্যদ্রব্য হিসাবে নিষিদ্ধ। তারা নিজেদের ওই টোটেম নামেই পরিচয় দেয়। একটি টোটেমের অন্তর্গত প্রতিটি মানুষ দুটি প্রধান বিধিনিষেধ মেনে চলে। এক টোটেমের লোক সেই টোটেমের লোককে কদাপি হত্যা করবে না। এক টোটেমের লোক সেই টোটেমের মেয়েকে কদাচ বিবাহ করবে না। এখানে গোত্রসমূহ প্রাচীন ঋষিদের নামে অভিহিত হলেও সেই নামগুলির পশ্চাতে পশুপাখির নাম পাওয়া যায়, যেমন ভরদ্বাজ পক্ষীবিশেষের নাম, শাণ্ডিল্য অর্থ ষাঁড়, কাশ্যপ বলতে কাছিমকে বোঝায়।

ঋগ্বেদে গোত্র শব্দটি বলতে বুঝিয়েছে 'গোশালা' অথবা 'গরুর পাল' (১৫১।৩, ২।১৭।১, ৩।৩৯।৪, ৩।৪৩।৭, ৯।৮৬।২৩, ১০।৪৮।২, ১০।১২০।৮), 'মেঘরাজি' (২।২৩।৩, ৬।১৭।২, ১০।১০৩।৬) বা 'দুর্গ' এবং 'সমূহ' বা জনসম্মেলন ২।২৩।১৮, ৬।৬৫।৫)। শেষোক্ত অর্থেই গোত্র বলতে 'রক্তের দ্বারা সম্পর্কিত জনগোষ্ঠী' বুঝিয়েছে। দ্রষ্টব্য অথর্ববেদ ৫।২১।৩, কৌশিক সূত্র ৪।২। 'সমূহ' শব্দটি 'গণ' বা উপজাতিবাচক। গোত্র যে গণ বা উপজাতির উপবিভাগ (ট্রাইবের যে রকম ক্লান) তার প্রমাণ পাওয়া যায় আশ্বলায়ন শ্রৌত-সূত্রে যখন বলা হয় ভরদ্বাজ আঙ্গিরসগণের অন্তর্গত গোত্র বা বোধায়ন শ্রৌত-সূত্রে যখন বলা হয় ঐতশাসন ভৃগুগণের অন্তর্গত। লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্রে (৮।২।৮-১০) গোত্র ও সগোত্রের সঙ্গে যথাক্রমে 'জন' ও 'সমানজন'-এর সমীকরণ করা হয়েছে। উপনিষদে দেখা যায় যে আচার্যরা ছাত্রদের গোত্রনামে আহ্বান করছেন (প্রশ্ন ১।১, ছান্দোগ্য ৫।১৪।১, ৫।১৬।১, বৃহদারণ্যক ২।২।৪) যা থেকে প্রমাণিত হয় যে উপনিষদের যুগে গোত্রব্যবস্থা মোটামুটি প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল।

গোত্রব্যবস্থার নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলী লক্ষণীয়। প্রথমত স্বগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ। একই গোত্রের অন্তর্গত পুরুষ বা নারী তাদের নিজেদের গোত্রের নারী বা পুরুষকে বিবাহ করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে সগোত্র ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা সঙ্গত নয় (আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ২।৭।১৭।৪, গৌতম ধর্মসূত্র ১৫।২০)। তৃতীয়ত সন্তান অবর্তমানে কোন ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকার তার নিকট সগোত্রদের উপর বর্তায় (গৌতম ধর্মসূত্র ২৮।১৯)। চতুর্থত, প্রেতকার্য ও পিণ্ডদানের সময় মৃতকে তার গোত্রনামে সম্বোধন করা দরকার (আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ৪।৪।১০)। পঞ্চমত, প্রাত্যহিক সন্ধ্যা উপাসনার সময় উপাসনাকারীর পক্ষে নিজ গোত্র ও প্রবরের নাম করা অবশ্য কর্তব্য।

প্রবরের ধারণা গোত্রের ধারণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু একজন ঋষির নামে যেখানে গোত্র পরিচিত, সেখানে একাধিক ঋষিকে নিয়ে প্রবর গঠিত হয়, যে ঋষিনামগুলি আবার অন্য গোত্রের প্রতীক। অর্থাৎ 'ক' ঋষির নামে কারো গোত্র হলে 'খ' 'গ' 'ঙ' এবং 'চ' ঋষিনামগুলি তার প্রবর, 'খ' নামের গোত্র হলে 'ক', 'গ', 'ঘ', 'ঙ' প্রভৃতি 'খ'-এর প্রবর। অর্থাৎ প্রবর হল জ্ঞাতি সম্বন্ধী শাখা। সগোত্রের ন্যায় সপ্রবরেও বিবাহসম্পর্ক স্থাপন করা বিধেয় নয়। প্রবরের অন্তর্গত ঋষিদের নামেই ব্রাহ্মণদের যজ্ঞসূত্রে গিঁট দেওযা হয়। প্রবর শব্দটির আক্ষরিক অর্থ 'পছন্দ করা' বা আহ্বান করা (আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ১।১০।১৮-১৯)। প্রবরের সমার্থবাচক শব্দ হল আর্ষেয় (যাজ্ঞবল্ক্য ১।৫২)। প্রবরপ্রথা ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

গোত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে পাণিনি (৪।১।১৬২) বলেছেন অপত্য পৌত্র প্রভৃতি গোত্র, এককথায় বংশধারা। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র অনুযায়ী গোত্রসমূহ চারটি প্রধান গণ থেকে উৎপন্ন যে চারটি গণ হল উপমন্যু, পরাশর, কুণ্ডিণ এবং বসিষ্ঠ। এই গণগুলি কয়েকটি করে পক্ষে বিভক্ত, পক্ষগুলি গোত্রে বিভক্ত। কোথাও কোথাও এই গণের সংখ্যা আটটি বলা হয়েছে। সে যাই হোক, জাতি ও বর্ণের মত গণ ও গোত্রকে অনাদি ও অনন্ত বলা হয়েছে এই অর্থে যে রক্তসম্বন্ধ ও বংশধারা চিরন্তন। কিন্তু রাম বা শ্যাম নামক ব্যক্তির সঙ্গে বসিষ্ঠ বা ভরদ্বাজ মুনির রক্ত বা বংশধারার সম্পর্ক যেহেতু প্রমাণ করার উপায় নেই, সেই হেতু শাস্ত্রকারকগণ লৌকিক গোত্রের ধারণার প্রবর্তন করেছিলেন যার উপর বর্তমান গোত্রব্যবস্থা নির্ভরশীল। এই লৌকিক গোত্রের মূল ভিত্তি 'রূঢ়ি' নামে পরিচিত যার অর্থ 'পরম্পরা'। এক্ষেত্রে গোত্রনির্ণয় বিষয়টি শাস্ত্রকাররা পারিবারিক পরম্পরার উপরই ছেড়ে দিয়েছেন। একটি পরিবারে যে ব্যক্তি জন্মায় তার বাপ-ঠাকুর্দাই তাকে বলে দেয় তাদের গোত্র কি। কেননা জাতিবর্ণের বিস্তৃত তালিকা শাস্ত্রকাররা অনেক পরিশ্রমে রচনা করলেও সেগুলির অন্তর্গত ব্যক্তিরা কে কোন্ গোত্রপ্রবরে যাবে তা নির্ণয় করা অসাধ্য। যাজ্ঞবল্ক্যের (১।৫৩) মিতাক্ষরা ভাষ্যে উপরিউক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে গোত্র বলতে তাকেই বোঝায় যা পারিবারিক পরম্পরায় গোত্র হিসাবে স্বীকৃত। প্রতিটি গোত্রের সঙ্গে এক থেকে পাঁচটি ঋষি-কুল সম্পর্কিত যা প্রবর নামে পরিচিত।

গোত্র এবং প্রবরের সংখ্যা অগণ্য এবং সেগুলিকে কোন নির্দিষ্ট নিয়মে শ্রেণীবদ্ধ করা যে অসম্ভব ব্যাপার সেকথা প্রবরমঞ্জরীর লেখক বলেছেন।

মহাভারতে (১২।২৯৭।১৭-১৮) বলা হয়েছে যে মূল গোত্র চারিটি—অঙ্গিরঃ, কাশ্যপ, বসিষ্ঠ ও ভৃগু। বোধায়ন শ্রৌতসূত্রের প্রবরাধ্যায়ে বলা হয়েছে যে আটটি মূল গোত্র থেকে পৃথিবীর তামাম গোত্রের উদ্ভব হয়েছে যেগুলি হল বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, অত্রি, বসিষ্ঠ, কশ্যপ এবং অগস্ত্য। ওই প্রবরাধ্যায়ে পাঁচশোর উপর গোত্র ও প্রবর ঋষিনাম আছে। প্রবরমঞ্জরীতে এই সংখ্যা পাঁচহাজারের কাছাকাছি। এই অসংখ্য নামকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে ৪৯টি প্রবরের মধ্যে চালিয়ে দেবার যে চেষ্টা হয়েছে সে কথা স্মৃত্যর্থসার গ্রন্থে বলা হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে যে গোত্র ব্যবস্থার মূলে আছে কোন-না-কোন প্রকারের আদিম উপজাতীয় বিভাজন। এই প্রসঙ্গে আমরা বলেছি যে বহু প্রাচীন গ্রন্থেই গণ থেকে গোত্রের উদ্ভব অন্বেষণ করা হয়েছে। গণ শব্দটি সমূহ শব্দের সঙ্গে সমার্থবাচক, এবং তা কোন ধরনের জনগোষ্ঠীকে সূচিত করে। এই প্রাচীন বিভাজনের আভাস এমন কি অনেক পরবর্তীকালে রচিত সংস্কারপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থেও পাওয়া যায় যেখানে বোধায়ন এবং অপরাপর শ্রৌতসূত্র অবলম্বনে দুটি মূল গণ থেকে গোত্রাদির উদ্ভব ব্যাখ্যা করার চেষ্টা আছে। বলা হয়েছে ভৃগু-গণের দুটি শাখা, জামদগ্ন্য ও অজামদগ্ন্য। প্রথম শাখার উপবিভাগ বৎস এবং বিদ, এবং দ্বিতীয় শাখার উপবিভাগ আরিষ্টসেন, যাস্ক, মিত্রয়ু, বৈন্য এবং শৌনক। এই মোট সাতটি সাতটি শাখা থেকে অসংখ্য গোত্রের উদ্ভব হয়েছে। দ্বিতীয় গণটির নাম অঙ্গিরঃ যার তিনটি শাখা গৌতম, ভরদ্বাজ এবং কেবলাঙ্গিরস। এই তিনটি শাখা যথাক্রমে সাতটি, চারটি ও ছয়টি উপবিভাগে বিভক্ত, যেগুলি থেকে নানা গোত্রের উদ্ভব হয়েছে।

প্রাচীন সাহিত্যে এমনকি লেখসমূহে গণ, ব্রাত, শ্রেণী, পূগ, সংঘ প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায় যেগুলিকে কাত্যায়ন সমূহ অথবা বর্গ আখ্যা দিয়েছেন। বৈদিক সাহিত্যে এই শব্দগুলি গোষ্ঠী বা দল অর্থে ব্যবহৃত। ঋগ্বেদের বহুস্থলেই শ্রেণী, ব্রাত এবং গণের উল্লেখ আছে (১।১৬৩।১০, ৩।২৬।৫, ৫।৫৩।১১ ইত্যাদি) যেগুলি নিতান্তই গোষ্ঠীবাচক। রাজাকে বলা হয়েছে 'গণের সেনানী এবং ব্রাতের প্রথম,' অর্থাৎ উপজাতীয় যুদ্ধ নেতা এবং উপজাতীয় সমাজের প্রথম ব্যক্তি। কৌষীতকি ব্রাহ্মণে (১৬।৭) রুদ্রকে পূগ বলা হয়েছে, কেননা তিনি মরুৎ নামক গণের নেতা। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে (১।১।৩.২৬) ভিক্ষার্থে গমনকারী ব্রহ্মচারীদের 'সংঘ' উল্লিখিত হয়েছে। পাণিনি (৫।২।২১, ৫,২।৫২) পূগ, গণ, সংঘ এবং ব্রাত থেকে নিষ্পন্ন

শব্দাবলী ব্যাখ্যা করেছেন যা থেকে বোঝা যায় তাঁর যুগে ওই শব্দগুলি সুনিশ্চিত অর্থ বহন করত। পাণিনি ৫।২।২১-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মহাভাষ্যে বলা হয়েছে যে ব্রাত বলতে সেই জাতীয় মানব গোষ্ঠীকে বোঝায় যাদের কোন নির্দিষ্ট জীবিকা নেই এবং যারা কায়িক শক্তির উপর নির্ভরশীল। কাশিকায় পূগের ব্যাখ্যা করা হয়েছে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী হিসাবেই, সেই শ্রেণীর মানুষ যাদের কোন পেশা নেই অথচ যারা ফূর্তি করে বেড়ায়। বোধ হয় ইঙ্গিতটা এমন কোন উপজাতির প্রতি করা হয়েছে যাদের মধ্যে কোন উৎপাদন মনস্কতা গড়ে ওঠেনি। কৌটিল্য এই সকল শব্দকে পেশাদারী গোষ্ঠীর তাৎপর্যবাচক বলে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। তিনি সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে শ্রেণীর পার্থক্য করেছেন, এবং শ্রেণী বলতে বুঝেছেন পেশাদার বা কারিগর বা বণিকদের গিল্ড। অবশ্য কৌটিল্যের মতে নিয়মিত সৈন্যবাহিনীকে শ্রেণী আখ্যা না দেওয়া গেলেও, কোন শস্ত্রজীবী জনগোষ্ঠী বার্তাজীবীদের মতই শ্রেণী আখ্যা পেতে পারে (অর্থশাস্ত্র ৭।১, ১১।১)।

বসিষ্ঠ ধর্মসূত্রে (১৬।১৫) বলা হয়েছে যে জমির সীমানাসংক্রান্ত কোন বিরোধ উপস্থিত হলে তা মীমাংসা করার দায়িত্ব 'শ্রেণীর' উপর বর্তায়। বিষ্ণু-ধর্মসূত্রে (৫।১৬৭) বলা হয়েছে যে যদি কেউ কোন 'গণ-এর সম্পত্তি অপহরণ করে বা গণের আইনকানুন লংঘন করে তাকে নির্বাসন দেওয়া কর্তব্য। উভয় ক্ষেত্রেই গণ বা শ্রেণী বলতে এমন কোন জনগোষ্ঠীকে বোঝাচ্ছে যা প্রকৃতির দিক থেকে জ্ঞাতিভিত্তিক। মনু (৮।২১৯) শ্রেণী বা গণের স্থলে সংঘ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কাত্যায়ণের মতে নৈগম বলতে বোঝায় কোন নগরের নাগরিকদের সংগঠন, ব্রাত বলতে বোঝায় শস্ত্রজীবী সৈন্যবাহিনী, পূগ বলতে বোঝায় বণিকদের সংঘ, গণ বলতে বোঝায় ব্রাহ্মণদের গোষ্ঠী, সংঘ বলতে বোঝায় বৌদ্ধ ও জৈনদের, গুল্ম বলতে বোঝায় শ্বপচ ও চণ্ডালদের দল। বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্র সমূহে কিন্তু সংঘ এবং গণ শব্দ দুটি ব্যাপক অর্থে উপজাতি বা কৌমসমাজের ক্ষেত্রে এবং সংকীর্ণ অর্থে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য (১।৩৬১) বলেন যে কুল, জাতি, শ্রেণী এবং গণ তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্ত্রীয় বিধানসমূহ লংঘন করলে রাজা কর্তৃক তারা শাস্তিযোগ্য। অন্যত্র যাজ্ঞবল্ক্য (২ ২৯২) এবং নারদ (সময়-স্যানপাকর্ম ২) শ্রেণী, নৈগম, পূগ, ব্রাত এবং গণ প্রভৃতির সামাজিক রীতিনীতি ও পেশাসমূহের অলংঘনীয়তার কথা বলেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির মিতাক্ষরা ভাষ্যে শ্রেণী ও গণের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে পেশাদার-গোষ্ঠী,

হিসাবে। বিবাদের ক্ষেত্রে পূগ ও শ্রেণীর বিচারক্ষমতার কথা যাজ্ঞবল্ক্য (২।৩০) উল্লেখ করেছেন এবং পূগকে শ্রেণীর চেয়ে অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী বলে বর্ণনা করেছেন।

পরবর্তীকালে শ্রেণী বলতে বিশেষভাবে বৃত্তিজীবীদের গোষ্ঠী বুঝিয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্যের মিতাক্ষরা ভাষ্যে শ্রেণীর উদাহরণ হিসাবে হেড়াবুক (অশ্ববিক্রেতা), তাম্বুলিক (পানবিক্রেতা), কুবিন্দ (তাঁতী), চর্মকার প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়েছে। নাসিক থেকে প্রাপ্ত আভীর রাজা ঈশ্বরসেনের আমলের একটি লেখ থেকে জানা যায় যে পীড়িত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের চিকিৎসার জন্য কুম্ভকার, তৈলকার এবং জলবাহীদের তিনটি শ্রেণী কিছু অর্থ দান করেছিলেন। নাসিক থেকে প্রাপ্ত আরও দুটি লেখে তন্তুবায়দের শ্রেণী কর্তৃক অর্থদানের কথা বলা হয়েছে। এখানে শ্রেণী বলতে পেশাদারদের গিল্ড বুঝিয়েছে। হুবিস্কের আমলের মথুরা ব্রাহ্মী লেখে ময়দা প্রস্তুতকারকদের শ্রেণীর কথা উল্লিখিত হয়েছে। জুনার বৌদ্ধ গুহালেখে বাঁশের কারিগর এবং কাংসকারদের শ্রেণী কর্তৃক অর্থবিনিয়োগের কথা বলা হয়েছে। স্কন্দগুপ্তের ইন্দোর তাম্রশাসনে তৈলকারদের শ্রেণীর কথা বলা হয়েছে।

আমরা আগে দেখেছি যে জাতিপ্রথা বহুলাংশে উপজাতীয়তাবিলোপকরণ পদ্ধতির পরিণাম। 'গণ', 'সংঘ', 'ব্রাত', 'পূগ', 'শ্রেণী', 'গোত্র', 'প্রবর', প্রভৃতি শব্দাবলী আদিমযুগের উপজাতীয় বা কৌমসমাজ ব্যবস্থার স্মারক। এই শব্দগুলির প্রত্যেকটি 'সমূহ' বা জ্ঞাতিভিত্তিক-জনগোষ্ঠী বাচক, যদিও পরবর্তীকালে শব্দগুলির তাৎপর্যের পরিবর্তন ঘটেছিল। শ্রেণী শব্দটি প্রাথমিকভাবে কোন ট্রাইব বা জনগোষ্ঠীকে বোঝালেও কালক্রমে তা বিভিন্ন বৃত্তিধারা বা পেশাদার গোষ্ঠীকে বুঝিয়েছে। মহাভারতে এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সংঘ শব্দটি উপজাতি অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে এবং শব্দটির সমীকরণ করা হয়েছে 'গণ'-এর সঙ্গে। শেষোক্ত শব্দটি মুদ্রায় ও লেখসমূহে বিশুদ্ধ উপজাতি অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন মালব-গণ, যৌধেয়-গণ, প্রভৃতি। সংঘ এবং গণ শব্দদ্বয় বৌদ্ধ এবং জৈন শাস্ত্রগ্রন্থে নির্দিষ্ট নিয়ম শৃংখলায় আবদ্ধ ধর্মীয় সম্প্রদায়কে বুঝিয়েছে। বুদ্ধ ও মহাবীরের সমসাময়িক আচার্যগণ, যেমন পূরণ কস্সপ, পকুধ কচ্চায়ন, অজিত কেশকম্বলী প্রভৃতি, গণাচার্য ও সংঘনায়ক হিসাবে পরিচিত ছিলেন ; জৈন সংঘনেতাদের উপাধি ছিল গণধর। বুদ্ধ ও মহাবীর উভয়েই উপজাতীয় সমাজব্যবস্থার অনুকরণেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের নিয়মকানুন প্রবর্তন করেছিলেন, যে বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আকরগ্রন্থ সমূহে প্রদত্ত তথ্যাবলী

১ ॥ ঋগ্বেদে জাতিবর্ণপ্রথা

'রঙ' বা 'আলো' অর্থে ঋগ্বেদের বহুস্থলেই 'বর্ণ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে এই শব্দটি সুনির্দিষ্ট কতিপয় জনগোষ্ঠীকে বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে (২।১২।৪, ১।১৩০।৮, ৩।৩৪।৯, ৪।১৬।১৩, ৯।৭১।২ ইত্যাদি)। আর্যবর্ণ, দস্যুবর্ণ, দাসবর্ণ, অসুরবর্ণ প্রভৃতির উল্লেখ ঋগ্বেদে পাওয়া গেলেও এই শব্দগুলি চাতুর্বর্ণ প্রথার সঙ্গে সংশ্রববিহীন। ঋগ্বেদের যুগে কোন-না-কোন ধরনের জাতিপ্রথা অবশ্যই বর্তমান ছিল, কিন্তু চাতুর্বর্ণের ধারণা তখনও গড়ে ওঠেনি। আমরা আগেই বলেছি যে চাতুর্বর্ণের সামাজিক আদর্শ অনেক পরে গড়ে উঠেছে, যা একটি কল্পিত সামাজিক বিভাজন, কিন্তু জাতিপ্রথা অনেক প্রাচীন যার মূলে নৃতাত্ত্বিক, ভাষাগত, পেশাদারী, উপজাতীয় নানা উপাদান বর্তমান। একমাত্র ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে চারটি বর্ণের নাম পাওয়া যায়, যেখানে বলা হয়েছে, তাঁর মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় থেকে রাজন্য, উরুদেশ থেকে বৈশ্য এবং চরণদ্বয় থেকে শূদ্রের উদ্ভব হয়েছে। এই পুরুষসূক্তকে (১০।৯০) অনেকেই পরবর্তীকালে রচিত এবং প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন। পরবর্তীকালে রচিত এবং প্রক্ষিপ্ত না হলেও, পুরুষসূক্ত কিছুই প্রমাণ করেনা, কেননা সেই বিরাট পুরুষের পাদদ্বয় তাঁর দেহের অন্যান্য অংশের চেয়ে মানমর্যাদায় খাটো ছিল সে বিষয়ে প্রমাণাভাব। দ্বিতীয়ত পুরুষসূক্তের কোথাও কোন বর্ণ বা চাতুর্বর্ণ শব্দের উল্লেখ নেই। সূক্তটির মূল বিষয়বস্তু যাগযজ্ঞের কোন এক জটিল পদ্ধতি। বস্তুত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শব্দদ্বয় ঋগ্বেদের বহুস্থলে থাকলেও কোন বর্ণের পরিপ্রেক্ষিতে ওই শব্দ দুটির ব্যবহার করা হয়নি। বৈশ্য ও শূদ্র শব্দদ্বয় পুরুষসূক্ত ছাড়া ঋগ্বেদের অন্যত্র অনুপস্থিত।

ঋগ্বেদে দুটি পরস্পরবিরোধী উপজাতীয় সমাজের পরিচয় পাওয়া যায়, আর্যবর্ণ ও দাস-দস্যুবর্ণ। ঋগ্বেদে আর্য বলতে যে কোন বহিরাগত জন-গোষ্ঠীকে বুঝিয়েছে তার কোন ক্ষীণতম ইঙ্গিতও নেই। যে গল্প বহুদিন ধরে ইতিহাসে প্রচলিত আছে, বাইরের কোন দেশ থেকে আর্যরা দলে দলে এসে

ভারতের অনার্যদের পরাজিত করে এদেশেই বসতি স্থাপন করে এবং এখানে বৈদিক সভ্যতার প্রবর্তন করে, এরকম গল্পের কোন হদিস অন্তত ঋগ্বেদ থেকে পাওয়া যায়না। ঋগ্বেদে আর্যবর্ণ বলতে বিশেষ কয়েকটি উপজাতির মানুষদের বুঝিয়েছে যাদের একটা নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক পর্যায়ে উত্তরণ ঘটেছিল। এই সকল উপজাতিদের মধ্যে ভরতরা বাস করত যমুনা ও সরস্বতী নদীদ্বয়ের মাঝখানে, তৃৎসুরা পরুষ্ণী নদীর পূর্বতীরে, সৃঞ্জয়রা উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে, পুরু ও যদুরা সরস্বতীর উভয় কূলে। কৃবিরা সিন্ধু ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্তী অঞ্চলে, দ্রুহ্যু, তুর্বস ও অনুরা চন্দ্রভাগা ও ইরাবতীর মধ্যস্থলে, মৎস্যরা বর্তমান আলোয়ার ভরতপুর অঞ্চলে, অজ, শিগ্রু ও যক্ষুরা যমুনা-সরস্বতী অঞ্চলে, পকথ, ভলানঃ, বিষাণী, অলিন ও শিবরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ অঞ্চলে, গান্ধারিরা পূর্ব আফগানিস্তানে এবং চেদি, উশীনর, বশ ও পারাবতরা যমুনার দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলে।

যাদের দাস ও দস্যুবর্ণ বলে ঋগ্বেদে অভিহিত করা হয়েছে তারা আর্য-বর্ণের প্রতিকূল উপজাতি। এই দুটি শব্দ দ্বারা পরবর্তীকালে ভৃত্য ও চোরডাকাতদের বোঝালেও, আদিতে প্রতিকূল উপজাতীয় জনগোষ্ঠীকেই বোঝাত কেননা ইরানেও এই অর্থেই 'দাহ' ও 'দহ্যু' শব্দদ্বয় প্রাচীনযুগে ব্যবহৃত হত। সম্রাট দারয়বৌসের বেহিস্তান ও অপরাপর লেখ থেকে 'দহ্যুনাম ক্ষায়থ' উপাধির পরিচয় পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে পণি নামক একটি জনগোষ্ঠীর খবরও পাওয়া যায় যাদের সঠিক ভৌগোলিক অবস্থান আমাদের জানা নেই। তবে তারা বাণিজ্যোপজীবী ছিল এবং আর্যবর্ণের সঙ্গে তাদের সদ্ভাব ছিলনা। ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও আর্যবর্ণের সঙ্গে দাস-দস্যুবর্ণের পার্থক্য ছিল, কেননা প্রথমোক্তেরা বহিষ্মৎ এবং শেষোক্তেরা অব্রত বলে পরিচিত ছিল। সম্ভবত দাস ও দস্যু শব্দ দুটি সমার্থক। ঋগ্বেদ ১০।২২।৮-এ দাস ও দস্যুরা একই শ্লোকে শত্রুগোষ্ঠী হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে। ১০।৯৯।৬-৮-এ ইন্দ্র একই সঙ্গে দাস ও দস্যুদের বধ করছেন বলা হয়েছে। দস্যুদের অব্রত অর্থাৎ শাস্ত্রবিরোধী (১৫১।৮, ১।১৭৫।৩, ৬।১৯।১০), অক্রতু বা যাগযজ্ঞবিহীন (৭।৬।৩), মৃধ্রবাক বা দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহারকারী (৫।২৯।১০, ৭।৬।৩) এবং অনাস বা চ্যাপটা নাক (৫।২৯।১০) বলা হয়েছে। দাস-দস্যু পর্যায়ের কিছু উপজাতির নামও ঋগ্বেদে বর্তমান, যেমন কীকট, কিরাত, চাণ্ডাল, পরাঙ্ক, সিমু্য প্রভৃতি। শম্বর, পিপ্রু, বর্চী প্রমুখ দাস রাজারা ঋগ্বেদে উল্লিখিত হয়েছেন। দাসবর্ণের সঙ্গে আর্যবর্ণের

যুদ্ধ, ইন্দ্র কর্তৃক দাসদের নগর ধ্বংস প্রভৃতি বিষয় ঋগ্বেদে স্থান পেয়েছে (১।১৭৪।৭, ২।১১।৪, ৩।১২।৭, ৬।২২।১০, ৬।৬০।৬, ৭।৮৩।১, ১০।৬৯।৬, ১০।৮৩।১, ১০।১০২।৩ ইত্যাদি)।

পরাজিত দাস-দস্যুদের থেকেই নিম্নবর্ণের জাতিরা গড়ে উঠেছিল এই ধারণাটি বহুল প্রচলিত হলেও ভিত্তিহীন। আর্যবর্ণের সঙ্গে সর্বদাই দাস-দস্যুবর্ণের সংঘর্ষ হয়েছিল এবং সেই সংঘর্ষে একমাত্র শেষোক্তরাই সর্বক্ষেত্রে পরাজিত হয়ে প্রথমোক্তদের কাছে দাসখত লিখে দিয়েছিল, এটা ঐতিহাসিক-ভাবে সম্ভব নয়। আসলে ভারত-ইতিহাসে বৈদিক সভ্যতার উদ্ভব সেই সময়ে, যখন এখানে উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন কৌশলের পরিবর্তনের ফলে কোন কোন উপজাতির সামাজিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন আসতে শুরু করেছিল. এবং পুরাতন কৌম ব্যবস্থার পরিবর্তে তাদের মধ্যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় উত্তরণের লক্ষণসমূহ দেখা গিয়েছিল। এই পরিবর্তনের শরিক যারা ছিল তাদের মধ্যে তথাকথিত আর্যবর্ণের উপজাতিরাও যেমন ছিল দাস-দস্যুবর্ণের উপজাতিরাও তেমনই ছিল। এদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষেও যেমন হয়েছিল, নানা ক্ষেত্রে সমন্বয়ও তেমন ঘটেছিল, ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসের দিকে তাকালেই যা বোঝা যায়। ফলে দাস-দস্যুবর্ণ থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চপর্যায়ের জাতিও গড়ে উঠেছিল। শাসক এবং পুরোহিতশ্রেণীর সকলেই আর্যবর্ণভুক্ত ছিলনা, পক্ষান্তরে নিম্ন পেশাজীবী মানুষদের সকলেই দাস-দস্যুবর্ণের ছিল না। প্রাথমিক ভেদটি ছিল উপজাতীয় পর্যায় যারা অতিক্রম করতে চলেছিল এবং যারা ওই পর্যায়ে পুরোপুরি আটকে ছিল তাদের মধ্যে। অনেক পরে শেষোক্তদের মধ্যে ভাঙন ধরতে শুরু করেছিল প্রথমোক্তদের প্রভাবে এবং নানা ঐতিহাসিক কারণে। তারপর যুগের পর যুগ ধরে তাদের থেকে অসংখ্য মানুষ জাতিকাঠামোর মধ্যে আসতে শুরু করে যে পদ্ধতির বিরাম আজও হয়নি।

ঋগ্বেদে চাতুর্বর্ণের বিকাশ লক্ষ্য না করা গেলেও পেশাদারী জাতিপ্রথা অবশ্যই গড়ে উঠেছিল। পুরোহিত ও শস্ত্রজীবীরা যে ঋগ্বেদের যুগেই যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বলে পরিচিত হয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ ২।৪৩।২-এ ব্রহ্মপুত্র শব্দটি ঋত্বিজ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ব্রাহ্মণ শব্দটির উল্লেখ ঋগ্বেদে ঘটেছে মঙ্গলকারক হিসাবে (৬.৭৫।১০), সোমপায়ী ও মন্ত্রপাঠকারী হিসাবে (৭।১০৩।৭-৮), অগ্নি ও সোমের উপাধি হিসাবে (১০।১৬।৬), পিতৃগণ প্রসঙ্গে (৬।৭৫।১০) এবং আরও নানা প্রসঙ্গে। তবে

ব্রাহ্মণের চেয়েও ব্রহ্ম শব্দের উল্লেখ আরও বেশি। ৭।৩৫।১১-র বসিষ্ঠকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে, ৯।৯৬।৬-র ব্রহ্মা দেবানাম উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু এখানে ব্রহ্ম শব্দটির জাতিগত তাৎপর্য নেই। ঋগ্বেদ ৮।৩৩।৯-তে ব্রহ্ম শব্দটি পুরোহিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তী সাহিত্যে ব্রহ্ম বলতে একশ্রেণীর পুরোহিতকে বুঝিয়েছে। সাধারণভাবে ঋগ্বেদে ব্রহ্ম বলতে স্তোত্র বা প্রার্থনাকে বোঝায়। দ্রষ্টব্য ৪।৬।১১, ৬।৫২।২, ১০।১০৫।৮, ১০।১৪১।৫। ঋগ্বেদ ৩।৫৩।১২-তে বলা হয়েছে বিশ্বামিত্রের ব্রহ্ম (প্রার্থনা বা আধ্যাত্মিক শক্তি) ভরতদের রক্ষা করে। ১ ১৫৭।২-তে প্রার্থনা ও শৌর্য অর্থে যথাক্রমে ব্রহ্ম ও ক্ষত্র শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়েছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে ব্রহ্ম থেকেই ব্রাহ্মণ হয়েছে যে শব্দটি পেশাদার পুরোহিতকে বুঝিয়েছে। ব্রাহ্মণের পেশা যে সর্বদাই বংশগত ছিল তা নয়, কেননা ঋগ্বেদ ৯।১১২।৩-এ বলা হয়েছে, আমি স্তোত্র আবৃত্তি করি, আমার পিতা চিকিৎসক, আমার মাতা প্রস্তরের দ্বারা শস্য মর্দন করেন। আমরা সকলেই একত্রে ধনার্জনের চেষ্টা করি।

ঋগ্বেদে ক্ষত্রিয় শব্দটিরও বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। দেবতাদের উপাধি হিসাবে, বিশেষ করে মিত্র, বরুণ ও আদিত্যের উপাধি হিসাবে, ক্ষত্রিয শব্দটিকে নানাস্থানে ব্যবহার করা হয়েছে। দ্রষ্টব্য ৭।৬৪।২, ৮।২৫।৮, ৮।৬৭।১, ১০।৬৬।৮ ইত্যাদি। কোন কোন স্থানে রাজা বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বোঝানোর জন্য ক্ষত্রিয় শব্দটির ব্যবহার হয়েছে (৪।৪২।১, ১০।১০৯।৩)। রাজন্য শব্দটির ক্ষত্রিয় অর্থে ব্যবহার একমাত্র পুরুষসূক্তেই বর্তমান, যদিও রাজন্‌ শব্দটির প্রয়োগ ঋগ্বেদের নানাস্থানেই আছে, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বা প্রধান, বা নেতা অর্থে। দ্রষ্টব্য ঋগ্বেদ ১০।৪২।১০, ১০।৯৭।৬। এছাড়া যদু, তুর্বস, দ্রুহ্য, অনু, পুরু, ভৃগু ও তৃৎসুদের প্রধান হিসাবে রাজন শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের, অর্থাৎ পুরোহিত ও শাসক শ্রেণীর মধ্যে একটা সমঝোতার ইঙ্গিতও ঋগ্বেদ থেকে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ ৪।৫০।৮-এ বলা হয়েছে, যে রাজা ব্রহ্মাকে প্রথমে স্থাপন করে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে সম্মান করে, তার গৃহে সুখের অবস্থান ঘটে, তার জন্য ধরিত্রী সর্বদাই সমৃদ্ধিশালী হয়, জনসাধারণ তার ইচ্ছার নিকট অবনত হয়।

বৈশ্য এবং শূদ্র শব্দদ্বয়ের উল্লেখ ঋগ্বেদে একমাত্র পুরুষসূক্ত ভিন্ন অন্যত্র নেই যদিও বিশ্‌ শব্দটির বহুল প্রয়োগ আছে যার অর্থ জনগণ অথবা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী। ঋগ্বেদের বহুস্থানেই মানুষীর্বিশঃ, মানুষীষু-বিক্ষু,

৩।১১।৫, ৪ ৬ ৭, ৪।১১২, ৫।১।১৯, ৫।৮।৩, ৬।৪৮।৮, ৬ ৪৭।১৬, ১০।১ ৪, মানুষীনাম-বিশম, বিশো-মানুষ্যান প্রভৃতির উল্লেখ আছে (৩ ৫।৫,৩।৬।৩, ১০।৬৯।৯ ইত্যাদি)। ঋগ্বেদ ৪।২৮।৪, ৬।২৫।২ প্রভৃতিতে দাসীর্বিশঃ বা দাসদের জনপদের কথা বলা হয়েছে। ৩.৩৪ ২-এ দৈবীনাম-বিশাম বলতে দেবগোষ্ঠী বুঝিয়েছে। ৮।৬৩।৭-এ বিশের সংগে জনের সমীকরণ করা হয়েছে। ৫।৩২।১১-তে ইন্দ্রকে বলা হয়েছে পাঞ্চজন্য এবং ৯।৬৬।২০তে অগ্নিকে বলা হয়েছে পাঞ্চজন্যঃ পুরোহিতঃ, অর্থাৎ পঞ্চজনের পুরোহিত। কোন কোন ক্ষেত্রে জন ও বিশের পার্থক্য করা হলেও (যেমন ২।২৬।৩-এ বলা হয়েছে স ইজ্জনেন স বিশা স জম্মনা স পুত্রৈর্বাজম ভরতে ধনা নৃভিঃ) অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঋগ্বেদে জন ও বিশকে এক বলা হয়েছে। ঋগ্বেদের নানা স্থানে জন শব্দ যোগে পাঁচটি নৃগোষ্ঠীর উল্লেখ করা হয়েছে যথা পঞ্চজনঃ (৩।১৭।৯, ৩।৫৯।৭, ৬।১১।৪, ৮।৩২ ২২, ১০।৬৫ ২৩, ১০ ৪৫।৬), পঞ্চকৃষ্টি (২।২।১০, ৪ ৩৮।১০), পঞ্চক্ষিতি (৫।৩৫।২, ৬ ৪৮।৭, ৭।৭৫।৪) পঞ্চচর্ষণি (৫।৮৬।২, ৭।১৫।২) ইত্যাদি। বিশ বা জনের তাৎপর্য এলাকাভিত্তিক। অন্ততঃ ঋগ্বেদের যুগে যে বিশ শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায় তার সংগে বৈশ্য জাতির কোন সম্পর্ক নেই। বৈশ্য শব্দটিকে জানপদীয় অর্থে ব্যবহার করলে তার দ্বারা একটা নির্দিষ্ট জনসমাজে অনুসৃত বিভিন্ন বৃত্তিধারীদের বোঝাতে পারে। এই অর্থে অন্তত ঋগ্বেদের যুগে বৈশ্য কোন জাতি নয়, যদিও বৈশ্য থেকে নানা পেশাদার জাতির উদ্ভব হওয়া অসম্ভব নয়। ঋগ্বেদে কিছু পেশাদার জাতির পরিচয় আছে যেমন বপ্তা বা নাপিত (১০ ।১৪২।৪), ত্বষ্টা বা তষ্টা অর্থাৎ সূত্রধর বা রথনির্মাতা (১।৬১।৪, ৭।৩২।২০, ৮।১০২।৮, ৯।১১২।১, ১০ ১১৯।৫), ভিষক্ (৯।১১২।১-৩), কর্মার (১০।৭২।২, ৯।১১২ ২) চর্মম্না বা চর্মকার (৮।৫।৩৮) প্রভৃতি।

২ ॥ পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণগ্রন্থে জাতিবর্ণপ্রথা

পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণ-গ্রন্থসমূহের যুগে যেমন একদিকে পেশাদার জাতিসমূহের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে অপরদিকে তেমনই চাতুর্বর্ণের ধারণার প্রাথমিক কাঠামোটা গড়ে ওঠার পরিচয় পাওয়া যায়। অথর্ববেদে (৫।১৭।১৯) বলা হয়েছে ব্রাহ্মণদের গোধনের ক্ষতি করলে তার পরিণাম ভাল হয় না। এই জাতীয় উক্তি সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যের দ্যোতক। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (১।৭।৩।১, ২।৬।২।৫, ৫।২.৭।১) বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণরা সেই জাতীয় দেবতা

যাদের প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায়, এবং সেই কারণে তাদের স্থান সর্বাগ্রে। তাণ্ড্যব্রাহ্মণে (১১।১।২) বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণদের মুখেই বিক্রম, কেননা তারা বিধাতার মুখ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণে (১১।৫।৭।১) ব্রাহ্মণদের চারটি বিশেষ গুণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যথা ব্রাহ্মণ্য (ব্রাহ্মণ হিসাবে জন্মের বিশুদ্ধ)। প্রতিরূপচর্যা (চরিত্রমাধুর্য), যশ (গৌরব) এবং লোকপক্তি (লোকশিক্ষা প্রদান)। ব্রাহ্মণদের দ্বারা শিক্ষালাভ করে মানুষ জীবনে সার্থকতা পায়, এবং সেইজন্যই ব্রাহ্মণ চারিটি সামাজিক সুবিধা-ভোগের অধিকারী, যথা অর্চা (সম্মান), দান, অজেয়তা, এবং অবধ্যতা। শতপথ ব্রাহ্মণেই (৫।৪।৬।৯) সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে বর্ণ চারটি—ব্রাহ্মণ, রাজন্য, বৈশ্য ও শূদ্র।

শতপথ ব্রাহ্মণে (৪। ।৪ ৬) ব্রাহ্মণের সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের সহযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শ্রোত্রিয় এবং রাজাই নিয়মের রক্ষক (ধৃতব্রত-বরুণের উপাধি, শতপথ ৫।৪।৪।৫)। রাজার পক্ষে পুরোহিতের সহায়তা অবশ্য প্রয়োজনীয়, এমনকি দেবতাদের পক্ষেও ঠিক পথে চলার জন্য পুরোহিতের প্রয়োজন (তৈত্তিরীয় সংহিতা ২।৫।১।১, ৫।১।১০।৩)। পুরোহিত ক্ষত্রিয়ের অর্ধ-আত্মা, কেননা পুরোহিতবিহীন রাজার অন্ন দেবতারা গ্রহণ করেন না (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩৮।৪, ৪০।১)। তবে কোন কোন স্থানে ক্ষত্রিয়কে উচ্চতর স্থান দেওয়া হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণে (১৪।৪ ১।২৩) বলা হয়েছে যে ক্ষত্রিয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই কেননা রাজসূয় যজ্ঞে ক্ষত্রিয়ের আসন ব্রাহ্মণের উপরে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বৌদ্ধ দীঘ-নিকায়ের অম্বট্ঠ-সুত্তে বুদ্ধ ক্ষত্রিয়দের জাতি হিসাবে ব্রাহ্মণদের চেয়ে উচ্চে স্থান দিয়েছেন। ক্ষত্রিয় বলতে সঠিকভাবে শাসকশ্রেণীকে বুঝিয়েছে, শুধু রাজা বা রাজবংশীয়দেরই নয়। পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণ-গ্রন্থসমূহে কিছু কিছু ক্ষত্রিয় পদাধিকারীর নাম পাওয়া যায় যেমন সংগ্রহীতৃ বা কোষাধ্যক্ষ (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৪।৫ ৪।২, ১।৮।৯।১-২) ক্ষতৃ বা প্রাসাদরক্ষক, ভাগদুঘা বা করআদায়কারী, অক্ষাবাপ প্রভৃতি (তাণ্ড্যব্রাহ্মণ ১৯ ১'৪, শতপথ ১৩।৪।৯।৫ ইত্যাদি)।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় (২।৩।৭।১) বলা হয়েছে যে পশুপ্রার্থী হয়ে বৈশ্যরা বাস্তবিকই যজ্ঞ করে, এবং দেবতারা অসুরদের নিকট পরাজিত হয়ে বিশ বা বৈশ্যে পরিণত হয়েছিলেন। ওই একই গ্রন্থে (৭।১।১।৫) বলা হয়েছে মানুষদের মধ্যে বৈশ্য এবং পশুদের মধ্যে গরু ভোগের সামগ্রী। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১।৬।৫, ৩।১২।৯) বলা হয়েছে যে বৈশ্য জাতি ঋগ্বেদের মন্ত্র থেকে

উদ্ভূত, এবং তারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের থেকে পৃথক হয়ে অন্যত্র বাস করে। তাণ্ড্যব্রাহ্মণে (৬।১।১০) বলা হয়েছে যে বৈশ্যরা যদিও অপরের খাদ্য বা ভোগস্বরূপ, তারা কিন্তু কখনও ফুরায়না, কেননা তারা প্রজাপতির প্রজনন। এজন্যই তার অজস্র গোসম্পদ, দেবতারা তার পৃষ্ঠপোষক, জাগতী ছন্দ থেকে তার উদ্ভব, বর্ষাকাল তার ঋতু. তাই সে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের খাদ্য, কেননা তাদের তুলনায় তার স্থান নীচু। শতপথ ব্রাহ্মণ (৪ ৩।৩।১০) বলা হয়েছে যে ইন্দ্রের পর রাজা মরুৎগণকে তার অংশ প্রদান করে যার ফলে সে বৈশ্যদের উপর প্রভুত্ব করে। এত কথার প্যাঁচের মধ্যে না গিয়ে ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ (৩৫।৩) মাত্র দুটি বাক্যে বৈশ্যদের সম্পর্কে সার কথা বলেছে যে তারা অপরকে খাদ্য যোগায় এবং করপ্রদান করে। উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে যে বৈশ্যরা যজ্ঞের অধিকারী, তারা সংখ্যায় অন্যের চেয়ে বেশি, তারা পশুপালন ও খাদ্য উৎপাদন করে, তারা রাজকর প্রদান করে, তারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের চেয়ে মর্যাদায় খাটো এবং এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের কাছ থেকে পৃথক থাকাই তারা বাঞ্ছনীয় মনে করে।

পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণগ্রন্থ সমূহে নিম্নতম বর্ণ হিসাবে শূদ্রের বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হয়েছে যে (৭।১।১।৬) মানুষের মধ্যে শূদ্র এবং পশুর মধ্যে অশ্ব উভয়েরই কাজ সেবা করা। সেই হিসাবে উভয়েই নিম্নস্থানভুক্ত এবং যাগযজ্ঞেব ক্ষেত্রে অনধিকারী। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৫।১২) বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণ গায়ত্রীছন্দ থেকে উদ্ভূত, ক্ষত্রিয় ত্রিষ্টুভ থেকে, বৈশ্য জাগতী থেকে, কিন্তু শূদ্র কোন ছন্দ থেকে উৎপন্ন হয়নি। তাণ্ড্যব্রাহ্মণে (৬।১।১১) বলা হয়েছে যে শূদ্র অনেক পশু সম্পদের মালিক হলেও যজ্ঞাধিকারী নয়, সে দেবতাবিহীন। সে অপর তিন বর্ণের পা ধুয়ে দেবার যোগ্য, কেননা তার উৎপত্তি পা থেকে (তুলনীয় ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত, পদ্ভ্যাম্ শূদ্রো অজায়ত)। শতপথ-ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে শূদ্র মূর্তিমান অনৃত, শূদ্র ও শ্রম অভিন্ন, কোন দীক্ষীত শূদ্রের সংগে বাক্যালাপের উপযুক্ত নয়। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে (৩৫।৩) বলা হয়েছে যে অপর তিন বর্ণের হুকুম তামিল করার জন্যই শূদ্রের উৎপত্তি, তাকে ইচ্ছামত দাঁড় করানো যেতে পারে, ইচ্ছামত প্রহার করা যেতে পারে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৭।৪।১৯।৩) বলা হয়েছে যে কোন শূদ্র নারী যদি অপরবর্ণের পুরুষকে দৈহিক তৃপ্তি দেয়, সেজন্য তার কোন পয়সাকড়ি চাওয়া উচিত নয়।

শূদ্র শ্রেণীভুক্ত কিছু জাতির উল্লেখ পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণগ্রন্থ-সমূহে

পাওয়া যায়। এই সকল জাতির মধ্যে অথর্ববেদে (৩।৫ ৬-৭) রথকার, কর্মার ও সূতের উল্লেখ আছে। বাজসনেয়ী সংহিতা (১৬।২৭ ২৮, ৩০ ৫-১৩), কাঠক সংহিতা (১৭।১৩) এবং তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৪।৫।৪।২) তক্ষণ (কাঠের মিস্ত্রী), রথকার, কুলাল (কুম্ভকার), কর্মার (কর্মকার), পুঞ্জিষ্ঠ, মৃগায়ু, শ্বনি (শিকারজীবী), নিষাদ, ইষুকৃৎ (বাণ প্রস্তুতকারী) ও ধন্বকৃতের (ধনু পস্তুতকারী) উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩।৪।১ থেকে) পুরুষমেধ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত পেশাদার জাতিসমূহ উল্লিখিত হয়েছে ঃ আযোগা, মাগধ (চারণ), সূত, শৈলূষ (অভিনেতা), রেভ, ভীমল, রথকার, তক্ষণ, কৌলাল, কর্মার, বপ, ইষুকার, ধন্বকার, জ্যাকার, রজ্জুসর্গ, মৃগায়ু, শ্বনি, সুরাকার, অয়স্তাপ, কিতব, বিদলকার, কণ্টককার প্রভৃতি। শতপথ ব্রাহ্মণে (১১।৮।১) কৌলালচক্র বা কুমোরের চক্রের উল্লেখ আছে। এছাড়া উগ্র (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩।৮।৫), পৌল্কস (বাজসনেয়ী ৩০।১৭, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩ ৪।১৪, কিরাত (তাণ্ড্য ১৩।১২ ৪, বাজসনেয়ী ৩০।১৬, অথর্ববেদ ১০ ৪।১৪, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩।৪।১২) ও চণ্ডালের (বাজসনেয়ী ৩০.২১, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩।৪।১৭) উল্লেখ আছে।

রথকার ও নিষাদদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে কিছু সংশয় আছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (১।১।৪) রথকারদের উপর অগ্নিচয়ন ধরনের কিছু যাজ্ঞিক কাজ অর্পণ করেছে যা থেকে মনে হয় তাদের বিশেষ পেশার গুণে রথকাররা কিছু বিশেষ সুযোগ সুবিধার অধিকারী ছিল। জৈমিনি তাঁর পূর্ব-মীমাংসা-সূত্রে (৬।১।৪৪ ৫০) রথকারদের বর্ণকাঠামোয় কিছু বিশেষ সুবিধা মেনে নিয়েছেন এবং তাদের সৌধন্বন নামক একটি জাতিতে স্থান দিয়েছেন যা শূদ্র নয়, আবার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যও নয়। যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি ১।১০-এর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বিশ্বরূপ বলেছেন যে কোন কোন স্মৃতিগ্রন্থে রথকারদের উপনয়নের অধিকারী ভুল করে বলা হয়েছে, কেননা শ্রুতি অনুযায়ী তারা অগ্নিচয়নাদি কাজের অধিকারী। কোন কোন ব্রাহ্মণগ্রন্থে নিষাদস্থপতি কর্তৃক রুদ্রের উদ্দেশে ইষ্টি অর্পণের অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে পূর্ব-মীমাংসাসূত্রে (৬।১।৫১-৫১) বিতর্ক তোলা হয়েছে যে ওই শব্দটির দ্বারা নিষাদ-জাতীয় অধিপতির কথা বলা হয়েছে না নিষাদদের অন্যজাতীয় অধিপতির কথা বলা হয়েছে। এই বিষয়ে অবশ্য মীমাংসাকারের সিদ্ধান্ত যে এখানে নিষাদজাতীয় প্রধানেরই কথা বলা হয়েছে, কাজেই নিষাদদের সামাজিক অবস্থান অন্যান্য শূদ্রজাতির চেয়ে সামান্য উপরে ; কেননা শাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণে

(২৫।১৫) বিশ্বজিৎ যজ্ঞকারী রাজাকে নিষাদ পল্লীতে অবস্থান ও নিষাদ-প্রাপ্ত খাদ্যগ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই বিচারে নিষাদরা একান্তই অন্ত্যজ ছিলনা, অন্তত বৈদিক যুগে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৩।৩৬) বলা হয়েছে যে শুনঃশেপকে বিশ্বামিত্র মুনি পুত্র হিসাবে গ্রহণ করতে চাইলে তাঁর পঞ্চাশজন পুত্র তাতে আপত্তি করে। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে বিশ্বামিত্র তাদের অভিশাপ দেন যে তারা নীচ জাতিতে পরিণত হবে এবং ফলে তারা অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, মূতিব ও পুলিন্দ জাতিতে রূপান্তরিত হয়। উপরিউক্ত পাঁচটি জাতিই কিন্তু প্রাচীন ভারতের পাঁচটি প্রসিদ্ধ উপজাতি। তাদের উপজাতীয়তাবিলোপ ও জাতিকাঠামোয় অনুপ্রবেশের বিষয়টি যুক্তিসিদ্ধ করার জন্যই এই কাহিনীটির আমদানী করা হয়েছে। একই যুক্তির সূত্র ধরে মনুস্মৃতিতে (১০।৪৩ ৪৫) পুণ্ড্র, ওড্র, দ্রবিড়, কম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দর্দ ও খসদের ক্ষত্রিয়ত্ব থেকে পতিত শূদ্র হিসাবে দেখানো হয়েছে। এদের শূদ্র হিসাবে পরিগণিত করার কারণস্বরূপ বলা হয়েছে যে এরা উপনয়নাদি বৈদিক সংস্কার থেকে বিচ্যুত হবার ফলেই শূদ্রত্বে অধঃপতিত হয়েছে।

৩ ॥ ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রসমূহে চাতুর্বর্ণ

ধর্মসূত্রসমূহের যুগে চাতুর্বর্ণের ধারণা সুপ্রচলিত হয়ে গিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে স্মৃতি বা ধর্মশাস্ত্র সমূহে এই ধারণা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল। প্রথম শ্রেণীর রচনাসমূহে চারটি বর্ণের অন্তর্গত মানুষদের কর্তব্য-অকর্তব্য এবং অধিকার ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধার কথা বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনাসমূহে উপরিউক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও বর্ণের অন্তর্গত জাতি-সমূহের কথা বলা হয়েছে এবং জাতিসমূহের উদ্ভব বর্ণসংকর তত্ত্বের ভিত্তিতে আলোচিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের দ্বিজাতির পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে, এবং শূদ্রদের পৃথক করা হয়েছে। বেদপাঠ, যজ্ঞ এবং দান দ্বিজাতির সাধারণ কর্তব্য বলে ঘোষিত হয়েছে, তবে বৃত্তি বা জীবিকার ক্ষেত্রে প্রতিটি বর্ণের জন্য পৃথক বিধান দেওয়া হয়েছে। বেদ-শিক্ষাদান, যজ্ঞ পরিচালনা এবং দানগ্রহণ ব্রাহ্মণদের জীবিকা, শস্ত্রব্যবসায় এবং শাসনকার্য ক্ষত্রিয়দের এবং কৃষি, পশুপালন, ব্যবসাবাণিজ্য ও ঋণদান বৈশ্যের। ধর্মসূত্র এবং ধর্মশাস্ত্র উভয় ধরনের রচনাতেই প্রধানত ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের অধিকার ও কর্তব্যের বিষয়ই আলোচিত হয়েছে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য আলোচনার ক্ষেত্রে তেমন গুরুত্ব পায়নি।

বেদচর্চা ও বেদ-শিক্ষাদান ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া অধিকারভুক্ত হলেও ক্ষত্রিয়রা এক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিলনা। যে বিদ্যাকে উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা বলা হয়েছে সেই বিদ্যা বহু ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় রাজারা ব্রাহ্মণদের শিখিয়েছিলেন যেমন যাজ্ঞবল্ক্য জনকের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করেন (শতপথ ব্রাহ্মণ ১১।৬।২৷১'৫), বালাকি গার্গ্য কাশীরাজ অজাতশত্রুর কাছে শিক্ষালাভ করেন (বৃহদারণ্যক ২।১), শ্বেতকেতু প্রবাহণ জৈবলির কাছ থেকে শিক্ষালাভ করেন (ছান্দোগ্য ৫।৩, যেখানে প্রবাহণ বলেন যে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা তিনি গৌতমকে না শেখানো পর্যন্ত ব্রাহ্মণদের অধিকারে ছিল না)। কয়েকজন ব্রাহ্মণ রাজা অশ্বপতি কেকয়র নিকট শিক্ষালাভ করেন (ছান্দোগ্য ৫।১১)। অবশ্য সেযুগে দ্বিজাতি ভিন্ন আর কারো বেদপাঠের অধিকার একেবারেই ছিলনা সে কথা হলফ্ করে বলা যায় না, কেননা কাঠক সংহিতায় (৯।১৬) সকল বর্ণের মানুষই যে বেদ পড়তে পারে এমন ইঙ্গিত আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদ ৪।১-২-এ পরিষ্কার দেখানো হয়েছে যে জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ নামে জনৈক শূদ্র রাজা রৈক্ক নামক ঋষির কাছ থেকে বেদপাঠ করেছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের এই অংশটুকুকে নিয়ে পরবর্তীকালে শংকরাচার্যকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। বেদান্তের ভাষ্যকাররা নানা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে উক্ত জানশ্রুতি শূদ্র ছিলেন না।

বেদচর্চা ও শিক্ষাদান যে ব্রাহ্মণদের প্রধান বৃত্তি একথা যাস্ক (নিরুক্ত ২:৪), পতঞ্জলি (মহাভাষ্য, ১।১৫, মনু (৪।১৪৭), যাজ্ঞবল্ক্য (১।১১৮) প্রভৃতিরা বলেছেন। ধর্মশাস্ত্র সমূহে ব্রাহ্মণদের ছয়টি শুদ্ধ বৃত্তির কথা উল্লিখিত হয়েছে অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ। অধ্যয়ন এবং যজন ব্রাহ্মণের আত্মোৎকর্ষের জন্য প্রয়োজনীয় এবং এই দুই বৃত্তি তখনই গ্রহণ করা সম্ভব যখন তার প্রয়োজনীয় বস্ত্র-তণ্ডুল-ঘৃত-ইন্ধন অন্য কোন উৎস থেকে নিশ্চিত থাকে, যদি রাজা বা রাজপুরুষেরা তা যোগান। তাই সকল ব্রাহ্মণই এই সুযোগ পাবার অধিকারী হতে পারেনা, ফলে জীবিকার জন্য অধ্যাপনা ও যাজনের প্রয়োজন। অধ্যাপক ব্রাহ্মণদের ভরণপোষণের দায়িত্ব সমাজের উপর ছিল। গুরুগৃহবাসী ছাত্ররা গ্রাম থেকে ভিক্ষাস্বরূপ যা পেত এবং তাদের প্রদত্ত সেবা ও গুরুদক্ষিণার উপরেই এই বৃত্তি নির্ভরশীল ছিল। পক্ষান্তরে যাজকবৃত্তিতে উপার্জনের সুযোগ অনেক বেশি ছিল। বড় বড় যাগযজ্ঞে অন্যূন দশ ধরনের পুরোহিতের প্রয়োজন পড়ত—যাদের মধ্যে প্রধান হোতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্মা ও ঋত্বিক—এবং তা ছাড়া রাজা, রাজপুরুষ ও

সম্পন্ন গৃহস্থদের ব্যক্তিগত পুরোহিতেরও প্রয়োজন ছিল। এ ছাড়া দানগ্রহণও ব্রাহ্মণদের বৃত্তি ছিল। তবে অযোগ্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে দানগ্রহণ অবাঞ্ছনীয় ছিল। গৌতম (৯'৬৩), যাজ্ঞবল্ক্য (১।১০০) এবং বিষ্ণুধর্মসূত্রে (৬৩১) বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণ কোন রাজা বা ধনীর কাছে তার যোগক্ষেমের (ভরণ-পোষণের) জন্য অনুরোধ করতে পারে, কিন্তু তা কোন অধার্মিক ব্যক্তি বা নীচ জাতির নিকট করা চলবে না। একান্ত বিপদে পড়লেই শূদ্রের কাছ থেকে দান নেওয়া চলে, নতুবা নয়। মনু ৪।২৫১, যাজ্ঞবল্ক্য ১।২১৬, গৌতম ১৮।২৪-২৫ ইত্যাদি।

ধর্মশাস্ত্রকারেরা ব্রাহ্মণদের জন্য যে জীবনযাপনের মান বেঁধে দিয়েছেন সেখানে সচ্ছলতার সুযোগ নেই। মনু (৪।২-৩) বলেন যে স্বাভাবিক অবস্থায় ব্রাহ্মণ ঠিক ততটা ধনই উপার্জন করবে যাতে কোনক্রমে তার পরিবারের ভরণপোষণ হয়, যাতে সে অপরের ক্ষতি না করে নিজের ধর্মকর্ম নিয়ে থাকতে পারে। মনু (৪।৭-৮) আরও বলেন যে একটি কুসূল বা কুম্ভী (বিশেষ মাপের পাত্র) যতটা শস্য ধারণ করতে পারে তার বেশি শস্যের সঞ্চয় ব্রাহ্মণ করতে পারবে না, অথবা তার তিনদিনের জন্য যে পরিমান শস্য লাগে তার বেশি নয়। যাজ্ঞবল্ক্য (১।২৮) বলেন যে কৃষক ফসল কেটে নেবার পর মাঠে যে শস্য পড়ে থাকে সেগুলি কুড়িয়ে নিয়ে ব্রাহ্মণ জীবন যাপন করবে। এই প্রথাকে মনু (৪।৫) ঋত বলেছেন এবং জানিয়েছেন দান গ্রহণের চেয়ে এভাবে জীবনযাপন করা অধিকতর সম্মানের (১০।১১২)। মহাভারতে (১৩।৬১।১৯) বলা হয়েছে যে যদি কোন ব্রাহ্মণের কাছে এতটা পরিমাণ শস্য মজুত থাকে যা দিয়ে তাদের তিন বছর চলে যাবে, তা হলে তা দিয়ে তার যজ্ঞ করা উচিত। কেননা ব্রাহ্মণ যদি প্রয়োজনের অধিক সঞ্চয় করে তাহলে তা বিপজ্জনক হতে বাধ্য। মনুর মতে (৪।১২,১৫,১৭) ব্রাহ্মণ একমাত্র সন্তোষের প্রয়াসী হবে, আত্ম-সংযমের দ্বারাই নিজেকে সুখী করবে, আসক্তির বশ হয়ে ধনসঞ্চয় করবে না, অযোগ্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে দান গ্রহণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণের অনুপযুক্ত কাজে লিপ্ত হবে না।

কিন্তু যে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা হচ্ছে শাস্ত্রনির্দিষ্ট শুদ্ধ বৃত্তিগুলি ছাড়াও অন্যান্য বৃত্তি গ্রহণের স্বাধীনতা ব্রাহ্মণদের দেওয়া হয়েছে, যদিও এই স্বাধীনতা অন্যান্য জাতিকে দেওয়া হয়নি। এর কারণ ব্রাহ্মণদের জন্য নির্দিষ্ট শুদ্ধবৃত্তিসমূহ বাস্তবে সকল ব্রাহ্মণের পক্ষে গ্রহণ করার কিছুটা অসুবিধা ছিল। সকল ব্রাহ্মণেরই বেদ কণ্ঠস্থ ছিলনা, কাজেই যজন-যাজন-

অধ্যাপনার কাজের যোগ্য সকলেই ছিলনা। দানের উপর নির্ভর করেও সংসার প্রতিপালন বাস্তবে অসম্ভব ছিল। এই কারণেই বলা হয়েছে যে যদি ব্রাহ্মণ শিক্ষাদান, পৌরোহিত্য এবং দানগ্রহণের দ্বারা সংসার প্রতিপালনের সুযোগ না পায় তাহলে সে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বৃত্তি অবলম্বন করতে পারে, এবং ক্ষত্রিয়রাও শাস্ত্রনির্দিষ্ট পেশায় জীবনযাপনে অসমর্থ হলে বৈশ্যের বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে। দ্রষ্টব্য গৌতম ধর্মসূত্র ৭।৬-৭, ৭ ২৬, বৌধায়ন ধর্মসূত্র ২।২।৭৭-৭৮, বসিষ্ঠ ধর্মসূত্র ২।২২, মনু ১০ ৮১-৮২, যাজ্ঞবল্ক্য ৩।৩৫। আপদ্ধর্ম হিসাবে মনু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের জন্য দশটি পেশা গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন যথা শিক্ষাদান, হাতের কাজ, দিনমজুরি, সেবা, পশুপালন, ব্যবসায়, কৃষি, উঞ্ছবৃত্তি, ভিক্ষা এবং মহাজনী কারবার (১০।১১৬)। যাজ্ঞবল্ক্য অনুরূপ সাতটি বৃত্তির উল্লেখ করেছেন (৩।৪২)।

অত্রি স্মৃতিতে (৩৭৩-৮৩) দশ ধরনের ব্রাহ্মণ উল্লিখিত হয়েছে যথা দেব-ব্রাহ্মণ (যারা প্রাত্যহিক স্নান, সন্ধ্যা, জপ, হোম, দেবপূজা এবং অতিথি ও বৈশ্বদেবের সেবায় নিযুক্ত), মুনি-ব্রাহ্মণ, (যারা বনবাসী, ফলমূল ভোজী এবং দৈনন্দিন শ্রাদ্ধ ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত), দ্বিজ-ব্রাহ্মণ (যারা আসক্তি-বিহীন এবং দর্শনশাস্ত্রাদি আলোচনা করে), ক্ষত্র-ব্রাহ্মণ (যারা যুদ্ধবিদ্যার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে), বৈশ্য-ব্রাহ্মণ (যারা বৈশ্যদের মত কৃষি, পশু-পালন ও বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল), শূদ্র-ব্রাহ্মণ (যারা লাক্ষা, লবণ, কুসুম্ভ, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু মাংস প্রভৃতি বিক্রয় করে), নিষাদ-ব্রাহ্মণ (যারা চুরি ডাকাতি করে ও মদ্যমাংসপ্রিয়), পশু-ব্রাহ্মণ (যারা শুধুমাত্র উপবীত ধারণ করে), ম্লেচ্ছ ব্রাহ্মণ (যারা সংস্কারাদি বর্জিত) এবং চণ্ডাল ব্রাহ্মণ (যারা কোন রকম শাস্ত্রীয় নিয়মের ধার ধারেনা)। অত্রি (৩৮৪) আরও বলেছেন, যাদের শাস্ত্রজ্ঞান নেই তারাই পুরাণ পাঠ করে জীবিকানির্বাহ করে, যারা পুরাণ পাঠেও অপারগ তারা কৃষি ইত্যাদি বৃত্তি অবলম্বন করে, যাদের সে ক্ষমতাও নেই তারা ভাগবত (বৈষ্ণব কিংবা শৈব) হয়ে যায়। দেবলের বচন উদ্ধৃত করে অপরার্ক আট ধরনের ব্রাহ্মণের উল্লেখ করেছেন: মাত্র (ব্রাহ্মণ পরিবারে যাদের জন্ম কিন্তু যারা বেদ পড়েনি বা বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করেনি), ব্রাহ্মণ (যারা শুধুমাত্র বেদের একটি অংশ পাঠ করেছে), শ্রোত্রিয় (যারা ষড়ঙ্গসহ বেদের একটি শাখা পাঠ করেছে এবং ব্রাহ্মণের ছয়টি কর্তব্য করেছে), অনুচান (যারা বেদ ও বেদাঙ্গের অর্থ জানে এবং যজ্ঞীয় অগ্নি প্রভৃতির তাৎপর্যও অবগত হয়েছে), ভ্রূণ(যারা অণুচান পর্যায় অতিক্রম

করে যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপে অভ্যস্ত হয়েছে), ঋষিকল্প (যারা সকল জাগতিক ও বৈদিক জ্ঞান লাভ করেছে), ঋষি (যারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ করেছে, শুদ্ধজীবন ও সত্যবাক্যে অভ্যস্ত এবং যাদের বরদান বা অভিশাপ ফলপ্রদ হয়) এবং মুনি (যারা ইন্দ্রিয়ের বন্ধন মুক্ত, যারা ষড়রিপুকে বিনাশ করেছে এবং কর্দমে ও সুবর্ণে ভেদ করেনা)।

ব্রাহ্মণদের কয়েকটি বিশেষ অধিকার ও সুবিধা ধর্মশাস্ত্রসমূহে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। (১) ব্রাহ্মণ গুরু এবং সেই হিসাবে সকলের কাছে শ্রদ্ধেয় ও প্রণম্য। সে বর্ণশ্রেষ্ঠ (মহাভারত ৬ ১২১।৫৫, আপস্তম্ব ধর্মসূত্র (.।৪।১৭।২৩), মনু (২.৩৩৫)। (২) অপরাপর জাতির কর্তব্য নির্ধারণ করে দেবার দায়িত্ব ব্রাহ্মণের (মনু, ৭ ৩৭, ১০।২, বসিষ্ঠ ধর্মসূত্র ১।৩৯-৪১)। (৩) রাজা সকলের প্রভু, কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রভু নন (গৌতমসূত্র ১১।১)। (৪) ছয় প্রকার দণ্ড ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যথা বেত্রাঘাত, বন্ধন, অর্থদণ্ড, নির্বাসন, বাকদণ্ড, এবং পরিত্যাগ (গৌতম ৮।১২-১৩, যাজ্ঞবল্ক্য ২।৪-এর মিতাক্ষরা ভাষ্য অনুযায়ী এই নীতি সদ্‌ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত, সকলের ক্ষেত্রে নয়)। (৫) শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণরা করমুক্ত (আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ২।১০।২৬।১০। বসিষ্ঠ ধর্মসূত্র ১৯।২৩, মনু ৭।১৩৩, যদিও কোন কোন ধর্মসূত্রের মতে করমুক্তি সকল ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য)। (৬) ব্রাহ্মণের গৃহে কোন গুপ্তধন আবিস্কৃত হলে রাজা তা গ্রহণ করবেন না, বা করলে সামান্য অংশ গ্রহণ করবেন (গৌতম ১০।৪৩-৪৫, বসিষ্ঠ ৩।১৩-১৪, মনু ৮।৩৭.৩৮, যাজ্ঞবল্ক্য ২।৩৪-৩৫) (৭) উত্তরাধিকারীবিহীন ব্রাহ্মণের মৃত্যু ঘটলে তার সম্পত্তি রাজা গ্রহণ না করে অন্যান্য ব্রাহ্মণদের মধ্যে বণ্টন করে দেবেন (বৌধায়ন ধর্মসূত্র ১।৫।১১৮-২২, মনু ৯।১৮৮-৮৯, গৌতম ২৮।৩৯ ৪০, বসিষ্ঠ ১৭।৮৪-৮৭)। (৮) সর্বাগ্রে যাবার জন্য ব্রাহ্মণকে পথ ছেড়ে দিতে হবে (গৌতম ৬.২১-২২)। (৯) ব্রহ্মহত্যা মহাপাতক যার উপযুক্ত দণ্ডবিধান করা কর্তব্য (তৈত্তিরীয় সংহিতা ২ ৫.১।১, গৌতম ২১।১, বসিষ্ঠ ১।২০, মনু ১১।৫৪, যাজ্ঞবল্ক্য ৩.২২৭)। (১০) ব্রাহ্মণের প্রতি পরুষবচন প্রয়োগ ও ব্রাহ্মণকে মারধোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ (গৌতম ২২।২০-২২)। (১১) কয়েকটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যবর্ণের তুলনায় ব্রাহ্মণ লঘুদণ্ড পাবার অধিকারী (গৌতম ২২।২০-২২, ২১।১২-১৪, মনু ৮।২৬৭-৬৮, ৩৩৭-৩৮, যাজ্ঞবল্ক্য ২।২০৬-০৭)। (১২) ব্রাহ্মণকে সাক্ষ্য দিতে ডাকা চলবেনা (গৌতম ১৩।৪, মনু ৮।৬৫, বিষ্ণুধর্মসূত্র ৮.২)। (১৩) কেবলমাত্র কয়েকশ্রেণীর ব্রাহ্মণই শ্রাদ্ধে এবং যজ্ঞে আমন্ত্রিত হবার

অধিকারী (আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ২।৭।১৭।৪, গৌতম ১৫।৫, ১৫।৯, মনু ২।১২৪ ১২৮, যাজ্ঞবল্ক্য ১।২১৭, ২।১৯, ২২১)। (১৪) কয়েকটি যজ্ঞ কেবলমাত্র ব্রাহ্মণরাই করার অধিকারী যেমন সৌত্রামণি, সত্র, প্রভৃতি (পূর্বমীমাংসাসূত্র ৬।৬।২৪-২৬)। (১৫) মৃতাশৌচ ব্রাহ্মণ পালন করবে দশ দিন, ক্ষত্রিয় এগারো দিন, বৈশ্য বারোদিন এবং শূদ্র একমাস (গৌতম ১৪।১-৪, বসিষ্ঠ ৪।২৭-৩০, বিষ্ণু ২২।১-৪, মনু ৫।৮৩, যাজ্ঞবল্ক্য ৩।২২)।

ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রসমূহে সর্বাধিক কথা ব্রাহ্মণদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে। যেটা লক্ষণীয় বিষয় তা হচ্ছে এই যে এই সকল গ্রন্থে ব্রাহ্মণত্বের একটা বড় আদর্শ তুলে ধরা হয়েছে। যদিও ব্রাহ্মণদের বর্ণশ্রেষ্ঠ আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং সর্বপূজ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে, যদিও শাস্ত্রনির্দিষ্ট শুদ্ধ বৃত্তিসমূহ ছাড়াও যে-কোন বৃত্তি অবলম্বনে ব্রাহ্মণদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি, এবং যদিও ব্রাহ্মণদের বিশেষ সামাজিক ও আইনগত অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, তৎসত্ত্বেও অধঃপতিত ব্রাহ্মণ সম্পর্কেও বড় কম তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। একথাও বারবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রকৃত বৃত্তি ও আদর্শ থেকে ব্রাহ্মণদের বিচ্যুতি ঘটলে তাদের ব্রাহ্মণত্বের মর্যাদা রক্ষা করার দায় কিন্তু অন্যজাতির নেই। বৌধায়ন ধর্মসূত্র ২।২।৪০, বসিষ্ঠ ধর্মসূত্র ৩।১-২, মনু ৮।১০২, পরাশর ৮।২৪ প্রভৃতিতে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞানী না হলে এবং ব্রাহ্মণের পক্ষে অযোগ্য বৃত্তিসমূহের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করলে তাকে শূদ্র বলেই গণ্য করতে হবে। অবস্থার বিপাকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের বৃত্তি অবলম্বন করলে তা মোটেই প্রশংসার যোগ্য নয়। শস্ত্রজীবী ব্রাহ্মণের অনেক উল্লেখ প্রাচীন গ্রন্থসমূহে থাকলেও (যেমন পাণিনি ৫।২।৭১, কৌটিল্য ৯।২) এবং মহাভারতে শস্ত্রজীবী ব্রাহ্মণরা বিশেষ প্রশংসিত হলেও আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে (১।১০।২৯।৭) পরিষ্কার বলা হয়েছে যে এমনকি পরীক্ষার ছলেও ব্রাহ্মণদের অস্ত্রধারণ নিষিদ্ধ। তবে আপদ্ধর্ম হিসাবে গৌতম (৭।৬) ব্রাহ্মণকে শস্ত্রজীবী হতে পরামর্শ দিয়েছেন, মনু (৮।৩৪৮-৪৯) ও বসিষ্ঠ (৩।২৪) ধর্মরক্ষার্থে।

যদিও আপদকালে অথবা জীবিকার প্রয়োজনে বৈশ্যের বৃত্তি নেওয়া ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ নয়, তথাপি ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রসমূহে বিভিন্ন পেশার বৈধতা নিয়ে অনেক কথা তোলা হয়েছে। গৌতম ধর্মসূত্রে (১০।৫-৬) মহাজনী কারবারকে ব্রাহ্মণের পক্ষে বৈধ বলা হলেও, সেটা প্রত্যক্ষভাবে না করে অন্যের মাধ্যমে করাই ভাল এরকম কথা বলা হয়েছে। বসিষ্ঠ (২।৪০) ও

মনু (১০।১১৭) ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সুদগ্রহণ অকর্তব্য হিসাবে ঘোষণা করেছেন। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে (১।৯।২৭।১০) বলা হয়েছে যে বাজার-হারে সুদ নিলে ব্রাহ্মণকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কৃষির ক্ষেত্রে বৌধায়ন ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে যে বেদ ও কৃষি পরস্পর বিরোধী (১।৫।১০১)। বৌধায়ন (২।২।৮২-৮৩), বসিষ্ঠ (২।৩২-৩৪), মনু (৪।৫, ১০।৮৩-৮৪) প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণের পক্ষে কৃষিকাজ অনুমোদিত হলেও বলা হয়েছে যে এই বৃত্তিতে যেহেতু পশুদের প্রতি অত্যাচার, আঘাত, হিংসা, পরনির্ভরতা প্রভৃতি বর্তমান সেই হেতু কৃষিকাজ ব্রাহ্মণদের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। ব্রাহ্মণকে বাণিজ্যের অধিকার দিলেও তার পক্ষে বহু পণ্যের কারবার নিষিদ্ধ করা হয়েছে যথা গন্ধদ্রব্য, স্নেহজাতীয় পদার্থ, রন্ধনকৃত খাদ্যসামগ্রী, তিল, শন, ক্ষৌম, হরিণের চামড়া, সাদা ও রঙীন বস্ত্র, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রী, মূল, ফুল, ফল, ওষধি, মধু, মাংস ঘাস, জল, মাদকদ্রব্য, পশু, মানুষ (দাস), ভূমি, শস্য (গৌতম ৭।৮-১৫) অস্ত্রশস্ত্র, লাক্ষা, ভোকম, কিম্ব (আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ১।৭।২০। ২-১৩), তিল, তণ্ডুল, লবন, প্রস্তর, রেশম, লোহা, টিন, শিসা, শৃঙ্গ, ক্ষুর (বৌধায়ন ধর্মসূত্র ২।১।৭৭ ৭৮, বসিষ্ঠ ধর্মসূত্র ২।২৪-২৯, মনু ১০।৯০-৯২), মোম, কুশ, নীল, সোম, কম্বল, মাংস, লোম, পিন্যাক, প্রভৃতি (মনু ১০।৮৬-৮৯, যাজ্ঞবল্ক্য ৩।৩৬-৩৮)। এই নিষিদ্ধ পণ্যাবলীর তালিকাই প্রমাণ করে যে ব্রাহ্মণকে বাণিজ্যের অধিকার দেওয়া হলেও তার ক্ষেত্র এতই সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে যে ওই বৃত্তি কার্যত তার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। বস্তুত, ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রকাররা ব্রাহ্মণকে তার শুদ্ধ বৃত্তিতেই দেখতে চেয়েছিলেন।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের সম্পর্কে ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রকাররা বেশি কিছু লেখা বাহুল্য মনে করেছেন। বৈশ্যদের বৃত্তিসমূহ ব্রাহ্মণদের কর্তব্য অকর্তব্য নির্ধারণ প্রসঙ্গেই ব্যাখ্যাত হয়েছে। ক্ষত্রিয়রাও অবস্থার বিপাকে বৈশ্যবৃত্তি গ্রহণের অধিকারী, তবে তাদের ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণের অনুরূপ বাধানিষেধ বর্তমান। শূদ্রদের প্রসঙ্গে অবশ্য ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রসমূহে অনেক কথা বলা হয়েছে। গৌতম ধর্মসূত্রে (১০।৬৯) শূদ্রকে অনার্য বলা হয়েছে, এবং কোন উচ্চবর্ণের নারীর সঙ্গে শূদ্রের সংসর্গ হলে তার জন্য তার কঠিন শাস্তির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (১২।৩)। জৈমিনি তাঁর পূর্বমীমাংসা সূত্রে (৬।১।২৫-৩৮) বলেছেন যে শূদ্রের অগ্নিহোত্র ও বৈদিক যাগযজ্ঞের কোন অধিকার নেই। যদিও তিনি বাদরি নামক একজন পূর্বাচার্যের উল্লেখ করেছেন (৬।১।২৭) যিনি শূদ্রদের বৈদিক অনুষ্ঠান করার অধিকার স্বীকার

করেছিলেন। বেদান্তসূত্রেও (১৷৩৷৩৪-৩৮) বলা হয়েছে যে বেদনির্ভর ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রের কোন অধিকার নেই, তবে বিদুরের মত শূদ্ররা যে এবিষয়ে জ্ঞানলাভ করেছিলেন তার কারণ তাঁদের এবিষয়ে পূর্বজন্মের সংস্কার ছিল। গৌতম ধর্মসূত্রে (১২৷৪) বলা হয়েছে যে মুখস্ত করার মতলবে যদি কোন শূদ্র ইচ্ছাকৃতভাবে বেদপাঠ শ্রবণ করে তাহলে তার কান শীসা বা লাক্ষা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া উচিত। আর যদি সে বেদবাক্য উচ্চারণ করে তাহলে তার জিভ কেটে দেওয়া উচিত। যদিও শূদ্রের বেদপাঠের অধিকার নেই, বিকল্পে অবশ্য ইতিহাস ও পুরাণ পাঠ ও শ্রবণের অধিকার তাকে দেওয়া হয়েছে (মহাভারত ১২৷৩২৮৷৪৯, ভাগবতপুরাণ ১৷৪৷২৫)।

শূদ্রদের পক্ষে বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ, তবে বিকল্প হিসাবে পূর্তধর্মের অধিকার তার আছে যার দ্বারা সে বৈদিক যজ্ঞের ফললাভের অধিকারী। এই পূর্তধর্ম বলতে বোঝায় কূপ ও পুষ্করিণী খনন, মন্দির নির্মাণ ও নানাপ্রকার জনকল্যাণমূলক কর্ম; এছাড়া দৈনিক পঞ্চ-মহাযজ্ঞ, শ্রাদ্ধ, নমঃ শব্দের উচ্চারণ এবং বৈদিক মন্ত্র ব্যতিরেকে ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের অধিকার তার আছে (মনু ৩৷৬৭, ১০৷১২৭, যাজ্ঞবল্ক্য ১৷১৭, ১৷১২১)। উপনয়নাদি সংস্কার শূদ্রের নেই (মনু ১০৷১২৬) তবে ব্রত, উপবাস, মহাদান, প্রায়শ্চিত্ত তারা করতে পারে। এছাড়া গর্ভাধান, সীমন্তোন্নয়ন, পুংসবন, জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চৌল, বিবাহ প্রভৃতি সংস্কার তার পক্ষে নিষিদ্ধ নয় যদিও সেগুলি করতে হবে বৈদিক মন্ত্র ব্যতিরেকে। অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে শূদ্রের প্রতি বৈষম্য প্রকাশ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণরমণীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করলে, শূদ্রের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হতে পারে, তার পুরুষাঙ্গ কর্তন করা হতে পারে, তাকে প্রাণেও মারা চলতে পারে, যদিও কোন ব্রাহ্মণ শূদ্রারমণীর সঙ্গে ব্যাভিচার করলে তাকে দেড় হাজার পণ জরিমানা দিতে হবে (গৌতম ১২৷১-২, বসিষ্ট ২১৷১, মনু ৮৷৩৬৬,৩৭৮, ৩৮৫)। মৃতাশৌচ শূদ্রকে একমাস পালন করতে হবে যেখানে ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে তা দশ দিন। বিচারক হওয়া বা বিধান দেওয়া শূদ্রের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ (মনু ৮৷৯, যাজ্ঞবল্ক্য ১৷৩)। শূদ্রের বাড়িতে ভোজন ব্রাহ্মণের পক্ষে সর্বদাই নিষিদ্ধ নয় (গৌতম ১৭৷৬, মনু ৪৷২৫৩, যাজ্ঞবল্ক্য ১৷১৬৬, পরাশর ৯৷১৯)। মনু (৪৷২১১, ৪৷২২৩) অবশ্য শূদ্রগৃহে ভোজনের ঘোর বিরোধী। তবে প্রয়োজনে আরাঁধা খাবার শূদ্রের কাছ থেকে ব্রাহ্মণ গ্রহণ করতে পারে। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে (১৷৫৷১৬৷২২) অপবিত্র শূদ্রের খাদ্য ব্রাহ্মণ কর্তৃক গ্রহণ নিষিদ্ধ

হলেও, বলা হয়েছে যে শূদ্রকে রাঁধুনি হিসাবে রাখা যায়, যদি সে কয়েকটি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে। চতুরাশ্রম প্রথা শূদ্রের জন্য নয়, তার একটিই আশ্রম, যা হচ্ছে গার্হস্থ (মহাভারত ১২।৬৩।১২-১৪, ১৩।১৬৫'১০)। তার জন্য নির্দিষ্ট কর্তব্যসমূহ সে পালন করলেই তার চতুর্বর্গ ফললাভ ঘটে। ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মসূত্রসমূহে অবশ্যই বৈষম্যমূলক মনোভাব বর্তমান এবং সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রেও তারা অপর তিনবর্ণের চেয়ে খাটো। তবে উচ্চ তিনবর্ণের জন্য সংরক্ষিত কিছু নির্দিষ্ট পেশা ছাড়া তারা যে কোন পেশা অবলম্বন করার অধিকারী, এমনকি সমর বিভাগেও তাদের যোগদানের অধিকার স্বীকৃত (কৌটিল্য ৯'২)। এছাড়া শাস্ত্রকাররা শূদ্রদের প্রতি নানা অবিচার করলেও, একটি ক্ষেত্রে মোক্ষম সুবিচার করেছেন। সেটি হচ্চে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের অজস্র নাগপাশ থেকে তাদের রেহাই দিয়েছেন।

৪ ॥ ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রসমূহে জাতিপ্রথা ও বর্ণসংকরতত্ত্ব

ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রসমূহে বর্ণিত যে চাতুর্বর্ণের পরিচয় দেওয়া হল তার সঙ্গে সমাজবাস্তবের অনেকটা ফারাক আছে। বস্তুত ওই সকল গ্রন্থে চাতুর্বর্ণের আদর্শ ব্যাখ্যাত হয়েছে এবং বিভিন্ন বর্ণের অধিকার ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তব সমাজ কখনওই চারটি বর্ণে বিভক্ত ছিল না। বাস্তবে ছিল, এবং এখনও আছে, অসংখ্য জাতি। এই অসংখ্য জাতিকে চাতুর্বর্ণের কাঠামোয় আনার জন্য শাস্ত্রকাররা চেষ্টার কোন ত্রুটি করেননি, এবং আমরা আগে দেখেছি যে এই উদ্দেশ্যে তাঁরা বর্ণসংকর তত্ত্বের সৃষ্টি করেছিলেন, এবং সেই তত্ত্বের ভিত্তিতে অসংখ্য অগণ্য জাতিকে অনুলোম-প্রতিলোম বিবাহের ফল স্বরূপ দেখানোর, ব্যাখ্যা করার, এবং জাতিবর্ণকাঠামোয় স্থান নিরূপণের প্রয়াস পেয়েছিলেন।

জাতিকাঠামোর সর্বনিম্ন স্তরে যারা অবস্থিত তারা অন্ত্য, অন্ত্যজ বা অন্ত্যাবসায়ী নামে পরিচিত। অত্রির (১৯৯) মতে অন্ত্যজদের সাতটি বিভাগ যথা রজক, চর্মকার, নট, বুরুড়, কৈবর্ত, মেদ ও ভিল্ল। যাজ্ঞবল্ক্য ৩।২৬০-এর মিতাক্ষরা ভাষ্যে চন্ডাল, শ্বপচ, ক্ষত্ত, সূত, বৈদেহিক, মাগধ এবং আয়োগব অন্ত্যাবসায়ী নামে পরিচিত। মহাভারতে (১৩।২২।২২) এই তালিকায় মেদ এবং পুক্কস যুক্ত হয়েছে। বৈখানস স্মার্তসূত্র (১০।১৫) অনুযায়ী রজকরা বৈদেহ পুরুষ এবং ব্রাহ্মণরমনীর সংকর। পাণিনি ১।৪'১০ প্রসঙ্গে পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে রজকদের শূদ্রবর্ণে স্থান দিয়েছেন। যাজ্ঞ-

বশিষ্ঠের মতে (২।৪৮) রজককে তার স্ত্রীর ঋণ শোধ করতে হয় কেননা তার জীবিকা স্ত্রীর উপর নির্ভরশীল। চর্মকারদের শূদ্র পুরুষ ও ক্ষত্রিয়ানারীর সংকর বলা হয়েছে (মনু ৪।২১৮, বৈখানস ১০।১৫, বিষ্ণু ৫১।৮, উশন ৪)। মনু (১০।২২) নটদের করণ ও খসদের সংগে সমীকরণ করেছেন। হারীতকে উদ্ধৃত করে অপরার্ক বলেন যে নট এবং শৈলূষ পৃথক জাতি, প্রথমোক্তদের জীবিকা নাচ-গান-অভিনয় এবং শেষোক্তরা ওই বৃত্তির ব্যবসায়ী। বরুড় বা বুরুড়রা বাঁশের জিনিস তৈরি করে যারা সম্ভবত তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৩ ৪। ৫।১) এবং বাজসনেয়ী সংহিতায় (৩০।৮) উল্লিখিত বিদলকারদের বংশধর বা শাখা। পূর্বভারতে কৈবর্তেরা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ও বিভিন্ন ধরনের সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন। মনুর (১০।৩৪) মতে কৈবর্তেরা নিষাদ এবং আয়োগব নরনারীর সংকর। বেদান্তসূত্রের ২।৩।৪৩-এর ভাষ্যে শংকর দাস ও কৈবর্তকে এক বলেছেন। জাতকসমূহে কৈবর্তরা কেবত্ত নামে পরিচিত। মনুর (১০।৩৬) মতে মেদরা বৈদেহিক ও নিষাদদের সংকর এবং তারা অন্ধ্র চুঞ্চু এবং মদ্‌গুদের মত শিকারজীবী (১০।৪৮)। ভিল্লরা ভীল উপজাতি যারা জাতিকাঠামোর অন্ত্যজ হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

চণ্ডাল জাতির উল্লেখ বহু প্রাচীন। চণ্ডাল প্রতিলোম জাতি, শূদ্রপিতা ব্রাহ্মণী মাতার সংকর হিসাবে কথিত (গৌতম ৪।১৫।১৬, বৌধায়ন ১।৯।৭, মনু ১০।১২, মহাভারত ১৩।৪৮।১১)। মনুর (১০।১২) মতে চণ্ডালরা জাতিকাঠামোর সর্বনিম্ন স্তরের। তাদের বাস গ্রামের বাইরে (১০।৫১-৫৬)। যাজ্ঞবল্ক্যের (১।৯৩) মতে তারা 'সর্বধর্মবহিষ্কৃত'। পাণিনি (কুলাদিগণ ৪।১।১১৮) চণ্ডাল শব্দটির উল্লেখ করেছেন। বৌদ্ধ জাতকেও চণ্ডালদের সম্পর্কে অনেক কথা বলা আছে যা আমরা পরে দেখব। শ্বপচ বা শ্বপাক অন্ত্যজ জাতিভুক্ত এবং চণ্ডালদের সমগোত্রীয়, উগ্রজাতির পুরুষ এবং ক্ষত্রি জাতীয় নারী, অথবা ক্ষত্রি পুরুষ উগ্র নারী অথবা চণ্ডাল পুরুষ এবং ব্রাহ্মণ নারীর সংকর বলে কথিত (বৌধায়ন ১।৯।১২, মনু ১০।১৯, বৈখানস ১০।১৫)। তারা চণ্ডালদের মতই চিহ্নধারী এবং তাদের কাজ আবর্জনা পরিষ্কার করা (মনু ১০।৫১-৫৬, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৮।৮১, ৮৩, ৮৬, ৯৬)। ক্ষত্রিরা প্রতিলোম জাতি শূদ্র পিতা এবং ক্ষত্রিয়া মাতার সংকর (বৌধায়ন ১।৯।৭, মনু ১০।১২-১৬, যাজ্ঞবল্ক্য ১৯৬)। তারা উগ্র এবং পুক্কসের সমবৃত্তি সম্পন্ন (মনু ১০ ৪৯-৫০) এবং বৈশ্য নামেও পরিচিত (বসিষ্ঠ ১৮।২)। ছান্দোগ্য উপনিষদে ক্ষত্রিদের দ্বাররক্ষক বলা হয়েছে। ক্ষত্রি

শব্দটি পাণিনিও (৬।৪।১১) উল্লেখ করেছেন। ক্ষত্রিদের মত সূতরাও প্রতিলোম সংকর জাতি, ক্ষত্রিয় পুরুষ এবং ব্রাহ্মণ নারীর মিলনজাত বলে কথিত (গৌতম ৪।১৫, বৌধায়ন ১।৯।৯, বসিষ্ঠ ১৮।৬, মনু ১০।১১)। মনুর (১০।৪৭) মতে সূতদের কাজ রথ চালানো। মহাভারতে (৮।৫২।৪৮) সূতদের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের অনুচর বলা হয়েছে। বায়ুপুরাণের (১।১।৩৩-৩৮, ১।২১।১৩৯) মতে সূতদের কাজ রাজাদের বংশকীর্তি মনে রাখা ও তা আবৃত্তি করা, রথ ও হাতিঘোড়া দেখাশোনা করা এবং প্রয়োজনে চিকিৎসা করা। বৈদেহিকরা বৈশ্য পুরুষ ও ব্রাহ্মণ নারীর সংকর বলে কথিত (বৌধায়ন ১।৯।৮, মনু ১০।১১,১৩,১৭, বিষ্ণু ১৬।৬, যাজ্ঞবল্ক্য ১।৯৩, মহাভারত ১৩।৪৮।১০) এবং তাদের পেশা অন্তঃপুর রক্ষা (মনু ১০।৪৭, অগ্নিপুরাণ ১৫১।১৪) ও পশুপালন এবং পশুজাত সামগ্রী বিক্রয় (বৈখানস ১০।১৪)। মাগধজাতি প্রতিলোম সংকর, বৈশ্য পুরুষ ও ক্ষত্রিয়া নারীর মিলনজাত (গৌতম ৪।১৫, মহাভারত ১৩।৪৮।১২, মনু (১০।১১,১৭, যাজ্ঞবল্ক্য ১।৯৩) অথবা শূদ্র পুরুষ এবং বৈশ্যা নারীর (বৌধায়ন ১।৯।৭), যাদের পেশা স্থলপথে বাণিজ্য (মনু ১০।৪৭) অথবা তোষামোদ (মহাভারত ১৩।১০৪৮)। আয়োগব বৈদিক সাহিত্যে বর্ণিত আয়োগু, শূদ্র পুরুষ ও বৈশ্যা নারীর মিলনজাত প্রতিলোম সংকর জাতি (গৌতম ৪।১৫, বিষ্ণু ১৬। ৪, মনু ১০।১২, মহাভারত ১৩।৪৮।১৩, যাজ্ঞবল্ক্য ১।৯৪), পেশা কাঠকাটা (মনু ১০।৪৮), তাঁত বোনা ও ধাতব পাত্র নির্মাণ করা (উশন ১৩)। পুক্কস বা পৌল্কস বৌদ্ধগ্রন্থে বর্ণিত পুক্কস, নিষাদ পুরুষ ও শূদ্রা নারী (বৌধায়ন ১।৯।১৪, মনু ১০।১৮) অথবা বৈশ্য পুরুষ ও ক্ষত্রিয়া নারী (বসিষ্ট ১৮।৫, বিষ্ণু ১৬।৫), অথবা নিষাদ পুরুষ ও উগ্রা নারীর (কৌটিল্য ৩।৭) মিলনজাত প্রতিলোম সংকরজাতি, বৃত্তিতে যারা শিকারজীবী (অগ্নি-পুরাণ ১৫১।১৫, মনু ১০.৪৯)।

দেশ বা উপজাতির নাম থেকে নিষ্পন্ন অসংখ্য জাতিকে বর্ণসংকর তত্ত্বের ভিত্তিতে জাতি কাঠামোয় স্থান দেওয়া হয়েছে। আমরা আগেই দেখেছি যে ভিন্ন উপজাতি ভিন্ন জাতিতে পরিণত হয়েছে এবং প্রতিলোম-সংকর জাতি হিসাবে অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। একথা বৈদেহিক (বিদেহ) ও মাগধদের (মগধ) ক্ষেত্রেও খাটে। প্রথম অধ্যায়ে জাতিকাঠামোয় বহিরাগত জনগোষ্ঠী প্রসঙ্গে আলোচনাকালে আমরা দেখেছি যে যবন, শক, পহ্লব, পারদ, চীন, আভীর প্রভৃতি বহিরাগত জনগোষ্ঠীকে ক্ষত্রিয়ত্ব থেকে অধঃপতিত শূদ্র

হিসাবে গণ্য করা হয়েছে (মনু ১০।৪৩-৪৪) এবং প্রতিলোম সংকরজাতি হিসাবে (যেমন যবনরা শূদ্র পুরুষ এবং ক্ষত্রিয় নারী মিলনজাত) জাতি-কাঠামোয় স্থান দেওয়া হয়েছে। অপরাপর উপজাতিদের মধ্যে যাদের সংকর জাতি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে তাদের মধ্যে অন্ধ্রগণ বৈদেহিক পিতা এবং কারাবর মাতার মিলনজাত সংকরজাতি (মনু ১০।৩৬) যারা বৃত্তিতে শিকার-জীবী, অম্বষ্ঠগণ ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্যা মাতার মিলনজাত অনুলোম সংকর জাতি (বৌধায়ন ১।৯।৩, মনু ১০।৮, যাজ্ঞবল্ক্য ১।৯১) যাদের বৃত্তি চিকিৎসা (মনু ১০।৪৭), কৃষি ও অন্যান্য, আবন্ত্য বা ভূর্জকণ্টক ব্রাত্য নরনারীর মিলনজাত সংকর জাতি। নামটি দৃশ্যতই অবন্তী থেকে এসেছে। ওড্রগণও অনুরূপভাবে জাতি হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে (মনু ১০।৪৩-৪৪); কাম্বোজরা নিরুক্ত (২।২), পাণিনি (৪।১।১৭৫) ও মহাভারতে (৫।১।৬০। ১০৩, ৭।১২১।১৩) উল্লিখিত। শক ও যবনদের সঙ্গে তারাও জাতিকাঠামোয় স্থান পেয়েছে (মনু ১০ ৪৩-৪৪), যা ঘটেছে খস (মনু ১০।২২, ১০।৪৩ ৪৪, মহাভারত ২।৫২ ৩, ৫।১৬০।১০৩) ও দরদদের ক্ষেত্রে (মনু ১০।৪৪, মহাভারত ৫ ৪ ১৫)। কিরাত উপজাতিদের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। মনুর (১০ ৪৩-৪৪) মতে কিরাতরা আগে ক্ষত্রিয় ছিল পরে তারা শূদ্রে অধঃপতিত হয়েছে, যে কথা মেকল, দ্রবিড়, লাট, পৌণ্ড্র ও যবনদের ক্ষেত্রেও সত্য (মহাভারত ১৩।৩৫।১৭-১৮)। চুঞ্চুরা অন্ধ্র অঞ্চলের চেঞ্চু উপজাতি যারা মেদ, অন্ধ্র এবং মদ্গুদের সঙ্গে শিকারজীবী জাতি হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে, এবং ব্রাহ্মণ ও বৈদেহিকের সংকর হিসাবে পরিগণিত হয়েছে (মনু ১০।৪৮)। নিচ্ছবি জাতি সুস্পষ্টভাবেই লিচ্ছবি উপজাতিদের থেকে এসেছে। বৈশালীর লিচ্ছবিরা বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে বিশেষভাবে বর্ণিত। ভারতের গুপ্ত রাজবংশের সঙ্গেও লিচ্ছবিদের সম্পর্ক ছিল। মনু লিচ্ছবিদের করণ বা খস পর্যায়ভুক্ত করেছেন (১০।২২)। নিষাদ উপজাতিদের প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। নিষাদদের ব্রাহ্মণ পুরুষ এবং শূদ্রা নারীর মিলনজাত অনুলোম সংকর জাতি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে (বৌধায়ন ১।৯।৩, ২।২।৩৩, বসিষ্ঠ ১৮।৮, মনু ১০।৮, মহাভারত ১৩।৪৮।৫, যাজ্ঞবল্ক্য ১।৯১)। মনু (১০।৮), কৌটিল্য (৩।৭), বৌধায়ন (২।২।৩৪) এবং যাজ্ঞবল্ক্য (১।৯১) অনুযায়ী নিষাদ ও পারশব অভিন্ন, কিন্তু গৌতম (৪ ৪) উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেন। অনুরূপভাবে প্রাচীন পুলিন্দ উপজাতীয়গণ বৈশ্য পুরুষ ও ক্ষত্রিয়া নারীর মিলনজাত প্রতিলোম সংকর জাতি হিসাবে গৃহীত

হয়েছে (উশনঃ ১৬, বৈখানস ১০।১৪)। বর্বররা শক, শবর, যবন, পহ্লব প্রভৃতির সংগে একত্রে উল্লিখিত হয়েছে (মহাভারত ২।৩২-১৬-১৭, ২ ৫১।২৩, ৩ ২৫৪ ১৮, ৬।১২১।১৩, ১২।৬৫।১৩, ১৩.৩৫।১৭) এবং সংকীর্ণযোনি জাতিসমূহের অন্তর্গত বলে ঘোষিত হয়েছে (মনু ১০।৪-এর উপর মেধাতিথির ভাষ্য)। বার্ধান, পুষ্পধ এবং শৈখ পূর্বোক্ত আবন্ত্যদেরই ভিন্ন নাম। ভূর্জকণ্ঠ এবং অম্বষ্ঠ অভিন্ন (গৌতম ৪।১৭)। সূতসংহিতা অনুযায়ী ভোজরা বৈশ্য নর ও ক্ষত্রিয়া নারীর মিলনজাত প্রতিলোম সংকর জাতি। শিকারজীবী মদ্গুরা (মনু ১০।৪৮) ব্রাহ্মণ নর এবং বন্দী নারী অথবা ক্ষত্রিয় নর ও বৈশ্যা নারীর (বৈখানস ১০।১২) মিলনজাত অনুলোম সংকর জাতি। মতঙ্গেরা (কাদম্বরী ৯, যম ১২) চণ্ডালদের সংগে অভিন্ন বলে ঘোষিত। মাহিষ্য বা মহিষক উপজাতি ক্ষত্রিয় পুরুষ ও বৈশ্যা নারীর মিলনজাত অনুলোম সংকর জাতি (গৌতম ৪।১৭, যাজ্ঞবল্ক্য ১।৯২), কৃষি, চিকিৎসা, জ্যোতিষ সহ নানা বৃত্তি যাদের উপর আরোপিত। মৃতপরা পূর্বোক্ত পুক্কসদের সংগে অভিন্ন যারা নিরবসিত শূদ্রের পর্যায়ভুক্ত, অর্থাৎ সাধারণ লোকালয়ের বাইরে যাদের বসতি (পাণিনি ২।৪।১০ প্রসংগে পতঞ্জলি)। সাত্বত বা কারুষরা, যারা সুধন্বাচার্য, বিজন্ম ও মৈত্র নামেও পরিচিত, ব্রাত্য-বৈশ্য নরনারীর মিলনজাত সংকর জাতি (মনু ২।২৩)।

অতঃপর বিভিন্ন পেশা বা বৃত্তিধারী জনগোষ্ঠী যারা জাতিকাঠামোয় এসেছে তাদের সম্পর্কে ধর্মশাস্ত্রকারেরা কি বলেছেন সে প্রসংগের উল্লেখ করার দরকার। পূর্বে উল্লিখিত জাতিসমূহের ক্ষেত্রে বহু স্থলেই তাদের পেশার উল্লেখ করা হয়েছে। শিকারজীবী জাতিসমূহের মধ্যে আমরা অন্ধ্র, কিরাত, চণ্ডাল, চুঞ্চু, মেদ, মদ্গু, পুলিন্দ, মতঙ্গ, শবর, শ্বপচ প্রভৃতির উল্লেখ করেছি। লুব্ধক বা ব্যাধরাও এই পর্যায়ভুক্ত। অনুরূপ নিম্ন পেশাধারী জাতিসমূহের মধ্যে সোপাকরা চণ্ডাল পুরুষ ও পুক্কস নারীর সংকর বলে কথিত (মনু ১০।৩৮) যাদের পেশা ঘাতকবৃত্তি। শূলিকদেরও অনুরূপ পেশা যারা ক্ষত্রিয় ও শূদ্রের সংকর হিসাবে কথিত। (বৈখানস ১০।১৩)। সূনিক বা সৌনিকরা, যারা খাটিক নামেও পরিচিত, আয়োগব পুরুষ এবং ক্ষত্রিয়া নারীর সংকর (উশন ঃ ১৪), পেশা পশুমারক বা কসাই বৃত্তি। ধিগবনরা ব্রাহ্মণ পুরুষ এবং আয়োগব নারীর মিলনজাত অনুলোম সংকর জাতি (মনু ১০।১৫, ১০ ৪৯) যারা চামড়া বিক্রয়ের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। জাতিবিবেক গ্রন্থে তাদের মোচিকার আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কারাবররাও

অনুরূপ পেশাধারী যারা নিষাদ ও বৈদেহিকের সংকর-মনু (১০।৩৬)। ডোম্ব বা ডোমরা বহু ক্ষেত্রেই শ্বপচ ও চণ্ডালের সঙ্গে অভিন্ন বলে ঘোষিত হয়েছে (রাজতরঙ্গিনী ৫।৩৮৯-৩৯৪)। চর্মকারদের কথা আগেই বলা হয়েছে। মনু আহিণ্ডিকদের কারাবরদের সঙ্গে অভিন্ন ঘোষণা করেছেন যারা নিষাদ পুরুষ ও বৈদেহী নারীর সংকর এবং যারা চর্মকারের বৃত্তি অনুসরণ করে (১০।৩৬-৩৭)। উগ্ররা ক্ষত্রিয় পুরুষ ও শূদ্রা নারীর অনুলোম সংকর (বোধায়ন ১।৯।৫, মনু ১০।৯, কৌটিল্য ৩।৭, মহাভারত ১৩।৪৮।৭) এবং কৃষি ও পশুপালন তাদের গৌণ জীবিকা হলেও তাদের মুখ্য জীবিকা পশু-নিধন (মনু ১০।৪৯)। পূর্বে উল্লিখিত কৈবর্তদের একটি শাখা মৎস্যজীবী যাদের অপরার্ক হারীত অনুসরণে জালোপজীবী আখ্যা দিয়েছেন। মৎস্যজীবী অপর একটি জাতির নাম ঝল্ল যাদের মনু করণ ও খসদের সঙ্গে সমীকরণ করেছেন (১০।২২)। মৎস্যজীবীদের আর একটি জাতি দাস নামে পরিচিত। মনুর (১০।৩৪) মতে মার্গব, দাস এবং কৈবর্ত একই জাতি, মাছ ধরা ছাড়া নৌকা চালনা করাও যাদের পেশা। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩।৪।১২) ধীবর, দাস ও কৈবর্তকে পৃথক বলা হয়েছে। ধীবররা প্রতিলোম সংকর জাতি হিসাবে কথিত, বৈশ্য পুরুষ ও ক্ষত্রিয়া নারীর গর্ভজাত (গৌতম ৪।১৭)। নারদ (স্ত্রীপুংস ১০৮) ও মহাভারত (১৩।৪৮।১২) অনুযায়ী নিষাদদের মূল বৃত্তি মাছ ধরা। মল্ল বা মালোরাও মৎস্যজীবী হিসাবে কথিত যাদের ঝল্ল প্রভৃতির সঙ্গে সমীকরণ করা হয়েছে (মনু ১০।২২)। উশন (৪৪) মৎস্যবন্ধক নামে একটি মৎস্যজীবী জাতির উল্লেখ করেছেন যারা তক্ষণ ও ক্ষত্রিয়ার মিলনজাত সংকর বলে কথিত।

পশুপালক আভীরদের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে যারা ব্রাহ্মণ পুরুষ ও অম্বষ্ঠ নারীর মিলনজাত অনুলোম সংকরজাতি হিসাবে পরিচিত (মনু ১০।১৫)। গোপ, গোপালক (কামসূত্র ১।৫।৩৭) ও গোলকরাও পশুপালক ও দুগ্ধজাত পণ্যের বিক্রেতা। শেষোক্তরা ব্রাহ্মণ বিধবা ও ব্রাহ্মণ পুরুষের সংসর্গজাত বলে কথিত (মনু ৩।১৭৪)। অম্বষ্টরা মিশ্র বৃত্তির অধিকারী হলেও তাদের একাংশ চিকিৎসাবৃত্তিকে গ্রহণ করেছে, বিশেষ করে তাদের সেই উপশাখা যারা বৈদ্য বলে পরিচিত। ভিষক নামক একটি জাতির খবর পাওয়া যায় যারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সংকর বলে কথিত (উশনঃ ২৬) এবং যাদের প্রধান বৃত্তি চিকিৎসা। অয়স্কাররা তক্ষণদের সঙ্গে শূদ্রজাতি হিসাবে পতঞ্জলির মহাভাষ্যে (১।৪৭৫, পাণিনি ২।৪।১০ প্রসঙ্গে) উল্লিখিত, এবং

কর্মার (পাণিনি ৪।৩।১১৮, মনু ৪।২১৫) বা কর্মকারদের (বিষ্ণু ৫১।১৪) সঙ্গে অভিন্ন হিসাবে গৃহীত। রজকদের উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। রজকবৃত্তির অনুসারী আরও কয়েকটি জাতির সন্ধান পাওয়া যায় যাদের মধ্যে উম্বন্ধকরা সূনিক এবং ক্ষত্রিয় অথবা খনক এবং ক্ষত্রিয়ের সংকর (বৈখানস ১০।১৫, উশনঃ ১৫)। চৈলনির্ণেজক বা নির্ণেজকরাও রজক পর্যায়ভুক্ত (বিষ্ণু ৫১।১৫, মনু ৪।২১৬)। অপরাপর পেশাদার জাতিসমূহের মধ্যে ঐশ্বিকরা অশ্বব্যবসায়ী যারা ক্ষত্রিয় পুরুষ ও বৈশ্য নারীর সংকর বলে কথিত (বৈখানস ১০।১২) ; উপকৃষ্ট যারা কাঠের কাজ করে ও বৈশ্য হিসাবে পরিগণিত (আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র ২।১) ; কাংস্যকার বা কাঁসারি ; কাকবক যারা ঘোড়ার ঘাস কাটে (উশন ৫০) ; কুক্কুট যারা উগ্র পুরুষ ও নিষাদ নারী অথবা বৈশ্য পুরুষ ও নিষাদ নারীর সংকর (বৌধায়ন ১।৮।৮, ১।৮।১২, ১।৯।১৫, মনু ১০।১৮, কৌটিল্য ৩।৭) এবং যাদের বৃত্তি অস্ত্র নির্মাণ ; কুলাল (পাণিনি ৪।৩।১১৮, আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ৪।৩।১৮) বা কুম্ভকার যারা ব্রাহ্মণ পুরুষ ও বৈশ্যা নারীর সংকর ; কোলিক (মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের কোলি) ; খনক যারা আয়োগব পুরুষ এবং ক্ষত্রিয়া নারীর সংকর (বৈখানস ১০।১৫) ; চক্রী যারা তৈল উৎপাদন ও তৈলব্যবসায়ের সংগে সম্পর্কিত, যারা বৈশ্যপুরুষ ও ব্রাহ্মণ রমনীর সংকর (১০।১৩) এবং যারা চাক্রিক নামেও পরিচিত ; চুচুক যারা বৈশ্য-শূদ্রের সংকর (বৈখানস ১০।১৩) এবং যারা পান, সুপারি ও চিনির কারবার করে ; তক্ষণ (কাঠের কারিগর) যারা ব্রাহ্মণ ও চুচুকের সংকর (বৈখানস ১০।১৪) এবং বর্ধকী নামেও পরিচিত (মনু ৪।২১০, বিষ্ণু ৫১।৮), তন্তুবায় (বিষ্ণু ৫১।১৩, পাণিনি ২।৪।১০ প্রসংগে পতঞ্জলি) ; তাম্বূলিক (কামসূত্র ১।৫।৩৭), তুন্নবায় বা দর্জি (মনু ৪।২১৪) ; তৈলিক অর্থাৎ তিল ও তৈলের ব্যবসায়ী (বিষ্ণু ৫১।১৫) ; তাম্রোপজীবী যারা তাম্রের কারিগর বা ব্যবসায়ী এবং আয়োগব ও ব্রাহ্মণের সংকর (বৈখানস ১০।১৫) ; নর্তক যারা রজক ও বৈশ্যের সংকর (উশন ঃ ১৯,—অত্রি ৭।২) ; নাপিত যারা ব্রাহ্মণ-বৈশ্য, অথবা অম্বষ্ঠ-ক্ষত্রিয় অথবা ব্রাহ্মন-শূদ্রের সংকর (বৈখানস ১০।১২,১৫, পরাশর ১১।২১) ; পাণ্ডুসোপাক যারা বাঁশের কারিগর চণ্ডাল ও বৈদেহিকের সংকর (মনু ১০।৩৭) ; মণিকার যারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সংকর (উশনঃ ৩৯-৪০) ; মালাকার বা মালিক (বেদব্যাস ১।১০।১১) ; মৈত্রেয়ক যারা পেশায় রাজভৃত্য এবং বৈদেহিক ও আয়োগবের সংকর (মনু ১০।২৩) ; রঙ্গাবতারী (মনু ৪।২১৫) যারা সাজঘর এবং বেশবাসের সংস্কার

করে ; রজক (মনু ৪।২১৬) যারা শূদ্র ও ক্ষত্রিয়ের সংকর (উশনঃ ১৯) ; রথকার যারা বৈশ্য ও শূদ্র অথবা মাহিষ্য ও করণের সংকর (বৌধায়ন ১।৯।৬, যাজ্ঞবল্ক্য ১।৯৫) ; লেখক ; লোহকার (দ্রষ্টব্য অয়স্কার) ; বন্দী যারা বন্দনাগান করে এবং কৃত্যকল্পতরুর মতে যারা বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয় নরনারীর সংকর ; বেণ বা বৈণ যারা নানা প্রকার নিম্ন বৃত্তি সম্পন্ন এবং বৈদেহিক ও অম্বষ্ঠ অথবা শূদ্র ক্ষত্রিয় নরনারীর সংকর (মনু ১০।১৯, বৌধায়ন ১।৯।১৩, কৌটিল্য ৩।৭, বিষ্ণু ৫১।১৪, যাজ্ঞবল্ক্য ৩।২০৭) ; বেনুক যারা বাঁশের কারিগর ও বীনাশিল্পী এবং যারা মদ্গু ও ব্রাহ্মণের সংকর (বৈখানস ১০।১৫ ; শৌণ্ডিক, শুঁড়ি বা ধ্বজী অর্থাৎ মদ্যবিক্রেতা (বিষ্ণু ৫১।১৫, মনু ৪।২১৬, যাজ্ঞবল্ক্য ২।৪৮) ; সুবর্ণ (অশ্বচালক ও চিকিৎসাব্যবসায়ী) যারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েব সংকর ; সুবর্ণকার, সৌবর্ণিক, হেমকার অর্থাৎ সোনার বা স্যাকরা (মনু ৪।২১৫, যাজ্ঞবল্ক্য ১।১৬৩) ; সূচিকা বা সূচীশিল্পী যারা বৈদেহিক ও ক্ষত্রিয়ের সংকর (বৈখানস ১০।১৫) ; ও সৈরিন্ধ্র বা গৃহভৃত্য (মনু ১০।৩২, ১০।৪৫) উল্লেখযোগ্য। জাতিবিবেক, শূদ্রকমলাকর প্রভৃতি বহু পরবর্তীকালে রচিত গ্রন্থে আরও কিছু বৃত্তিধারী জাতির নাম পাওয়া যায় যথা অঘাসিক বা আন্ধসিক বা রান্ধবণু যারা রান্না করা খাদ্য বিক্রয় করে এবং বৈদেহিক ও শূদ্রের মিলনজাত সংকর বলে পরিচিত ; ঔরভ্র বা ধঙ্গর যারা মহারাষ্ট্র অঞ্চলের মেষপালক ; কুন্তলক বা নাপিত ; পৌষ্টিক যারা ব্রাহ্মণ ও নিষাদের সংকর, বর্তমানের কহার বা ভোই বা পাল্কীবাহক ; বন্ধুল, যারা মৈত্রেয় ও জাংঘিকের সংকর, বর্তমানকালের ঝারেকরি, সোনার দোকানের পরিত্যক্ত ধুলো থেকে যারা স্বর্ণবিন্দু সংগ্রহ করে ; মন্যু যারা বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের সংকর, পেশা চোরধরা ; রোমিক যারা মল্ল এবং আবর্তকের সংকর, বর্তমানের লোনার বা লবন-উৎপাদনকারী ; শুদ্ধ-মার্জক বা মান্দলি যাদের উপজীবিকা গানবাজনা ; এবং সিন্দোলক বা স্পন্দলিক যারা শূদ্র এবং মাগধের সংকরজাতি বলে পরিচিত, বর্তমানের রংগারী বা রঞ্জকের বৃত্তিসম্পন্ন।

এ ছাড়া ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রসমূহে আরও কিছু সংকরজাতির কথা বলা হয়েছে যাদের কোন বিশেষ পেশা উল্লেখ করা হয়নি। এই সকল জাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য অবরীট (একই জাতির নরনারীর ব্যাভিচারমূলক মিলনজাত সংকর জাতি), অবীর (ক্ষত্রিয় পুরুষ ও বৈশ্যা নারীর মিলনজাত), আপীত (ব্রাহ্মণ পুরুষ ও দৌষ্যন্তি নারীর মিলনজাত), কটকার (বৈশ্য পুরুষ ও শূদ্রা নারী, বৈখানস ১০।১৩), কুণ্ড (ব্রাহ্মণ নর এবং ব্রাহ্মণ

নারীর ব্যাভিচারজ মিলনজাত সংকর, মনু ৩।১৭৪), কুকুন্ধ (মাগধ পুরুষ ও শূদ্রা রমণী), কুলিক, কুশীলব (অম্বষ্ট পুরুষ ও বৈদেহিক নারী অথবা বিপরীত, কৌটিল্য ৩।৭, অন্যনাম চারণ), কৃত (বৈশ্য পুরুষ ও ব্রাহ্মণ নারী, গৌতম ৪।১৫, যাজ্ঞবল্ক্য ১।.৩), গুহক (শ্বপচ পুরুষ ও ব্রাহ্মণ নারী), গোজ (ক্ষত্রিয় নারীপুরুষের ব্যাভিচারজ সংকর), দিবাকীর্তি (চণ্ডাল পুরুষ নাপিত নারী), দৌষ্মন্ত (ক্ষত্রিয় পুরুষ শূদ্রা নারী), পিঙ্গল (ব্রাহ্মণ ও আয়োগব), ভূপ (বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয়), মানবিক (শূদ্র নরনারীর ব্যাভিচারজ সংকর), রামক (বৈশ্য এবং ব্রাহ্মণ, গৌতম ৪।১৫), বেলা (শূদ্র ও ক্ষত্রিয়), সূচক (বৈশ্য ও শূদ্র), অবর্তক (ভূজকণ্ঠ ও ব্রাহ্মণ), অহিতুণ্ডিক (নিষাদ ও বৈদেহ), কটধানক (আবর্তক ও ব্রাহ্মণ), কুরুবিন্দ (কুম্ভকার এবং কুক্কুট, বর্তমানের সালি), ঘোলিক (ব্যাধ এবং গারুড়ী), দুর্ভর (আয়োগব এবং ধিগবন, বর্তমানের ডোহর), প্লব (চণ্ডাল ও অন্ধ্র, বর্তমানের হাড়ি), ভস্মাংকুর বা গুরব (শৈব সাধু ও শূদ্রা গণিকা), সালাক্য বা শাকল্য (মালাকার এবং কায়স্থ) প্রভৃতি।

আরও কয়েকটি জাতি বা জাতিগত ধারণা সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। প্রথমেই আসে ব্রাত্যদের কথা। আপস্তম্ব ধর্মসূত্র (১।১।১।২২ থেকে ১।২।১০) এবং পারস্কর গৃহ্যসূত্র অনুযায়ী যাদের উপনয়নাদি সংস্কার হয়নি তারাই ব্রাত্য। কিন্তু বোধায়ন ধর্মসূত্রের (১।৯।১৫) মতে যে কোন সংকর জাতিই ব্রাত্য। ব্রাহ্মণ পুরুষ এবং ক্ষত্রিয়া রমণীর অনুলোম বিবাহজাত সন্তান মূর্ধাবসিক্ত বা মূর্ধাভিষিক্ত জাতিনামে পরিচিত, কিন্তু এই মিলন বিবাহব্যতিরেকে গোপনে হলে তজ্জাতরা অভিষিক্ত এই জাতিনামেই পরিচিত হয়। মূর্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজপদও পেতে পারে, তবে তাদের সাধারণ পেশা আয়ুর্বেদ, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষ প্রভৃতি। করণ বলতে বোঝায় বৈশ্য পুরুষ ও শূদ্রা নারীর মিলনজাত সংকরজাতি (গৌতম ৪।১৭)। জাতি হিসাবে কায়স্থদের কোন উল্লেখ প্রাচীন ধর্মসূত্রসমূহ এমন কি মনুস্মৃতিতেও পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে রচিত বিষ্ণুধর্মসূত্রে (৭।৩) এবং যাজ্ঞবল্ক্যে (১।৩২২) কায়স্থ নামক উৎপীড়ক রাজকর্মচারীদের উল্লেখ আছে। যাজ্ঞবল্ক্যের মিতাক্ষরা ভাষ্যে কায়স্থদের লেখক ও গণক বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উশনঃ স্মৃতিতে (৩৫) কায়স্থরা জাতি হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে কাক, যম এবং স্থপতি এই তিন নামের আদ্যক্ষর নিয়ে কায়স্থ শব্দটি গঠিত, কাকদের লোভ, যমের নিষ্ঠুরতা ও স্থপতিদের লুণ্ঠন এই তিনের সমাহার কায়স্থ জাতি। বেদব্যাস-স্মৃতিতে

(১।১০-১১) কায়স্থদের নাপিত, কুম্ভকার প্রভৃতির সঙ্গে শূদ্র শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে।

৫ ॥ মেগাস্থেনেস বর্ণিত ভারতীয় জাতিপ্রথা

মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে (আনুমানিক ৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) গ্রীক রাজদূত মেগাস্থেনেস দীর্ঘদিন পাটলিপুত্র নগরে বাস করেছিলেন এবং ভারত-সম্পর্কিত তাঁর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। মূল গ্রন্থটির অস্তিত্ব বর্তমানে না থাকলেও আরিয়ান, স্ট্রাবো প্রভৃতি পরবর্তী লেখকরা ভারত প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে মেগাস্থেনেসের গ্রন্থ থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যা থেকে মেগাস্থেনেসের মূল বক্তব্যসমূহের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। মেগাস্থেনেস এদেশে চাতুর্বর্ণপ্রথা দেখেন নি সঙ্গত কারণেই, এমন কি চাতুর্বর্ণ তত্ত্বের সঙ্গেও তিনি পরিচিত ছিলেন না। তবে পেশাদার বা বৃত্তি-জীবী নানা জাতি তাঁর চোখে পড়েছিল এবং জাতিপ্রথার বৈশিষ্ট্যগুলিও যথা অন্তর্বিবাহ, পেশাগত স্বাধীনতা ও বন্ধন প্রভৃতি বিষয় তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। সম্ভবত বিদেশী এবং নগরের অধিবাসী বলেই তাঁর দেখাশোনার ক্ষেত্র ছিল সীমাবদ্ধ, যে কারণে তিনি বৃত্তিজীবী জাতিদের মধ্যে ভেদ করতে পারেন নি। যেমন কর্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, চর্মকার সকলকেই তিনি কারিগর জাতি বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু জাতিকাঠামোয় এঁদের প্রকৃত অবস্থান ও মর্যাদার বিষয়টি অনুধাবন করতে পারেন নি। আরিয়ান মেগাস্থেনেস বর্ণিত ভারতীয় জাতিপ্রথা সম্পর্কে যা বলেছেন তা নিম্নে উদ্ধৃত করা হল।

মেগাস্থেনেস বলেছেন যে ভারতের জনসমাজ সাতটি জাতিতে বিভক্ত। মর্যাদায় যাঁরা সবচেয়ে উপরে কিন্তু সংখ্যায় যাঁরা সবচেয়ে কম তাঁরা হলেন দার্শনিক (এখানে দার্শনিক শব্দটির দ্বারা মেগাস্থেনেস নিঃসন্দেহে ব্রাহ্মণদের বুঝিয়েছেন)। তাঁদের কোন দৈহিক শ্রম করতে হয় না, অথবা কোন সাধারণ ভাণ্ডারে তাঁদের শ্রমের ফসল দান করতে হয় না। যারা যাগযজ্ঞ করাতে চায় বা যারা পবিত্র আচার অনুষ্ঠানাদি করাতে চায় তারা নিজ ব্যয়ে তাঁদের নিয়োগ করে। কিন্তু রাজারা জনসাধারণের ব্যয়ে অথবা স্বার্থে তাঁদের নিয়োগ করেন, যাকে বলা হয় বৃহৎ সমাবেশ, যেখানে নববর্ষের প্রারম্ভে সকল দার্শনিক রাজ-দ্বারসমূহে সমবেত হন।

দ্বিতীয় জাতি কৃষকদের নিয়ে গঠিত যারা জনসংখ্যার সর্বাধিক অংশ এবং যারা মৃদু ও ভদ্র আচরণযুক্ত। তারা সামরিক কার্যের দায় থেকে মুক্ত এবং

নির্ভয়ে নিজেদের জমি চাষ করে। তাদের অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করা হয় না, তাদের সামরিক কর্তব্যও করতে হয় না, কিন্তু তারা ভূমিতে চাষ করে এবং রাজাদের ও স্বাধীন নগরসমূহে কর প্রদান করে। গৃহযুদ্ধের সময়ে কৃষকদের উপরে হামলা করা বা তাদের জমি থেকে ফসল লুণ্ঠন করতে সৈন্যদের নিষেধ করা থাকে, ফলে যখন সৈন্যরা যুদ্ধ করে এবং নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে যত খুশি মানুষ বধ করে, তখন কৃষকদের নিকটেই গভীর শান্তিতে কাজ করতে দেখা যায়, হয় তারা লাঙ্গল দিচ্ছে, নয় তারা শস্য জমা করছে, নয় তারা বৃক্ষ-চ্ছেদন করছে, নয় তারা ফসল কাটছে। তারা শহরে যায় না, কোন কাজেও নয় বা হট্টগোলে অংশগ্রহণ করার জন্যও নয়। তৃতীয় জাতি পশুপালক ও শিকারী-দের নিয়ে গঠিত যাদের একমাত্র অনুমতি আছে শিকার করার এবং পশুসমূহ রাখার, ভারবাহী পশুদের বিক্রয় করার অথবা ভাড়া খাটানোর।

শিকারী এবং পশুপালকদের পর, চতুর্থ জাতি তাদের নিয়ে গঠিত যারা ব্যবসায়ী হিসাবে কাজ করে, মালপত্র গুদামজাত করে এবং দৈহিক শ্রমে নিযুক্ত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কর প্রদান করে, আবার কেউ রাষ্ট্রকে নির্দিষ্ট সেবা দান করে। কিন্তু যারা অস্ত্রনির্মাণ করে এবং জাহাজ তৈরি করে তারা রাজা-দের কাছ থেকেই বেতন ও জীবিকা পায় যাদের জন্যই তারা কাজ করে।

পঞ্চম জাতিটি যোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত যারা, যখন যুদ্ধকার্যে লিপ্ত থাকে না, আলস্যে ও মদ্যপানে সময় অতিবাহিত করে।

ষষ্ঠ জাতিটি পরিদর্শকদের নিয়ে গঠিত। তাদের উপর যা ঘটে তার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব এবং রাজার কাছে গোপনে জানাবার দায়িত্ব দেওয়া আছে। খবরাখবর নেবার জন্য নগর পরিদর্শকেরা নগরের গণিকাদের নিযুক্ত করে সহকারী হিসাবে, আবার সৈন্যশিবিরের পরিদর্শকেরা ওই একই প্রয়োজনে সৈন্যবাহিনীকে অনুসরণকারী গণিকাদের নিযুক্ত করে। সর্বোত্তম ও সবচেয়ে বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদেরই এই সব দপ্তর দেওয়া হয়।

সপ্তম জাতিটি রাজার মন্ত্রণাদাতা ও মূল্যায়নকারীদের নিয়ে গঠিত। তাদের হাতে রাজ্যের দপ্তরসমূহ, বিচারালয় এবং জনস্বার্থ সম্পর্কিত সাধারণ প্রশাসনের দায়িত্ব থাকে।

স্ট্রাবো লিখেছেন : "বিভাগের অপর একটি আদর্শ অনুযায়ী তিনি (মেগাস্থেনেস) দার্শনিকদের দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেছেন, ব্রাখ্মানেস (ব্রাহ্মণ) ও সারমানেস (শ্রমণ বা তপস্বী)। ব্রাখমানেসরা উচ্চতর মর্যাদা পায়, কেননা তারা নিজেদের মতামত সমূহের ক্ষেত্রে ঐক্য প্রদর্শন করে। তারা

যখন মাতৃগর্ভে অবস্থান করে তখন থেকেই বিজ্ঞ ব্যক্তিদের যত্ন ও তত্ত্বাবধানে থাকে, যারা তাদের মায়েদের কাছে যায়, এবং মাতা ও গর্ভস্থ সন্তানের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে মন্ত্রপাঠ ইত্যাদির সুযোগে তারা মায়েদের জ্ঞানগর্ভ ইঙ্গিত ও পরামর্শ দেয়, এবং যে মেয়েরা তা খুবই আগ্রহভরে শ্রবণ করে তারা সন্তানভাগ্যে ভাগ্যবতী বলে গণ্য হয়। জন্মের পর থেকেই এই সন্তানেরা কারো না কারো তত্ত্বাবধানে থাকে, এবং তাদের যত বয়স বাড়ে সেই অনুপাতে তাদের তত্ত্বাবধায়করাও উচ্চতর যোগ্যতাবিশিষ্ট হয়। দার্শনিকরা নগরের সম্মুখাংশে মধ্যম আকারের বেষ্টনীর মধ্যে তপোবনে বাস করে। তারা সরল ধরনের জীবনযাপন করে এবং খড় ও চামড়া নির্মিত পর্ণকুটীরে শয়ন করে। তারা মাংসভক্ষণ ও যৌন আনন্দ থেকে বিরত থাকে। গভীর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শ্রবণ করে এবং শ্রবনেচ্ছু ব্যক্তিদের জ্ঞান বিতরণ করেই তারা সময় কাটায়। শ্রবণকালে শ্রোতা কোন মতেই কথা বলবে না, এমনকি কাশবে না বা থুথু ফেলবে না, কেননা তা করলে তাকে আত্মসংযমহীন ব্যক্তি হিসাবে সমাজ থেকে বার করে দেওয়া হবে। এভাবে সাইত্রিশ বছর থাকার পর প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজের অধিকারে ফিরে যায়, যেখানে সে নিরাপত্তার মধ্যে এবং অপেক্ষাকৃত কম সংযমের মধ্যে বাস করে, এবং মসলিনের বস্ত্র ও আঙুলে ও কানে কিছু স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করে। তারা মাংস খায়, কিন্তু সেই সব পশুর মাংস খায় না যারা মানুষকে তার পরিশ্রমে সাহায্য করে। তারা গরম এবং বেশি মসলাযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করে না। তারা যত খুশি বিবাহ করে অধিক সন্তান লাভের আশায়, কেননা বেশি সংখ্যক স্ত্রী থেকে বেশি সুবিধা পাওয়া যায়। যেহেতু তারা দাস রাখে না, তারা নানা প্রয়োজনে সন্তানদের কাছ থেকে কাজ গ্রহণ করে। ব্রাখমানেসরা তাদের জ্ঞান স্ত্রীদের নিকট প্রকাশ করে না পাছে তারা নিষিদ্ধ রহস্যসমূহ সাধারণের কাছে ফাঁস করে দেয় অথবা তারা বিপথচালিত হয়, বা নিজেরা জ্ঞানী হয়ে স্বামীদের পরিত্যাগ করে, এই আশংকায়। কেননা যে আনন্দ ও দুঃখকে সমভাবে ঘৃণা করে, জীবন ও মৃত্যুকে একই দৃষ্টিতে গ্রহণ করে, সে কখনও কারো অধীন থাকেনা।···

"সারমানেসদের (শ্রমণ) মধ্যে, তিনি বলেন, সবচেয়ে সম্মানিত তারা যারা হুলোবিওই (বানপ্রস্থী) নামে পরিচিত। তারা বনে বাস করে। বন্য ফলমূল খেয়ে জীবনধারণ করে, গাছের ছালের পরিচ্ছদ পরিধান করে, মদ্য এবং নারী-সংসর্গ থেকে নিজেদের বিরত রাখে। রাজারা দূত পাঠিয়ে তাদের সংগে বিভিন্ন বস্তুর কারণ সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং তাদের মাধ্যমে দেবতার পূজা ও

তুষ্টিবিধান করেন। হ্যলোবিওইদের পর সম্মানভাজন হন চিকিৎসকেরা, কেননা তারা মানুষের প্রকৃতিচর্চার ক্ষেত্রে দর্শনের প্রয়োগ করে। তারা অভ্যাসে মিতব্যয়ী কিন্তু মাঠে বাস করে না। তারা ধান ও যবজাত খাদ্য গ্রহণ করে, যা তারা প্রার্থনা করলেই প্রত্যেকে দেয় এবং তারাও দেয় যারা তাদের অতিথি হিসাবে গ্রহণ করে। তাদের ঔষধের জ্ঞানের দ্বারা তারা ব্যক্তিদের অসংখ্য সন্তান এনে দিতে পারে, এমনকি প্রয়োজন মত পুরুষ শিশু ও নারী শিশু উৎপাদনে সহায়তা করতে পারে। তারা ঔষধ ব্যবহারের পরিবর্তে পথ্য নিয়ন্ত্রণের দ্বারাই রোগের আরোগ্য ঘটায়। তাদের তৈরি মলম ও আবরণমূলক ঔষধ খুবই খ্যাতিসম্পন্ন।...এছাড়া আছে দৈবজ্ঞ ও মন্ত্রবিশারদ এবং সেই শ্রেণীর ব্যক্তিরা যারা মৃত-সংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সুদক্ষ, যারা নগরে ও গ্রামে ভিক্ষা করে। এদের থেকে যারা অধিকতর মার্জিত, এবং অনেক বেশি লোকের সংগে মেলামেশা করে, নরক সংক্রান্ত নানাপ্রকার অদ্ভুত ধারণা প্রচার করে, যা তারা মনে করে পবিত্রতা ও ন্যায়ধর্ম বিকাশের অনুকূল। তাদের কারো কারো সংগে মেয়েরাও দর্শনচর্চা করে, এবং তারাও যৌন সংসর্গ থেকে নিজেদের বিরত রাখে।

"তিনি (আরিস্তোবুলোস) তক্ষশিলা অঞ্চলের কিছু অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক প্রথার উল্লেখ করেছেন।...এখানে অনেক স্ত্রী-গ্রহণের প্রথা আছে, এবং অপরাপর জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও এটা সাধারণ। তিনি বলেন, কিছু লোকের কাছ থেকে তিনি শুনেছেন যে মৃত ব্যক্তির স্ত্রীরা তাদের স্বামীর দেহের সংগে নিজেদের অগ্নিদগ্ধ করে, এবং তা আনন্দের সংগেই। এবং যে নারীরা এভাবে নিজেদের দগ্ধ করতে রাজি হয় না, তাদের নীচু চোখে দেখা হয়। অন্য লেখকেরাও একথা বলেছেন।..."

নিয়ার্কোস দার্শনিকদের সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিবরণ দিয়েছেন। ব্রাখমানেস-দের মধ্যে অনেকেই রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ করে, এবং রাজার মন্ত্রণাদাতা হিসাবে কাজ করে। অপরেরা প্রকৃতির চর্চায় নিযুক্ত থাকে। নারীরাও তাদের সঙ্গে দর্শনশাস্ত্রে অধ্যয়ন করে এবং তারা কঠোর শৃংখলাবদ্ধ জীবন যাপন করে।

৬ ॥ বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে জাতিপ্রথা

বৌদ্ধ শাস্ত্রসমূহেও জাতিপ্রথার সুবিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম তার নিজস্ব প্রকৃতিতেই জাতিপ্রথা বিরোধী। গোতম বুদ্ধ নিজেই উপজাতীয়

সমাজের মানুষ ছিলেন এবং এমন একটা স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন যেখানে ব্রাহ্মণ্যবাদ মোটেই প্রসার লাভ করেনি। তাছাড়া বৌদ্ধধর্মের যে তত্ত্ব তার সংগে জাতিপ্রথা খাপ খায় না। উদ্দালক-জাতকে বলা হয়েছে ঃ "ক্ষত্তিয়, ব্রাহ্মণ, বেস্‌স, শুদ্দ, চণ্ডাল, পুক্কস সকলেই পুণ্যবান ও আত্মসংযমী হতে পারে, সকলেই নির্বাণলাভ করতে পারে। যারা চিত্তের উৎকর্ষ ও প্রশান্তি অর্জন করেছে তাদের মধ্যেই কেউই একে অপরের চেয়ে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট নয়।" সুত্তনিপাতের বসলসুত্তে (আসলে বুদ্ধ নিজেই বসল বা বৃষল অর্থাৎ নীচ-জাতিভুক্ত বলে গণ্য হতেন, পরে তাঁর উচ্চবর্ণের শিষ্যরা তাঁকে ক্ষত্রিয় এবং চক্রবর্তীর পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন) বলা হয়েছে ঃ "জন্মের কারণে কেউ নীচ জাতি বা ব্রাহ্মণ হয় না, একমাত্র কর্মের দ্বারা কেউ নীচ হয়, কর্মের দ্বারাই কেউ ব্রাহ্মণ হয়।" বাসেঠসুত্তে বুদ্ধ বলেছেন যে জাতির জন্য কিংবা মাতৃ-বিশেষের গর্ভে উৎপত্তির জন্য কাউকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করা যায় না, যিনি অকিঞ্চন ও অনাসক্ত তিনিই ব্রাহ্মণ। দেহবিশিষ্ট প্রাণীদের মধ্যে পার্থক্য আছে, কিন্তু মানুষের মধ্যে ওই পার্থক্য অবিদ্যমান। ধম্মপদ ২৬-এ বলা হয়েছে ঃ "মাথায় জটা রাখলেই কেউ ব্রাহ্মণ হয় না। পরিবার বা জন্মের দ্বারাও কেউ ব্রাহ্মণ হয় না। যার মধ্যে সত্য ও ন্যায় অবস্থান করে, যে পুণ্যবান, সে-ই ব্রাহ্মণ।" যদিও তত্ত্বের দিক থেকে বৌদ্ধধর্ম জাতিবর্ণপ্রথা ও ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের বিরোধী, তৎসত্ত্বেও মনে হয় যে বৌদ্ধ লেখকেরা জাতিধর্মসংক্রান্ত প্রচলিত ধ্যানধারণাগুলিকে ত্যাগ করতে পারেন নি। যখন তাঁরা বলেন যে জন্মসূত্রে কেউই ব্রাহ্মণ নয়, কর্মের দ্বারাই মানুষ ব্রাহ্মণ হয়, তখন এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে তাঁদের অবচেতন মনে ব্রাহ্মণত্বের আদর্শের একটা দৃঢ় ধারণা ক্রিয়াশীল ছিল। তা ছাড়া এটাও মনে রাখা দরকার যে যাঁদের হাত দিয়ে বৌদ্ধ শাস্ত্র রচিত হয়েছে তাদের অধিকাংশই জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। বৌদ্ধধর্মে আশ্রয় গ্রহণ সত্ত্বেও তাঁরা জাতিসংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। অবশ্য বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে যে সমাজব্যবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে সেটা ভারত-বর্ষেরই সাধারণ সমাজ, কোন বৌদ্ধ জনসমাজ নয়।

বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে ব্রাহ্মণদের উচ্চজাতি হিসাবেই গণ্য করা হয়েছে। ধম্ম-পদের একটি পুরো অধ্যায় ব্রাহ্মণদের গুণবর্ণনায় ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃত ব্রাহ্মণ সর্বদাই অক্ষত অবস্থায় গমন করে। ধম্মপদে আরও বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণকে আক্রমণ ক্ষমার অতীত। মহিলমুখ এবং মুদুলাকখান জাতক থেকে জানা যায় যে ব্রাহ্মণরা বৌদ্ধ গৃহস্থের নিকটও সম্ভ্রমের পাত্র ছিল। সম্রাট অশোক বৌদ্ধ

হলেও তাঁর অনুশাসন সমূহে ব্রাহ্মণদের যথার্থ মর্যাদা দেবার কথা বলেছেন। সুত্তনিপাতের বসলসুত্তে বুদ্ধের মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মিথ্যাকে আশ্রয় করে কোন ব্রাহ্মণ বা শ্রমণ বা তপস্বীকে প্রবঞ্চনা করে তাকে জাতিচ্যুত করা উচিত। ছবক-জাতকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে ব্রাহ্মণ শিক্ষকদের উল্লেখ করা হয়েছে। সুত্তনিপাতের সেলসুত্তে ব্রাহ্মণ সেল-র বিদ্যাবত্তার প্রশংসা করে বলা হয়েছে যে তিনি তিন বেদ, শব্দ ও অর্থতত্ত্ব, ইতিহাস, ছন্দ, ব্যাকরণ এবং বিতণ্ডাশাস্ত্রে দক্ষ ছিলেন এবং তিনি তিনশত ছাত্রকে শিক্ষাদান করে-ছিলেন। ওই গ্রন্থের বন্ধুগাথা অংশেও ব্রাহ্মণদের প্রশস্তি আছে। বংশানুক্রমিক ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের কথা সুসীম জাতকে বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণরা রাজাদের কাছ থেকে দান গ্রহণ করার অধিকারী ছিল যে দানকে সোমদত্ত-জাতকে ব্রহ্মদেয় আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য শ্রেণীর জনগণও ব্রাহ্মণদের প্রতি যথেষ্ট বদান্য ছিল, বিত্তসম্ভূত জাতকে যে দানকে ব্রাহ্মণবচনক আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

দাসব্রাহ্মণ-জাতকে দশ ধরনের বৃত্তিধারী ব্রাহ্মণের কথা উল্লিখিত হয়েছে যথা চিকিৎসক, দূত, কর-সংগ্রহকারী, কাঠুরিয়া, ব্যবসায়ী, চাষী, পশুপালক, কসাই, সামরিক প্রহরী ও শিকারজীবী, এবং বলা হয়েছে যে এদের ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হলেও এরা ব্রাহ্মণপদবাচ্য নয়। আমরা পূর্বে দেখেছি ধর্মশাস্ত্রসমূহ ব্রাহ্মণের বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বনের স্বাধীনতা মেনে নিলেও যজন-যাজন-অধ্যয়ন-অধ্যাপন-দান-প্রতিগ্রহ ছাড়া ব্রাহ্মণদের আর কোন বৃত্তি অবলম্বন সুনজরে দেখেনি। কাশীভরদ্বাজ-সুত্তে ভরদ্বাজ গোত্রজ এক ব্রাহ্মণের মুখে বুদ্ধের উদ্দেশ্যে এই কথাগুলি বসানো হয়েছে: "হে শ্রমণ, আমি ভূমি কর্ষণ করি ও বীজ বপন করি, এবং কর্ষণ ও বপনের পরিণামে, আমি খাদ্য পাই। আপনিও (ভিক্ষা না করে) কর্ষণ এবং বপন করুন, এবং কর্ষণ ও বপনের পরিণামে খাদ্য সংগ্রহ করুন।" জাতকসমূহে ব্রাহ্মণ চিকিৎসক, ব্রাহ্মণ যুদ্ধব্যবসায়ী (শরভঙ্গ-জাতক), ব্রাহ্মণ কৃষক (সোমদত্ত-জাতক), ব্রাহ্মণ ব্যবসায়ী (গংগ-জাতক), ব্রাহ্মণ-পশুপালক (ধূমকরী-জাতক), ব্রাহ্মণ কাঠের মিস্ত্রী (ফন্দন-জাতক) এমন কি ব্রাহ্মণ শিকারজীবীরও (চুল্লনন্দীয়-জাতক) উল্লেখ পাওয়া যায়। নকখত্ত, অসিলকখন ও কুনাল জাতকে এমন ব্রাহ্মণদের উল্লেখ আছে যারা স্বপ্নফল বর্ণনা, দুঃস্বপ্ন দূরীকরণ ও ভাগ্যগণনার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। জুনূহ এবং বেদব্ভ জাতকে ভূতের ওঝার বৃত্তিধারী ব্রাহ্মণদের কথা আছে। ব্রাহ্মণদের লোভী প্রবৃত্তির কথাও বহু জাতকে ফলাও করে বলা আছে।

বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহের সাক্ষ্য থেকে আরও জানা যায় যে জাতি মূলত জন্মের

দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হত। পূর্বোক্ত বসলসুত্তে মাতঙ্গের কাহিনী থেকে জানা যায় যে নিম্ন জাতিতে জন্মগ্রহণ করে নিজ কর্ম ও পুণ্যবলে কোন ব্যক্তির পক্ষে জগতে সর্বপূজ্য হওয়া সম্ভব, মৃত্যুর পর সর্বোচ্চ স্বর্গে গমনও সম্ভব, কিন্তু ব্রাহ্মণ হওয়া কদাচ সম্ভব নয়, যদিও ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত কোন ব্যক্তি পাপকর্ম করেও ব্রাহ্মণত্ব থেকে বিচ্যুত হয় না। যদিও শিলবিমনস জাতকে বলা হয়েছে, "জন্ম এবং জাতি আত্মগর্বের কারণ, বাস্তবিকই উৎকর্ষই সর্বোচ্চ, উৎকর্ষ-বিহীন ব্যক্তির বিদ্যাবুদ্ধি অর্থহীন, যদি তারা পুণ্যবান হয় দেবতাদের জগতে খত্তিয়, ব্রাহ্মণ, বেস্‌স, শুদ্দ, চন্ডাল, পুক্কস সকলেই সমান, ভবিষ্যৎ জগতের পক্ষে বেদ, জাতি ও জন্ম মূল্যহীন, এবং একমাত্র পুণ্যই পরবর্তী জগতে ব্যক্তির অনন্তসুখের কারণ।" তৎসত্ত্বেও জন্ম যে জাতিনির্ধারক সে প্রসঙ্গ একেবারেই চাপা দেওয়া যায়নি। দীঘ নিকায়ের অন্তর্গত অম্বট সুত্তে বুদ্ধের সঙ্গে ব্রাহ্মণ অম্বটঠের জাতিবিষয়ক কথাবার্তা থেকে যখন জানা যায় ক্ষত্রিয় পুরুষ ও ব্রাহ্মণ নারীর মিলনজাত সন্তান মাতৃদোষে ক্ষত্রিয় বলে গণ্য হতে পারেনা এবং ব্রাহ্মণ পুরুষ ও ক্ষত্রিয় নারীর মিলন জাত সন্তান পিতৃদোষে ক্ষত্রিয় বলে গণ্য হতে পারে না তখন যুক্তির শৃংখলার বদলে ক্ষত্রিয়দের ব্রাহ্মণদের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারই চোখে পড়ে। আসলে সকল বৌদ্ধগ্রন্থেই ক্ষত্রিয়কে শ্রেষ্ঠতর বর্ণ হিসাবে দেখানো হয়েছে এবং বর্ণক্রম ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের পরিবর্তে ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-শূদ্র হিসাবে দেখানো হয়েছে। বরং বাসেট্‌ঠ সুত্তে ভরদ্বাজ বাস্তব অবস্থা তুলে ধরেছেন এই বলে যে ব্রাহ্মণ পিতামাতার গর্ভে যে জন্মেছে সে ষোল আনাই ব্রাহ্মণ।

ক্ষত্রিয়দের যে বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে ব্রাহ্মণদের উপর স্থান দেবার চেষ্টা করা হয়েছে তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। ললিতবিস্তর গ্রন্থে বলা হয়েছে যে বোধিসত্ত্ব কখনও নিম্ন জাতিতে জন্মগ্রহণ করেন নি। তিনি জন্মেছেন ব্রাহ্মণ-কুলে অথবা ক্ষত্রিয় কুলে। এখনকার দিনে যেহেতু ভিক্ষুরা ক্ষত্রিয়দেরই শ্রেষ্ঠতর মনে করেন, বোধিসত্ত্বরাও তাই ক্ষত্রিয়জাত হন। অম্বট্‌ঠ সুত্তে বলা হয়েছে ক্ষত্রিয়রা অধঃপতনের চরম পর্যায়ে পেঁাছে গেলেও তারা ব্রাহ্মণদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ক্ষত্রিয়রাই সর্বোৎকৃষ্ট হিসাবে মনুষ্যগণ কর্তৃক বিবেচিত হয় যারা তার প্রতি মূল্য আরোপ করে। বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে মাতাপিতুসু-খত্তিয় শব্দটি (অর্থাৎ যাদের মাতা ও পিতা উভয়েই ক্ষত্রিয়) বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়দের বোঝাবার জন্য। জাতক গ্রন্থসমূহে ষোল বছর বয়স্ক ক্ষত্রিয় কুমারদের গুরুগৃহে যাবার কথা বলা হয়েছে। গমনিছন্দ-জাতকে ক্ষত্রিয় রাজাদের বেদ-

শিক্ষাদাতা হিসাবে দেখানো হয়েছে। চুল্লসুতসোম, কুন্দল এবং গান্ধার জাতকে ক্ষত্রিয় বাণপ্রস্থীদের কথা আছে। সোনক-জাতকে রাজা অরিন্দম তাঁর বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্ব সম্পর্কে এত অহংকার প্রকাশ করেছেন যে তিনি তাঁর পুরোহিত-তনয় সোনককে নীচ জাতীয় বলতে কুন্ঠাবোধ করেননি। বেসস (বৈশ্য) এবং সুদ্দ (শূদ্র) শব্দদ্বয় সাধারণভাবে চাতুর্বর্ণমূলক বিষয়সমূহ বোঝাবার ক্ষেত্রে বৌদ্ধ গ্রন্থে বাঁধা ছকের মত ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু জাতি হিসাবে বৈশ্য বা শূদ্রদের বিষয় সেখানে আলোচিত হয়নি। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ ছাড়া আর সকল জাতির সুনির্দিষ্ট পেশাদারী পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত গহপতি এবং কুটুম্বিক বৈশ্যদের সমতুল্য।

বৌদ্ধ জাতকসমূহে যাদের গহপতি বা গৃহপতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে তারা মোটামুটি ভূম্যধিকারী ও বণিক শ্রেণীর মানুষ, যাদের সামাজিক স্থান ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের নীচে। তারাও জাতিপ্রথার নিয়মানুযায়ী অন্তর্বিবাহ করত এবং বংশগত পেশা অনুসরণ করত। গহপতির মধ্যে যারা ধনী তারা শ্রেষ্ঠী (সেট্‌ঠি) বলে পরিচিত হত। ব্যবসা বাণিজ্য এবং কৌলিক বৃত্তি ছাড়াও, এরা পাঠ ইত্যাদিতে সময় দিত, এবং ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের অনুকরণে বাণপ্রস্থও অবলম্বন করত। উচ্চতর দুই বর্ণের মত গহপতিরাও নিম্নজাতীয় মানুষদের ঘৃণা করত। মতঙ্গ-জাতকের একটি কাহিনী থেকে জানা যায় যে জনৈক শ্রেষ্ঠীকন্যা একজন চণ্ডালকে দেখে সুগন্ধী জলের দ্বারা চোখ ধৌত করেছিল। জাতক সাহিত্যে গহপতি ও কুটুম্বিক সমার্থক। মুনিক-জাতক থেকে জানা যায় যে কুটুম্বিকরা শহরে এবং গ্রামে বাস করত সালক-জাতক অনুযায়ী কুটুম্বিকরা ছিল প্রধানত বাণিজ্যজীবী। এছাড়া তারা মহাজনী ব্যবসাও করত (সতপত্ত জাতক)। গহপতিদের সঙ্গে কুটুম্বিকদের পার্থক্য সম্ভবত ছিল এই যে প্রথম শ্রেণী কৃষি, ব্যবসাবাণিজ্য ও অপরাপর পেশা নির্ভর ছিল, যেখানে শেষোক্তরা প্রধানত বাণিজ্যজীবী ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে জাতকগ্রন্থসমূহে বহির্বাণিজ্যের বিশেষ উল্লেখ আছে। বাবেরু-জাতকে পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের উল্লেখ আছে। পাণ্ডর-জাতকে জাহাজডুবির ফলে পাঁচশো বণিকের মৃত্যুর কাহিনী আছে।

শ্রমোপজীবী দু' ধরনের মানুষের কথা বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে ভত্তক বা কম্মকার অর্থাৎ ভাড়া করা শ্রমিক এবং দাস। যদিও সুতনো-জাতকে দুর্দশায় পতিত হয়ে গহপতির ভাড়াটে শ্রমিকের পর্যায়ে নেমে যাবার কাহিনী আছে বা সুবন্নহংস-জাতকে তিনজন ব্রাহ্মণ কন্যার দাসীবৃত্তি

অবলম্বনের কাহিনী আছে, তথাপি কুম্মসপিন্দ-জাতকের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে এই ভতক বা কম্মকারের বৃত্তি বংশগত ছিল, অর্থাৎ তাদের অস্তিত্ব ছিল জাতি হিসাবে। এরা উৎপীড়িত এবং অল্প বেতনভোগী ছিল সন্দেহ নেই, তবু তাদের স্বাধীনতা ছিল এবং মালিক বদল করার অধিকার ছিল। পক্ষান্তরে দাসদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। দাসরা অবশ্য কোন নির্দিষ্ট জাতিভুক্ত ছিলনা, বিভিন্ন জাতি থেকেই তাদের নেওয়া হত। কুলবক-জাতকে দেখা যায় যে কোন অপরাধের জন্য একজন গ্রামাধ্যক্ষকে রাজা দাস করেছেন। চুল্লনারদ-জাতকে দস্যুদল কর্তৃক গ্রামলুণ্ঠন করে গ্রামবাসীদের দাস করে নেবার কাহিনী আছে। বেস্‌সন্তর ও নন্দ জাতকে দাস ক্রয় করার উল্লেখ আছে। কটাহক-জাতকে উত্তরাধিকারসূত্রে দাসপ্রাপ্তির কথা আছে। প্রভু ইচ্ছা করলে যে দাসকে মুক্তি দিতে পারত তার উল্লেখ সোননন্দ-জাতকে আছে। কুস-জাতকে দাস কর্তৃক প্রভুর খাদ্য রন্ধনের কথা এবং সিলবিমংস জাতকে দাসী কর্তৃক প্রভুর দেহ ধৌত করার কথা উল্লিখিত আছে।

এছাড়া অজস্র কারিগর জাতি বৌদ্ধ জাতকসমূহে উল্লিখিত হয়েছে। কচ্ছপ-জাতক এবং কুম্ভকার-জাতকে এরকম কিছু বৃত্তিধারী জাতির কথা আছে যথা কর্মকার, কুম্ভকার, প্রস্তরচূর্ণকারী, হাতির দাঁতের কারিগর, সূত্রধর, মালাকার, নাপিত, ধীবর, নর্তক, বাদক, হস্তিপালক প্রভৃতি। নগরে বা লোকালয়ে এই সকল বৃত্তিধারী জাতির বসবাসের বিশেষ এলাকা নির্দিষ্ট ছিল বলে জাতকসমূহে বলা হয়েছে। অলিনচিত্ত-জাতক এবং সমুদ্দবাণিজ-জাতকে সূত্রধরদের পল্লীর কথা আছে, সূচী-জাতকে কর্মকার পল্লীর উল্লেখ আছে। এই সকল পেশাদার জাতির নিজস্ব গিল্‌ড (শ্রেণী) বা সংগঠন ছিল এবং এগুলি পরিচালিত হত সংগঠনের নেতার নির্দেশে যাকে বলা হত জেট্ঠক। এক পেশার সংগে অপর পেশার মর্যাদার পার্থক্য ছিল দুস্তর। কোন কোন ক্ষেত্রে পেশার বদলও হত এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যেমন সুপ্পারক-জাতকে বলা হয়েছে যে একজন ধীবর নিজ পেশা বদল করে বিভিন্ন মূল্যবান পণ্যের দরকর্তার বৃত্তি গ্রহণ করে, এবং পরে আবার নিজস্ব কৌলিক পেশায় ফিরে আসে। সুত্তবিভঙ্গে (পাচিত্তিয় ২।২) ঝুড়ি প্রস্তুতকারক, কুম্ভকার, তন্তুবায়, চর্মকার, নাপিত প্রভৃতি বৃত্তিকে হীনসিপ্প (হীনশিল্প) আখ্যা দেওয়া হয়েছে, এবং বেন, রথকার, চণ্ডাল, নিষাদ, পুক্কস প্রভৃতিকে হীনজাতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কুস-জাতকে বেনদের (বাঁশের সামগ্রী প্রস্তুতকারক) চণ্ডালদের সঙ্গে অভিন্ন ঘোষণা করা হয়েছে। তক্করীয়-জাতকে ঝুড়ি ও

বাদ্যপ্রস্তুতকারীদের, ভীমসেন-জাতকে, তাঁতীদের এবং শিগাল-জাতকে নাপিতদের অতিশয় হীনজাতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

বৌদ্ধ জাতকের সাক্ষ্য অনুযায়ী চণ্ডালরা সমাজে সবচেয়ে ঘৃণিত জাতি ছিল। তারা নগরের বাইরে বাস করত। তাদের দেখা বা স্পর্শ করা অবিধেয় বলে গণ্য করা হত। মাতঙ্গ-জাতকে দেখানো হয়েছে কিভাবে ষোল হাজার ব্রাহ্মণ অজানিতভাবে চণ্ডালের খাদ্য স্পর্শ করে জাত খুইয়েছিল। সতধম্ম-জাতকে জনৈক ব্রাহ্মণের চণ্ডালস্পৃষ্ট খাদ্য খেয়ে আত্মহত্যা করার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। চণ্ডাল দেখে শ্রেণীকন্যার গোলাপজলে চোখ ধোয়ার কাহিনী আগেই বলা হয়েছে। চিত্ত-সম্ভূত জাতক ও মাতঙ্গ জাতকে চণ্ডালদের পৃথক ভাষা ও পোষাকের কথাও বলা হয়েছে। পুক্কস ও নিষাদরাও ঘৃণিত জাতির পর্যায়ে পড়ে, তবে চণ্ডালের মত অতটা নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন চণ্ডালদের পেশায় ধীবর ও শিকারজীবী বলেছেন। হিউয়েন সাং চণ্ডালের বৃত্তি হিসাবে কসাই, ঝাড়ুদার, ধীবর, ঘাতক প্রভৃতি পেশার উল্লেখ করেছেন। তাঁরা উভয়েই জানিয়েছেন যে চণ্ডালরা নগরের বা বাজারের প্রবেশপথে একটি কাঠের লাঠি ঠুকে শব্দ করে নিজেদের উপস্থিতি জানিয়ে দিত যাতে অপরে তাদের স্পর্শদোষ এড়াতে পারে। চণ্ডালদের প্রসঙ্গে ঠিক একই কথা বলেছেন অপর একজন চৈনিক পরিব্রাজক ই-সিং। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, এই অবস্থার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার মত মানুষ সে যুগেও ছিল নতুবা মাতঙ্গ জাতকে কিভাবে এটা দেখানো হয় যে চণ্ডাল হওয়া সত্ত্বেও মাতঙ্গ শুধু প্রজ্ঞা ও সদাচারের জোরে সর্বজনমান্য হয়েছিল এমন কি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দেরও ভক্তির পাত্র হয়েছিল।

৭॥ বৈদেশিক বৃত্তান্তে জাতিপ্রথা

চৈনিক পরিব্রাজকদের মধ্যে ফা-হিয়েন ও ই-সিং বিশেষ সচেতনতার সঙ্গে জাতিপ্রথার উল্লেখ করেননি। ফা-হিয়েন যদিও বিভিন্ন মতাবলম্বী বিতণ্ডাবাদী ব্রাহ্মণদের উল্লেখ করেছেন, রাজা ও রাজকর্মচারীদের কথা বলেছেন, বৈশ্য প্রধানদের কথাও বলেছেন যারা নগরে ধর্মশালা, চিকিৎসাকেন্দ্র প্রভৃতি খুলেছিল, এমন কি চণ্ডাল বা অস্পৃশ্যদের কথাও বাদ দেননি, এবং ই-সিং যদিও ব্রাহ্মণদের দেবতা হিসাবে গণ্য ও পঞ্চ-ভারতে সর্বাধিক সম্মানিত জাতি হিসাবে বর্ণনা করেছেন, তাঁদের উভয়েরই দৃষ্টি ছিল এদেশে আচরিত বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি নিবদ্ধ। পক্ষান্তরে হিউয়েন-সাং-এর অনুসন্ধিৎসার ক্ষেত্র ছিল

অত্যন্ত ব্যাপক এবং তিনি জাতিপ্রথাকে বোঝার চেষ্টাও করেছিলেন আন্তরিকভাবে। চাতুর্বর্ণের সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন বংশগত কুলপার্থক্য বলে, এবং ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রসমূহে চাতুর্বর্ণের যে সামাজিক পরিচয় ও কর্তব্যভেদ উল্লিখিত আছে তারই পুনরুক্তি করেছেন, যদিও কৃষিকে তিনি বৈশ্যের পরিবর্তে শূদ্রের কর্তব্য বলে উল্লেখ করেছেন, হয়ত সমসাময়িক অবস্থার নিরিখে যেখানে বৌদ্ধ বা জৈন গহপতিরা হিংসার কারণেই কৃষি থেকে বিরত হয়েছিল। ই-সিং বলেছেন নির্দোষ পেশা বলতে বাণিজ্যকেই বোঝায়, কেননা এতে প্রাণিহত্যার সুযোগ নেই ; বর্তমান ভারতে কৃষকদের চেয়ে বণিকরাই বেশি সম্মান পেয়ে থাকে, কেননা কৃষিকার্যে অনেক পোকামাকড় নিহত হয়, রেশম-চাষে প্রাণিহত্যার প্রয়োজন হয়। তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবেরও যে মাঝে মাঝে অমিল থাকে তাও দেখা যায় যখন হিউয়েন-সাং বলেন যে কামরূপ, উজ্জয়িনী, মহেশ্বরপুর এবং চি-চি-টোর রাজারা ব্রাহ্মণ ছিলেন, মণিপুর ও সিন্ধুর রাজারা শূদ্র ছিলেন এবং তার নিজ পৃষ্ঠপোষক কনৌজরাজ হর্ষবর্ধন বৈশ্য ছিলেন। তক্ক দেশে তিনি ব্রাহ্মণ কৃষিজীবী দেখেছিলেন। এদেশে যে অসংখ্য পেশা-নির্ভর জাতি ছিল তা হিউয়েন-সাং-এর নজর এড়ায়নি, যদিও তিনি বলেছেন যে এই সব মিশ্রজাতিদের সংখ্যা এত বেশি যে তার উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তাঁর মতে চারবর্ণের নিজস্ব পবিত্রতা-অপবিত্রতার আনুষ্ঠানিক ধারণা বর্তমান যার উপর ভিত্তি করেই বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতিষ্ঠা। হিউয়েন-সাং ব্রাহ্মণদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার কারণ হিসাবে তাদের শিক্ষাদীক্ষা, শাস্ত্রজ্ঞান ও যুক্তিপদ্ধতির প্রয়োগদক্ষতার উল্লেখ করেছেন। তাদের পৌরোহিত্য বৃত্তির কথাও তিনি বলেছেন।

ভারত সংক্রান্ত কিছু আরব বিবরণেও জাতিপ্রথা বিষয়ক ইঙ্গিত আছে। এই সকল আরব লেখকদের মধ্যে নবম শতকের সুলাইমান, দশম শতকের খুরদাদবা, আবু জাইদ এবং মাসুদি, একাদশ শতকের অল-বিরুণী ও দ্বাদশ শতকের ইদ্রিসি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুলাইমান এবং মাসুদি বলেন যে ভারতের সম্ভ্রান্তশ্রেণী, জ্ঞানী ব্যক্তিরা, চিকিৎসকবর্গ, রাজা, ওয়াজির, কাজী প্রভৃতি পদাধিকারীরা বংশপরম্পরায় একই বৃত্তি অনুসরণ করে এবং এইভাবে এক একটি পেশা অবলম্বনে এক একটি জাতি গড়ে ওঠে। যারা ধর্মশাস্ত্র ও জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করে তারা ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত। মাসুদির মতে যারা উচ্চ-বর্গের জাতি, তারা মাংস ভক্ষণ করে না এবং যারা অন্য জাতিদের সঙ্গে পার্থক্য বজায় রাখার জন্য নারীপুরুষ উভয়েই হরিদ্রাবর্ণের উপবীত ধারণ করে। গ্রীক

লেখকদের মত খুরদাদবা এবং ইদ্রিসি ভারতের জনসমাজকে সাতটি জাতিতে বিভক্ত করেছেন। প্রথম জাতিটির নাম সাবকুফরিয়া বা সাকরিয়া যারা সম্ভ্রান্ত এবং যাদের থেকে রাজার মনোনয়ন হয়। দ্বিতীয় জাতিটি ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্ম নামে পরিচিত যারা মদ্যপান করে না, মূর্তিপূজা করে এবং সমাজে উচ্চ মর্যাদা লাভ করে। তৃতীয় জাতিটি কাতারিয়া বা কাস্তারিয়া নামে পরিচিত যারা তিন পাত্রের বেশি মদ্যপান করে না। চতুর্থ জাতিটি সুদরিয়া বা সরদুয়া যারা পেশায় কৃষক। পঞ্চম জাতিটির নাম বেসুরা বা বস্য যারা কারিগর শ্রেণীর মানুষ। ষষ্ঠ জাতিটির নাম সান্দালিয়া যারা নীচু কাজ করে। সপ্তম জাতিটির নাম লাহুদ বা জাক্যা যারা খেলাধুলা দেখিয়ে মানুষকে আনন্দ দেয়। এই জাতিগুলির মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে খাপ খায়, দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ, চতুর্থ শূদ্র, পঞ্চম বৈশ্য ও ষষ্ঠ চণ্ডালদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সপ্তমটি নট বা শৈলূষিকদের সমগোত্রীয়।

ভারত সম্পর্কে অল-বিরুণীর প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল এবং তার উপর ভারতীয় শাস্ত্রের উপরও তাঁর পড়াশোনা ছিল। তিনি ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্র অনুমোদিত চাতুর্বর্ণের যথাযথ ব্যাখ্যা করেছেন এবং বলেছেন যে অপর বর্ণসমূহের মত ব্রাহ্মণদের রাজার কাছে কোন কর্তব্যের বাধ্যবাধকতা ছিল না। ব্রাহ্মণ করপ্রদানে বাধ্য নয় এবং ব্রাহ্মণদের উপর মৃত্যুদণ্ডের প্রয়োগ হয় না যদিও গুরুতর অপরাধে রাজা তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারেন। ব্রাহ্মণ হত্যাকারী হলেও উপবাস ও প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা তার শুদ্ধি ঘটে। ব্রাহ্মণ হত্যার চেয়ে বড় পাপ আর নেই। ব্রাহ্মণদের জীবিকা সম্পর্কে অলবিরুণী বলেন যে শিক্ষাদানের দ্বারা তাদের যে উপার্জন হয় সেটা ঠিক বেতন নয়, কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসাবেই তা তারা পেয়ে থাকে। এছাড়া পৌরোহিত্য এবং দানপ্রাপ্তিও তাদের উপার্জনের উৎস। অলবিরুণী ব্রাহ্মণদের অন্যবৃত্তি গ্রহণের অধিকার ও আপদকালে যে কোন বৃত্তি গ্রহণের স্বাধীনতার প্রসঙ্গে ধর্মশাস্ত্রসমূহের মতেরই প্রতিধ্বনি করেছেন। ব্রাহ্মণদের নিজস্ব পবিত্রতাবোধ, পঙক্তিভোজনের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র প্রভৃতি বিষয়ও অলবিরুণী উল্লেখ করেছেন। তিনি ব্রাহ্মণ রাজবংশেরও উল্লেখ করেছেন। ক্ষত্রিয়দের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন শাসন ও রক্ষা তাদের মূল কাজ। ক্ষত্রিয় বেদপাঠ করে কিন্তু বেদ শিক্ষা দেয় না। ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রেও মৃত্যুদণ্ডের সচরাচর প্রয়োগ হয় না বলে অলবিরুণী মন্তব্য করেছেন। বৈশ্যদের ক্ষেত্রেও অলবিরুণী ধর্মশাস্ত্রের প্রতিধ্বনি করেছেন যদিও তাঁর যুগে বহু পেশার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে কৃষিকর্মের ক্ষেত্রে বৈশ্য-শূদ্রের ভেদ ঘুচে গিয়েছিল, যে কারণে

তিনি বলেছেন যে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সামান্য। শূদ্রদের নীচে অলবিরূণী অন্ত্যজদের স্থান দিয়েছেন যারা আটপ্রকার বলে তিনি উল্লেখ করেছেন যথা রজক, চর্মকার, ক্রীড়াবিদ (নট বা শৈলূষিক), ঝুড়ি বা বাঁশের দ্রব্য প্রস্তুত-কারক (বুরুড়), নাবিক, জেলে, শিকারজীবী এবং তাঁতী। অন্ত্যজদের নীচে তিনি স্থান দিয়েছেন হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল এবং বধতৌদের। শিষোক্তদের পরিচয় সঠিক জানা যায় না, তবে অলবিরূণী বলেছেন যে তারা মৃত পশুর মাংসে জীবনধারণ করে, এমন কি কুকুরের মাংস পর্যন্ত ভক্ষণ করে।

তৃতীয় অধ্যায়

জাতি পরিচয়

১ ॥ ব্রাহ্মণদের আঞ্চলিক বণ্টন ও শ্রেণীবিভাগ

বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণরা মোটামুটি পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত যথা দাক্ষিণাত্য বৈদিক, পাশ্চাত্য বৈদিক, রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র এবং মধ্যশ্রেণী। দাক্ষিণাত্য বৈদিকদের সংখ্যা খুবই সীমাবদ্ধ, প্রধানত মেদিনীপুর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণাতেই এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের বসতি। ভাটপাড়াতেও কিছু দাক্ষিণাত্য বৈদিকের সন্ধান মেলে। পাশ্চাত্য বৈদিকরা বঙ্গদেশের সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে, তবে বিশেষ কেন্দ্র ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া, চব্বিশ পরগণা জেলার ভাটপাড়া ও নদীয়া জেলার নবদ্বীপ। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণরা বঙ্গদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ যাদের মূল নিবাস রাঢ় অঞ্চল, অর্থাৎ ভাগীরথীর পশ্চিম দিক। পরে তারা পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে বসতি স্থাপন করে। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণরা শতাধিক শাখায় বিভক্ত যেগুলি চারটি মূল ভাগে বিন্যস্ত, কুলীন, বংশজ, শুদ্ধ শ্রোত্রিয় ও কষ্ট শ্রোত্রিয়। কৌলিন্য প্রথা নিয়ে আমরা অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করব। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের মূল কেন্দ্র উত্তরবঙ্গ, যদিও তারা বঙ্গদেশের নানাস্থানে ছড়িয়ে আছে। সংখ্যায় তারা রাঢ়ীয়দের চেয়ে অল্প হলেও দুই শ্রেণীর বৈদিকের চেয়ে অধিক। বারেন্দ্র-দের মধ্যে কুলীন ইত্যাদি অনুলোমজ-প্রতিলোমজ ভেদ আছে। তাদের একটি অংশ চাপ নামে পরিচিত যারা রাঢ়ীয় শ্রেণীর বংশজদের কাছাকাছি। মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের পাওয়া যায় মেদিনীপুর জেলায়। তারা কৈবর্তদের দান গ্রহণ করে বলে অন্য ব্রাহ্মণদের চোখে নিম্ন পর্যায়ের, যদিও তারা রাঢ়ীয়দের উপাধি ও গোত্রনাম ধারণ করে। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে কুলীন, শ্রোত্রিয় ইত্যাদি ভেদ নেই। বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণদের বেশির ভাগই মধ্যপন্থী শাক্ত মতে বিশ্বাসী, তবে বৈষ্ণবও কিছু কিছু আছে। গোস্বামী উপাধি ধারী ব্রাহ্মণরা সকলেই বৈষ্ণব, অন্য উপাধিধারীদের মধ্যেও বৈষ্ণব দেখা যায়। আসাম অঞ্চলের ব্রাহ্মণরা নিজেদের বৈদিক বলে পরিচয় দেয়।

উড়িষ্যার ব্রাহ্মণদের দুটি প্রধান শাখা, দাক্ষিণাত্য ও যাজপুরিয়া। উভয় শাখার মধ্যে বৈবাহিক বা অপরাপর সম্পর্ক নেই। দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণরা কয়েকটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত যথা বৈদিক ব্রাহ্মণ, পূজারী, অধিকারী বা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ এবং

মহাজনপন্থী ও মহাস্থানী ব্রাহ্মণ। বৈদিক ব্রাহ্মণরা প্রধানত পূজা-অনুষ্ঠান ইত্যাদি ধর্মীয় কাজকর্ম করে থাকে, এবং তারা কুলীন ও শ্রোত্রিয় দুইগোষ্ঠীতে বিভক্ত। কুলীনদের মধ্যেও যারা শাসনী বা রাজকীয় আদেশনামা প্রাপ্ত কয়েকটি বিশেষ গ্রামের বাসিন্দা তারা বিশেষ সম্মানের পাত্র। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য বঙ্গদেশের বৈদিক ব্রাহ্মণদের মধ্যে কৌলিণ্যপ্রথা কার্যত অনুপস্থিত হলেও, দাক্ষিণাত্য বৈদিকদের উড়িষ্যাগত কোন কোন শাখার মধ্যে এই প্রথা বিকাশলাভ করেছিল। পূজারী বা অধিকারী ব্রাহ্মণরা সকলেই বৈষ্ণব এবং শ্রীচৈতন্যের অনুগামী। তারা যজ্ঞোপবীত ছাড়াও গলায় তুলসীর মালা পরিধান করে। তাদের মধ্যে বিভিন্ন গুরু অনুসারী উপসম্প্রদায় ভেদও আছে। মহাজনপন্থী বা পানিগিরি ব্রাহ্মণরা সচরাচর ধর্মনিরপেক্ষ পেশায় নিযুক্ত। মহাস্থানী ব্রাহ্মণরা উড়িষ্যার সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে, যদিও সামাজিক মানমর্যাদার দিক থেকে তারা খাটো, কেননা তারা চাষবাস করে এবং সেই কারণে হালিয়া ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। নিম্নস্তরের ব্রাহ্মণদের মধ্যে পান্ডাদের কথাও এক্ষেত্রে উল্লেখ যোগ্য, যাদের মধ্যে অনেকেই বংগদেশে এসে রাঁধুনির বৃত্তি অবলম্বন করেছে। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের পান্ডারা কিন্তু সকলেই ব্রাহ্মণ নয়, এবং তাদের ব্রাহ্মণত্বের দাবি খুবই সাম্প্রতিক। যাজপুরীয়া ব্রাহ্মণরা উড়িষ্যার উপকূলবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দা, এবং বঙ্গদেশে যত ওড়িয়া ব্রাহ্মণ দেখা যায় তাদের বেশির ভাগই যাজপুরী। এই ব্রাহ্মণরা ছয়টি গোত্রে বিভক্ত যথা কফলা, কুমার, কুশিক, কৃষ্ণাত্রেয়, কামকায়ন এবং কাত্যায়ন। তা ছাড়া উড়িষ্যায় কিছু অথর্ব-বেদী ব্রাহ্মণ আছে যারা নিম্নপর্যায়ের ব্রাহ্মণ বলে বিবেচিত।

বিহারী ব্রাহ্মণদের মধ্যে মৈথিলীরা অগ্রগণ্য এবং পঞ্চগৌড় নামে কথিত ব্রাহ্মণদের শাখা বলে তারা নিজেদের মনে করে। মিথিলা একদা সংস্কৃতচর্চার, বিশেষ করে ন্যায়শাস্ত্রচর্চার একটি বৃহৎ কেন্দ্র ছিল। মৈথিলী ব্রাহ্মণদের অধিকাংশই শক্তিমতাবলম্বী এবং বংগদেশের ব্রাহ্মণদের মতই তারা মাছমাংস খায়। বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতিও দেবী দুর্গার উপাসক ছিলেন। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ও আরও অনেক নামকরা বিহারী জমিদার মৈথিলী ব্রাহ্মণ কুলজাত। মৈথিলী ব্রাহ্মণদের কোন শাখা নেই তবে বঙ্গদেশের কুলীন প্রভৃতির মত অনুলোমজ-প্রতিলোমজ গোষ্ঠী আছে যেমন শ্রোত্রিয় বা মোত, যোগ, নাগর, পঞ্জীবন্ধ ও জাইওয়ার। এছাড়া দক্ষিণ বিহারে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বর্তমান, যাদের পেশা ভাগ্যগণনা, শুভাশুভনির্ণয় ও চিকিৎসা। তবে তাদের মধ্যে পণ্ডিত ও ভূম্যধিকারী মানুষও আছে। পাঞ্জাবের সারস্বত ব্রাহ্মণদের মত

শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণরা সগোত্রে বিবাহ করে। তবে তাদের গোত্রের উপবিভাগ আছে যেগুলি পুর নামে পরিচিত। স্বগোত্রে বিবাহ হয় তবে স্বপুরে হয়না।

উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণরা প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত যথা কনৌজীয়া, সরযূপারীয়া এবং সনাঢ্যা। সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে কনৌজীয়াদের স্থান খুবই উচ্চে কেননা বিভিন্ন স্থানের ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যে কনৌজাগত বলে পরিচিত হবার প্রবণতা খুবই বেশি। কনৌজীয়া ব্রাহ্মণদের নানা শাখা বর্তমান। উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হলেও কনৌজীয়ারা নিম্নধরনের নানা বৃত্তিতে নিযুক্ত। কোম্পানীর আমলের সিপাহীদের মধ্যে একটা বড় অংশই ছিল কনৌজীয়া। সরযূপারীয়ারা অযোধ্যা অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। তারা নিজেদের কনৌজীয়াদের শাখা বলে মনে করলেও কনৌজীয়াদের সঙ্গে তাদের বৈবাহিক বা অপর কোন সামাজিক সম্বন্ধ নেই। সরযূপারীয়া বা সারোরিয়াদের মধ্যে সংস্কৃতচর্চা বর্তমান এবং তারা স্বহস্তে জমি চাষ করেনা। সনাঢ্যারাও কনৌজীয়াদের শাখা বলে নিজেদের দাবি করে। তারা গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলের বাসিন্দা। তারা প্রধানত বাণিজ্যজীবী হওয়ায় অপরাপর ব্রাহ্মণদের তুলনায় সামাজিক মর্যাদায় হীন। উত্তর-প্রদেশের ব্রাহ্মণরা অধিকাংশই শৈব-মতাবলম্বী।

হরিয়ানা অঞ্চলের ব্রাহ্মণরা গৌড় ব্রাহ্মণ নামে পারচিত। তাদের মতে উত্তর ভারতে ব্রাহ্মণদের যে পঞ্চ-গৌড় নামে পরিচিতি আছে তাদের মধ্যে তারাই হচ্ছে আদি গৌড়, এবং সারস্বত, কান্যকুব্জ, মৈথিল ও উৎকল ব্রাহ্মণরা তাদের থেকে উৎপন্ন। গৌড় শব্দের মূলে তাৎপর্য কি তা বলা শক্ত, তবে এই শব্দটি পুরোহিত অর্থেও প্রযুক্ত হয়, এবং এই অর্থে গৌড় ব্রাহ্মণদের পুরোহিত শ্রেণী বলা যায়। তবে হরিয়ানার গৌড় ব্রাহ্মণরা প্রধানত কৃষিজীবী। তাদের একটি শাখাকে তাগা-গৌড় বলা হয়। তাগার অর্থ উপবীত। ওই উপবীত-টুকু ছাড়া ব্রাহ্মণত্বের আর কোন পরিচয় তাদের নেই। অন্য জাতির লোকেরা তাদের ব্রাহ্মণ বলে প্রণাম করে না। দেখা হলে মুখে শুধু রামরাম বলে। গৌড় ব্রাহ্মণদের অধিকাংশই শৈব, একাংশ বৈষ্ণব, বৈষ্ণবদের একটি অংশ আবার বল্লভাচারী। গৌড় ব্রাহ্মণরা মাছমাংস ভক্ষণ করে না এবং মাঝে মাঝে বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে থাকে। উত্তর-প্রদেশ ও হরিয়ানার ব্রাহ্মণরা মদ্য স্পর্শ করে না তবে প্রচুর গঞ্জিকাসেবন করে থাকে।

পাঞ্জাব ও হরিয়ানার পশ্চিমাঞ্চলের সারস্বত ব্রাহ্মণদের নামের উৎস সরস্বতীনদী। সারস্বতরা পঞ্চগৌড়ের একটি বলে নিজেদের দাবি করে।

তাদের অধিকাংশই কৃষিজীবী। তারা বানিয়া ও ক্ষেত্রিদের পৌরোহিত্য করে এবং তাদের আতিথ্য গ্রহণ করতেও পরাঙ্মুখ নয়। সারস্বতরা বেশিরভাগই শাক্ত, তবে সচরাচর মাছমাংস ভক্ষণ করে না। তারা দুটি শাখায় বিভক্ত, বানজাই এবং মোহয়াল। শেষোক্তরা পাঞ্জাবের পশ্চিমাঞ্চলে বাস করে, এবং তারা কদাপি পুরোহিতের কাজ করে না। বানজাইরা কয়েকটি অনুলোমজ-প্রতিলোমজ গোষ্ঠীতে বিভক্ত, বঙ্গদেশের কুলীন প্রভৃতির মতই, যেগুলির নাম পঞ্চ-জাতি (আড়াই-ঘর ও চার-ঘর), অষ্ট-ভান, এবং বরুহি। সারস্বতদের মধ্যে সগোত্র বিবাহ হয়। সিন্ধুপ্রদেশের ব্রাহ্মণরাও প্রধানত সারস্বত এবং তারা পাঁচটি শাখায় বিভক্ত যথা শ্রীকর, বারি (বারোটি কুল), ভবনজাহী (বাহান্নটি কুল), শেতপাল ও কুবছন্দ। এদের মধ্যে একমাত্র যারা বৈষ্ণব ও বল্লভাচারী তারা ব্যতিরেকে সকলেই মাছমাংস খায়, এমনকি পাঞ্জাবের সারস্বতদের মত ক্ষৌত্র ও রোজা বানিয়াদের হাতেও খায়। ভবনজাহী এবং শেতপালদের একাংশ উগ্রধরনের শাক্ত এবং তারা মদ্যপানও করে। পৌরোহিত্য ছাড়াও তারা গ্রহ-বিপ্রের কাজ করে। এছাড়া চাষবাস ও বাণিজ্যেও তাদের আগ্রহ দেখা যায়। কাশ্মীরের ব্রাহ্মণরা দুই-শ্রেণীর, পণ্ডিত এবং ডোগরা। প্রথমোক্তরা শাস্ত্রানুশীলন ও বিদ্যাচর্চায় অতিরিক্ত উৎসাহী হবার দরুন উত্তরভারতের নানাস্থানে সম্মানভাজন ব্রাহ্মণ হিসাবে পরিচিত। ডোগরা ব্রাহ্মণরা ডোগরা উপজাতি থেকে উদ্ভূত।

রাজস্থানের ব্রাহ্মণদের একটা বড় অংশ বহিরাগত, প্রধানত সারস্বত, গৌড় ও কনৌজীয়াদের নিয়ে গঠিত। স্থানীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রীমালী ব্রাহ্মণ রাজস্থানের সর্বত্র ও গুজরাতে দেখা যায়। মেবারী ব্রাহ্মণরা সচরাচর মেবার অঞ্চলেই কেন্দ্রীভূত। পল্লীওয়ালারা উত্তর ও পশ্চিম রাজস্থানের বাসিন্দা তবে তাদের মহারাষ্ট্র ও গুজরাতেও বিস্তৃতি আছে। পোকরনা ব্রাহ্মণদের উৎপত্তিস্থল যোধপুর ও জয়শলমীরের মধ্যবর্তী পোকরনা শহরে কিন্তু তাদের বিস্তৃতি উত্তর ও পশ্চিম রাজস্থান এবং তৎসহ সিন্ধু ও গুজরাতেও দেখা যায়। রাজগোর ও গুজরগোর কিছুটা নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, রাজস্থানের সর্বত্রই যাদের দেখা যায়। আরও নানা শ্রেণীর ব্রাহ্মণ রাজস্থানে বর্তমান যারা এখানে-ওখানে কেন্দ্রীভূত যেমন সাঞ্চোরা ব্রাহ্মণদের এলাকা শিরোহী জেলার সাঞ্চোরা, দহিমা ব্রাহ্মণদের পাওয়া যায় মারওয়ার ও বুন্দিতে, পারিক ব্রাহ্মণদেরও এলাকা ওই দুই অঞ্চলে, দিওয়াস ব্রাহ্মণদের পাওয়া যায় বিকানীর, মারবার এবং নাথাড়ওয়ারা অঞ্চলে, খাণ্ডেলবালদের পাওয়া যায় মারবার ও জয়পুরে, নন্দওয়ানি বোরা ব্রাহ্মণদের

পাওয়া যায় মারবার এবং কসৌলিতে, শিখাওয়ালদের কেন্দ্র জয়পুর এবং আসোপাদের কেন্দ্র মারবার। এই সকল ব্রাহ্মণদের অনেকেই জৈন মতাবলম্বী হয়েছে এবং জৈন জাতিকাঠামোয় স্থান পেয়েছে। রাজস্থানে ভোজক নামে একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছে যারা জৈনদের পৌরোহিত্য করে। পুষ্কর তীর্থের পাণ্ডারা পুষ্কর সেবক নামে পরিচিত। রাজস্থানের ভাট ও চারণরা ব্রাহ্মণত্বের মর্যাদা চাইলেও তারা ব্রাহ্মণ বলে স্বীকৃত নয়।

গুজরাতী ব্রাহ্মণরাও নানা শাখায় বিভক্ত, প্রধানত ছয়টি শাখায়, যথা ঔদীচ্য, নাগর, রাইকওয়ার, ভার্গব, শ্রীমালী ও গির্ণার। এরা নিজেদের পঞ্চ-দ্রাবিড় (পঞ্চগৌড়ের অনুরূপ) কুলোদ্ভূত বলে দাবি করে। ঔদীচ্যরা প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্তঃ তোলকীয়া, সিদ্ধপুরীয়া এবং শিহোর। এছাড়া ঔদীচ্য-দের আরও কয়েকটি ছোট ছোট গোষ্ঠী আছে যেমন সহস্র, খেরওয়ার, উনাওয়ার ঘরিয়া, কালওয়ারি, খরাইরি ও গোহেলওয়ারি। এই সকল নামগুলির অধি-কাংশই স্থাননামবাচক। নাগর ব্রাহ্মণদের ছয়টি শাখা যথা বড়নগর, বিশাল-নগর, সাথোদ্রা, প্রসনোরা, কিসনোরা, চিৎরোদা। প্রত্যেকটি নামই এক একটি নগরের নাম থেকে উদ্ভূত। রাইকোয়ার ব্রাহ্মণরা কচ্ছ ও খেড়া অঞ্চলের, ভার্গবদের বাস ব্রোচ জেলায়। শ্রীমালীরা রাজস্থান থেকে আগত এবং ছয়টি শাখায় বিভক্ত—কচ্ছী, কাথিয়াবারী, গুজরাতী, আমেদাবাদী, সুরাটী এবং খাম্ভাতী। গির্ণাররা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—জুনাগড়ীয়া, চোরওয়াদা (সোম-নাথ ও মাঙ্গরোলের মধ্যবর্তী উপকূল-শহর চোরওয়াদ), আজকীয়া (আজক গ্রামের)। এছাড়া আরও বহু আঞ্চলিক ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী গুজরাতের নানাস্থানে বর্তমান, যথা অনাবালা বা ভাতেলা (ব্রোচ ও দমনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে), চোবিশা (বরোদা, সিনোর এবং জানোরে সীমাবদ্ধ), দধীচি (মহী নদীর কূলে), দশহারা (অনহিলওয়ারা পত্তনে), দেশোয়ালী (খেড়া জেলায়), জম্বু (ব্রোচ জেলার জম্বুসর), খাড়ায়ৎ (খেড়া, আমেদাবাদ ও ব্রোচ), মস্থান (সিদ্ধপুর) মোধা (আমেদাবাদ ও খেড়া), নন্দোদ্রা (নান্দোদ), নারাদিক (ক্যাম্বে), নরসিপারা (কাইরা জেলা, বল্লভাচারী সম্প্রদায়ভুক্ত), পরাশরীয়া (কাথিয়াবারের দক্ষিণ-পূর্ব), সাচোরা, সাজোদ্রা (ব্রোচের নিকটবর্তী সাজোধ), সোমপারা (সোমনাথ অঞ্চল), সোরাঠীয়া (সুরাট), তালাজীয়া (ভবনগরের অন্তর্গত তলাজ), তপোধন, বালাদ্রা (ওয়াদা), বাল্মীকি (খেড়া, ক্যাম্বে, ইদার), বয়াদ প্রভৃতি। আরও কিছু নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ গুজরাতে আছে যেমন আভীর-ব্রাহ্মণ (আভীর গোয়ালাদের পুরোহিত), মুচিগোড় (চর্মকারদের

পুরোহিত), কুনবি গৌড় (কুনবি চাষীদের পুরোহিত), দর্জিগৌড় (দর্জিদের পুরোহিত), গন্ধর্পগৌড় (গাইয়ে-বাজিয়েদের পুরোহিত), গুর্জরগৌড় (গুর্জরদের পুরোহিত) প্রভৃতি।

মধ্যপ্রদেশে মোটামুটি তিন ধরনের ব্রাহ্মণ দেখা যায়, মালব অঞ্চলের মালবীয়া, নর্মদা নদী অঞ্চলে নর্মদীয়া এবং বুন্দেলখণ্ডের জিঝোটিয়া। নাগপুর ও জবলপুর অঞ্চলে গোন্দী ব্রাহ্মণদের পরিচয় পাওয়া যায় যাদের সঙ্গে মারাঠী ব্রাহ্মণদের বিবাহাদি সম্পর্ক চলে। গোন্দ ব্রাহ্মণদের একটি শাখা চরকী নামে পরিচিত। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের নামকরণ হয়েছে গোন্দ-উপজাতি থেকে। মহারাষ্ট্রের প্রধান ব্রাহ্মণ পাঁচ ধরনের—দেশস্থ, কোংকনী, যজুর্বেদী, করহাদে এবং শেনাবি। দেশস্থ ব্রাহ্মণরা খুবই প্রভাবশালী। তারা দুভাগে বিভক্ত, লৌকিক বা গৃহস্থ এবং ভিক্ষু। দেশস্থদের মধ্যে যারা চিরাচরিত পন্থায় বিশ্বাসী তাদের মধ্যে যারা বেদচর্চা করে তারা বৈদিক, যারা ধর্মশাস্ত্র চর্চা করে তারা শাস্ত্রী, যারা জ্যোতিষচর্চা করে তারা জ্যোতিষী বা যোশী, যারা চিকিৎসাবৃত্তির অনুসারী তারা বৈদ্য এবং যারা পুরাণ পাঠ করে তারা পৌরাণিক। দেশস্থরা ঋক ও কৃষ্ণযজুর্বেদের অনুসারী। তবে অধিকাংশই শৈব। যারা বৈষ্ণব তারা প্রধানত মধ্বপন্থী। কর্ণাটকেও দেশস্থ ব্রাহ্মণদের বসতি আছে। কোংকনী ব্রাহ্মণরাও রীতিমত প্রতিপত্তিশালী এবং তারা চিৎপাবন নামে পরিচিত। কোংকনীদের দুটি শাখা, নির্বাণবর এবং কেলেসকর। চিৎপাবন নামটি সম্ভবত রত্নগিরি জেলার চিপলুন থেকে এসেছে। যজুর্বেদীরা দুটি শাখায় বিভক্ত, নির্বাণবর এবং মাধ্যন্দিন। করহাদে ব্রাহ্মণদের নামকরণ কৃষ্ণা ও কোইনা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত করহাদ নগর থেকে হয়েছে। করহাদে ব্রাহ্মণরা উগ্র শাক্তমতাবলম্বী। শেনাবি ব্রাহ্মণরা পাঞ্জাবের সারস্বত ব্রাহ্মণদের শাখা বলে কথিত। তাদের মোটামুটি কোংকন, গোয়া ও বোম্বাই অঞ্চলে পাওয়া যায়। উচ্চশ্রেণীর এই পাঁচ ধরনের ব্রাহ্মণ ছাড়া নিম্ন ধরনের নানা শ্রেণীর ব্রাহ্মণ মহারাষ্ট্রে দেখা যায়। এই সকল ব্রাহ্মণদের মধ্যে দেব-রুকেরা কৃষিজীবী। তাদের সঙ্গে দেশস্থরা একত্রে ভোজন করলেও কোংকনীরা করে না। সাবাশেরা বাণিজ্যজীবী এবং মহারাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের বাসিন্দা। কিবস্তরা কৃষিজীবী এবং কোংকন অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। যাজক ব্রাহ্মণরা দুই শ্রেণীর, পলাশে এবং আভীর, প্রথমোক্তরা শূদ্রদের পুরোহিত, শেষোক্তরা আহির গোয়ালাদের। কৃষিজীবী ব্রাহ্মণদের আরও তিনটি গোষ্ঠীর নাম পুনা খান্দেশ অঞ্চলের কাস্তা, কৃষ্ণার তীরবর্তী অঞ্চলের ত্রিগুলো এবং বাসিন অঞ্চলের

সোপারা। কোংকন অঞ্চলে জাবাল ব্রাহ্মণরা নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ হিসাবে পরিচিত।

কর্ণাটকী ব্রাহ্মণদের বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন অঞ্চলের নামানুসারে গড়ে উঠেছে। বাব্বুরু-কাম্মে, কন্নড়-কাম্মে ও উমেচ-কাম্মে ব্রাহ্মণদের আদি নিবাস মহীশূরের পূর্বস্থ কাম্মে অঞ্চল। হাসনিকা ব্রাহ্মণরা হাসন জেলা থেকে উদ্ভূত। আরবত্তা ব্রাহ্মণরা কর্ণাটকের নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে যারা প্রধানত মধ্বপন্থী। বদুগনাড়ু ও সিরনাড়ু কর্ণাটকের দুটি প্রাচীন জেলার নাম যা থেকে ওই নামের ব্রাহ্মণরা পরিচিত হয়েছে। হবিক বা হাইগা ব্রাহ্মণদের বিশেষ এলাকা শিমোগা তালুক, যাদের নামকরণ হব্য বা যজ্ঞীয় ঘৃত থেকে হলেও যারা পেশায় প্রধানত সুপারী-চাষী। উত্তর কানাড়া অঞ্চলের হবু ব্রাহ্মণরা সাধারণত মন্দিরের পুরোহিতবৃত্তি ও জ্যোতিষশাস্ত্রের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। হালে-কর্ণাটক নামে একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ প্রচুর সংখ্যায় কর্ণাটকে পাওয়া যায় তবে তারা নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ হিসাবে পরিগণিত।

অন্ধ্র অঞ্চলের ব্রাহ্মণরা তিনটি বৃহৎ শ্রেণীতে বিভক্ত – শ্রীবৈষ্ণব, মাধ্ব এবং স্মার্ত। শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণরা রামানুজ পন্থী এবং তারা দ্রাবিড় দেশ থেকে আগত। তাদের দুটি উপসম্প্রদায় বড়কলই ও তেনকলই। প্রথমোক্তরা ব্রাহ্মণ্যবাদের সমর্থক, শেষোক্তরা বিরোধী। ঘটনাচক্রে দুটি সম্প্রদায়েরই জাতিতে রূপান্তর ঘটেছে, এবং উভয় সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণরা তাদের ব্রাহ্মণ্য পরিচয়ের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছে। মধ্বপন্থীরা মুখ্যত ধর্মীয় সম্প্রদায় হলেও অন্ধ্র অঞ্চলে পুরোদস্তুর মাধ্ব ব্রাহ্মণ জাতিতে পর্যবসিত হয়েছে। স্মার্ত ব্রাহ্মণরাই বরাবরের ব্রাহ্মণ যাদের দুটি মূল শাখা, বৈদিক ও নিয়োগী। বৈদিক শাখার সাতটি উপশাখার মধ্যে বেলনাড়ুরা গোদাবরী ও কৃষ্ণা জেলায় প্রতিষ্ঠিত। বেঙ্গিনাড়ুরা, বেঙ্গিদেশ অর্থাৎ ভিজাগাপত্তম ও গোদাবরী জেলার, কোসল-নাড়ুরা দক্ষিণ কোসলের (উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর অন্ধ্রের কিয়দংশ) মুলকি বা মুলকনাড়ুরা কৃষ্ণার দক্ষিণাঞ্চলের এবং তেলেগনাড়ুরা তেলেঙ্গনার। প্রতিটি নামই কোন না কোন অঞ্চল অবলম্বনে গড়ে উঠেছে। বৈদিক উপশাখার অপর দুটি হল যাজ্ঞবল্ক্য-বৈদিক এবং কানাড়া-কাম্মা-বৈদিক। প্রথমোক্তরা দুই শাখায় বিভক্ত, কান্ব এবং মাধ্যন্দিন, এবং যজুর্বেদী। শেষোক্তরা আসলে কর্ণাটক থেকে এসে অন্ধ্রের স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছে। নিয়োগী-ব্রাহ্মণদের পাঁচটি উপশাখা যথা আরবেলু-বারু, তেলেঙ্গানা-নিয়োগী, নন্দবারিক-নিয়োগী, পকুল-মত্তি-নিয়োগী, যাজ্ঞবল্ক্য-নিয়োগী এবং কর্ণাটক-কাম্মা-নিয়োগী। নিয়োগী

নিযুক্ত অর্থে প্রযুক্ত, এবং নানা বৃত্তিতে তারা নিযুক্ত। বৈদিকদের তুলনায় নিয়োগীদের স্থান নিম্নে। অন্ধ্র-কর্ণাটকের আরাধ্য ব্রাহ্মণরা অর্ধদীক্ষিত লিঙ্গায়ৎ, যারা গায়ত্রীমন্ত্রপাঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য রীতি অনুসরণ করে, তবে সৎ-ব্রাহ্মণ হিসাবে তাদের স্বীকৃতি নেই।

তামিলনাড়ুর ব্রাহ্মণরা দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ হিসাবে পরিচিত। স্মার্ত-দ্রাবিড় ব্রাহ্মণদের চারটি শাখা—ওয়ার্মা, বৃহৎচরণ, অষ্টসহস্র এবং সংকেত। এরা সকলে কপালে জাতিগত চিহ্ন ধারণ করে। তাঞ্জোর ও তার আশেপাশের এলাকায় ওয়ার্মাদের বিশেষ প্রতিপত্তি লক্ষ্য করা যায়। তারা চোল, ওয়ার্মা, সাবায়ার, জবালি ও ঈয়াপ্পি এই পাঁচটি উপশাখায় বিভক্ত। বাকি চারটি শাখা তামিলনাড়ুর নানাস্থানে ছড়িয়ে আছে। দক্ষিণ কানাড়া ও কুর্গ জেলায় কোল ঘেঁসা তুলব অঞ্চল থেকে তুলব ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি। তাদের চারটি শাখা—শিওয়ালি, পঞ্চগ্রামদবুরু, কোটা এবং কন্দবরু। কুর্গ অঞ্চলে অম-কোদাগা বা কাবেরি ব্রাহ্মণ নামে একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ পাওয়া যায়। মালাবার উপকূলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্রাহ্মণশ্রেণী নাম্বুদিরি নামে পরিচিত। নাম্বুদিরি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অন্য কোন এলাকার ব্রাহ্মণদের রীতিনীতির মিল নেই যদিও তারা পরশুরামের বংশধরত্ব দাবি করে এবং যদিও শঙ্করাচার্য এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলে কথিত আছে। নাম্বুদিরি পরিবারে সর্বজ্যেষ্ঠ সন্তানই সম্পত্তির অধিকারী হয়, এবং স্বজাতিতে বিবাহ করার অধিকার একমাত্র তারই। তার পরবর্তী ভাইরা নায়ার প্রভৃতি জাতিতে বিবাহ করে। তারা ভয়ানকভাবে নিরামিষাশী এবং মাথার সম্মুখ দিকে শিখা রাখে। তারা সর্বদাই একটি বৃহৎ ছত্র বহন করে। মালাবার অঞ্চলের বৈদেশিক ব্রাহ্মণরা পট্টারা নামে পরিচিত। ওই অঞ্চলের অম্বলবাসীরা মন্দিরের কাজকর্ম করে এবং তারা নাম্বুদিরিদের অধঃপতিত বংশধর বলে পরিচিত।

২ ॥ প্রায়-ব্রাহ্মণ, নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও পতিত ব্রাহ্মণ

আপদকালে এবং বাস্তব কারণে কোন ব্রাহ্মণ যদি শাস্ত্র নির্দিষ্ট ব্রাহ্মণের পক্ষে গ্রহণযোগ্য বিশুদ্ধ বৃত্তিসমূহে অপারগ হয় তাহলে সে যে-কোন বৃত্তি অবলম্বন করতে পারে এ-নির্দেশ ধর্মশাস্ত্রসমূহে দেওয়া আছে, কেননা ব্রাহ্মণ সন্তান হলেই কোন ব্যক্তি জ্ঞানী বা শিক্ষিত হবে এটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আশা করা যায় না। কিন্তু আইনগত স্বীকৃতি থাকলেও বিশুদ্ধ বৃত্তিসমূহ ছাড়া ব্রাহ্মণের পক্ষে অন্যান্য বৃত্তি অবলম্বন করা কোনদিনই সুনজরে দেখা হয়নি।

অন্য বৃত্তিধারী ব্রাহ্মণের মর্যাদা স্থান-কাল-পরিবেশ ভেদে ওঠানামা করেছে। যে-সব অঞ্চলে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সংখ্যা বেশি এবং ক্ষমতাও বেশি সে-সব অঞ্চলে কৃষিজীবী বা অনুরূপ বৃত্তিধারী ব্রাহ্মণদের খুবই নীচু চোখে দেখা হয়, আবার যে-সব অঞ্চলে শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণ কম সেখানে অন্যাবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণরা তেমন ছোট নয়। আমরা আগেই দেখেছি যে হরিয়ানা অঞ্চলে যে সব ব্রাহ্মণকে তাগা-গৌড় বলা হয় বা দক্ষিণ মারাঠা দেশের ত্রিগুলা, বাসিন অঞ্চলের সোপারা, গুজরাতের সাকোদ্রা ও ভাতেলা, উড়িষ্যার মহাস্থানী প্রভৃতি ব্রাহ্মণরা কৃষি-জীবীর বৃত্তি অবলম্বনের ফলে নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয়। কোংকন অঞ্চলের জাবাল, গুজরাতের সাচোরা প্রভৃতি ব্রাহ্মণরা রাঁধুনির কাজ করে বলে নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলে পরিগণিত হয়।

এমনকি ধর্মকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্রাহ্মণদেরও অনেকে নিম্নশ্রেনীর ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয়। যে সকল ব্রাহ্মণরা নিম্নবর্ণের জাতিসমূহের কাছ থেকে দান গ্রহন করে, নিম্নবর্ণের জাতিসমূহের পৌরোহিত্য করে, এমনকি বিধিসংগত দানও (বিশেষ করে শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক কাজের ক্ষেত্রে) গ্রহণ করে তারাও নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয়। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে উত্তরভারতের মহাব্রাহ্মণ ('মহা' উপাধিটি অবশ্যই ব্যঙ্গার্থে), বঙ্গদেশের অগ্রদানী ব্রাহ্মণ, উড়িষ্যার অগ্রভিক্ষু, পশ্চিমভারতের আচার্য প্রভৃতিরা উল্লেখযোগ্য কেননা এরা মৃতের পাপশুদ্ধির জন্য দান গ্রহণ করে। কাশীর সবালখি ব্রাহ্মণরা তীর্থ-যাত্রীদের কাছ থেকে দান নেয় বলে তারা পতিত হিসাবে গণ্য এবং অন্য ব্রাহ্মণদের কাছে তারা জলচল নয়। উত্তরপ্রদেশের ভট্ট ব্রাহ্মণরা গোহত্যা প্রভৃতি পাপের প্রায়শ্চিত্তের ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করে। সেইজন্য তারা পতিত। যে সকল ব্রাহ্মণরা শ্মশানে দাহকার্যের আগে মন্ত্রপাঠ করে তারাও অতি নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ হিসাবে গণ্য। রাজস্থানের ডাকোট ও শনিচর ব্রাহ্মণরা শনিপূজায় পৌরোহিত্য করার জন্য পতিত হিসাবে পরিচিত। যারা বিখ্যাত মন্দিরসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাদেরও অধঃপতিত ও নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলে গণ্য করা হয়, যেমন গয়ার গয়ালি, মথুরার চৌবে, পুস্করের পুকরসেবক, কাশীর গঙ্গাপুত্র, দক্ষিণ ভারতের পান্দারাম ও মোয়লার, প্রয়াগের প্রয়াগওয়ালা, পশ্চিম ভারতের দিওয়াস, মালাবার অঞ্চলের অম্বলবাসী, কর্ণাটকের নাম্বি-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি। এদের মধ্যে সোমনাথের সোমপারাদের স্থান অপেক্ষাকৃত উচ্চে।

যে সব ব্রাহ্মণ শূদ্র ও নিম্নজাতির পৌরোহিত্য করে তাদের বর্ণ-ব্রাহ্মণ বলা হয়। বলাই বাহুল্য এই সব ব্রাহ্মণকে নীচজাতীয় বলে গণ্য করা হয়।

বঙ্গদেশের সোনারবেনেদের ব্রাহ্মণ, গোয়ালাদের ব্রাহ্মণ, কলুদের ব্রাহ্মণ, রজকদের ব্রাহ্মণ, বাগদিদের ব্রাহ্মণ এবং কৈবর্তদের ব্রাহ্মণ এই পর্যায়ভুক্ত। মিথিলায় এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা তাতোয়া ব্রাহ্মণ, তেলি-ব্রাহ্মণ, কামার-ব্রাহ্মণ ও সোনার-ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। গুজরাত ও রাজস্থানের বর্ণ-ব্রাহ্মণদের মধ্যে আভীর ব্রাহ্মণ, কুনবি-গৌড়, গুজর-গৌড়, মুচি-গৌড়, গন্ধর্প-গৌড়, কোলি-গৌড় ও গারুদ্য উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ ভারতের বর্ণ-ব্রাহ্মণদের মধ্যে গন্দ-দ্রাবিড়, নাম্বি-ভলু, এলেদু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত ব্রাহ্মণরা নায়ারদের পুরোহিত।

এ ছাড়া যে সব ব্রাহ্মণরা অন্য জাতির সংস্পর্শে এসে আচারভ্রষ্ট হয়েছে তারাও পতিত শ্রেণীর, যেমন আহমদনগর এলাকার হোসাইনি বা সিন্ধুর কুবচন্দ। এরা কিছু কিছু ইসলামীয় রীতিনীতি মেনে চলার জন্য পতিত। আবার বঙ্গদেশের পিরালী ব্রাহ্মণদের ব্যাপারটি ভিন্ন ধরনের। তারা নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও নবাবী আমলে মুসলমানদের সঙ্গে ওঠাবসা করার দরুন কিছুটা নিন্দিত। পিরালীদের সঙ্গে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণরা বিবাহাদি সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করে, তবে তাদের ঘরে বিবাহ দিলে পণের মাত্রাটা বেশি হয়।

আরও কয়েকটি জাতি আছে যারা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে দাবি করলেও, বা লোকচক্ষে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকৃত হলেও, ব্রাহ্মণ নয়। এই সকল জাতির মধ্যে বিহারের ভূমিহাররা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা ভূম্যধিকারী শ্রেণীর মানুষ এবং নিজেদের ব্রাহ্মণ-পিতা ও ক্ষত্রিয়-মাতার অনুলোমজ বলে দাবি করে। ভূমিহাররা ব্রাহ্মণ্য রীতিনীতি নিষ্ঠাভরে মেনে চলে। ঐতিহাসিক-ভাবে বলতে গেলে ভূমিহাররা বর্তমানে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতি হলেও, পূর্বে এরা নানা জাতীয় ছিল যাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ দুইই ছিল। আসলে ভূম্যধিকারী শ্রেণীভুক্ত হবার জন্য পূর্বে জমিদারদের বিভিন্ন জাতি একই ধরনের সামাজিক রীতিনীতিতে অভ্যস্ত হবার দরুন তাদের একটি স্বতন্ত্র সত্তার প্রকাশ দেখা যায়। ভূমিহারদের একটা অংশ বরাবরই ব্রাহ্মণ ছিল কেননা রাজারা সচরাচর ব্রাহ্মণদের ভূমি দান করতেন। রাজস্থানের ভাট ও চারণরাও ব্রাহ্মণত্বের দাবিদার এবং তারা উপবীত ধারণ করে। কিন্তু তারা ব্রাহ্মণ বলে গণ্য নয়। ভারতের অন্যান্য স্থানে ভাটরা নিম্নজাতীয় হিসাবে পরিচিত।

৩ ॥ শস্ত্রজীবীদের রূপান্তর

পেশায় যারা শস্ত্রজীবী জাতি ভারতীয় বর্ণব্যবস্থায় তাদের ক্ষত্রিয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু শাস্ত্রনির্দিষ্ট পেশার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের যে সমস্যা সেই

একই সমস্যার সম্মুখীন ক্ষত্রিয়দেরও হতে হয়েছিল। সকল ব্রাহ্মসন্তান যেমন শাস্ত্রজ্ঞ হয় না, সকল ক্ষত্রিয়সন্তানও সমান তাগড়াই হয় না, ধনুর্বিদ্যা বা অসিচালনার দক্ষতা সকলেই অর্জন করতে পারে না। তাই ধর্মশাস্ত্রসমূহে ব্রাহ্মণদের মত ক্ষত্রিয়দেরও নানা বৃত্তি গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া সকল শস্ত্রজীবীই ক্ষত্রিয় ছিল না। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে সৈন্যবাহিনীতে বিভিন্ন শূদ্রজাতির অবাধ অধিকার আছে। আমরা এই কারণেই ক্ষত্রিয়ের পরিবর্তে শস্ত্রজীবী শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী।

শস্ত্রজীবী বলে যে-সব জাতি সচরাচর পরিচিত তারা সকলেই আসলে বার্তাজীবী অর্থাৎ কৃষি-শিল্প বাণিজ্য ইত্যাদি নানা বৃত্তি সম্পন্ন। এমন কি পূর্বে যারা প্রত্যক্ষভাবে সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত থাকত তারাও যুদ্ধ ছাড়া অন্য সময়ে ভিন্ন জীবিকা অবলম্বন করত। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাস্তব কারণেই নিয়মিত বেতনভোগী বিরাট সৈন্যবাহিনী পোষণ করা রাজাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যুদ্ধকালে অধীনস্থ রাজারা ও ভূম্যধিকারীরা যুদ্ধার্থে লোকের যোগান দিতেন। কাজেই শস্ত্রজীবীদের মধ্যে অসামরিক বৃত্তির ব্যাপক চল দেখা যায়, যেগুলির মধ্যে বলাই বাহুল্য কৃষিই প্রধান।

শস্ত্রজীবী জাতিদের মধ্যে রাজপুতদের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। রাজপুতেরা বর্তমানে পেশায় মুখ্যত ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবী এবং ভারতের সব অঞ্চলেই তাদের পাওয়া যায়। তাদের তিনটি মূল বিভাগ—সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নিকুল—এবং ছত্রিশটি শাখার কথা আগেই বলা হয়েছে। বিভিন্ন শাখার মধ্যে অনুলোম-প্রতিলোম বিবাহ চলে। খাদ্যাখাদ্যের ব্যাপারে বিভিন্ন শাখা ও বংশের মধ্যে অনেক নিয়মকানুন আছে, কথায় বলে বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি। রাজস্থান ছাড়াও রাজপুতেরা বিশেষ করে উত্তরভারতের নানাস্থানে ছড়িয়ে আছে। এরা যে সকলেই আসল রাজপুত তা নয়। স্থানীয় ভূম্যধিকারী বা জমিদাররা রাজপুতদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে নিজেদের রাজপুত বলে পরিচিত করে, যাতে অধিকতর সামাজিক মর্যাদা পাওয়া যায়। রাজপুতদের মধ্যে অনভিজাত-অভিজাতভেদ মূলত নির্ভর করে লাঙল ধারণের উপর। অভিজাত রাজপুতেরা লাঙল স্পর্শ করে না।

রাজপুতদের তুলনায় ক্ষত্রি বা ক্ষেত্রিরা মর্যাদায় ছোট। মনুর মতে ক্ষত্রিরা শূদ্র পিতা ও ক্ষত্রিয় মাতার প্রতিলোমজ সংকর জাতি। ক্ষত্রিরা কৃষি ও বাণিজ্যজীবী যাদের উত্তর ভারতের নানাস্থানেই দেখা যায়। তাদের চারটি বিভাগ—বনজাই, শিরীন, কুক্কুর এবং রোরহা বা অরোরা। শিরীনদের

সাতাশটি শাখা, প্রধানত পাঞ্জাব অঞ্চলে সীমাবদ্ধ যেগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধ ভাজে, তিহান সোদি, বেদি প্রভৃতি। শিরীনরা কৃষিজীবী। বনজাইরা বাণিজ্যজীবী যারা কয়েকটি শাখায় বিভক্ত যথা আড়াই ঘর, চারঘর, ছজাতি এবং বারঘর। কুক্কুরদের এলাকা পেশোয়ার ও নওসেরা অঞ্চলে। অরোরাগণ পুরোদস্তুর বণিক এবং ক্ষত্রিদের অপরাপর শ্রেণী তাদের সংগে সামাজিক কর্ম করে না। নীচ পেশা গ্রহণ করার জন্য ক্ষত্রিদের একটি অধঃপতিত অংশ পুরিওয়াল নামে পরিচিত। তারা স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হয়েছে। নানক বনজাই-ক্ষত্রি ছিলেন। বিহারের সোনি-ক্ষত্রিরা স্বর্ণকারের কাজ করে। গুজরাতের ক্ষত্রিদের একটা বড় অংশ তন্তুবায়। বঙ্গদেশেও কিছু ক্ষত্রি আছে, পেশা কৃষিকাজ।

রাজপুত ও ক্ষত্রিদের মত জাঠরাও শস্ত্রজীবী থেকে রূপান্তরিত কৃষিজীবী যাদের এলাকা পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, কাশ্মীর ও সিন্ধু। পাঞ্জাবের শিখদের একটা বড় অংশ জাঠ জাতি থেকে এসেছে। জাঠেরা পুরোদস্তুর কৃষিজীবী। তারা ক্ষত্রিয়জ বলে নিজেদের দাবি করলেও উপবীত ধারণ করে না, এবং দ্বিজাতির আচরিত সংস্কার সমূহ অনুসরণ করে না। এই কারণে তারা সৎ শূদ্র হিসাবে পরিচিত।

উড়িষ্যার খন্দাইৎরাও পূর্বে শস্ত্রজীবী ছিল যাদের বিস্তৃতি বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলেও দেখা যায়। খন্দাইৎ শব্দটির অর্থ অসিচালক। তবে তারা কৃষিকেই বৃত্তি হিসাবে নেবার ফলে চাষা-খন্দাইৎ হিসাবে অধিকতর পরিচিত। ব্রাহ্মণরা তাদের পূজাপার্বণে পৌরোহিত্য করে এবং তাদের কাছ থেকে দান গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হয় না। ছোটনাগপুরের খন্দাইৎরা ছোট-খন্দাইৎ নামে পরিচিত। তারা কুক্কুটভক্ষণ করে ও মদ্যপান করে এবং সেই হেতু তারা অন্ত্যজ হিসাবে পরিগণিত।

মারাঠারা শস্ত্রজীবী হলেও হিন্দু ঐতিহ্যে তারা বরাবরই নিম্নজাতি হিসাবে পরিচিত। শিবাজী স্বাধীন মারাঠারাজ্য প্রতিষ্ঠা করার পর হিরণ্যগর্ভ মহাদান যজ্ঞ করে নিজেকে ক্ষত্রিয় বলে ঘোষণা করেন। মারাঠা রাজ্যের বিস্তৃতির ফলে মারাঠাদের মধ্যে ভূম্যধিকারী, জমিদার, ছোট ছোট রাজা, পদস্থ কর্মচারী ও অভিজাত শ্রেণী গড়ে ওঠে এবং বর্ণব্যবস্থায় একটা মর্যাদার স্থান পাবার জন্য তারা রাজপুতদের সংগে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে শুরু করে। যারা প্রত্যক্ষভাবে কৃষিতে নিযুক্ত তারা ব্যতিরেকে ভূম্যধিকারী ও পদস্থ মারাঠারা বিবাহকালে উপবীত ধারণ করতে শুরু করে। মারাঠা

জাতি অনেকগুলি শাখায় বিভক্ত যেগুলির মধ্যে সাতটি প্রধান—ভোঁসলে, মোহিতে, শিকে, আহিনরু, গুজর, নিম্বলকার ও ঘোরপুরে।

মালাবার অঞ্চলের নায়াররা শস্ত্রজীবী জাতি যারা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দেয়। তবে অন্যান্য শস্ত্রজীবীদের মত নায়াররাও কৃষিসহ নানা বৃত্তির উপর নির্ভরশীল। নায়ারদের ষোলটি শাখা যথা বালাইমা, কেরাথি, ইলাকর, স্রুভকর, পান্ড-মংগলম, তর্মিলপদম, পলিচম (নাম্বুদিরিদের ভৃত্য), শকুলার বা বেলকুদু (তেলি), পুলিকাই বা ওদম (কুম্ভকার), বেলথাদম বা এরিনকুলাই (রজক), পারিয়ারি বা বেলকথরা (নাপিত), আগতগর্ণাবার (শ্রমজীবী), ইয়েদাচাইরাই বা ইয়োরমা (গোপালক), কুলত বা বেলুর, ইরাবারি (বণিক) এবং উদাত্তু (নাবিক)। এগুলি কিন্তু ভিন্ন জাতিগত সত্তা অর্জন করেনি, একই জাতির অন্তর্গত পেশাদার গোষ্ঠী। নায়ারদের পরিবার ও সমাজব্যবস্থার সংগে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মৌলিক পার্থক্য আছে যে বিষয় নিয়ে অন্যত্র আলোচনা করা যায়।

দক্ষিণভারতে মারাবান এবং কাল্লানরা শস্ত্রজীবী জাতি হিসাবে একদা পরিচিত ছিল। পরে মারাবানরা কৃষিজীবীতে এবং কাল্লানরা চোরডাকাতে রূপান্তরিত হয়। মারাবানরা মাংস ভক্ষণ ও মদ্যপান করে যদিও তারা সংশূদ্র হিসাবে পরিগণিত এবং ব্রাহ্মণরা তাদের কাছ থেকে দান গ্রহণ করে। তাদের একটি অপকৃষ্ট শাখা অহমদিয়ান নামে পরিচিত, যদিও তাদের সংগে মারাবানদের বৈবাহিক সম্পর্কাদি চলে। কাল্লানরা ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে শৈব, কিন্তু তারা মুসলমানদের মত ছুন্নৎ প্রথা অনুসরণ করে।

উত্তরবঙ্গের পোলিয়া এবং কোচ এবং পশ্চিমবঙ্গের আগুরিরা শস্ত্রজীবী থেকে কৃষিজীবীতে রূপান্তরিত হয়েছে। আগুরিরা নিজেদের মনুস্মৃতিতে বর্ণিত (১০।৯) উগ্র বলে দাবি করে যারা ক্ষত্রিয় পুরুষ ও শূদ্রনারীর সংকর বলে কথিত। সে যাই হোক আগুরিরা সমৃদ্ধিশালী কৃষিজীবী। তারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, সুত ও জানা। উভয়ের মধ্যে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ। প্রথমোক্তরা বর্ধমানী, কাশীপুরী, চগ্রামী, বড়গ্রামী প্রভৃতি শাখায় বিভক্ত। নিম্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণরা আগুরিদের দান গ্রহণ করে। পূর্ববংগেও আগুরি আছে তবে তারা অধিকাংশই পেশায় মৎস্যজীবী। বর্ধমানের আগুরিদের মধ্যে কৌলিন্যপ্রথা বর্তমান।

৪ ॥ চিকিৎসক ও জ্যোতিষী

বঙ্গদেশে চিকিৎসাবৃত্তি একান্তভাবেই বৈদ্যজাতির একচেটিয়া। বঙ্গদেশের বৈদ্যরা ধর্মশাস্ত্র সমূহে বর্ণিত অম্বষ্ঠদের সঙ্গে নিজেদের অভিন্নতা ঘোষণা করে (যদিও দক্ষিণ-ভারতে অম্বষ্ঠরা নাপিত)। বঙ্গদেশের জাতি-কাঠামোয় ব্রাহ্মণদের পরেই বৈদ্যদের স্থান (যদিও এ-বিষয়ে কায়স্থদের আপত্তি আছে, এবং পত্রপত্রিকায় এই দুই জাতির মাতব্বর পণ্ডিতরা এই প্রসঙ্গের উপর দীর্ঘকাল বিতর্ক করেছেন এবং এখনও করেন), কেননা বৈদ্যরা উপবীত ধারণ করে, ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও আচার মেনে চলে এবং সর্বোপরি জাতিকাঠামোয় উচ্চস্থান লাভের যে বিশেষ যোগ্যতা, নিজেদের পেশার প্রয়োজনে সেই সংস্কৃতচর্চাও তারা করে থাকে। বৈদ্যদের তিনটি শাখা—রাঢ়ীয় বৈদ্য, বঙ্গজ বা বারেন্দ্র বৈদ্য এবং শ্রীহট্টী বৈদ্য। বৈদ্যজাতির মধ্যে অশিক্ষিতের পরিমাণ ভারতে যে-কোন জাতির চেয়ে কম। যে-কোন পরিবর্তনের ইসারা বৈদ্যরা খুব সহজেই বুঝতে পারে, এবং তার সঙ্গে নিজেদের সহজেই খাপ খাইয়ে নেয়, যে-কারণে বৈদ্যরা অন্যান্য জাতির তুলনায় আর্থিক দিক থেকেও সমৃদ্ধ। জাতি প্রসঙ্গে সাহেব ও বাঙালী লেখকেরা বৈদ্যদের ভয়ঙ্কর ধরনের 'ক্ল্যানিশ' বলে উল্লেখ করেছেন। আসামের বৈদ্যরা বেজ নামে পরিচিত।

জ্যোতিষ পেশাধারীরা সচরাচর নিম্ন বর্গের ব্রাহ্মণ হয়। আসাম ও উড়িষ্যায় তারা গণক ও নক্ষত্র-ব্রাহ্মণ হিসাবে পরিচিত। বঙ্গদেশে তারা আচার্য ব্রাহ্মণ, গ্রহ বিপ্র, দৈবজ্ঞ, গ্রহাচার্য ও গণক নামে পরিচিত, তবে ব্রাহ্মণ হিসাবে তারা নিম্ন মর্যাদার। তুলনায় আসামের গণকদের সামাজিক মর্যাদা বেশি। মহারাষ্ট্রের যোশীরা সদ্ব্রাহ্মণ বলেই গণ্য হয়।

৫ ॥ লেখক ও হিসাবরক্ষক

লেখক ও হিসাবরক্ষকরা সারা ভারতেই কায়স্থ হিসাবে পরিচিত। বঙ্গদেশের কায়স্থরা ছয় শ্রেণীর—দক্ষিণ-রাঢ়ী, উত্তর-রাঢ়ী, বঙ্গজ, বারেন্দ্র, শিলেটী এবং গোলাম। দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থরা পশ্চিমবঙ্গের, বিশেষ করে বর্ধমান বিভাগের নিম্নাঞ্চল উদ্ভূত এবং তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা কুলীন, মৌলিক বা আটঘরে, এবং বাহাত্তুরে। প্রত্যেকের নিজস্ব পদবী আছে। উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থরা পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ করে বর্ধমান বিভাগের উত্তরাঞ্চল থেকে উদ্ভূত, এবং তারাও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা কুলীন, সন্মৌলিক ও একপোয়া। বঙ্গজ ও বারেন্দ্র কায়স্থরা যথাক্রমে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গ থেকে

উদ্ভূত, এবং অন্যান্য কায়স্থদের মত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। শিলেটী কায়স্থরা শ্রীহট্ট অঞ্চলে এবং বর্তমানে আসামের কাছাড় জেলায় সীমাবদ্ধ। গোলাম-কায়স্থরা আসলে পতিত কায়স্থ, গৃহভৃত্যাদি প্রভৃতি নিম্নবৃত্তির অনুসারী, যাদের সঙ্গে অন্যান্য কায়স্থরা বৈবাহিক সম্পর্কাদি স্থাপন করে না।

বিহার ও উত্তর প্রদেশের লালা-কায়স্থরা বারোটি শ্রেণীতে বিভক্ত যথা শ্রাবস্ত (উত্তর প্রদেশের গোন্ডা জেলার), অম্বষ্ঠ (মুঙ্গের, পাটনা ও গয়া জেলার), করণ (উত্তর বিহার ও তিরহুত, পেশায় পাটোয়ারী বা গ্রাম্য হিসাবরক্ষক; উড়িষ্যার করণদের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য), শাক্যসেনী (এটাওয়া, এটাহ এবং ফতেপুর জেলার, তিনটি শাখা—আইল, দুসরি, খোরে), কুলশ্রেষ্ঠী (আগ্রা এবং এটাহ্ জেলার), ভটনগরী (রাজস্থানের ভটনগর থেকে উদ্ভব ; বিস্তৃতি সম্ভল ও মোরদাবাদ থেকে আগারোহা ও আজমীর পর্যন্ত, গোয়ালিয়রে কানুনগো এবং মথুরায় মহাবন হিসাবে পরিচিত ; জৌনপুর, ছাপরা ও মুঙ্গেরেও এদের পাওয়া যায়), মাথুরী (মথুরা অঞ্চলের), সূর্যধ্বজ (বালিয়া এবং গাজীপুর জেলার ; বিজনৌর জেলার সূর্যধ্বজরা ব্রাহ্মণ), বাল্মীকি (গুজরাত) আস্থানা (আগ্রা, বালিয়া ও গাজীপুর জেলার), নিগম (উনাও অঞ্চলের), গৌড় (পাঞ্জাব, হরিয়ানা ; ভটনগরীরা গৌড়দের শাখা হিসাবে পরিচিত)।

অন্ধ্রপ্রদেশে লেখালেখি ও হিসাবনিকাশের কাজ নিয়োগী ব্রাহ্মণরাই করে থাকে। তবে সেখানে কর্ণম নামক একটি জাতি আছে যারা কায়স্থদের কাছাকাছি যায়। তারা উপবীত ধারণ করে, কিন্তু শূদ্র হিসাবে গণ্য। কর্ণাটকে কনক্কন ও সনুভোগরা অন্ধ্রের কর্ণমদের সমতুল্য। তামিল অঞ্চলসমূহে বাদুগারা নিজেদের কায়স্থ বলে দাবি করে। কিন্তু বাদুগা কোন সুনির্দিষ্ট জাতি নয়, তেলুগু দেশ থেকে আগত শূদ্রদের সাধারণ নাম। বাদুগাদের পদবী সচরাচর নাইডু। তামিল দেশের বেল্লাররা উত্তর ভারতের কায়স্থদের সমতুল্য। বেল্লাররা দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত, মুদালায়র এবং পিল্লাই। প্রথমোক্তরা অধিকতর সামাজিক মর্যাদার অধিকারী। বেল্লাররা উপবীত ধারণ করে না। কিন্তু সৎ-শূদ্র হিসাবে পরিচিত, যাদের কাছ থেকে দান গ্রহণ করতে ব্রাহ্মণরা আপত্তি করে না।

মহারাষ্ট্রের প্রভুরা কায়স্থদের অনুরূপ হলেও উত্তরের কায়স্থদের থেকে তাদের মর্যদা বেশি। প্রভুরা নিজেদের ক্ষত্রিয়জ বলে, দ্বিজাতির সংস্কারসমূহ

অনুসরণ করে এবং উপবীত ধারণ করে। প্রভুদের কয়েকটি শ্রেণী আছে যেমন গুজরাত অঞ্চলের পটনি-প্রভু, মহারাষ্ট্রের চন্দ্রসেনী-প্রভু, গোয়ার দেশ-প্রভু প্রভৃতি।

আসামের কায়স্থরা অতিশয় প্রতিপত্তিশালী ও তারা উপবীত ধারণ করে। মূল সুরমা উপত্যকা অঞ্চল অসমীয়া কায়স্থদের মূলকেন্দ্র ছিল এবং পরে তারা আসামের নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। কায়স্থদের মত আসামের কলিতারাও মসীজীবী। উচ্চশ্রেণীর কলিতারা বরা-কলিতা নামে পরিচিত এবং তাদের মধ্যে কাকতী এবং চালিয়া পদবী বেশি প্রচলিত। কলিতারা ব্যবসাবাণিজ্য ও কৃষিকাজও করে থাকে। তারা সৎ-শূদ্র হিসাবে পরিগণিত এবং ব্রাহ্মণদের রান্নাঘরেও প্রবেশের অধিকারী। পঞ্চদশ শতক থেকে আসামে যে ভক্তি আন্দোলন শুরু হয়েছিল তাতে কলিতারা বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে এবং সেই হিসাবে ধর্মের ক্ষেত্রেও তারা বেশ উচ্চস্থানের অধিকারী।

৬ ॥ বাণিজ্যজীবী জাতিসমূহ

বাণিজ্যজীবী জাতিসমূহ প্রধানত বণিক বা বানিয়া হিসাবে পরিচিত। বণিকরা ছাড়াও আরও অনেক বাণিজ্যজীবী জাতি আছে। অনেক উৎপাদক জাতিও নিজেদের প্রস্তুত পণ্যের বাণিজ্য করে। আমরা আগেই দেখেছি যে বৈশ্য এবং বৌদ্ধ গ্রন্থে বর্ণিত গহপতি-কুটুম্বিকরা ছাড়াও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের বাণিজ্যের অধিকার ছিল। এছাড়া বাণিজ্য যাদের মূল কৌলিক বৃত্তি নয় তারাও যে বাণিজ্য করে না তা নয়, যা আমরা আগে দেখেছি। এখানে অবশ্য আমরা তাদেরই কথা বলছি যাদের কৌলিক বৃত্তি বাণিজ্য।

উত্তরভারতে অসংখ্য বণিক বা বানিয়া জাতি বর্তমান যাদের তালিকা নিম্নরূপ। আগরওয়াল (সমগ্র উত্তরভারতেই বর্তমান, ধর্মে বৈষ্ণব অথবা শৈব অথবা জৈন, আঠারোটি গোত্রে বিভক্ত, উদ্ভবকেন্দ্র সম্ভবত পাঞ্জাবের হিসার জেলার অগ্রহা), ওসওয়াল, শ্রীমাল ও শ্রী-শ্রীমাল (আসলে একই জাতি, ধর্মে বৈষ্ণব ও জৈন, মূল এলাকা রাজস্থান, কাজের এলাকা গুজরাত থেকে বঙ্গদেশ), খাণ্ডেলওয়াল (মূল এলাকা জয়পুর, ক্ষেত্র উত্তরপ্রদেশ, ধর্ম বৈষ্ণব অথবা জৈন), শ্রীমালী (মারওয়ারের অন্তর্গত শ্রীমাল বা ভিনাল নগরজাত, গুজরাত অঞ্চলেও শক্তিশালী, ধর্মে বৈষ্ণব অথবা জৈন), পল্লিওয়াল (আদি নিবাস মারবার, ধর্মে বৈষ্ণব অথবা জৈন, আগ্রা ও জৌনপুরে বিশেষ প্রাধান্য), পোরাওয়াল (গুজরাতে পোরবন্দর অঞ্চলের, উত্তরপ্রদেশে বিশেষ প্রাধান্য),

ভাটিয়া (রাজস্থান অঞ্চলের, গুজরাত ও উত্তরভারতের সর্বত্র এদের কাজ-কারবার), সাহেশ্রী (উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও বিহার, ধর্মে বৈষ্ণব অথবা জৈন), অগ্রহারী (কাশী ও সন্নিহিত অঞ্চল, আরা জেলায় বিশেষ বসতি, অনেকে শিখ ধর্মে দীক্ষিত), ধুনসর (হরিয়াণা ও উত্তরপ্রদেশ, বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী), উমর (আগ্রা থেকে গোরখপুর, কানপুরে বিশেষ বসতি, সৎ বৈশ্য বলে স্বীকৃত), রুস্তোগী (গঙ্গা-যমুনা-দোয়াব অঞ্চলের, উত্তরভারতের সর্বত্রই বর্তমান, বেশির ভাগই বল্লভাচারী বৈষ্ণব, তিনটি শাখা—আমেথি, ইন্দ্রপতি, মানহারিয়া), কাসরওয়ানি ও কাসনাধান (বান্দা, বস্তি ও বারাণসী জেলা, নামের উদ্ভব কাংস বা কাঁসা থেকে), লোহিয়া (উত্তরপ্রদেশ, নামের উদ্ভব লোহা থেকে, বৈষ্ণব অথবা জৈন) সোনি বা সোনিয়া (বঙ্গদেশের সুবর্ণবণিকদের উত্তরভারতীয় প্রতিরূপ), সুরসেনী (মথুরা অঞ্চলের বানিয়া), বড়সেনী (মথুরা ও সন্নিহিত জেলাসমূহ) বারানওয়াল (উত্তরপ্রদেশ ও বিহার), অযোধ্যাবাসী, জৈশোয়ার (উত্তরপ্রদেশের রায় বেরিলী জেলা), মাহোনিয়া (হমীরপুর জেলার মাহোবা শহরের), মাহুরিয়া (বিহার ও উত্তরপ্রদেশ), বৈশ, কঠ, বাওনিয়ার (বিহার), জামেয়া (এটাওয়া জেলা), লোহনা (সিন্ধুপ্রদেশ), কানু, রেওয়ারী (গুরগাঁও) প্রভৃতি।

গুজরাতের বানিয়াদের মধ্যে শ্রীমালী, ওসুসবাল, খাণ্ডেলবাল প্রভৃতি ছাড়াও নাগর, দিসাওয়াল, পোরাওয়াল, গুজর, মোধ, লাদ, ঝারোলা, সোরাঠিয়া, খাদাতিয়া, হারসোরা, কাপোলা, উরবালা, পাতোলিয়া, বায়াদা প্রভৃতি জাতি বর্তমান। ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে এদের অধিকাংশই হয় জৈন না হয় বল্লভাচারী বৈষ্ণব। বঙ্গদেশে চার ধরনের বণিক বা বানিয়া জাতি দেখা যায় যথা সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, কাংসবণিক এবং শংখবণিক। এদের মধ্যে সুবর্ণবণিকরাই সবচেয়ে বেশি উন্নত ও সমৃদ্ধ, যদিও মর্যাদার বিচারে অপর তিন জাতির তুলনায় নিম্নপর্যায়ের। সৎ-ব্রাহ্মণ সুবর্ণবণিকের কাছ থেকে জল গ্রহণ করে না। সুবর্ণবণিকেরা অধিকাংশই চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণব। পূর্ববঙ্গে সাহা উপাধিধারী বাণিজ্যজীবী জাতি বর্তমান যারা নিজেদের বৈশ্য বলে দাবি করে। উড়িষ্যায় দুধরনের বণিক দেখা যায়—সুবর্ণবণিক ও পুতাল-বণিক।

দক্ষিণের বাণিজ্যজীবী জাতিসমূহের মধ্যে চেট্টি, কোমতি, নাগর্ত ও লিঙ্গায়ৎ-বাণিজিগা উল্লেখযোগ্য। চেট্টি আসলে শ্রেষ্ঠী শব্দের তামিল রূপ। চেট্টিরা বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। তারা নিরামিষাশী এবং নিজেদের বৈশ্য বলে গণ্য করে। কোন কোন চেট্টি উপবীতও ধারণ করে। চেট্টিদের মধ্যে মাদ্রাজের

নাটকুত্তাই চেট্টিরা বিশেষ প্রসিদ্ধ। লিঙ্গায়ৎ-বাণিজিগারা কর্ণাটকের উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যজীবী জাতি। এরা আসলে লিঙ্গায়ৎ বা বীরশৈব সম্প্রদায়ের বণিক শাখা। অন্ধ্রপ্রদেশে কোমতিদের প্রাধান্য যারা নিজেদের বৈশ্য বলে গণ্য করে ও উপবীত ধারণ করে। কোমতিদের পাঁচটি শাখা—গাবদুরি, কলিঙ্গ, বেরি, বলজি ও নাগর।

৭ ॥ কারিগর ও অন্যান্য পেশাদার জাতি

যে-সকল কারিগর বা পেশাদার জাতি সৎ শূদ্র হিসাবে পরিচিত তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তন্তুবায়, মোদক, কৌলাল বা কুম্ভকার, কর্মকার, তৈলকার, গোপ, বারুই, মালী, নাপিত প্রভৃতি। সৎ-শূদ্রের একটি লক্ষণ হল এই যে তারা জলচল জাতি, অর্থাৎ তাদের আনীত জল পান করলে উচ্চবর্ণের লোকদের কোন দোষ হয় না। এই সকল জাতির নানা শাখা আছে বা এক বৃত্তির অনুসারী নানা জাতি আছে। সকলেই অবশ্য সৎ-শূদ্রের পর্যায়ে পড়ে না।

তন্তুবায়রা বঙ্গবিহারে তাঁতী, তাতোয়া, জোলা, কপালী ও যুগী, আসামে তাঁতী ও যুগী, উত্তরভারতে কোরি, জোলা বা জুলাহা ও বিপা, পশ্চিমভারতে কোষ্টি, সালি, খাত্রি, থাকেরদা, রাওয়ালিয়া ও দেবঙ্গ, এবং দক্ষিণভারতে কাই-কালার, সালি, পাটওয়া, তোগাতা, ডোম্ব প্রভৃতি জাতিতে বিভক্ত। বঙ্গদেশের তাঁতীরা নব-সায়ক গোষ্ঠীভুক্ত সৎ-শূদ্র এবং তারা বহু শাখায় বিভক্ত। বিহারের তাতোয়ারা তাদের মদ্যমাংসপ্রীতির দরুন সৎ-শূদ্র হিসাবে পরিগণিত হয় না। এ ছাড়া বিহারে অন্য পেশা থেকে আগত তাঁতীও আছে যেমন চামার-তাঁতী, কাহার-তাঁতী প্রভৃতি। এ ছাড়া বিহারের কিছু তাঁতীর আঞ্চলিক পরিচয় আছে যেমন তিরহুতিয়া তাঁতী, বৈশওয়ারা তাঁতী কনৌজিয়া তাঁতী প্রভৃতি। উত্তরভারতের কোরি এবং মহারাষ্ট্রের কোলি জাতির একাংশ তন্তুবায় বৃত্তিধারী। উড়িষ্যার তাঁতীদের তিনটি শাখা—গোলা, হংস ও মোতি হংস। মধ্যপ্রদেশের কোষ্টি এবং মাহাররা তন্তুবায় বৃত্তির অনুসারী কিন্তু তারা সৎ-শূদ্র নয়। গুজরাতের ক্ষৌত্রিয়রা অবশ্য সৎ শূদ্র পর্যায়ের তাঁতী। তামিল অঞ্চলের তাঁতীদের মধ্যে কাই-কালার, পাতনুলকরা প্রভৃতির সৎ-শূদ্র বলে গণ্য হয় না। যদিও সালিয়ার নামক অপর একটি তাঁতী সম্প্রদায় উপবীত ধারণ করে। কর্ণাটকে তন্তুবায় জাতিসমূহের মধ্যে দেবঙ্গ, তোগাতা, সালে বা সালিগা, বিলিমগ্গ, সেনিগা, পটভেগর, খাত্রি ও সৌরাষ্ট্রিক

উল্লেখযোগ্য, অন্ধ্রপ্রদেশে পওশালি, দেবঙ্গল বা দেয়ন্দ্র ও সালিয়ার। বঙ্গদেশ ও উত্তরভারতের জোলা বা জুলাহারা ইসলাম ধর্মাবলম্বী। আসাম ও বঙ্গদেশের যোগী বা যুগীরা প্রধানত তন্তুবায় এবং নাথধর্মাবলম্বী, যাদের বিস্তৃতি উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়।

মোদকরা ময়রা, হালুই, গুরিয়া প্রভৃতি জাতিনামে পরিচিত এবং নানা শাখায় বিভক্ত। গুরিয়াদের নামকরণ গুড় থেকে হয়েছে এবং তারা উড়িষ্যা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। পাঞ্জাব অঞ্চলে রোরা বা অরোরারা এবং কান্ডোরা মোদকের কাজ করে থাকে, দক্ষিণে ব্রাহ্মণ এবং কোমতি। কুম্ভকাররা গুজরাতে অতিশয় সৎ-শূদ্র অথচ উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যায় অসৎ-শূদ্ররূপে গণ্য হয়। লোহের কারিগররা বঙ্গদেশে কর্মকার বা কামার এবং উত্তরভারতে লোহার নামে পরিচিত। সোনার কারিগররা বঙ্গদেশে স্বর্ণকার বা স্যাকরা এবং উত্তরভারতে সোনার নামে পরিচিত। পাঞ্জাব অঞ্চলে তারা উপবীত ধারণ করে। দক্ষিণে কম্মল্লার বলে একটি জাতি আছে যারা একই সংগে ধাতু ও কাঠের কাজ করে, কর্ণাটকে যাদের বলা হয় পঞ্চবালা (পাঁচরকম কাজের জন্য) যাদের একটি শাখা অক্কসাল (অর্কশাল) বা আগাসালা যারা উত্তরের স্বর্ণকারদের অনুরূপ। মধ্যপ্রদেশে দুরকম স্বর্ণকার আছে সোনার এবং পঞ্চল্লার। অন্ধ্রপ্রদেশে পঞ্চনম-বরলু জাতির চারটি শাখা যথাক্রমে কনসালি (স্বর্ণকার), কামারি (কর্মকার), বাদরোঙ্গা (সূত্রধর), কানসারি (কাংস্যকার) নামে পরিচিত, আবার এই চারটি শাখার লোকই অপর একটি পঞ্চম পেশায় অভ্যস্ত যা হচ্ছে মূর্তিনির্মাণ ও খোদাই-এর কাজ। কাঠের কারিগররা বঙ্গদেশ ও উত্তরভারতে সুতার (ছুতার, সূত্রধর) ও বারুহি, মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমভারতে সুতার, দাক্ষিণাত্যে বাদিগা, পাঞ্জাবে তরুখন এবং রাজস্থানে খাতি হিসাবে পরিচিত। বঙ্গদেশে যারা কাঁসার কাজ করে তারা কংসবণিক ও কাঁসারি নামে পরিচিত, উত্তরভারতে কাসার ও থাথেরা এবং দক্ষিণে গোঞ্জগোরা ও কাঞ্চুগোরা নামে পরিচিত। শংখবণিক ও শাঁখারিদের প্রধান এলাকা বঙ্গদেশ। পরিচ্ছদনির্মাতারা দর্জি বা দির্জি নামে পরিচিত। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান ও দাক্ষিণাত্যে তারা সৎ-শূদ্র হিসাবে পরিচিত, বঙ্গদেশে তারা মুসলমান।

বঙ্গদেশ ও বিহারের শৌণ্ডিক বা শুঁড়ি ও উত্তরভারতের কালোয়াররা মদ্য প্রস্তুতকারক জাতি। কালোয়ারদের অনেকগুলি শাখা যথা বিয়াহুত, জৈশোয়ার বা অযোধ্যাবাসী, বানোধ্যা, খলসা, খোরিদাহ, দিশওয়ার প্রভৃতি।

মধ্যপ্রদেশের মাহাররা তাড়ি সংগ্রাহক। দক্ষিণের শানাব, ইল্লবার বা বিল্লবাররা তাড়ি-সংগ্রাহক। এছাড়া তিয়ান, ইদিগা, গোনলা, গামাল্লা, সিত্তিগাদু প্রভৃতি দক্ষিণের জাতিরাও ওই পেশায় নিযুক্ত। বিহারের পাশী এবং মহারাষ্ট্রের ভণ্ডারীরাও তাড়ি-সংগ্রাহক। তৈলকাররা উত্তরভারতে তেলি, কলু, ঘণ্ডি প্রভৃতি নামে এবং দক্ষিণে গণিগা, তেল-কুলু-বোর্লু, বণিকন প্রভৃতি নামে পরিচিত। বংগদেশের তেলিরা একাদশ, দ্বাদশ, বেতনা, তুষ-কোটা, সপ্তগ্রামী প্রভৃতি শাখায় বিভক্ত। কর্ণাটকে তেলিরা জোতিফন নামেও পরিচিত। লবণ উৎপাদকরা উত্তর ভারতে লুনিয়া বা নুনিয়া নামে পরিচিত। তাদের বিভিন্ন শাখা বেলদার ও কোরা নামে পরিচিত যারা সোরাও উৎপাদন করে। সোরা উৎপাদনকারী উত্তরভারতের অপরাপর জাতিদের মধ্যে রেহ্‌গর ও সোরাগর বিশেষ পরিচিত। তামিলদেশে উপ্পিলিয়ান, উপ্পর, উপলিগা প্রভৃতি জাতিরা লবণ প্রস্তুতকারক। চর্মকার জাতিরা উত্তরভারতে চামার, মুচি, বাম্বি, জাতিযা প্রভৃতি নামে এবং দক্ষিণে চাক্কিলিয়ন, মাদিগা প্রভৃতি নামে পরিচিত। মাদুর বা ঝুড়ি প্রস্তুতকারকরা বংগদেশে বাইতি, আসামে তুরি, উত্তর প্রদেশে বিন্দ, তামিল অঞ্চলে মেথাকোরান প্রভৃতি নামে পরিচিত। এছাড়া ডোম ও বাঁশফোড়রাও এই কাজ করে থাকে। নাপিতরা সৎ-শূদ্র হিসাবে পরিচিত। তারা অন্ধ্রপ্রদেশে মংগলি, উড়িষ্যায় ভাণ্ডারী, তামিল-নাড়ুতে অম্বট্টন, কর্ণাটকে নয়িন্দা এবং উত্তরভারতের নানাস্থানে নাই, নইন ও হাজাম নামে পরিচিত। রজকরা বংগদেশে ধোপা, উত্তরভাবতে ধোবি, মধ্যপ্রদেশে ওয়ার্থি এবং পন্ত, অন্ধ্রে চাকলি এবং দক্ষিণের অন্যত্র বউনান ও আগাসিয়া নামে পরিচিত।

৮ ॥ পশুপালক ও কৃষিজীবী

পশুপালক জাতিসমূহের মধ্যে উত্তর ও পশ্চিমভারতের আহির বা আভীররা সমধিক প্রসিদ্ধ। আভীর উপজাতির কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। আহিররা নন্দবংশ, যদুবংশ, ও গোয়ালবংশ এই তিন জাতিগত শাখায় বিভক্ত। রোহিলখণ্ড অঞ্চলের আহিররা অহর নামে পরিচিত। রাজস্থানের যদুবংশী ক্ষত্রিয়রা আসলে আহিরই। গুজররা পাঞ্জাব ও সিন্ধু অঞ্চলের প্রসিদ্ধ গোপালক জাতি। সিন্ধুতে গুজরদের একটি উপশাখা গোয়ার বলে পরিচিত। বঙ্গদেশের গোপালকরা গোয়ালা নামে পরিচিত। তাদের কয়েকটি শাখা আছে যথা পল্লব, বগ্রি বা উজাইনি, বারেন্দ্র, রাঢ়ী, মঘাই, গোদো প্রভৃতি।

উড়িষ্যার গোয়ালারা প্রধানত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা কৃশমৌত, মথুরাবংশী এবং গৌরবংশী। অন্ধ্রে গোয়ালারা গোল্লালু, কর্ণাটকে গোল্ল এবং তামিল অঞ্চলে মত্তু-এদিয়া নামে পরিচিত। গোল্লালুদের একটি শাখা যাথব (যাদব) নামে পরিচিত। গোল্লদের দুটি প্রধান শাখা উরু এবং কাদু। এছাড়া উত্তর ভারতের গাদারিয়া, মহারাষ্ট্রের দঙ্গর ও দক্ষিণের আত্তু-এদিয়ার জাতিবাও পশুপালক।

কৃষিজীবী জাতিসমূহের মধ্যে উত্তরভারতে কুর্মি এবং মহারাষ্ট্র ও মধ্য-প্রদেশের কুনবিরা মূলত একই। এদের নানা শাখার মধ্যে বিহারের ঘামেলা, কোচাইসা, সানসবার, চন্দিনী, বানোধিয়া, ফসর্ফাসিয়া ও জইসোয়ার, উত্তর প্রদেশের সাইথওয়ার, আথারিয়া, চুনোরবার, আকোরবার, পাটনাবার, কেওয়াৎ, রাওয়াৎ, জাদন, ভরতি, কাট্টিয়ার, গঙ্গওয়ারি, সিঙ্গরাওন, চাপোরিয়া, কনোজিয়া ঝুনিয়া ও ঘোরাচারা. মহারাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রদেশে জইসোয়ার, ঝারি, চৌরিয়া, মনোহাস, চারমাও, দেরিয়েসিয়া, সিংরোলো তিরোলা ও চন্দারিয়া উল্লেখযোগ্য। উত্তরভারতের অপরাপর কৃষিজীবী জাতির মধ্যে কোষেরি, মালি, কছি ও লোধা উল্লেখযোগ্য। কছিরা কনৌজিয়া, শাক্যসেনী, হরদিয়া, মুরাও, কচহুওয়ারা সাক্সেরিয়া প্রভৃতি উপশাখায় বিভক্ত। লোধাদের ছয়টি শাখা—পাটোরিয়া, মথুরিয়া, সংকলজারিয়া, লাখিয়া, খোরিয়া ও পানিয়া। বঙ্গদেশের কৃষি-জীবীরা প্রধানত কৈবর্ত, সদগোপ, কোচ এবং আগুরি এই চার শ্রেণীতে বিভক্ত। সদ্গোপদের মধ্যে কুলীন ও মৌলিক এই দুই ভাগ আছে, কুলীনরা আবার পূর্বকুলীয় ও উত্তরকুলীয় দুই শাখায় বিভক্ত। বঙ্গদেশ ও উত্তরভারতের পান-উৎপাদকরা বারুই ও তাম্বুলি নামে পরিচিত। পাঞ্জাব অঞ্চলে জাঠ, কম্বো, আরাইন, সৈনি, ঘিরথ, তাগু প্রভৃতি কৃষিজীবী জাতি বর্তমান। অন্ধ্র প্রদেশে তেলেগা, বেল্লামা-বারু, কাম্মা-বারু, রেড্ডি-বারু কাপু এবং নাগরা কৃষিজীবী জাতি। কর্ণাটকের কৃষিজীবী জাতিদের মধ্যে গঙ্গাধিকারা, কুঞ্চিতিগা, মোরাসু, রেড্ডি, হাল্লিকারা, দাস, হালু, মুসাকু, ভোকালিকা, হালায়া, হুক্তলু, মাম্নালু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তামিল অঞ্চলে কাবারাই, কাম্পিলিয়ান, বুমিয়া বা পুল্লি, ওড্ডার, উম্পারব, পাল্লান পাদেয়াৎচি, নাথমবদায়ান ও উরালিরা কৃষিজীবী। কাবারাইরা বালিগা এবং তোত্তিয়ার বা কম্বলত্তের এই দুই শাখায় বিভক্ত।

৯ ॥ মুসলমানদের মধ্যে জাতিবর্ণভেদ

তত্ত্বের দিক থেকে ইসলামধর্মে জাতিবর্ণের কোন স্থান নেই। তৎসত্ত্বেও ভারতীয় মুসলমান সমাজে জাতিপ্রথা প্রচলিত আছে। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রসমূহে জাতিপ্রথার গঠনগত কাঠামো ও উচ্চনীচ সোপানবিন্যাস যে রকম সুনির্দিষ্ট কাগজে কলমে সেরকম ব্যবস্থা মুসলমানদের মধ্যে না থাকলেও, বাস্তবে দুটিই বর্তমান। দ্বিতীয়ত, জাতিপ্রথার যেটা কার্যকারিতার দিক সেক্ষেত্রে হিন্দুর সঙ্গে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের বিশেষ পার্থক্য নেই। জাতিপ্রথার যা প্রাথমিক উপাদান অর্থাৎ বৃত্তিনির্ভর বিশেষ জনগোষ্ঠী এবং সেই গোষ্ঠীর মধ্যেই বিবাহাদি সামাজিক কাজকর্মের সীমাবদ্ধতা, হিন্দুদের মত মুসলমান সমাজেও সমভাবে বিদ্যমান। এর একটা প্রধান কারণ হল এদেশের মুসলমানদের সর্বাধিক অংশই হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত। কিন্তু ধর্মান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের পেশার বদল হয়নি। ধর্মান্তরিত হবার আগে তারা যে পেশার উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করত, এবং যে জাতির আশ্রয়ে ওই পেশার দক্ষতা, কলাকৌশলের গোপনীয়তা ও পেশাধারীর নিরাপত্তা রক্ষিত ছিল, ধর্মান্তরিত হবার পরেও সেই জাতির প্রয়োজন তাদের ফুরিয়ে যায়নি। এখানে যে কথাটা সর্বাগ্রে মনে রাখা দরকার যে যুগের পর যুগ ধরে ভারতের উৎপাদন ব্যবস্থা কার্যত অনড় ও অপরিবর্তনীয় ছিল, এমনকি আজও আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার প্রচলন হওয়া সত্ত্বেও চিরাচরিত উৎপাদন ব্যবস্থার সামান্যই পরিবর্তন হয়েছে, যে কারণে বৃত্তিনির্ভর জাতিপ্রথা আজও টিকে আছে।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাম্মদ ইয়াকুব আলি 'মুসলমানদের জাতিভেদ' নামক একটি পুস্তকে বঙ্গদেশের মুসলমান সমাজে জাতিপ্রথার সুন্দর আলোচনা করেছেন এবং মুসলমান জাতিসমূহের নিম্নোক্ত তালিকা প্রকাশ করেছেন— আবদাল, আজলাফ, আখুঞ্জি, বেদিয়া, বেহারা, বেলদার, ভাট-ভাটিয়া, চাটুয়া, চুরিহার, দফাদার, দাই, দর্জি, দেওয়ান, ধাওয়া, ধোবা, ধুনিয়া বা ধুনকার, ফকির, গাইন, হাজ্জাম, জোলা, কাগাজি, কালান, কান, কাসুবি, কসাই, কাজি, খাঁ, খোন্দকার, কলু, কুমার, কুঁজরা, লালবেগি, মাহিফেরুশ, মাহিমল, মাল্লা, মল্লিক, মশালচি, মেহতর, মীর, মীর্জা, মুচি, মোগল, নগার্চি, ননিয়া বা ননুয়া, নাস্যা, নাট, নিকারী, পাঠান, পাওয়াবিয়া, পীরকোদালী, রাসুয়া, সৈয়দ, শেখ, সোনার ও অন্যান্য জাতি যেগুলি হল আফগান, আশরাফ, বাকলি, বাখো, বাজি ভুঁইয়া, চৌধুরী, চুনারি, দফালি, গন্ডি, গোলাম, হালালখোর, হিজরা, হোসেনি, খরাদি, কোরেশি, লাহেরি, মাংটা, মেহানা,

মীরদেহ্, মিরিয়াসিন, মিঞা, নওমোসলেম, পাটোয়া প্রভৃতি। ইয়াকুব আলির মতে এই জাতিপ্রথা সম্পূর্ণভাবেই হিন্দুপ্রভাবের ফল। তিনি লিখেছেন, "আজকাল অনেক হিন্দুঘেঁষা অজ্ঞ মুসলমান কৃষি-শিল্প ব্যবসায়জীবী মুসলমানদের সহিত সমাজ করিতে নাসিকা কুঞ্চিত করেন, এবং হিন্দুর বর্ণভেদ প্রথার অনুকরণে ওই সকল মুসলমানের সহিত পানাহার করিতে বা একাসনে উপবেশন করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। কোন কোন স্থলে ইহাও পরিলক্ষিত হয় যে বংশাভিমানী মুসলমানগণ বিদ্যাশিক্ষার্থী মুসলমান ছাত্রদিগকে জায়গীর দান করিয়া কালক্রমে তাহাদিগকে চাষা, নিকারী, কলু বা জোলার সন্তান জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া আপনাপন বংশগৌরব বা শরাফত রক্ষা করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, যে আলেমগণ নবি করিমের খলিফা বলিয়া হাদিস-শরীফে বর্ণিত হইয়াছেন, সেই আলেমগণ কৃষি-শিল্প-ব্যবসায়জীবীর বংশসম্ভূত হওয়ায় তাহারা তাঁহাদের পশ্চাতে নামাজ পড়িতেও অসম্মত হয়।"

তবে বিষয়টি আরও একটু জটিল। ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদের সর্বাধিক অংশ ভারতীয় হলেও বহিরাগত নানা দেশের মুসলমানও এখানকার স্থায়ী মুসলিম বসতির একটি অংশ যারা নিজেদের পূর্ব নৃগোষ্টীগত ঐতিহ্য ও পরম্পরা সম্পর্কে প্রখরভাবে সচেতন। তারা নিজেদের নৃগোষ্ঠীর মধ্যেই বিবাহাদি করে এবং স্থানীয়দের সংগে তারা কোন রকম সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করে না। এই সকল নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব পেশাও আছে। ফলে কার্যত তারাও এক একটি জাতির ভূমিকাই পালন করে। এই সকল বহিরাগতদের মধ্যে আরব আছে, ইরাণীয় আছে, আফগান আছে, তুর্কী আছে, এমন কি চৈনিক ও তিব্বতীও আছে। দ্বিতীয়, যারা বিশুদ্ধ ভারতীয় তাদের মধ্যেও নৃগোষ্ঠীগত এবং ভাষাগত ব্যবধান আছে যেমন কাশ্মীরী মুসলমান, পাখতুন, পেশোয়ারী, তামিল, মালয়ালী, গুজরাতী, বাঙালী, কোংকনী, মোপলা বা মাপ্পিলা, নবায়ৎ, জাঠ, মেও প্রভৃতি। সম্প্রতি এম. এ. সিদ্দিকী শুধুমাত্র কলকাতা শহরে বসবাসকারী মুসলমানদের একটি জাতিগত সমীক্ষা প্রকাশ করেছেন যাতে দেখা যায় কলকাতায় বসবাসকারী পাঞ্জাবী মুসলমানরা সচরাচর রাজপুত হলে রাজপুতদের সঙ্গে এবং জাঠ হলে জাঠদের সঙ্গেই সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করে। এছাড়াও এখানে দুটি কোম-এ-পাঞ্জাবীয়ান আছে, একটি দিল্লীকেন্দ্রিক অপরটি আনওয়ালা নামে পরিচিত। কাশ্মীরীরাও এখানে অনেকগুলি পেশাদার জাতিতে বিভক্ত যারা জাতির বাইরে বিবাহাদি করেনা।

পেশোয়ার থেকে আগত, মুসলমানরা পাঁচটি গোষ্টীতে বিভক্ত যথা সৈয়দ, আওয়ান, কাকাজাই, বালাল (কোলাল বা কুম্ভকার) এবং কাশ্মীরী পেশোয়ারী (বাণিজ্যজীবী)। রাজস্থানী মুসলমানরা সাতটি জাতিতে বিভক্ত— শেখাওয়াতি (লাল-কুর্তা, নীলগর), সাদি (কালো-কুর্তা, নীলগর), মনিহার (চুড়িপ্রস্তুত কারক), সোনার (স্বর্ণকার), লোহার (কর্মকার), ধোবি (রজক) এবং বেসাতি (ফেরিওয়ালা ও ব্যবসায়ী)। গুজরাত থেকে আগত মুসলমানরা সকলেই বাণিজ্যজীবী এবং ছয়শ্রেণীর—দাউদী-ভোরা, ইমামী-ইসমাইলী-শিয়া, হালাই-মেমান, কচ্ছি-মেমান, সুন্নি-ভোরা এবং আথনা-আশারি ভোরা। দক্ষিণ থেকে আগতদের মধ্যে তামিলভাষী মারায়কর এবং রওথেররা বাণিজ্যজীবী ও লাব্বাইরা কৃষিজীবী এবং নিম্নবৃত্তি সম্পন্ন। মালয়ালীদের পাঁচটি জাতির পরিচয় পাওয়া যায় যথা থঙ্গল, মুসাল্লিয়র, মাপিল্লা, রওথের ও কেয়ী। এছাড়া আছে অসংখ্য বৃত্তিজীবী জাতি যারা জাতিকাঠামোর নিম্নতর সোপনাবলীতে অবস্থিত। এদের পরিচয় পরে দেওয়া হবে।

এছাড়া মুসলমানদের জাতিপ্রথার আরও একটি উৎস তত্ত্বগত সাম্প্রদায়িকতা। প্রাচীনপন্থী সুন্নিরা, চারটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত—হানাফী, সাফেয়ী, মালেকী এবং হানবালী। এই চার সম্প্রদায়ের পার্থক্য ধর্মতত্ত্বের দিক থেকে ততটা নয়, পার্থক্যটা মুসলিম আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর। হানাফীরা যেখানে আইনব্যাখ্যাতাদের স্বাভাবিক ঐক্যমতের উপর গুরুত্ব আরোপ করে, হানবালীরা সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত পোষণ করে যারা শাস্ত্রীয় নির্দেশ আক্ষরিকভাবে প্রয়োগের পক্ষপাতী। মালিকীদের মতে সুস্পষ্ট শাস্ত্রীয় নির্দেশ নেই এমন ক্ষেত্রে স্থানীয় ঐতিহ্য ও, পরম্পরাকে প্রাধান্য দেওয়া দরকার। পক্ষান্তরে সাফেয়ীরা বিশেষ বিধানসমূহের প্রকৃত উদ্দেশ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। নব্যপন্থী সুন্নীদের দুটি শাখা বারেলভি (বেরিলীর আহমদ রাজাখান কর্তৃক ব্যাখ্যাত ধর্মতত্ত্বে বিশ্বাসী) এবং দেওবন্দী (দেওবন্দের বিখ্যাত শিক্ষালয় ও তত্ত্বজিজ্ঞাসাকেন্দ্রের বক্তব্যসমূহের অনুগামী)। তবে সুন্নিদের এই বিভাগগুলির সঙ্গে কোন জাতিগত বা সামাজিক ভেদাভেদগত ব্যাপার নেই। কিন্তু সুন্নিদের সঙ্গে শিয়াদের পার্থক্য অনেক বেশি এবং তা জাতি পার্থক্যের কাছাকাছি যায়। শিয়ারা হজরত আলির অনুগামী এবং তাদেরও নানা শাখা আছে। একটি শাখার নাম ইমামী-ইসমাইলী। শেষোক্তদের দুটি গোষ্ঠী, ভোরা (বোহ্‌রা) এবং খোজা। ভোরারা তাদের ইমামদের পরম্পরার উৎস হিসাবে আল্ মুস্তালিকে গণ্য করে। পক্ষান্তরে খোজারা মনে

করে যে তাদের ইমাম-পরম্পরার উৎস মুস্তালির ভাই নিজার এবং তারা আগাখানকে জীবন্ত ইমাম মনে করে। দাউদী-ভোরারা অপর একটি শিযাপন্থী সম্প্রদায় যারা দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত, সুলেমানী (যারা সুলেমান-ইবন-হাসানের অনুগামী, মোটামুটি ভাবে গুজরাত ও মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা) এবং দাউদী (যারা দাউদ-ইবুন-আজব শাহুর অনুগামী)। অপব একটি সম্প্রদায় ইতনাসেরী যারা বারোজন ইমামের অস্তিত্ব স্বীকার করে যাদের শেষজন নবম শতকের মুহম্মদ-অল-মুন্তাজার। আহ্‌মদীযারা একটি আধুনিক সম্প্রদায়, যাদের একটি উপসম্প্রদায কাদিয়ানী নামে পরিচিত। এই উপসম্প্রদায়ের প্রবক্তা মীর্জা গোলাম আহ্‌মদ নিজেকে কৃষ্ণ এবং খ্রীষ্টের অবতার এবং মুহম্মদের পুনঃপ্রকাশ বলে দাবি করেন। আহ্‌ল-এ-হাদিশ ওহাবী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত একটি বিশুদ্ধিপন্থী সম্প্রদায। এছাড়া সুফি মতাবলম্বী নানা সম্প্রদায় আছে যেমন চিশতীয়া, নাকসবন্দীয়া, কাদিরীয়া, কালন্দরীয়া প্রভৃতি। এই সকল সম্প্রদায় একে অন্যের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে নানা বাধানিষেধ মেনে চলে।

জাতি অর্থে মুসলমান সমাজের দুটি প্রধান বিভাগ, আশরাফ ও আজলাফ। প্রথমটি উচ্চ শ্রেণী এবং দ্বিতীয়টি নিম্নশ্রেণী, বঙ্গদেশে আতরাফ নামেও পরিচিত। আশরাফরা চারটি জাতিতে বিভক্ত—সৈয়দ, শেখ, মুঘল ও পাঠান। পঞ্চম জাতি হিসাবে মুসলমান রাজপুতরাও নিজেদের আশরাফ শ্রেণীভুক্ত বলে মনে করে। আজলফ শ্রেণীতে নিম্ন মর্যাদার অসংখ্য জাতি বর্তমান, এবং পেশার গুরুত্ব অনুযায়ী জাতিকাঠামোয় তাদের মর্যাদার পার্থক্য সুনির্দিষ্ট। আজলাফ পর্যায়ের পেশাদার জাতিদের তালিকা নিম্নরূপ—মোমিন (তাঁতী) বা জুলহা (জোলা), রংকি-কালাল (চোলাই-কর), দর্জি, খরাদি (ছুতোর মিস্ত্রী), কাসব (কসাই), চিক (ছাগল ও ভেড়ার মাংসের কারবারী), রাই ও কাবারিয়া (সবজী বিক্রেতা), বেসাতি (ফেরিওয়ালা), বেহনা বা মনসুরি (ধুনুরী), চুরিহার বা মনিহার (চুড়ির প্রস্তুতকারক ও ব্যবসায়ী), নিকারী (মৎস্যজীবী), দফালি (বাদক ও বাদ্য-প্রস্তুতকারী), নাট বা নট (চামড়ার বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুতকারী, তৎসহ গানবাজনা ও ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শক), হাজ্জাম বা নাই (নাপিত), মিরশিকর বা চিরিমার (পাখি ধরা এবং পাখি বেচার কারবারী), কালন্দর (চুল-দাড়ি-গোঁফ, ভুরু কামানো কম্বলাবৃত ফকির), ফকির বা শাহ বা শাহ-ফকির (ভিক্ষোপজীবী এবং ভূমিশ্রমিক), পটুয়া (চিত্রকর), শেখজী বা ঘোষী এবং মেও (খাটাল-ওয়ালা ও দুগ্ধব্যবসায়ী), বাঞ্জারা (জিপসী), বেহেন-কাসব (মিশ্রজাতি,

কসাই ও ধুনুরী), ভাঙ্গি বা লালবেগি (ঝাড়ুদার, মেথর), ধোবি (রজক), গুজর (গোয়ালা), হালওয়াই (মিষ্টান্ন প্রস্তুত কারক), কাসগর (কুম্ভকার), নীলগর, লোহার (কর্মকার), শক্ত, মিরাশী (গায়ক), তেলি (তৈলকার), সোনার (স্বর্ণকার) প্রভৃতি।

আজলাফ পর্যায়ভুক্ত এই সকল পেশাদার জাতিদের প্রসঙ্গে জারিনা ভাট্টি-বলেন যে এদের পেশার শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থে দুটি মানদণ্ড বর্তমান। প্রথমটি হচ্ছে পবিত্রতা-অপবিত্রতা অথবা পরিচ্ছন্নতা-অপরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত সামাজিক ভাবে গৃহীত ধারণা যা পেশার বিষয়বস্তু বা যে ধরনের উপাদান পেশাধারীরা ব্যবহার করে সেগুলির উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয় মানদণ্ডটি হচ্ছে পেশাটি বাস্তব অর্থে আশরাফ শ্রেণীর কতটা কাছাকাছি। যেমন নটরা যার মৃত পশুর চামড়া দিয়ে বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত করে তারা অনিবার্য-ভাবেই জাতিকাঠামোর বেশ নীচু স্তরে অবস্থিত যেখানে জুলহা এবং দর্জিদের স্থান বেশ উপরে কেননা তাদের পেশা অনেক পরিচ্ছন্ন। পক্ষান্তরে ধোবিরা যারা ময়লা কাচে তারা তাদের পেশার প্রকৃতির দরুনই নটদের কাছাকাছি কিন্তু জুলহাদের অনেক নীচে। আবার মিরাশীদের স্থান আশরাফ-দের অনেক কাছাকাছি কেননা তারা গানবাজনা করে। নটরাও গানবাজনা করে কিন্তু তাদের গানবাজনা সর্বস্তরের লোকদের জন্য যে কারণে তারা নিম্ন পর্যায়ের। পক্ষান্তরে মিরাশীদের গানবাজনা নিছকই আশরাফ শ্রেণীর মানুষের চিত্তবিনোদনের জন্য যে কারণে তাদের স্থান উচ্চে। নটরা অশিক্ষিত এবং স্থানীয় ভাষায় কথা বলে। পক্ষান্তরে মিরাশীদের মধ্যে শিক্ষিত লোক আছে এবং তাদের ভাষা উর্দু। তারা নিজেরা আরবী ভাষায় প্রার্থনা উচ্চারণ করতে পারে, এবং আশরাফদের মত তাদের মেয়েরাও ঘারারা পরিধান করে।

সিদ্দিকী বলেন যে বাস্তবে শুধু যে আশরাফদের সঙ্গে আজলাফদের বিবাহাদি সামাজিক সম্পর্কস্থাপন নিষিদ্ধ তাই-ই নয়, আজলাফদের মধ্যেও বৃত্তিধারী গোষ্ঠীগুলির ক্ষেত্রে এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অপরগোষ্ঠীর বিবাহাদি সম্পর্কস্থাপন নিষিদ্ধ। মোমিনের ছেলের সঙ্গে মোমিনের মেয়ের বিবাহটাই স্বাভাবিক ও কাম্য। এমনকি বৃত্তির বদল ঘটে গেলেও বিবাহের সম্বন্ধের ক্ষেত্রে পূর্বপুরুষদের অনুসৃত বৃত্তিই বিবেচ্য। অসবর্ণ বিবাহ নিন্দার চোখেই দেখা হয় এবং এই বিবাহজাত সন্তানরা 'শুধ' বা বিশুদ্ধ হিসাবে গণ্য হয়না, 'বিসের' বা অপবিত্র হিসাবে গণ্য হয়। উচ্চবর্ণের ক্ষেত্রে অনুলোম প্রতিলোম বিবাহ আছে, যেমন সৈয়দ ও শেখদের মধ্যে। কিন্তু এক্ষেত্রে

বিবাহজাত সন্তান সৈয়দত্বের মর্যাদা পায়না, সৈয়দজাদা বা শেখজাদা নামে পরিচিত হয়, এবং তারা অনুরূপ সংকরদের সংগেই বিবাহাদিকর্ম সম্পন্ন করে। এই সংকররা 'বিরুরে' বা 'বিরুরাহে' নামে পরিচিত। এছাড়া প্রতিটি জাতির জাতপঞ্চায়েত আছে, বিশেষ করে পেশাদার জাতিদের ক্ষেত্রে। একমাত্র কলকাতাতেই কুরেশিদের বারোটি এবং রাইদের বাইশটি পঞ্চায়েত আছে যাদের নির্বাচিত নেতারা সর্দার বা চৌধুরি নামে পরিচিত, কার্যনির্বাহকেরা ছড়িদার। 'কোম', 'বেরাদরি', 'জাত' এবং 'জামাত' প্রভৃতি শব্দ সম্পূর্ণভাবেই 'জাতি অর্থে' ব্যবহৃত হয়। 'কোম' শব্দটি দিল্লী, পাঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে বেশি প্রচলিত। গুজরাতীরা 'জামাত' শব্দটি অধিক পরিমানে ব্যবহার করে। 'জাত' ও 'বেরাদরি' রাজস্থানীদের মধ্যে বহুপ্রচলিত। জন্মই হচ্ছে একটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হবার মাপকাঠি। কেউই সৈয়দ বা রাই বা কুরেশি বা মোমিন বা লালবেগি হতে পারেনা যদি না সে সেই কুলে জন্মায়। একত্র আহারের ক্ষেত্রেও কয়েকটি অলিখিত নিয়ম কার্যকর। প্রতিটি গোষ্ঠীরই উদ্ভবসংক্রান্ত কিছু কিম্বদন্তী আছে। এই গোষ্ঠীসমূহের ক্ষেত্রে চাতুর্বর্ণ ধরনের একটি কাঠামোর আভাস পাওয়া যায়। প্রথম ও সর্বোচ্চ স্তরে সৈয়দ প্রভৃতি বহিরাগত হিসাবে কথিত আশরাফ বা সম্ভ্রান্ত শ্রেণী এবং চতুর্থ বা সর্বনিম্নস্তরে নিম্নবৃত্তিধারীরা। এই ভেদটা সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে যে গোষ্ঠীগুলি বর্তমান তাদের সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে কোন ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত নেই। একে অপরের চেয়ে উঁচু বলে দাবি করে। পরীদের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন সুফী খানকুয়া বা সম্প্রদায় সৈয়দ এবং শেখদের সমমর্যাদার অধিকারী। জাতি-পঞ্চায়েতের অস্তিত্ব উপরের স্তরে নেই, মধ্যস্তরে অল্প এবং নীচের স্তরে প্রবল। লালবেগিদের পঞ্চায়েতগুলি তাদের সদস্যদের অপরাধীর বিচারও করে থাকে। বুলন্দশহরের নাই পঞ্চায়েত তাদের সদস্যদের কাজের গাফিলতির তদন্ত করে; দোষী প্রমাণিত হলে জাতিচ্যুতিই চরম দণ্ড হিসাবে বিবেচিত হয়। বান্দা জেলার মুসলমান চামার-গৌরদের মধ্যে যারা জাতিচ্যুত হয় তারা পুনরায় জাতিতে ফিরে আসার জন্য স্বজাতিদের আনুষ্ঠানিক ভোজে আপ্যায়িত করে।

নানা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক কারণে ভারতীয় মুসলমান সমাজে জাতিপ্রথার ধরনের প্রথা গড়ে উঠলেও হিন্দু ও ভারতীয় খ্রীষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত জাতিপ্রথার সংগে মুসলমান সমাজের জাতিপ্রথার কিছু গুণগত পার্থক্য আছে। হিন্দুর ক্ষেত্রে যেমন নিম্নপর্যায়ের জাতিসমূহের উপর

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের ব্যাপারে বাধা নিষেধ আছে, মুসলমান সমাজে তেমন কোন বাধানিষেধ নেই। একই কাতারে দাঁড়িয়ে আশরাফ ও আজলাফ উভয়েই প্রার্থনা করার অধিকারী, এমন কি প্রার্থনাকালে আজলাফ সামনের কাতারে দাঁড়ালেও কোন আপত্তি নেই, যেখানে কেরালার পুলায়া খ্রীষ্টান ও পারায়া খ্রীষ্টানদের জন্য গীর্জায় পৃথক প্রার্থনার আসন নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। দ্বিতীয়ত হিন্দুদের মধ্যে শূদ্রদের বেদাদি পাঠের অধিকার নেই, কিন্তু যে কোন জাতির মুসলমানই সমগ্র মুসলিম শাস্ত্র অধ্যয়নের অধিকারী, এমন কি তার মোল্লা হতেও আপত্তি নেই। তৃতীয়ত, জাতিপ্রথা ইসলাম শাস্ত্রসংগত নয় এবং এই প্রথাকে অনুমোদিত করে না। চতুর্থত, যদিও বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্বিবাহ বর্তমান, তার সংগে জাতিপ্রথার কার্যকারণ সম্পর্ক যেমন হিন্দুদের ক্ষেত্রে অনিবার্য, মুসলমানদের ক্ষেত্রে তা নয়। পঞ্চমত, মুসলমানদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের মত শাস্ত্রসংগত বিশুদ্ধ জাতি নেই। সৈয়দদের বংশ গৌরব থাকলেও, অথবা তারা শাস্ত্রজ্ঞানী হলেও, জাতিবিচারে তারা ব্রাহ্মণদের মুসলমান বিপরীত-সংখ্যা নয়। এই হিসাবে 'জাতিপ্রথা' নামক বিশেষ পরিভাষাটি মুসলমানদের সম্পর্কে কতদূর প্রযোজ্য হতে পারে তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। সমাজতত্ত্ববিদদের একাংশের মতে জাতিপ্রথা নামক বিশেষ পরিভাষাটি একমাত্র হিন্দুসমাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং সেই সব অহিন্দু সমাজের ক্ষেত্রে, যারা মোটামুটি হিন্দুসমাজের ছত্রতলে বাস করে। পক্ষান্তরে অপর একদল সমাজতত্ত্ববিদ মনে করেন জাতিপ্রথা একটা বিশেষ ধরনের সমাজকাঠামো যা নানা জটিল কার্যকারণ পরম্পরা-সূত্রে গ্রথিত যার সংগে কোন ধর্মব্যবস্থাকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়, যদিও কোন বিশেষ ধর্মব্যবস্থা ওই সমাজকাঠামোকে নৈতিকভাবে বা বাস্তবতার প্রয়োজনে সমর্থন করতে পারে, আবার নাও পারে।

মুসলমান জাতিপ্রথা ও সামাজিক স্তর বিন্যাসের উপর ইমতিয়াজ আহমদ কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থে বিভিন্ন লেখকদের রচনায় এই দ্বৈধীভাবের লক্ষণ দেখা যায়। তাঁরা বলেন জাতিপ্রথার যে প্রত্যক্ষ লক্ষণগুলির সংগে আমরা পরিচিত যেমন নিজস্ব গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্বিবাহ, বিশেষ গোষ্ঠীগত বৃত্তি, সমাজকাঠামোর মধ্যে বিশেষ মর্যাদার নানা উপস্তর এবং এক গোষ্ঠীর সংগে অন্য গোষ্ঠীর কয়েকটি বিশেষ ধরনের সম্পর্কস্থাপনের ক্ষেত্রে বাধা নিষেধ—সেই লক্ষণগুলিকে যেহেতু ভারতীয় মুসলমান সমাজের মধ্যে পাওয়া যায় সেই হেতু জাতিপ্রথা নামক পরিভাষাটিকে যদিও মুসলমান সমাজের

ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে কোন আপত্তি নেই, তথাপি এই লক্ষণগুলি কোন্ স্থানে, কোন্ সমাজে, কতটা মাত্রায়, বর্তমান সেটাকেও হিসাবের মধ্যে আনতে হবে, আর সেই সংগে এটাও ভুললে চলবে না যে ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে 'স্থানীয়তার' একটা বড় ভূমিকা আছে, একটা বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে জাতিপ্রথার লক্ষণগুলি যতটা সুপরিস্ফুট অপর অঞ্চলের ক্ষেত্রে ততটা নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের পাঠানদের মধ্যে উপজাতীয় গোষ্ঠীবিভাগ অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট হলেও তাদের মধ্যে জাতি-প্রথা গড়ে ওঠেনি, কিন্তু রাজস্থান ও হরিয়ানার মেওরা উপজাতীয় পশ্চাদপট সত্ত্বেও জন্মসূত্র, অন্তর্বিবাহ, পাল ও গোত্রব্যবস্থা, পেশাদারী ও সমাজ-কাঠামোয় মর্যাদার স্তরভেদ প্রভৃতি জাতিপ্রথার সকল লক্ষণই প্রকটিত করেছে। পক্ষান্তরে তামিল মুসলমানদের মধ্যে সমাজকাঠামোয় মর্যাদার স্তরভেদ নেই, যদিও সামগ্রিকভাবে ভারতের অন্য অঞ্চলের মুসলমানদের সংগে তাদের সাংস্কৃতিক পার্থক্য এবং নিজেদের বিশেষ উৎকর্ষের অহংকার বর্তমান। তাদের মধ্যে যে অন্তর্বিবাহ নেই তা নয় কিন্তু তার ভিত্তি পেশাগত বা রক্তসম্বন্ধী নয়। আবার আগাখান পন্থী খোজারা নিজেদের স্বাতন্ত্রের ব্যাপারে জাতিপ্রথা যেটুকু দেয় তার চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে গেছে।

কিছুটা সরলীকৃত হলেও, ইয়াকুব আলির বক্তব্য মোটের উপর যুক্তিসহ যিনি বলেন ; "এদেশীয় অজ্ঞ ও অশিক্ষিত মুসলমানগণ প্রতিবেশী হিন্দুর জাতিভেদের অনুকরণে আপনাদিগের মধ্যে জাতিভেদ প্রচলনে চেষ্টিত দেখা যাইতেছে। ইহার কারণ এই যে বহু শতাব্দী যাবৎ হিন্দুর সহিত একত্র বসবাস করিয়া হিন্দুর প্রভাব মুসলমানদের সমাজে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। অধিকন্তু যাহারা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া স্বল্পকাল মুসলমান সমাজভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা বংশপরম্পরাগত জাতিভেদ সংস্কার প্রভাবে সাম্যবাদী মুসলমান সমাজেও জাতিভেদ প্রচলনে চেষ্টিত রহিয়াছেন।" এছাড়া নিজেদের উপজাতি, গোষ্ঠী বা কুলের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার মানব প্রকৃতির একটি বিশেষ দিক যা শাস্ত্রবচনের প্রতিকূল হলেও বাস্তবে কার্যকর। নাজমুল করিম বলেন যে হানাফীদের মতে একজন আরব একজন অ-আরবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং আরবদের মধ্যে কুরেশীরা শ্রেষ্ঠ। যারা আরব নয় তাদের মধ্যে কোন লোক জন্ম-সূত্রে আরবদের সমতুল্য হতে পারে, যদি তার পিতা এবং পিতামহ তার পূর্বে মুসলমান হয়ে থাকে, অথবা যদি সে বিবাহকালে উপযুক্ত মহর প্রদানের উপযোগী ধনী হয়। আরব নয় অথচ শিক্ষিত এই রকম একজন লোক একজন

অশিক্ষিত আরবের সমান। একজন মুসলমান কাজি বা তত্ত্বজ্ঞ একজন বণিকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, একজন বণিক একজন সাধারণ ব্যবসায়ীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এজাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাবও মুসলমান সমাজে আশরাফ ও আজলাফদের মধ্যে ভেদাভেদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে।

১০ ॥ জাতিপ্রথা ও খ্রীষ্টধর্ম

বৌদ্ধ, জৈন বা ইসলাম ধর্মের মত খ্রীষ্টধর্মেও তত্ত্বের দিক থেকে জাতি-প্রথার কোন স্থান নেই, তবুও ভারতীয় খ্রীষ্টান সমাজের একটা বড় অংশ জাতিপ্রথা মেনে চলে। এদেশের আদি সিরীয় খ্রীষ্টানদের সাম্প্রদায়িকতা প্রবাদস্বরূপ এবং তারা কোনদিন নিজ সম্প্রদায়ের বাইরে স্বধর্মীদের মধ্যেও সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করে না। অবশিষ্ট ভারতীয় খ্রীষ্টানদের, তাদেব তত্ত্বগত সাম্প্রদায়িক-ভেদের কথা বাদ দিয়ে, তিনটি ব্যাপক শ্রেণীতে ভাগ করা যায় যথা ইউরেশীয়, উপজাতীয় এবং হিন্দু প্রভৃতি ধর্ম থেকে দীক্ষিত। ইউরোপীয়দের সংগে ভারতীয়দের মিশ্রণজাত ইউরেশীয়রা, বিশেষ করে ভারতের নানা শহরাঞ্চলে, পৃথক নৃগোষ্ঠীর ন্যায় বৃহত্তর জনসমাজের সংগে কিছুটা স্বাতন্ত্র বজায় রেখে চলে এবং নিজেদের মধ্যেই বিবাহাদি সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করে। কিছু আঞ্চলিক প্রভেদ সত্ত্বেও ইংরাজীকে মাতৃভাষা হিসাবে গ্রহণ এবং ইউরোপীয় ধরনের জীবনযাত্রাকে অবলম্বন করার জন্য বিভিন্ন প্রান্তের ইউরেশীয়দের মধ্যে একটা ব্যাপক সামাজিক ঐক্যভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু নিজ সমাজের বাইরে তারা সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী নয়। ইউরেশীয় খ্রীষ্টান সমাজের ছেলেমেয়েদের সংগে ভারতীয় খ্রীষ্টান সমাজের ছেলেমেয়েদের যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়না তা নয়, তবে তা অনেকটা হিন্দু অসবর্ণ বিবাহের মত। বিভিন্ন উপজাতি থেকে যারা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে, তারা কিন্তু উপজাতীয় স্বাতন্ত্র আদৌ বিসর্জন দেয়নি, এবং বৃহত্তর খ্রীষ্টান জনজীবনের সংগে এমন কি স্বধর্মী অন্য উপজাতির সংগেও সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে তারা আগ্রহী নয়। আবার এও দেখা গেছে যে কোন উপজাতির খ্রীষ্টান হয়ে যাওয়া অংশের সংগে খ্রীষ্টান না হওয়া অংশের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান ঘটে গেছে। অনেক উপজাতি আছে যারা খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করা সত্ত্বেও তাদের পুরাতন হিন্দু বা স্থানীয় সংস্কারাদি পরিত্যাগ করেনি। তবে এই সকল খ্রীষ্টানরা নানা বিশিষ্ট জনগোষ্ঠী হিসাবে জাতির মত ব্যবহার করলেও নিজেদের মধ্যে কোন জাতিভেদ রাখে না। তাই

জাতিপ্রথার প্রশ্নটি মূলত সেই সকল খ্রীষ্টানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দুধর্ম থেকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। এক্ষেত্রে উত্তরের খ্রীষ্টানদের সঙ্গে দক্ষিণের খ্রীষ্টানদের আবার পার্থক্য আছে। উত্তরের খ্রীষ্টানরা মুখে জাতিপ্রথা বিরোধী হলেও বাস্তবে, বিশেষ করে বৈবাহিক ক্ষেত্রে, জাতিপ্রথা মেনে চলে। স্বজাতির মধ্যে তেমন পাত্র বা পাত্রী না পাওয়া গেলে তবেই তারা অসবর্ণ বিবাহের দিকে অগ্রসর হয়। তবে বৈবাহিক ক্ষেত্র ছাড়া সামাজিক মেলামেশা ও আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে ও উপাসনাস্থলে কোন ভেদ তারা রাখেনা। পক্ষান্তরে দক্ষিণী খ্রীষ্টানরা প্রকাশ্যেই জাতিবিচার মেনে চলে। শুধু বাস্তবেই নয়, মুখেও তারা অসবর্ণ বিবাহের বিরোধী। প্রার্থনাস্থানে ও সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রেও তারা জাতিস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে।

খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে জাতিপ্রথার অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করার প্রসঙ্গে ডঃ সুন্দররাজ মানিকম বলেন যে এদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রসারের প্রথম যুগে মিশনারীরা জাতিপ্রথা বর্জনের কথা বলেননি, কেননা তাঁরা ভেবেছিলেন যে জাতিপ্রথা হিন্দুসমাজের কিছু অধিকার ও মানমর্যাদার ব্যাপার, যার সঙ্গে ধর্মতত্ত্বের কোন সম্পর্ক নেই। কথিত আছে যে ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে খ্রীষ্টের দ্বাদশ শিষ্যের একজন সেন্ট টমাস কর্তৃক প্রথম খ্রীষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়। এরকম দাবিও করা হয় যে টমাস ৫২ খ্রীষ্টাব্দে কেরালায় একটি গীর্জা স্থাপন করেন যা নাকি আজও ভিন্ন নামে বর্তমান আছে। সে যাই হোক, এদেশে খ্রীষ্টধর্মের প্রথম আগমন ঘটে পশ্চিম দেশ থেকে নয় পূর্বদেশ থেকে, সম্ভবত নেস্টোরীয় মিশনারীদের মারফৎ। পশ্চিমী খ্রীষ্টধর্ম ষোড়শ শতকে পোর্তুগীজ ক্যাথলিকদের মাধ্যমে এদেশে আসে, তারপর ইটালীয়, ফরাসী, ডাচ ও ইংরাজ মিশনারীরা এখানে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার করেন। এই প্রচারের কাজে ক্যাথলিকরা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিলেন। প্রোটেস্টান্টদের আগমন পরে ঘটেছিল এবং তাঁদের কর্মক্ষেত্রও ছিল ভৌগোলিকভাবে সীমাবদ্ধ। পশ্চিম উপকূলে পোর্তুগীজ প্রাধান্যের ছত্রছায়ায় এদেশে খ্রীষ্টধর্মের সূচনা ঘটলেও ধর্মপ্রসারের ক্ষেত্রে তেমন কোন সাফল্য আসেনি, কেননা প্রচারকগণ নিজেরাই কুচরিত্রের লোক ছিলেন এবং সেই কারণেই তাঁদের কোন আকর্ষণীয়তা ছিল না। ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সিস জেভিয়ারের আগমনের পরই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। সাধুসন্ন্যাসীদের মত তাঁর আচার-আচরণ জনমনে প্রভাব বিস্তার করে, যার পরিণামে তুতিকোরিনের নিকটবর্তী উপকূল অঞ্চলের ধীবরজাতীয় পরবরা দলে দলে খ্রীষ্টান হয়। পরবর্তীকালে জেসুইট মিশনারীরা বিশেষ

সাফল্যলাভ করেননি কেননা পোর্তুগীজ বা ফিরিঙ্গীদের ভাবভঙ্গী ও জীবন-যাত্রাপদ্ধতি ভারতীয়দের তাদের প্রতি প্রতিকূল করে তুলেছিল। মাদুরায় ফাদার ফার্ণান্ডেজ ১৫৯২ থেকে পনের বছর খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেও একজনকেও নূতনভাবে দীক্ষিত করতে পারেননি।

১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীয় মিশনারী রবার্ট দে-নোবিলি মাদুরা মিশনের প্রতিষ্ঠা করার পর ঘটনাচক্র অন্যদিকে গতি নেয়। এদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রসারের ব্যর্থতার কারণগুলি তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। নোবিলি ছিলেন বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ, যিনি এদেশের মানুষদের ফিরিঙ্গীদের প্রতি বিরূপতার কারণ অনুধাবন করেছিলেন এবং তদনুযায়ী তিনি নিজেকে রোমক ব্রাহ্মণ বলে প্রচার করেন। হিন্দু খাদ্যাভ্যাস, সন্ন্যাসীর গৈরিকবস্ত্র, উপবীত ও চন্দনলেপন প্রভৃতির দ্বারা তিনি এদেশীয় মানুষদের বিশ্বাস অর্জন করেন। তিনি প্রকাশ্যে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কোন বর্ণের সঙ্গে একত্রে আহার করতেন না। তিনি দীক্ষিতদের মধ্যে জাতিপ্রথা ও জাতিগত আচার অনুষ্ঠান বজায় রাখার অনুমতি দেন, এমন কি ব্রাহ্মণ দীক্ষিতদের ক্ষেত্রে কুদুমি (শিখা) ধারণ ও তাদের বিশেষ জাতিগত সুবিধা মেনে নেন। যাতে উচ্চবর্ণের মানুষ খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয় এই উদ্দেশ্যে তিনি পূর্বদীক্ষিত ধীবর জাতীয় পরবদের তাঁর গীর্জায় প্রবেশের অনুমতি দেননি। অধ্যাপক সাথিয়ানাথ আয়ার লিখেছেন যে তিনি মালাবার অঞ্চলের সেন্ট টমাস খ্রীষ্টানদেরও জাতিপ্রথা অনুসরণ করতে বাধ্য করেছিলেন। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন যে জাতিপ্রথা একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান যার সঙ্গে হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্বের কোন সম্পর্ক নেই। কাজেই খ্রীষ্টান হলেই কেউ তার জাতি, সামাজিক অবস্থান, ও রীতিনীতি বিসর্জন দেবে তার কোন মানে নেই। নোবিলির এই নীতির পরিণামে মাদুরা মিশনও জাতিভিত্তিক হয়ে পড়েছিল উচ্চবর্ণের মিশনারীরা উচ্চবর্ণের মানুষদের কাছেই প্রচার করতেন, নিম্নবর্ণের মিশনারীরা নিম্নবর্ণের কাছে যেতেন। এই প্রসঙ্গে এল এস. এস. ওমালী একজন লেখকের নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন: "একজন মিশনারীকে যেখানে অশ্বপৃষ্ঠে অথবা পাল্কীতে, ব্রাহ্মণের মত পোষাক পরে কাউকে অভিবাদন না জানিয়ে সদর্পে পথ পরিভ্রমণ করতে দেখা যায় সেখানে অপর একজন মিশনারীকে কম্বলাবৃত ও ভিক্ষুকদল পরিবৃত হয়ে পদব্রজে ভ্রমণ করতে দেখা যায়। যদি পথে তার সঙ্গে কোন উচ্চবর্ণের যাজকের সাক্ষাৎ হয় সে তার নিকট নিজেকে অবনত করে, এবং হাত দিয়ে

নিজের মুখ আবৃত করে যাতে তার নিঃশ্বাস উচ্চবর্ণের গুরুকে দূষিত না করে।"

হিন্দু জাতিপ্রথার সঙ্গে রবার্ট দে-নোবিলির এই আপোষপন্থা এদেশে খ্রীষ্ট ধর্মের ইতিহাসকারদের তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী প্রশংসিত ও নিন্দিত হয়েছে। জে. হাউ এবং জে. ডব্লিউ কায়ে বলেন যে নোবিলি অনুসৃত পদ্ধতি এদেশে খ্রীষ্টধর্মের যথেষ্ট ক্ষতি করেছে। পক্ষান্তরে লাটুরেট, পি. টমাস ও সাথিয়ানাথ আয়ার মনে করেন যে নোবিলিই একমাত্র খ্রীষ্টধর্মকে এদেশের জলমাটির সঙ্গে মেশাতে সক্ষম হয়েছেন। পি. টমাস লিখেছেন: "এটা অবশ্যই কল্পনা করা উচিত নয় যে ফাদার রবার্ট অনুসৃত জীবনধারায় কোন ভন্ডামি ছিল। তিনি এটা ভালবাসতেন…তাঁর নিজের ভাষায়, ভারতীয়-দের রক্ষা করার জন্য তিনি ভারতীয় হয়েছিলেন, যেমন মানবজাতিকে রক্ষা করার জন্য ঈশ্বর স্বয়ং মানুষ হয়েছিলেন। এর মধ্যে কোন কৌশল বা অধার্মিকতা নেই। ভারত ও ভারতবাসী এবং তাদের জীবনধারাকে দে-নোবিলি ভালবাসতেন। মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি, ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর সহানুভূতি, মুক্তিদাতার আগমন সম্পর্কে ভারতীয় ঋষিবাক্য সমূহের প্রতি তাঁর স্বীকৃতি, তাঁকে সমকালীন ইউরোপীয়-দের থেকে পৃথক ও অনন্যসাধারণ করেছিল যারা হিন্দুদের ঈশ্বর পরিত্যক্ত পৌত্তলিকরূপেই দেখতে চাইত।" যদিও নোবিলির জন্য দীক্ষিতের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল তৎসত্ত্বেও তাঁর কাজকর্মের সঠিক মূল্যায়ন এখনও হয়নি। তাঁর সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মতামত এখনও পর্যন্ত তাঁদের নিজস্ব পূর্বধারণার দ্বারা নির্ধারিত। ভি. এ. নারায়ণ তাঁকে ও তাঁর সহযোগীদের হিন্দু সন্ন্যাসীদের ছদ্মবেশে জলদস্যু ছাড়া অন্য কিছু ভাবেন নি। জুলিয়াস রিখটের বলেন যে তাঁর কর্মদক্ষতার দাবি অতিরঞ্জিত। সে যাই হোক মাদুরা মিশনের অন্তর্গত খ্রীষ্টানরা জাতিচিহ্ন ধারণ করত, গীর্জায় বিবাহ করা সত্ত্বেও অগ্নি সাক্ষী রেখে হিন্দুপ্রথা অনুযায়ী তা পাকা করে নিত, এবং কিছু হিন্দু সংস্কার মেনে চলত।

তবে খ্রীষ্টধর্মের প্রচারের ব্যাপারে-জাতিপ্রথা বজায় রাখার পক্ষে নোবিলি যা করেছিলেন, তৎকালীন বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তা তাঁর সাধারণ কান্ডজ্ঞানের অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নয়, এটা মনে করার সংগত কারণ আছে। ডাচ মিশনারীরাও দীক্ষিত খ্রীষ্টানদের মধ্যে জাতিপ্রথা বজায় রাখার অনুকূলে ছিলেন। ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে ডাচ উপনিবেশ ট্রাঙ্কুবেবারে বার্থোলোমিউ

জাইগেনবাল্‌গ ও হেনরী প্লুৎশ্‌চেউ নামক দুজন মিশনারী আসেন। এঁরা কিন্তু প্রোটেস্টান্ট ছিলেন। তৎসত্ত্বেও এঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে জাতি-চেতনা এখানে এত ব্যাপক যে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হলেও এই চেতনার বিলুপ্তি এদেশের লোকদের মধ্যে ঘটবে না। কাজেই গীর্জার ক্ষেত্রে জাতিপ্রথাকে মেনে নেওয়াই ভাল। একমাত্র শুল্‌ৎসে নামক মিশনারী, যিনি ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে জাইগেনবাল্‌গের মৃত্যুর পর কর্তৃত্ব পেয়েছিলেন, এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিপক্ষে ছিলেন। তিনি দীক্ষিতদের মধ্য থেকে জাতিপ্রথা দূর করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সাফল্যলাভ করতে পারেননি। আর্নো লেহ্‌মান লিখেছেন যে, যে সব মিশনারীরা পরে এসেছিলেন, ওয়াল্টার, প্রেসিয়ের, ডাল, বোস্‌সে প্রভৃতি, তাঁরাও গীর্জায় জাতিপ্রথা বজায় রাখার পক্ষে ছিলেন। ট্রাঙ্কুয়েবারের নিউ জেরুজালেম চার্চের চারটি দিক বিভিন্ন জাতির জন্য পাকাপাকি-ভাবে নির্দিষ্ট ছিল। গীর্জা-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় সমূহেও জাতিপার্থক্য বজায় রাখা হত। এই প্রসঙ্গে রেভারেন্ড ডানকান বি. ফরেস্টার লিখেছেন: "ট্রাঙ্কুয়েবার মিশনারীরা সর্বদাই জাতিপ্রথার প্রশ্নে একটি দ্বৈধীভাব বজায় রেখেছিলেন, এমনকি বিদ্যালয় সমূহেও জাতিপার্থক্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে তাঁরা আপত্তির কিছু দেখেননি।" এইচ গ্রাফে এবং আর. ডি. পল দেখিয়েছেন যে গীর্জার পদাধিকারীদের ক্ষেত্রেও জাতিপ্রথা কার্যকর ছিল। রাজনাইকন নামক ট্রাঙ্কুয়েবার মিশনের একজন সুদক্ষ ও সুপ্রতিষ্ঠিত কর্মী যোগ্যতা সত্ত্বেও যাজকের পদলাভ করতে পারেনি। গীর্জা-কর্তৃপক্ষের বক্তব্য ছিল যে যেহেতু রাজনাইকন পারিয়া জাতিভুক্ত, উচ্চবর্ণের খ্রীষ্টানরা তাকে দিয়ে ধর্মীয় সংস্কারাদি করাতে রাজি হবে না এবং তাকে যাজকের ভূমিকায় দেখা পছন্দ করবে না।

ট্রাঙ্কুয়েবার মিশনের পরবর্তী পর্যায়ের নামকরা প্রচারক ছিলেন ফ্রেডেরিক সোয়ার্ৎজ যিনি রাজগুরু নামে পরিচিত ছিলেন, কেননা তাঞ্জোরের রাজা তাঁকে খুবই শ্রদ্ধাভক্তি করতেন, যে কারণে সরকারী মহলে তাঁর খুব প্রতিপত্তি ছিল যার সুযোগ নিয়ে তিনি বহু লোককে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। কিন্তু সোয়ার্ৎজও গীর্জার ক্ষেত্রে জাতিপ্রথা বজায় রাখতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারীদের একাংশ ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে গীর্জায় জাতিবৈষম্য মানতে রাজি না হওয়ায় একটি বিভেদের সৃষ্টি হয়। তাঁর অনুগতরা জাতিপ্রথা-অনুসরণ-কারী নীতিই বজায় রাখেন। ট্রাঙ্কুয়েবার খ্রীষ্টানরা অ্যাংগলিকানদের অধীনে যাবার পর কিছুটা অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। রেভারেন্ড রেনিয়াস এবং

ডঃ শ্‌ক্মিড গীর্জা থেকে জাতিপ্রথা উচ্ছেদের চেষ্টা করেন। তথাপি শূদ্র (যারা তামিল খ্রীষ্টান নামে পরিচিত) এবং পারিয়াদের মধ্যে পার্থক্য দূর করা যায়নি। মিশনারীদের মধ্যে অবশ্য এই নিয়ে প্রায়ই বিতর্ক হতে থাকে। স্ক্রেভোগেল গীর্জা থেকে জাতিপ্রথা উচ্ছেদের পক্ষে প্রচারকার্য চালান, কিন্তু রেভারেণ্ড খ্রীষ্টিয়ান ডেভিড প্রমুখেরা জাতিপ্রথাকে ধর্মের সঙ্গে সংশ্রবহীন সামাজিক প্রথা বলে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে অভিমত দেন। কলকাতার সেকেণ্ড বিশপ রেগিনাল্ড হেবার ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতীয় গীর্জাসমূহ পরিদর্শন করেন। তিনি গীর্জার উপর জাতিপ্রথার প্রভাবের বিষয়টি অনুসন্ধান করার জন্য মাদ্রাজে একটি কমিটি গঠন করেন। তবে তিনিও জাতিপ্রথা বিরোধীদের অত্যুৎসাহ অনুমোদন করেননি। তাঁর বক্তব্য ছিল ব্যাপারটিকে পৌত্তলিক আদর্শের প্রকাশ বলে এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায়না, যেখানে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নানা প্রশ্ন জড়িত সেক্ষেত্রে সহনশীলতা ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন। জুলিয়াস রিখটের বলেন যে জাতিপ্রথাবিরোধীদের প্রচার সত্ত্বেও মিশনারীদের অধিকাংশ জাতিপ্রথার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার পক্ষপাতী ছিলেন। এমনকি তাঁরা এমনও বলতেন যে এটা একটা বিশুদ্ধ সামাজিক প্রতিষ্ঠান যা এদেশে ব্রাহ্মণরা আসার আগেও বিদ্যমান ছিল, কাজেই এব্যাপারে সন্ত্রস্ত হবার কোন কারণ নেই। খ্রীষ্টধর্মের আওতায় এই প্রথা নূতন তাৎপর্য খুঁজে পাবে।

কলকাতার পঞ্চম বিশপ ড্যানিয়েল উইলসন ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ জুলাই তারিখের একটি ঘোষণাপত্রে অ্যাংগলিকান মিশনারীদের গীর্জার ক্ষেত্রে জাতি-প্রথা নিষিদ্ধ করার নির্দেশ দেন। এই নির্দেশের বিরুদ্ধে দক্ষিণী গীর্জা-সমূহে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ১৮৩৫-এ উইলসন স্বয়ং দক্ষিণের গীর্জাসমূহ পরিদর্শন করেন এবং যথেষ্ট যুক্তিমত্তার সঙ্গে নিজ বক্তব্য বজায় রাখেন, কিন্তু অ্যাংগলিকান মিশনারীদের সংখ্যাগরিষ্ট অংশ তাঁর নির্দেশের বিরোধিতা করে। অনেকে লুথারীয় মিশনসমূহে যোগ দেন কেননা জাতির প্রশ্নে এদের নীতি ছিল বরাবরই নমনীয়। ইংরাজ ওয়েসলেয়ান মেথডিস্ট মিশনারীরা করমণ্ডল উপকূলে নাগপটমের নিকটবর্তী মেলনাট্টম গ্রামে ১৮৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কাজ শুরু করেন। এঁরা বরাবরই জাতিপ্রথাবিরোধী ছিলেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এঁদের মধ্যে জাতিপ্রথা ঢুকে পড়ে, বিশেষ করে গীর্জায় পারিয়াদের সম-অধিকার স্বীকার করার প্রশ্নে। মেলনাট্টমের স্থায়ী মিশনারী রেভারেণ্ড টমাস ক্রাইয়ার জাতিপ্রথার প্রশ্নে অনমনীয় নীতি গ্রহণ করার ফলে দীক্ষিতদের মধ্যে প্রচণ্ড

বিক্ষোভ দেখা দেয়। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য ছিল ক্রাইয়ারের নীতির ফলে সমাধানের অতীত নানা ধরনের সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। দক্ষিণের অন্যান্য অঞ্চলের খ্রীষ্টানদের মধ্যে গুজব রটে গিয়েছিল যে মেলনাট্রমের খ্রীষ্টানরা সকলেই পারিয়া হয়ে গেছে। এই সংবাদে অনেক প্রস্তাবিত বিবাহ ভেঙে যায় এবং আরও নানা ধরনের সামাজিক প্রতিক্রিয়া ঘটে। তৎসত্ত্বেও মেথডিস্ট কর্তৃপক্ষ তাঁদের জাতিপ্রথাবিরোধী নীতিতে অটল থাকেন, যদিও এর জন্য বহু দীক্ষিত তাঁদের ত্যাগ করেছিল। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা জাতিপ্রথা বিরোধী নীতি বজায় রাখার পক্ষেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক এবং লাইপৎসিগ লুথারীয়রা ছাড়া অন্যান্য খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়সমূহ গীর্জা থেকে জাতিপ্রথা দূরীকরণ করার পক্ষপাতী হয়। পরবর্তী শতবৎসরে খ্রীষ্টীয় সকল সম্প্রদায়ই কাগজে কলমে জাতিপ্রথা প্রত্যাখ্যান করেছে, যদিও বাস্তবে তা দূরীভূত হয়নি, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে।

১১॥ বৃত্তি-পরিবর্তন

জাতিপ্রথার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে আমরা বলেছি যে প্রাথমিকভাবে জাতি একটি পেশাদারগোষ্ঠী। এমন কোন জাতি নেই যার কোন জাত ব্যবসা নেই। আমরা একথাও বলেছি যে বিভিন্ন জাতির বৃত্তি বা পেশাসমূহ ধর্মশাস্ত্রে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। রাজার কর্তব্য বর্ণাশ্রম-রক্ষা, কোন জাতির বৃত্তি যাতে লোপ না পায় তা দেখা, বিভিন্ন জাতি তাদের নিজস্ব বৃত্তিকে অবলম্বন করে চলছে কিনা সে বিষয়ে নজর রাখা, এবং সর্বোপরি একজাতির বৃত্তি বা পেশার ক্ষেত্রে অন্য জাতি যাতে অনুপ্রবেশ করতে না পারে তা লক্ষ্য করা। মহাভারতের একটি কাহিনী এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। একটি কপোত বাজপাখি কর্তৃক তাড়িত হয়ে শিবিরাজার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল এবং রাজা তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। বাজপাখি সভায় এসে রাজার এই কাজের যৌক্তিকতার বিষয়ে প্রশ্ন তোলে। তার বক্তব্য ছিল কপোত হত্যা ও তার মাংস ভক্ষণ ওই বাজপাখির শাস্ত্রনির্দিষ্ট বৃত্তি। এক্ষেত্রে কপোতকে আশ্রয় দিয়ে রাজা অপরের কৌলিক বৃত্তি লোপ করার অপরাধে অপরাধী। এই গল্প থেকে বোঝা যায় বিভিন্ন জাতির পেশার সার্বভৌমত্ব রক্ষার উপর কতটা গুরুত্ব আরোপ করা হত।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও বিভিন্ন জাতির ক্ষেত্রে কৌলিক পেশার বদল হয়েছে এবং

এই বদলকেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শাস্ত্রকাররা স্বীকৃতি দিয়েছেন। একই পেশায় একাধিক জাতি লিপ্ত হয়েছে এরকম নজীরও যেমন আছে, শাস্ত্রনির্দিষ্ট পেশা থেকে সরে গিয়ে অন্য পেশা গ্রহণের নজীরও প্রচুর। আবার অনেক ক্ষেত্রে এমনও হয়েছে যে শ্রমবিভাগ বা অপরাপর অর্থনৈতিক কারণে একই পেশায় বিভাজন হয়েছে এবং বিভক্ত পেশা দুই বা ততোধিক জাতি কর্তৃক নিজস্ব কৌলিক বৃত্তি হিসাবে গৃহীত হয়েছে। যেমন তেলি কলু, বারুই-তামলি প্রভৃতি। নিজস্ব পেশা থেকে সরে এসে অধিকাংশ জাতিই কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করেছে, এছাড়া অন্যান্য লাভজনক পেশাতেও গেছে। আবার এও দেখা গেছে যে একটি বিশেষ জাতির অন্তর্গত মানুষদের একাংশ কৌলিক পেশায় নিযুক্ত, কিন্তু সেই জাতির অনেক মানুষই অন্য পেশা অবলম্বন করেছে। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে যে উচ্চবর্ণ বা উচ্চ-জাতিভুক্তদের ক্ষেত্রে এই পেশান্তর গ্রহণ সংখ্যা ও অনুপাত উভয় দিক থেকেই বেশি, কিন্তু নিম্ন-পর্যায়ের জাতিদের ক্ষেত্রে তা অনেক কম। যথা ব্রাহ্মণদের একটি ক্ষুদ্র অংশই কৌলিক পেশায় নিযুক্ত, বেশিরভাগ কিন্তু ভিন্ন পেশা অবলম্বন করেছে। এটা আজকের ব্যাপার নয়, বরাবরেরই। পক্ষান্তরে, আজও পর্যন্ত নিম্ন বৃত্তিজীবী মানুষদের সর্বাধিক অংশই কৌলিক পেশায় আবদ্ধ, সামান্য সংখ্যক মানুষ বৃত্তি পরিবর্তন করেছে।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের ক্ষেত্রে শাস্ত্রনির্দিষ্ট শুদ্ধ কৌলিকবৃত্তি অনুসরণের মত যোগ্যতা না থাকলে বৈশ্যের বৃত্তি গ্রহণের, এবং আপদ্‌কালে বা অনন্যোপায় হলে শূদ্রের বৃত্তি গ্রহণের অনুমতি ধর্মশাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে, যদিও এইরকম বৃত্তি অবলম্বনকারীদের মোটেই সুনজরে দেখা হয়নি। সুনজরে দেখা হোক বা না হোক, এর ফলে তথাকথিত উচ্চবর্ণ থেকে অনেক মানুষ কৃষি, শিল্প কারিগরী-বাণিজ্য প্রভৃতি বৃত্তিতে এসেছে। ব্রাহ্মণদের একটা বড় অংশ বরাবরই ভূমিনির্ভর, কেননা ব্রাহ্মণরা প্রায় সর্বযুগেই (অতি আধুনিককাল বাদ দিলে) রাজা বা জমিদার বা শাসকদের কাছ থেকে দান স্বরূপ কৃষিযোগ্য ভূমি এবং ক্ষেত্রবিশেষে জমিদারীও পেয়েছে। বস্তুত প্রাচীন ভারতের যত ভূমিদানলেখ এপর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলির প্রায় সবগুলিরই বিষয়বস্তু পুণ্যার্থে বা ধর্মার্থে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান। কিন্তু ভূমিনির্ভর উপজীবিকা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণের পক্ষে স্বহস্তে চাষ করা বা লাঙ্গল স্পর্শ করা নিষেধ। সচরাচর উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণরা স্বহস্তে লাঙ্গল দিয়ে চাষ করে না, বিশেষ করে বঙ্গদেশে। তবে কনৌজীয়া ব্রাহ্মণদের একাংশ স্বহস্তে চাষ করে। কনৌজীয়াদের এক

শাখা সরযূপারীয়ারা কদাচ স্বহস্তে চাষ করেনা যদিও সনাধ্য নামে পরিচিত কনৌজীয়াদের আর এক শাখা দোকানদারী করে। হরিয়ানা অঞ্চলের গৌড় ব্রাহ্মণদের যে শাখাটি তাগা গৌড় নামে পরিচিত, তারা পুরোপুরিই কৃষিজীবী। পাঞ্জাবের সারস্বত ব্রাহ্মণদের একাংশ কৃষিজীবী। উড়িষ্যার কৃষিজীবী ব্রাহ্মণরা হালিয়া-ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। অনেক দরিদ্র ওড়িয়া ব্রাহ্মণ ধনীগৃহে রাঁধুনির কাজ করে। একথা বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রেও সত্য। রাজস্থানের শ্রীমালী ব্রাহ্মণরা ভূস্বামী ও ব্যবসায়ীদের কাছে কাজ করে, পল্লিবান ও নন্দবন ব্রাহ্মণরা বাণিজ্যোপজীবী। রাজস্থান ও গুজরাতের সাঙোর ব্রাহ্মণদের অনেকেই রাঁধুনির বৃত্তি অবলম্বী। বালোদ্রারা মহাজনী কারবার করে। গুজরাতের সিদ্ধপুরিয়ারাও রাঁধুনির বৃত্তি অবলম্বী। অপরাপর গুজরাতী ব্রাহ্মণদের মধ্যে কৃষিজীবীর সংখ্যা প্রচুর, বাণিজ্যজীবীও কিছু আছে। মহারাষ্ট্রের কাসটা, ত্রিগুণ এবং সোপারা ব্রাহ্মণরা সর্বতোভাবে কৃষিজীবী, সাবাশে ব্রাহ্মণরা বাণিজ্যোপজীবী। কর্ণাটকের হালে-কর্ণাটক ব্রাহ্মণরা পুরোদস্তুর কৃষিজীবী হবার দরুন সমাজে খুবই নিন্দিত। দক্ষিণের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের একটা বড় অংশই কৃষিজীবী।

ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে। প্রথমত, ব্রাহ্মণরা বৈশ্য তথা যে-কোন অব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করার অধিকারী হলেও, ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করার অধিকার অন্য কোন জাতির নেই। দ্বিতীয়ত, কৃষিজীবী ব্রাহ্মণদের মধ্যে যারা ভূস্বামী বা ভূমির মালিক এবং যারা স্বহস্তে চাষ করেনা তাদের সামাজিক মর্যাদা বেশ উঁচু, পক্ষান্তরে যারা স্বহস্তে চাষ করে তারা সামাজিক মানমর্যাদার দিক থেকে শূদ্রের তুল্য। তৃতীয়ত, এটাও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, যে-সকল ব্রাহ্মণ বরাবর কৌলিক পেশা অনুসরণ করে এসেছে—পৌরোহিত্য ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত নানা কাজ—তারা নিম্নস্তরের ব্রাহ্মণ হিসাবে গণ্য হয়েছে। যে সকল ব্রাহ্মণ নিম্নবর্ণের পৌরোহিত্য করে—মনে রাখা দরকার নিম্নবর্ণের মানুষদের পূজা-পার্বন বিবাহাদি সংস্কার ও পারলৌকিক কাজের জন্য পুরোহিতের অবশ্য প্রয়োজন এবং ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কোন জাতির পৌরোহিত্যের অধিকার নেই—তাদের প্রায় অন্ত্যজদের সমতুল্য বলে গণ্য করা হয়, এবং এ প্রথা আজকের নয়। [বর্তমান লেখকের ধারণা বৈদিক যুগের পর থেকেই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। একদিকে তত্ত্বজ্ঞানীদের প্রতি রাজারাজড়ার পৃষ্ঠপোষকতা, আর একদিকে বৌদ্ধ ও জৈনদের কর্মকাণ্ড বিরোধীদাপট, সাধারণের যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপবিরোধিতা,

ভক্তিমূলক ধর্মসমূহের উৎপাত (যেখানে নিখরচায় ভগবানের সঙ্গে ভক্তের লাইন করা যায়) যজ্ঞাদি আচার অনুষ্ঠানের কাজকর্ম জানা ব্রাহ্মণদের অবস্থা অত্যন্ত অসহায় করে তুলেছিল। নেহাত কতকগুলি প্রাচীন সংস্কার না মানলে নয়, তাই সমাজজীবনে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের কিছু ভূমিকা থেকে গেলেও তারা কোনদিনই সমাজের কাছ থেকে উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। সেই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদেরই অধঃপতিত বংশধররাই আজকের বর্ণব্রাহ্মণ, পুরোহিত-ব্রাহ্মণ অগ্রদানী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি, যারা বরাবরই অর্থসম্পদ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা থেকে বঞ্চিত। এই কারণে আজকে পুরোহিতের পুত্র একান্ত অনন্যোপায় না হলে কৌলিক বৃত্তি গ্রহণ করে না।]

শস্ত্রজীবীদের বৃত্তিবদলের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। রাজপুতদের মধ্যে অধিকাংশই ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবী। ক্ষেত্রিরা মূলত বাণিজ্যজীবী। তাদের বানজাই শাখাটির নামকরণের মূলে বাণিজ্য শব্দটি বর্তমান। শিরিন ক্ষেত্রীরা কৃষিজীবী, শিরিনা শব্দটির অর্থই হচ্ছে কৃষক। রোরহারা পাঞ্জাব অঞ্চলে মোদকবৃত্তি অবলম্বী। জাঠরা শস্ত্রজীবী পর্যায় থেকে পুরোদস্তুর কৃষিজীবীতে রূপান্তরিত হয়েছে। উড়িষ্যার শস্ত্রজীবী খন্দাইৎরা চাষা-খন্দাইৎ-এ পরিণত হয়েছে। মারাঠা, নায়ার, পোলিয়া, কোচ, আগুরি প্রভৃতিরাও কৃষকের বৃত্তি অবলম্বন করেছে। বঙ্গদেশের বৈদ্যদের ক্ষেত্রে বৃত্তি বদলের সূচনা একেবারেই আধুনিককালে ঘটেছে, কেননা বৃত্তিটি লাভজনক হওয়ার জন্য বৃত্তি পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন উদ্ভূত হয়নি। বৈদ্যের বৃত্তিতে অন্য কোন জাতি যেতে পারেনি। কায়স্থ, বেল্লার, প্রভু, কলিতা প্রভৃতি জাতির ক্ষেত্রে ব্যাপক বৃত্তিবদল লক্ষ্য করা যায়, যদিও তাদের বেশিরভাগই কৃষিতে এসেছে। বণিক জাতিসমূহের ক্ষেত্রে বৃত্তি বদল বিশেষ হয়নি বললেই হয়, যেটুকু হয়েছে তা বঙ্গদেশের বৈদ্যদের মত এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের পর থেকে।

অপরাপর পেশাদার জাতিসমূহের ক্ষেত্রে আগমন ও বহির্গমন দুই-ই ঘটেছে। তন্তুবায়দের পেশা অপরাপর জাতিরাও যে গ্রহণ করেছে তার নিদর্শন আছে, যেমন বিহারের চামার-তাঁতী ও কাহার তাঁতী। উড়িষ্যার মোতিবংশ-তাঁতীরা কৌলিক বৃত্তি ত্যাগ করে অন্যবৃত্তি অবলম্বন করেছে, আবার গুজরাতের একশ্রেণীর ক্ষত্রি তাঁতীর পেশা অবলম্বন করেছে। নাথপন্থী যোগিজাতির ক্ষেত্রে তিনটি বৃত্তি লক্ষ্য করা যায়—কৃষি, বাণিজ্য ও তাঁতবোনা। মুসলমান মোমিন ও জোলারাও বৃত্তিতে তন্তুবায়। ময়রা, হালুই, গুরিয়া,

কুম্ভকার, কর্মকার বা লোহার, ছুতোর, কাঁসারি, স্বর্ণকার, শাঁখারি, শুঁড়ি, কালওয়ার, সানার, ভাণ্ডারী, পাশী, তিয়ান, ইদিগা প্রভৃতি বৃত্তিজীবী জাতিদের ক্ষেত্রে পেশার পরিবর্তন তেমন নয়। কামারদের একাংশ সোনার বা স্যাকরার পেশা নিয়েছে। দক্ষিণভারতে পঞ্চনম-বলু (যাদের পঞ্চবল ও কম্মল্লারও বলা হয়) একই সংগে সোনা, কাঁসা, তামা, লোহা ও ভাস্করের কাজ করে। বঙ্গদেশের ছুতোরদের বাড়ির মেয়েরা চিঁড়ে-কোটাকে পুরোদস্তুর বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছে। তেলি ও কলুদের মধ্যে অপর জাতিদের তুলনায় বৃত্তিবদলের হার বেশি। তেলিরা নানাপ্রকার ব্যবসায়ে লিপ্ত এবং কলুদের মধ্যে অনেকেই কৃষিজীবী। নদীয়া জেলার তেহট্টে তালুকদার উপাধিকারী ভূম্যধিকারী শ্রেণী বর্তমান যারা জাতিতে কলু। উত্তর ভারতের চর্মকাররা ভূমিশ্রমিক হিসাবে কাজ করে, রাজস্থানের বাম্বি চামাররা তন্তুবায়ের কাজও করে। কৃষিজীবীদের মধ্যে কুর্মি বা কুনবি ও তাদের শাখা জাতিদের মধ্যে বড় একটা পেশার বদল হয়নি, তবে বঙ্গদেশের কৃষিজীবী কৈবর্তদের একটা অংশ মৎস্যজীবীতে পরিণত হয়েছে যারা জালিক-কৈবর্ত নামে পরিচিত। কিন্তু তাদের বৃহত্তর অংশ কৃষিজীবী বা হালিক। পশুপালক জাতিদের মধ্যে আভীর বা আহিররা এবং গুজররা কৃষিকাজও করে থাকে। বঙ্গদেশে সদ্গোপরা পশুপালক থেকে কৃষিজীবীতে রূপান্তরিত।

এটা লক্ষ্য করা যায় যে কৃষিজীবী ও কারিগরী বৃত্তিজীবী জাতিদের ক্ষেত্রে পেশার পরিবর্তন বড় একটা হয়নি। কিন্তু জাতিকাঠামোর উপরের স্তরের জাতিগুলি থেকে অনেক মানুষই বৃত্তিবদল করেছে, এবং সবচেয়ে বেশি করেছে ব্রাহ্মণেরা। পেশার পরিবর্তন ঘটিয়ে সর্বাধিক মানুষ এসেছে কৃষির ক্ষেত্রে, এবং তারপর বাণিজ্যের ক্ষেত্রে। কারিগরী পেশায় খুব কম লোকই এসেছে কেননা এতে বংশানুক্রমিক দক্ষতার দরকার হয়। পক্ষান্তরে কৃষিজীবীর পেশা থেকে খুব কম লোকই অন্য পেশায় গেছে। যারা গেছে তারা একান্তই আধুনিক যুগে ইংরাজ শাসনের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতির প্রভাবে গেছে। খুব সামান্য সংখ্যকই আধুনিক উচ্চতর পেশার ক্ষেত্রে এসেছে। ইদানীং অবশ্য ভূমির উপর চাপ বেশি পড়ায়, অনেকে বৃত্তিচ্যুত হয়ে কায়িক শ্রমকেই জীবিকা করতে বাধ্য হয়েছে। একথা অন্য পেশাদারদের ক্ষেত্রেও সত্য, কেননা আধুনিক যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা পূর্বতন কারিগরী পেশাকে একেবারেই খোঁড়া করে দিয়েছে। কিন্তু এগুলি অতি-সাম্প্রতিক পরিস্থিতি। তথাপি আজও পর্যন্ত স্বীকৃত মৎস্যজীবী জাতি ছাড়া অন্য কোন জাতির

লোক জেলেদের পেশায় আসেনি, অথবা স্বর্ণকার ছাড়া অন্য কোন জাতি স্যাকরার পেশা নেয়নি। ধোপা, নাপিত প্রভৃতি জাতিগত বৃত্তির ক্ষেত্রে অন্য জাতির লোকের অনুপ্রবেশ হয়নি, যদিও এই সব বৃত্তিজীবী জাতি থেকে অনেক মানুষ সরে গিয়ে অন্য পেশা নিয়েছে, লেখাপড়ার কাজ অথবা কায়িক শ্রমের কাজ। তবে এটা ঠিক যে বৃত্তির পরিবর্তন ভারতবর্ষে সকল জাতির মধ্যে এবং সর্বকালে ন্যূনাধিক পরিমানে হলেও, এই পরিবর্তনের গতি অনেক মন্থর, এমনকি ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পরেও এই পরিবর্তন প্রত্যাশিত দ্রুতলয়ে হয়নি।

চতুর্থ অধ্যায়

জাতিকাঠামোয় সামাজিক মর্যাদার স্তরভেদ ও অন্যান্য বিষয়

১ ॥ জাতিকাঠামোয় সামাজিক মর্যাদার স্তরভেদ

বহুকাল পূর্বে ইবেটসন মন্তব্য করেছিলেন যে পৃথিবীর অপরাপর দেশের মত ভারতবর্ষের সমাজও বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত, কিন্তু এখানে এই স্তরভেদটা এমনই জন্মভিত্তিক এবং জাতিপ্রথা নামক একটি কৃত্রিম মানদণ্ডের অধীন যে, ব্যক্তির পক্ষে নিজ প্রচেষ্টায় তার বাইরে যাওয়া অসম্ভব। পৃথিবীর অন্যান্য সমাজেও এই স্তরভেদ সুনির্দিষ্ট, কিন্তু সেখানে সমাজটা কঠিন নয় তরল, যার একাংশ উপরে ওঠে অপরাংশ নীচে নামে এবং তদনুযায়ী সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিদেরও বিভিন্ন স্তরে ওঠানামা হয়, অর্থাৎ আজ যারা নীচু কাল তারা উপরে উঠতে পারে, আবার বিপরীতটাও ঘটতে পারে। তবে অন্য জায়গার সমাজ তরল হলেও সেই তারল্য বেশ আঠালো, যার ফলে নীচ থেকে উপরে উঠতে প্রচণ্ড বেগ পেতে হয়। তফাৎ এই যে ভারতের ক্ষেত্রে কিছু অধিকন্তু আইনকানুন দ্বারা উপরে ওঠার ব্যাপারটাকে বেশ দুর্গম করা হয়েছে। এম. এন. শ্রীনিবাস বলেন, ভারতবর্ষে সর্বোচ্চ স্তরে ব্রাহ্মণ এবং সর্বনিম্ন স্তরে অস্পৃশ্যদের অবস্থানটা মোটামুটি নিশ্চিত, যেখানে মধ্যবর্তী-দের স্থান নিয়ে নানা সংশয়। তাঁর মতে জাতিপ্রথার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিভিন্ন স্তরভুক্ত জাতির সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নে বিরোধ। এই বিরোধ প্রধানত সেই সকল জাতির মধ্যে বর্তমান জাতিকাঠামোয় যাদের স্তরগুলি মোটামুটি কাছাকাছি, বিশেষ করে তাদের ক্ষেত্রে যারা উপরের দিকে ওঠার চেষ্টা করে।

জাতিপ্রথার নানা প্রকারভেদ আছে। একই নামযুক্ত জাতির বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পেশা থাকতে পারে। যেমন অম্বষ্ঠ বঙ্গদেশে বৈদ্য কিন্তু দক্ষিণে নাপিত। উত্তরপ্রদেশের কোন কোন স্থানে জাঠরা উচ্চস্তরের জাতি, কিন্তু উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে এবং পাঞ্জাবে তারা মধ্যস্তরের জাতি, গুজ্জরদের সঙ্গে সমমর্যাদা সম্পন্ন। দক্ষিণে জাতিদের ক্ষেত্রে ডান-হাতি বাঁ-হাতি ভাগ আছে যা

উত্তরে অনুপস্থিত। দ্বিতীয়ত, জাতিসমূহের ক্ষেত্রে একটা মোটা দাগের ভাগ বরাবরই বর্তমান যথা আভ্যন্তর ও বাহ্য, অথবা স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য। স্পৃশ্য শ্রেণীর জাতিরা অস্পৃশ্যদের দূরে রাখার জন্য ক্ষমতার ব্যবহার করে। এটাই হচ্ছে ক্ষমতার নিরিখে জাতিসমূহের প্রাথমিক বিভাজন। স্পৃশ্য শ্রেণীর জাতিদের মধ্যে কয়েকটি জাতি স্থানীয়ভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার দিক থেকে অধিকতর প্রভাবশালী। এর অর্থ কিন্তু এই নয় যে সংশ্লিষ্ট জাতিটির সকল সদস্যই প্রভাবশালী, কিন্তু যে সব ব্যক্তি প্রভাবশালী বলে চিহ্নিত তাদের প্রতিফলিত গৌরবই তারা যে-জাতির অন্তর্গত সেই জাতির মর্যাদা বাড়ায়। অবশ্য এই প্রভাবশালী জাতিসমূহের প্রভাবক্ষেত্রের স্তরভেদ আছে—গ্রাম্য, জেলাগত, অঞ্চলগত ও রাজ্যগত। যেমন প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে মালব অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ক্ষমতার অধিকারী ছিল মারাঠা জাতীয় অভি-জাতরা, তাদের নীচে ছিল রাজপুত ভূস্বামী শ্রেণী। গ্রাম্য পর্যায়ে ক্ষমতার অধিকারী ছিল কোথাও রাজপুতরা কোথাও কালোতারা। কাজেই যখন ক্ষমতা বা প্রভাবশালী জাতির কথা বলা হয় তখন সেই ক্ষমতার বিশেষ এলাকাটিকেও নির্দিষ্ট করার দরকার। কাজেই জাতিকাঠামোর সামাজিক মর্যাদার স্তরভেদের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় মনে রাখতে হবে—একটি শাস্ত্রীয় বা তত্ত্বগত স্তরভেদ যেখানে নানা কারণে ব্রাহ্মণদের স্থান জাতিকাঠামোর শীর্ষে যদিও এই শীর্ষস্থান ব্রাহ্মণদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার পরিচায়ক নয়; অপরটি বাস্তব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার দিক থেকে স্তরভেদ যেখানে কয়েকটি প্রভাবশালী জাতির পরিচয় পাওয়া যায়।

জাতিকাঠামোর সামাজিক মর্যাদার স্তরভেদ নির্ণয়ের জন্য দেবব্রত বসু পাঁচটি উপাদান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। প্রথম, দৈহিক বা নৃগোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য; দ্বিতীয়, সাংখ্যাধিক্য তৃতীয়, সম্পত্তি ও অর্থনৈতিক শক্তি; চতুর্থ, অপবিত্রতা, দূষণ প্রভৃতি বিষয়; এবং পঞ্চম, উপরিউক্ত চারটি বিষয়ের যোগফল। কোন বিশেষ নৃগোষ্ঠী অপর নৃগোষ্ঠীদের উপর বিজয়লাভ ও প্রভুত্ব স্থাপন করতে পারলে শেষোক্তরা নিম্নবর্ণের জাতিতে পরিণত হয় কিনা, জাতিকাঠামোর বিভিন্ন স্তরকে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর সংগে শনাক্ত করা যায় কিনা, সে বিষয়ে সংশয় আছে। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে, এবং কিছুটা বঙ্গ-দেশেও, উচ্চবর্ণের মানুষদের সংগে নিম্নবর্ণের মানুষদের নৃগোষ্ঠীগত পার্থক্য চোখে পড়ে। কিন্তু পাঞ্জাবে উচ্চ ও নিম্নবর্ণের জাতিদের মধ্যে কোন নৃগোষ্ঠীগত পার্থক্য দেখা যায় না। মারাঠী ব্রাহ্মণরা দৈহিক বৈশিষ্ট্যের

নিরিখে ওই অঞ্চলের মধ্যপর্যায়ের জাতিগুলির সঙ্গে কোন পার্থক্য প্রদর্শন করেনা। আবার বঙ্গদেশের চণ্ডাল বা নমঃশূদ্রদের সঙ্গে উচ্চবর্ণের মানুষদের দৈহিক বৈশিষ্টের কোন পার্থক্য নেই। ডি. এন. মজুমদার এবং কে. কিসেন জানিয়েছেন যে একেবারে সর্বোচ্চ জাতির সঙ্গে একেবারে সর্বনিম্ন জাতিগুলির মধ্যে কিছু দৈহিক বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য থাকলেও সামগ্রিকভাবে গুজরাতী জনসমাজ দৈহিক বৈশিষ্ট্যের বিচারে একই ধরনের। জি. এস. ঘুর্যে-বলেন যে একথা দক্ষিণভারত ও উড়িষ্যার ক্ষেত্রেও সত্য। কোন জাতিই তাদের নৃগোষ্ঠীগত ঐতিহ্যের কথা বলে না। তাদের পুরাকাহিনী আছে, উদ্ভব সংক্রান্ত কিংবদন্তী আছে, যেখানে তারা বিশেষ কোন দেবতা বা বীরপুরুষ বা ঋষি থেকে উদ্ভূত বলে দাবি করে। কিন্তু কোন বিশেষ নৃগোষ্ঠী থেকে উদ্ভব দাবি করে না। যেমন উত্তরপ্রদেশের বারুহি-সূত্রধর জাতি নিজেদের বিশ্বকর্মার বংশধর বলে দাবি করে। আরাশরা পরশুরাম থেকে, বিহারের আগরওয়ালারা রাজা অগ্রসেন থেকে, এই রকম। অনেক নিম্নবর্ণের জাতি তাদের নিম্নত্বের কারণ স্বরূপ তাদের পূর্বপুরুষের কোন দুষ্কর্মের জন্য শিব কর্তৃক অভিশাপ প্রাপ্তির কাহিনী উল্লেখ করে। শক-যবন-হূণ-কুষাণ-পহ্লব প্রভৃতি যে সকল বহিরাগত জাতি এখানে এসেছে, ভারতীয় জনসমাজের সঙ্গে তাদের মিশ্রণ এভাবে হয়ে গেছে যে তাদের নৃগোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য সত্যই কি ছিল তা জানার উপায় নেই। কিন্তু মুসলমান আক্রমণের পর থেকে যে সব বহিরাগত এসেছে, একমাত্র তারাই তাদের নৃগোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট সম্পর্কে সচেতন, এবং মুসলমানদের উচ্চবর্ণ বা আশরাফ শ্রেণীর অধিকাংশই এই বহিরাগতদের নিয়ে গঠিত।

সংখ্যার ভিত্তিতে জাতিকাঠামোয় মর্যাদার স্তরভেদ ব্যাখ্যা করা, অর্থাৎ কোন জাতি কোন এলাকার জনসংখ্যার সর্বাধিক অংশ হলে সেই জাতি যে সেই এলাকায় শক্তিশালী এবং জাতিকাঠামোয় উচ্চতরের জাতি হিসাবে পরিগণিত হয় এরকম ধারণা করারও কোন কারণ নেই, যদিও কোন কোন এলাকায় কোন বিশেষ জাতিকে, সাংখ্যাধিক্যের কারণে শক্তিশালী হতে দেখা যায়। গ্রাম পর্যায়ে জাতিগত জনসংখ্যা সম্পর্কে যত সমীক্ষা হয়েছে তা থেকে উপরি-উক্ত ধারণার পক্ষে বা বিপক্ষে কিছুই প্রমাণিত হয়নি। জেলান্তরে যে সকল সমীক্ষা হয়েছে তাতে দেখা যায় যে উচ্চবর্ণের জাতিরা অথবা তথাকথিত প্রভাবশালী জাতিরা কোথাও এবং কোন ক্ষেত্রেই সংখ্যার দিক থেকে অন্যান্য জাতির থেকে বেশী নয়। বস্তুত গোটা উত্তরভারতেই উচ্চবর্ণের জাতিরা সাধারণত দ্বিজাতির

পর্যায়ভুক্ত এবং সর্বত্রই সংখ্যালঘু। তবে সম্পত্তি ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার ব্যাপারটা কিছু স্বতন্ত্র, যদিও তা দিয়ে জাতিকাঠামোয় সামাজিক মর্যাদার স্তরভেদ ব্যাখ্যা করা যায় না। একথা যদিও সত্য যে উচ্চবর্ণের জাতির অনেকে নিম্নবর্ণের জাতির তুলনায় আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ, এবং সেই সমৃদ্ধির মূল উৎস ভূমিগত অধিকার, তৎসত্ত্বেও দেখা যায় যে সমাজে ধনবান শ্রেণী বলতে মধ্য-পর্যায়ের জাতিগুলিই প্রধান। কৃষিজীবীদের মধ্যে উত্তরভারতের জাঠ বা বঙ্গদেশের আগুরিরা বেশ সমৃদ্ধ, অসংখ্য বণিকজাতির কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল, কিন্তু এই সকল জাতির সামাজিক মর্যাদার স্থানটা খুব উচ্চের নয়। শ্রীনিবাস দেখিয়েছেন যে কর্ণাটকের নানা বণিক জাতি নিজেদের বৈশ্য বলে পরিচিত করতে চায়, কিন্তু অপর জাতিরা তা স্বীকার করে না। একথা পূর্ববঙ্গের সাহা উপাধিকারী বণিকদের ক্ষেত্রেও খাটে। পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলের সুবর্ণবণিকরা রূপবান, অর্থবান ও বিদ্বান হওয়া সত্ত্বেও জলচল-জাতি বলে গণ্য হয় না, এমনকি যে ব্রাহ্মণরা সুবর্ণবণিকদের গৃহে পৌরোহিত্য করে তারাও ব্রাহ্মণ সমাজে সোনার-বেনের-বামুন বলে নিন্দিত। মধ্যপর্যায়ের যে জাতিগুলি কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের দ্বারা যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করেছে তার প্রতি গোটা সমাজেরই দৃষ্টিভঙ্গী "ছোটলোকের দু'পয়সা হওয়া"। এই দৃষ্টিভঙ্গী শুধু ব্রাহ্মণই পোষণ করে না, একেবারে যে অন্ত্যজ সে-ও পোষণ করে। তবে অর্থের অন্য মহিমা থাকার দরুন সমৃদ্ধিশালী জাতিরা উচ্চজাতি না হলেও ক্ষমতাশালী ও প্রভাবশালী (ডমিনাণ্ট) জাতি হিসাবে পরিগণিত হয় এবং সমাজের শ্রদ্ধা না হলেও কিছুটা সমীহ আদায় করে থাকে, যেমন রাজস্থান ও গুজরাতের বানিয়া জাতিরা, উত্তর ভারতের জাঠরা, বা বিভিন্ন স্থানের ভূম্যধিকারী রাজপুতরা। ব্রাহ্মণদের প্রতি এই মধ্যপর্যায়ের সমৃদ্ধ জাতিগুলির মনে একটা দ্বৈধীভাব বর্তমান। ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বের ঐতিহ্য, যা নানা যুগের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছে, তাদের না মেনে উপায় নেই, কিন্তু নিজেদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতার জোরে তারাও জাতিকাঠামোর শ্রেষ্ঠস্থান পেতে চায় বা পাবার চেষ্টা করে।

২ ॥ ব্রাহ্মণ বনাম প্রভাবশালী জাতিসমূহ

ধর্মশাস্ত্র অনুমোদিত জাতিকাঠামোয় বিভিন্ন জাতির সামাজিক মর্যাদার যে স্তরভেদ সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির কিছুটা পার্থক্য স্বাভাবিক নিয়মেই বিদ্যমান। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে

স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি জাতি রীতিমত ক্ষমতাশালী, এবং তাদের শাস্ত্রীয় মর্যাদা প্রকৃত পক্ষে যাই হোক না কেন, নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার জন্য প্রভাবশালী জাতি হিসাবে সম্ভ্রমের পাত্র। মোটামুটিভাবে এই সব জাতি জাতিকাঠামোর মধ্য পর্যায়ের অন্তর্গত যাদের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথম হচ্ছে প্রভাবের ক্ষেত্রটি একেবারে স্থানীয়। এক এলাকায় যে জাতি বিশেষ প্রভাবশালী ও সম্মানীয় হিসাবে পরিচিত অপর এলাকায় সেই একই জাতির সামাজিক অবস্থান নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর হতে পারে। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে কালের প্রভাব। আজ যে জাতি প্রভাবশালী কাল সে তা নাও থাকতে পারে। অন্য জাতি প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে প্রভাবশালী জাতিদের মধ্যেও ভাঙাগড়া চলে, পার্থক্য ও সংঘর্ষ দেখা যায়, যার ফলে একটা জাতি ভেঙে গিয়ে তার জায়গায় নানা মর্যাদার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি গড়ে ওঠে।

প্রভাবশালী জাতিসমূহের উদ্ভবের কারণ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক। মূলত ভূম্যধিকারী, বণিক ও শস্ত্রজীবীরাই এই জাতিসমূহের অন্তর্গত, এবং এদের প্রতিষ্ঠার মূলে রাজশক্তি ও দেশের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার অধিকারীদের বিশেষ ভূমিকা আছে। মালাবার অঞ্চলে নাম্বুদিরি এবং নায়ার এই দুই জাতিকে প্রভাবশালী বলে চিহ্নিত করা হয়। বহু এলাকাতেই নাম্বুদিরি ব্রাহ্মণরা ভূম্যধিকারী শ্রেণীভুক্ত। এই রকম কয়েকটি 'পকেট' ভারতবর্ষের নানাস্থানে বর্তমান যেখানে ব্রাহ্মণরা একই সঙ্গে জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রেই প্রভাবশালী। কিন্তু অপরাপর প্রভাবশালী জাতিদের ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি সর্বাধিক, এবং রাজপুতরা তাদের আদর্শ। বিশেষ করে উত্তর ভারতের বড় বড় ভূম্যধিকারীরা নিজেদের রাজপুত-ক্ষত্রিয় বলে পরিচিত করার প্রয়াসী। অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় যে রাজপুত নয় এমন জমিদার বা ভূম্যধিকারী অনেক টাকা পণ দিয়ে দরিদ্র রাজপুতদের ঘর থেকে ছেলে বা মেয়ের জন্য পাত্রী বা পাত্র খুঁজে আনে এবং এই পদ্ধতিতে দুই পুরুষের মধ্যেই তারা রাজপুতে পরিণত হয়। রাজপুত ছাড়া নায়ার এবং মারাঠারা ক্ষত্রিয় হিসাবে নিজেদের পরিচিত করে। নায়াররা নানা শাখায় বিভক্ত এবং তারা বরাবরের শস্ত্রজীবী জাতি এবং সেই হিসাবে নানা পদাধিকারের সুযোগে গ্রামান্তর পর্যন্ত নিজেদের প্রাধান্য বজায় রেখেছে। মালাবার অঞ্চলে ইউ-রোপীয় ধরনের একজাতীয় সামন্ততন্ত্রের কিছুটা আভাস মেলে। ভূমিনির্ভর এই সামন্ত তন্ত্রের শীর্ষে যারা প্রভু শ্রেণীর লোক তারা হয় নাম্বুদিরি না

হয় নায়ার, কোন কোন ক্ষেত্রে সমস্তন। বাকি সকল জাতি যেমন তিয়ান বা ইরুবা, চেরুমান প্রভৃতি অধীন শ্রেণীর মানুষ। তবে ক্ষত্রিয়ত্ব দাবি করলেও ব্রাহ্মণরা নায়ারদের শূদ্র হিসাবে গণ্য করে। ক্ষত্রিয়ত্বের অপর দাবিদার মারাঠা জাতি যারা মহারাষ্ট্র, কোংকন, মধ্যপ্রদেশ এবং কর্ণাটকের কোন কোন অঞ্চলে রীতিমত প্রভাবশালী। মারাঠা জাতির নিজস্ব অভ্যন্তরীন স্তর-উপস্তর বর্তমান, যেগুলির মধ্যে আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতিগত কিছু কিছু পার্থক্যও আছে। দাক্ষিণাত্য ও কোংকন অঞ্চলের প্রাক্তন শস্ত্রজীবী ও ভূম্যধিকারীরা নিজেদের আসল মারাঠা ও ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দেয়। নীচু মারাঠীরা কুনবি-কৃষক ও ভাণ্ডারী, চিত্রকঠী, গবন্দী, কুম্ভর, লোথার, মালি, নাহবি, পারিত, তকর, তারু, তালি প্রভৃতি পেশাদার গোষ্ঠীতে বিভক্ত। আসল মারাঠা বলে যারা নিজেদের পরিচয় দেয় এবং যাদের প্রভাবের উৎস মারাঠা রাজশক্তি, সেই ক্ষমতাবান শ্রেণী রাজপুতদের অনুকরণে চারটি পৌরাণিক বংশ থেকে নিজ নিজ কুলের উদ্ভব অন্বেষণ করে। এই চারটি বংশ হল সূর্য, সোম, ব্রহ্ম এবং শেষ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ব্রাহ্মণদের কাছে এই মারাঠারা শূদ্র হিসাবে পরিগণিত।

উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলে রাজপুত, ব্রাহ্মণ ও বানিয়া জাতিগুলি অধিকতর প্রভাবশালী এবং পশ্চিমাঞ্চলে জাঠরা। এছাড়া গুজর ও আহিররা কোন কোন স্থানে রীতীমত ক্ষমতাবান। এই প্রাধান্যের উৎস মধ্যযুগের রাজকীয় বিলিব্যবস্থা। পাঠান ও মুঘল বাদশাহদের আমলে শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে যে পদাধিকার-কাঠামো গড়ে উঠেছিল সেই কাঠামোর যে যে জাতির মানুষ গ্রাম বা অঞ্চলের কর্তাব্যক্তি হয়েছিল, সেই সকল গ্রাম বা অঞ্চলে তাদের জাতির সামাজিক প্রাধান্যের সূত্রপাত ঘটেছিল, যার পরিণামে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন প্রভাবশালী জাতির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। রাজস্থানে দেখা যায় যে বিভিন্ন গ্রামের প্রধান যে জাতির অন্তর্গত, সেই জাতির মানুষরাই সেই গ্রামে সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং অঞ্চল ভিত্তিতে রাজপুত, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বানিয়ারা জাতি হিসাবে প্রভাবশালী। কর্ণাটক অঞ্চলে লিংগায়ৎ, ব্রাহ্মণ ও কৃষিজীবী ওক্কালিগারা (ভোক্কালিগা, উত্তরের জাঠদের সমতুল্য) মোটামুটি প্রভাবশালী জাতি হিসাবে চিহ্নিত। অন্ধ্রে, কাপু বা রেড্ডিরা কৃষিজীবী হওয়া সত্ত্বেও প্রভাবশালী। কাপু শব্দটির অর্থই হচ্ছে গ্রাম-প্রধান বা গ্রাম-পরিদর্শক এবং সেই হিসাবে তাদের শক্তির উৎস শাসনতান্ত্রিক পদাধিকারবল। তামিলনাড়ুতে ব্রাহ্মণ বাদ দিলে, প্রভাবশালী জাতিদের মধ্যে যারা পরিগণিত হয় তাদের পশ্চাতে রাজ-

শক্তির অদৃশ্য হস্তের পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন বেলল্লানরা কৃষিজীবী হলেও গ্রামপ্রধানের পদের দৌলতে তাদের প্রতিষ্ঠা, এছাড়া কেল্লান, নায়ক প্রভৃতিদের পূর্বপুরুষেরা বিভিন্ন আক্রমণকারী ও দখলদার রাজাদের সৈন্যবাহিনীভুক্ত ছিল। কুর্গ অঞ্চলে গ্রাম পর্যায়ে কন্নড়ভাষী ওক্কালিগারা এবং তুলু ভাষী গৌড়রা প্রভাবশালী. কিন্তু উপরের স্তরে আম্মা-কুর্গীরা অধিকতর প্রভাবশালী কেননা তারা একই সঙ্গে জমির মালিক এবং যোদ্ধা, এবং সর্বোপরি ব্রাহ্মণ্য আচার মেনে চলে। বাণিজ্যজীবী কোমতিরাও সেখানে প্রভাবশালী। অল্পসংখ্যক লিঙ্গায়ৎ সেখানে আছে যারা রাজার জ্ঞাতিগোষ্ঠী হিসাবে প্রাধান্য পেয়েছে।

এই তথাকথিত প্রভাবশালী জাতিগুলির মধ্যে কিন্তু ব্রাহ্মণদের মত সমভাবাপন্নতা নেই। আহার, পবিত্রতা-অপবিত্রতাবোধ এবং সামাজিক রীতিনীতির ক্ষেত্রে এদের মধ্যে পার্থক্য আছে, যেমন নায়ারদের সমাজ কিছুটা মাতৃতান্ত্রিক, কুর্গীদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ ও বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্তু রাজপুত এবং উচ্চবংশীয় রাজপুতদের ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। যদিও মধ্যশ্রেণীর এই সকল প্রভাবশালী জাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ব্রাহ্মণের উচ্চাসনকে টলিয়ে দিতে সক্ষম, বাস্তবে তা কিন্তু ঘটেনি, এবং ওই দুই ক্ষমতা ব্যতিরেকেই ব্রাহ্মণরা শীর্ষস্থানের অধিকারী (যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদেরও ওই দুই ক্ষমতা আছে)। এমনকি কালচক্রে ব্রাহ্মণদের অধোগতি হলেও, বা ব্রাহ্মণদের কোন কোন শ্রেণী বৃহত্তর জনসমাজে নিন্দিত হলেও, তাকে চাল-কলা-প্রত্যাশী, ভন্ড, বিটলে প্রভৃতি অসম্মানজনক বিশেষণে ভূষিত করা হলেও, অগ্রাহ্য করা যায় না। ব্রাহ্মণের শীর্ষাসনের নানা কারণ দেখানো হয়ে থাকে, যেগুলির মধ্যে তিনটি প্রধান। প্রথম, ব্রাহ্মণ দেবতা ও মানুষের মধ্যবর্তী হিসাবে কল্পিত। দ্বিতীয়, পুরোহিত হিসাবে দেবতাদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে তার বিশেষ ভূমিকা, তার আধ্যাত্মিক শক্তি এবং ভালো বা মন্দ করার ক্ষমতার প্রতি সাধারণের যুগ-অর্জিত বিশ্বাস। এবং তৃতীয়, ভারতীয় জীবনাদর্শের যেগুলি মহত্তর দিক, যে সকল বিশ্বাস এবং আচার-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে হিন্দুসমাজ আজও টিঁকে আছে, ব্রাহ্মণ সেগুলির প্রতিনিধি ও প্রতিরূপ। এই কারণেই জাতিমর্যাদা উচ্চ করার প্রেরণায় তথাকথিত প্রভাবশালী ও ক্ষমতাশালী জাতিদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য শুদ্ধাচার অবলম্বনের একটা প্রবণতা দেখা যায়। মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিম-ভারতের বানিয়ারা মদ্য এবং মাছমাংস স্পর্শ করে না। রাজস্থানের অন্তর্গত দেওলির বানিয়াদের প্রসঙ্গে কারস্টেয়ার্স লিখেছেন যে তারা ব্রাহ্মণের চেয়েও

অধিকমাত্রায় খাদ্য প্রভৃতির ব্যাপারে খুঁতখুতে। গত শতকের প্রথমার্ধেই আম্মা-কুর্গীরা কাবেরীর তীরের বিভিন্ন ব্রাহ্মণ্য মঠসমূহে দীক্ষাগ্রহণ করে নিজেদের কাবেরী-ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত করে এবং ঘোরতর নিরামিষাশীতে পরিণত হয়। এই নব-ব্রাহ্মণ্য জীবনকে অনুসরণ করলেও তাদের উপজাতীয় অতীতটা একেবারে হারিয়ে যায়নি। তারা প্রধানত শিব-পার্বতীর সম্মানে মদ্য মাংস উৎসর্গ করে। নায়াররা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে পরিচিত করলেও ঐতিহ্যগত কিছু আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলে যেগুলি কিন্তু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পরিচায়ক নয়। তৎসত্ত্বেও ক্যাথারিন গাফ দেখিয়েছেন যে নায়ারদের মধ্যে নিরামিষ আহার্য গ্রহণের এবং নিজেদের প্রথাগত পূর্বপুরুষদের উপাসনার পরিবর্তে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর উপাসনার প্রবণতা বেড়েছে। এই প্রবণতাকে তিনি সংস্কৃতকরণ আখ্যা দিয়েছেন। রাসেল দেখিয়েছেন যে মধ্যপ্রদেশের রাজপুতরা পূর্বে মদ্যপান করলেও ব্রাহ্মণ্য জীবনচর্যার খাতিরে ওই অভ্যাস ত্যাগ করেছে। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণরা এইসকল জাগতিকভাবে প্রভাবশালী জাতি সম্পর্কে মনে যে ভাবই পোষণ করুকনা কেন, বাইরে তাদের অগ্রাহ্য করে না। কর্ণাটকের প্রভাবশালী জাতির গ্রাম প্রধানের সংগে দরিদ্র ব্রাহ্মণপুরোহিতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একে অপরকে মান্য করার প্রবণতার কথা শ্রীনিবাস উদাহরণ সহকারে দেখিয়েছেন। গ্রামপ্রধান বৃত্তিতে কৃষিজীবী জাতি হলেও তার জাগতিক ভালমন্দ করার ক্ষমতায় ব্রাহ্মণ যেমন আস্থাবান, সেই রকম ব্রাহ্মণের আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পর্কে গ্রামপ্রধানও সমান সচেতন। কেউ কাউকে ঘাঁটায় না, অথবা উভয় উভয়কে সমীহ করে। মোট কথা সর্বত্রই প্রভাবশালী জাতিসমূহের সংগে ব্রাহ্মণদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নানা স্থানীয় শক্তির নেপথ্য ভূমিকা বর্তমান। প্রভাবশালী জাতিসমূহ নীতিগতভাবে ব্রাহ্মণ প্রাধান্যকে স্বীকার করে, কিন্তু তথাকথিত প্রভাবশালী জাতিসমূহের সামাজিক মর্যাদা ব্রাহ্মণদের মত সর্বস্তরে স্বীকৃত নয়, যদিও এই স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য একটা সচেতন প্রচেষ্টা সব সময়েই চলেছে।

৩ ॥ অস্পৃশ্যতা, পবিত্রতা-অপবিত্রতাবোধ, ইত্যাদি

জাতিপ্রথার সংগে অস্পৃশ্যতাকে এক করে দেখার একটা প্রবণতা জাতিপ্রথা নিয়ে যারা লিখেছেন তাদের অধিকাংশের মধ্যেই বর্তমান। কিন্তু অস্পৃশ্যতার সংগে জাতিপ্রথার কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নেই, এবং অস্পৃশ্যতা জাতিপ্রথার কোন পরিণামও নয়। ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে এবং তাদের বংশধর

আমেরিকানদের মধ্যে অন্য জাতির সঙ্গে অস্পৃশ্যতাবোধ যেমন তীব্র, এবং তা বজায় রাখার জন্য তারা যে ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করে, যেমন পৃথক ভোজনালয়, পৃথক রেলের কামরা, এমন কি ভ্রমণস্থলগুলির ক্ষেত্রেও পার্থক্য—ডগস্ এন্ড কালার্ডস্ আর নট এলাউড—এরকম কোন ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতবর্ষ কোনদিনই পরিচিত ছিল না। ভারতের জাতিকাঠামোয় একের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য স্বীকৃত এবং প্রতিটি জাতিরই—তা সে ব্রাহ্মণই হোক আর ডোমই হোক—নিজস্ব ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত। একত্র ভোজন, বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাতিসীমার বাইরে না যাওয়া প্রভৃতি বিষয়গুলি জাতিপ্রথার কার্যকর দিকগুলির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। এমনকি জাতিকাঠামোয় যাদের স্থান বেশ উঁচে তারাও এক পঙক্তিতে ভোজন করেনা। আমাদেরই বাল্যকালে নিমন্ত্রণ বাড়ীতে ব্রাহ্মণদের জন্য পৃথক সারির ব্যবস্থা থাকত। আজও পর্যন্ত নিষ্ঠাবান বহু ব্রাহ্মণ স্বপাকে ভোজন করে, আত্মীয় স্বজন, জাতিকুটুম্ব এবং পুত্র-কন্যা পুত্রবধূদের স্পর্শ করা খাদ্য মুখে তোলে না। এই মনোভাবের পিছনে পবিত্রতা-অপবিত্রতাবোধ, দূষণ থেকে সংক্রমিত না হবার প্রবণতাই বর্তমান। ফলে যে সকল জাতির কৌলিক বৃত্তি অপবিত্র, যাদের কাজকারবার দূষিত পদার্থ নিয়ে, তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই অস্পৃশ্যতার কারণ। এছাড়া ভৌগোলিক ও ভাষাগত বিভিন্নতা একই জাতির সংহতির পক্ষে অন্তরায় হওয়ার দরুন, বিভিন্ন এলাকার, বিশেষ করে উচ্চবর্ণের জাতিরা, নিজেদের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার মানসে নানা ধরনের শুদ্ধাচার কঠোরভাবে মেনে চলার ফলে পবিত্রতা-অপবিত্রতা সংক্রান্ত ধারণা সমূহের গুরুত্ব সমাজজীবনে স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায়। উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণের সঙ্গে বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণের সংহতি ভৌগোলিক দূরত্ব ও ভাষাভেদের জন্য সম্ভব নয়। অথচ নিজস্ব এলাকায় এই দুই অঞ্চলের ব্রাহ্মণেরই ভাষা ও অপরাপর কারণে স্থানীয় জাতিগুলির সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটে যাওয়া খুবই সম্ভব। ফলে উভয় স্থানের ব্রাহ্মণকেই একটা শুচিতার কঠোর বর্ম আচ্ছাদন করে নিজস্ব স্বাতন্ত্র ও উচ্চাসন বজায় রাখতে হয়।

অস্ট্রিয় নৃতত্ত্ববিদ এস, এফ নাভেল বলেন যে দূষণ বা অপবিত্রতা সংক্রান্ত ধারণা ভারতীয় জাতিপ্রথাকে অন্যজায়গার অনুরূপ সামাজিক ব্যবস্থার থেকে পৃথক করেছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে দূষণ এবং অপবিত্রতা বলতে ভারতীয় ধ্যানধারণায় কি বোঝায় সেটা জানা দরকার। যেহেতু জীবন পবিত্র, সেইহেতু জীবনহানিকর কোন পেশা, যেমন শিকারজীবীর পেশা, অপবিত্র। মৃত-জীব

তাই স্বাভাবিকভাবেই অপবিত্র এবং যে সব মানুষেরা মৃত জীবের চামড়া, নাড়িভুঁড়ি ইত্যাদি নিয়ে কাজকর্ম করে বা কসাই-এর কাজ করে তাদের পেশা অপবিত্র। মুরগী, শূকর প্রভৃতি জীব মলমূত্র, থুতু, কফ ও নানা আবর্জনা ভক্ষণ করে। এই কারণে এই সকল জীবের মাংসভক্ষণ অপবিত্র। মদ্যপানও একটা অপবিত্র ব্যাপার। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে মৃত্যু, ক্ষয়, দৈহিক পরিত্যক্ত সামগ্রী, রোগ, অপরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এখানে পবিত্রতা-অপবিত্রতার ধারণা গড়ে উঠেছে। এই সকল বিষয় সমাজের প্রতিটি মানুষেরই আচরণবিধিকে নিয়ন্ত্রণ করে। উচ্চজাতির লোক হলেও নিজের জাতিগত ক্ষেত্রেও সে এই সকল অপবিত্র বিষয় সম্পর্কিত আচারবিচার মেনে চলে। এই অপবিত্রতা বা দূষণবোধ শুধু যে ভারতবাসীরই একান্ত নিজস্ব বিষয় তা নয়, কোন-না-কোন ভাবে এই বোধ সর্বত্র ব্যাপ্ত। মৎরচিত 'ইণ্ডিয়ান পিউবার্টি রাইট্‌স' নামক গ্রন্থে দেখানো হয়েছে যে স্ত্রীলোকের মাসিক রজঃস্রাব পৃথিবীর সর্বজাতির মধ্যেই একটা ভয়াবহ অপবিত্র ব্যাপার হিসাবে গণ্য, এবং মেয়েদের এই অবস্থা ঘটলে তাদের পৃথক করে রাখার বিধান সর্বত্রই বর্তমান। রজস্বলা নারীকে স্পর্শ করা বিপজ্জনক এবং তার পরিণাম সাংঘাতিক, একথা শুধু যে হিন্দু-ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে তা নয়, কোরানে এবং বাইবেলের লেভিটিকাসেও বলা হয়েছে। প্লিনি বলেছেন রজস্বলা নারী যদি কোন গাছের তলায় বসে সেই গাছের সকল ফল ঝরে যাবে, সে কোন অস্ত্র স্পর্শ করলে তাতে মরচে ধরবে, সে যে আয়নায় মুখ দেখবে সেই আয়নায় আর প্রতিফলন ঘটবে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে দূষণ বা অপবিত্রতাবোধ একটা মানসিক ব্যাপার যা সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং যা প্রত্যেকেই কোন-না-কোন ভাবে সর্বদাই মেনে চলে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বলা যায় যে এখানে কিছু জাতি বংশানুক্রমিক ভাবে এমন কয়েকটি বৃত্তিতে নিযুক্ত যেগুলির সংগে স্বীকৃত দূষিত বা অপবিত্র বস্তুর সম্পর্ক থাকার দরুন সেগুলি অপবিত্র বৃত্তি হিসাবে গণ্য। যারা এই সকল অপবিত্র বৃত্তির অনুসারী তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা হয়।

বৈদিক সাহিত্যে চর্মম্বা, চণ্ডাল, পৌল্কস, বপ্তা, বিদলকার, বাসঃপল্পূলী প্রভৃতি নিম্নবৃত্তির উল্লেখ থাকলেও এই সকল বৃত্তিধারীরা যে অস্পৃশ্য তা উল্লিখিত হয়নি। বাজসনেয়ী সংহিতায় (৩০।১৭) পৌল্কসদের বীভৎসা আখ্যা দেওয়া হয়েছে, যা থেকে কিন্তু কিছু প্রমাণিত হয়না। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৫।১০।৭) কর্মফল প্রসংগে বলা হয়েছে যে যারা প্রশংসনীয়

কাজকর্ম করে তারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হিসাবে জন্মান্তর গ্রহণ করে। কিন্তু যারা খারাপ কাজকর্ম করে তাদের জন্মান্তর হয় হীন অবস্থায়, শূকর-রূপে, কুকুররূপে অথবা চণ্ডালরূপে। পাণিনি (২।৪।১০) চন্ডালদের 'নিরবসিত শূদ্র' বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু তার অর্থ চণ্ডাল 'অস্পৃশ্য' এরকম হতে পারেনা। ধর্মশাস্ত্র সমূহের যুক্তিপদ্ধতি অনুযায়ী চাতুর্বর্ণের কেউই অস্পৃশ্য নয়, এছাড়া সংকরজাতি হিসাবে যারা পরিচিত, অনুলোম বা প্রতিলোম যে রকমই হোক না কেন, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তারা শাস্ত্রানু-মোদিত জাতিসমূহ থেকে উদ্ভূত। মনু (১০।৪১) পরিস্কার বলেন যে প্রতিলোম জাতিসমূহ শূদ্র ধর্মাবলম্বী। কাজেই তত্ত্বের দিক থেকে চাতুর্বর্ণ ও তার থেকে উপজাত জাতিসমূহ অস্পৃশ্য হতে পারেনা। তাহলে অস্পৃশ্যতা অন্যান্য বাস্তব অবস্থা বা শর্তের উপর নির্ভরশীল যেগুলির সঙ্গে ধর্ম-শাস্ত্রোক্ত বিধিসমূহের সম্পর্ক একান্তভাবেই পরোক্ষ। যে সকল ঐতিহাসিক পদ্ধতির ভিতর দিয়ে অস্পৃশ্যতা সংক্রান্ত ধ্যানধারণার উদ্ভব হয়েছে সেগুলির ইঙ্গিত অবশ্য ধর্মশাস্ত্র থেকে পাওয়া যায়। কোন গুরুতর অপরাধের জন্য জাতিচ্যুতির বিধান এই প্রথা গড়ে ওঠার একটি কারণ। মনু (৯।২৩৫-৩৯) বলেন যে যারা ব্রহ্মহত্যা করে, ব্রাহ্মণের সর্বস্ব অপহরণ করে, মাদকদ্রব্য ব্যবহার ও অপরাপর নিন্দিত কর্ম করে, তাহলে কেউ যেন তাদের সঙ্গে ভোজন না করে, তাদের শিক্ষাদান না করে, তাদের পৌরোহিত্য না করে, তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন না করে, কেননা তারা বৈদিক ধর্ম থেকে বিচ্যুত। দ্বিতীয়ত, বিধর্মীরা কোন কোন ক্ষেত্রে অস্পৃশ্য হিসাবে গণ্য। অপরার্ক ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ উদ্ধৃত করে বলেন যে বৌদ্ধ, পাশুপত, জৈন, লোকায়ত, কাপিল (সাংখ্যপন্থী), বেয়াড়া-ব্রাহ্মণ, শৈব এবং নাস্তিককে স্পর্শ করলে স্নান করতে হয়। তৃতীয়ত, ভিন্ন সংস্কৃতির ও বাইরের দেশের লোকেরা যারা ম্লেচ্ছ হিসাবে পরিগণিত, তাদের অপবিত্র হিসাবে গণ্য করা হয় এবং সেই কারণে তারাও অস্পৃশ্য হতে পারে। চতুর্থত, কতকগুলি পেশাকে অপবিত্র বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সংবর্ত সংহিতা থেকে উদ্ধৃত করে অপরার্ক বলেন যে ধীবর, শিকারজীবী, রজক প্রভৃতিকে স্পর্শ করলে স্নান করার পর তবেই খাদ্যগ্রহণ করা যাবে।

এই জাতীয় বাধানিষেধের মূলে ততটা সামাজিক ঘৃণার মনোভাব নেই, যতটা আছে স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্নতার তাগিদ। দৈহিক শুচিতার উপর ভারতীয় মনের একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে। এখানে মনের সঙ্গে দেহের

শুচিতার উপরও মোক্ষলাভের ধারণা নির্ভরশীল। এই পবিত্রতা-অপবিত্রতা, দূষণের সংক্রমণ থেকে দূরে থাকার পিছনের মনস্তত্ত্ব বড় অদ্ভুত এবং তার প্রকাশভঙ্গীও বিচিত্র, যেটা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পারার দরুন অনেকেই অস্পৃশ্যতার পিছনে গভীর জাতিবিদ্বেষের ছায়া দেখতে পান। একদিকে যেমন প্রতি গৃহস্থেরই বৈশ্যদেবকে খাদ্য নিবেদন করার পর চণ্ডলাদি জাতিদের অন্নপ্রদান অবশ্য কর্তব্য, অপর দিকে তেমনই কুকুর স্পর্শ করলে এমন কি কোন বিশেষ গাছগাছড়া স্পর্শ করলেও স্নান করতে হয় (আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ১।৫।১৫।১৬, ২।৪ ৯ ৫, বশিষ্ঠ ২৩।৩৩, বিষ্ণু ২২।৬৯, বৃদ্ধহারীত ১১।৯৯-১০২)। কোন ব্যক্তির নিকট আত্মীয়া মহিলা—জননী, জায়া, ভগিনী, কন্যা, যেই হোক না কেন—রজস্বলা হলে অস্পৃশ্যা স্বরূপ গণ্য হয়। কোন ঘনিষ্ট বান্ধবের শোক-অশৌচকালে তাকে স্পর্শ করা নিষেধ। ভোজনকালে নিজপুত্রকেও স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। এই বিচিত্র পবিত্রতা-অপবিত্রতা বোধের সংগে সামাজিক মর্যাদার কোন স্তরের বিশেষ সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়না। অত্রি স্মৃতিতে বলা হয়েছে যে কোন মন্দিরে, ধর্মস্থানে বা ধর্মীয় মিছিলে বিবাহ সভায়, যজ্ঞস্থলে বা উৎসবকালে তথাকথিত কোন অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করলে দোষ হয় না। একথা স্মৃতি চন্দ্রিকা, স্মৃত্যর্থসার প্রভৃতি গ্রন্থেও বলা হয়েছে। পরাশর-মাধবীয়তে বলা হয়েছে যে বৃহৎ পুষ্করিণী থেকে সকলেই জল ব্যবহার করতে পারে। দক্ষিণ ভারতে রাস্তায় স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যদের যে পার্থক্য কিছুকাল আগে পর্যন্ত বজায় ছিল, এই প্রসংগে যাজ্ঞবল্ক্য ১।১৯৪-১৯৭ উদ্ধৃত করা যায় যেখানে বলা হয়েছে রাস্তাঘাট-গৃহাদি চন্দ্রসূর্যের আলোর ও বায়ুর দ্বারা সর্বদাই পবিত্র। সেখানে কোন দূষণ ঘটতে পারেনা। অন্ত্যজ ও অন্ত্যাবসায়ীদের, যাদের সচরাচর অস্পৃশ্য বলে গণ্য করা হয়, যদিও উপনয়নাদি বৈদিক সংস্কারের যোগ্য নয়, ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে অপরাপর শূদ্র জাতির সমান অধিকার প্রাপ্ত। নির্ণয়সিন্ধু গ্রন্থে দেবীপুরাণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে অন্তজরা ভৈরবের মন্দির স্থাপনের অধিকারী। ভাগবত-পুরাণেও (১০।৭০।৪৩) অন্ত্যজদের ধর্মাচরণের স্বাধীন অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। তামিল আড়বার সাধকদের মধ্যে তিরুপ্পান অন্ত্যজ ছিলেন, নম্মাড়বার বেড়োর জাতিভুক্ত ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য ৩।২৬২-র মিতাক্ষরা ভাষ্যে চণ্ডালসহ প্রতিলোম জাতিসমূহের নানা ব্রত পালনের অধিকার মেনে নেওয়া হয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে অবশ্য যেন কেউ মনে না করেন যে ভারতীয় সমাজে অস্পৃশ্যতার ব্যাপারটা খুব হাল্কা ধরনের। আমরা যেটা বলতে

চেয়েছি তা হচ্ছে এই যে জাতিপ্রথার সংগে অস্পৃশ্যতার কোন জৈবিক সম্পর্কের বিষয় ধর্মশাস্ত্রগুলির দ্বারা সমর্থিত হয় না। কিন্তু এক্ষেত্রে তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবের ফারাক আছে। অস্পৃশ্য হিসাবে বরাবরের ছাপমারা কোন জাতি না থাকলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অন্ত্যজ, অন্ত্যাবসায়ী ও চণ্ডাল শ্রেণীভুক্ত জাতিরা অস্পৃশ্যদের কোঠায় পড়ে। চণ্ডাল বলতে ঠিক কাদের বোঝায় বলা শক্ত। গৌতম ধর্মসূত্র (৪।১৫, ৪।২০) অনুযায়ী শূদ্র পুরুষ ও ব্রাহ্মণনারীর প্রতিলোম সংকর চণ্ডাল বলে গণ্য হয়। সেক্ষেত্রে চণ্ডালের অস্পৃশ্য হবার কারণ নেই। শাস্ত্রের কথা বাদ দিলে, বঙ্গদেশে চণ্ডাল নামক জাতি-হিসাবে যারা পরিচিত, দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তারা উচ্চবর্ণদের সমতুল্য, অধিকাংশেরই গাত্রবর্ণ গৌর কিংবা উজ্জ্বল শ্যাম, যা উচ্চবর্ণের ক্ষেত্রেও সর্বদা দেখা যায় না। বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রে উত্তরসাধিকা হিসাবে চণ্ডালীর বিশেষ ভূমিকা স্বীকৃত, এবং মানবদেহের স্নায়ুতন্ত্রের একটি বিশেষ এলাকা চণ্ডাল নামে পরিচিত। মনে হয় চণ্ডাল শব্দটির ব্যাপক ও সংকীর্ণ উভয় অর্থেই প্রয়োগ ছিল, সংকীর্ণ অর্থে প্রতিলোম-সংকর চণ্ডাল জাতি এবং ব্যাপক অর্থে সেই সকল অতি-নিম্ন পর্যায়ের জাতি যাদের সম্পর্কে আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে (২।১।২ ৮-৯) বলা হয়েছে যে তাদের স্পর্শ করলে স্নান করতে হবে, কথা বললে ব্রাহ্মণের সংগে কথা বলে শুদ্ধ হতে হবে এবং চোখে দেখলে সূর্য, চন্দ্র অথবা তারকাদের দেখে চোখ পবিত্র করতে হবে। মনু (১০।৩৬, ১০।৫১) অন্ধ্র, মেদ, চণ্ডাল ও শ্বপচের বাসস্থান গ্রামের বাইরে নির্দিষ্ট করেছেন, এবং অন্ত্যাবসায়ীদের (১০।৩৯) বাসস্থান নির্দিষ্ট করেছেন শ্মশানের কাছাকাছি। অপরার্ক হারীত উদ্ধৃত করে বলেন যে রজক, চর্মকার, নট, বুরুড়, মেদ প্রভৃতি অন্তজদের সংগে স্পর্শ ঘটে গেলে দেহের যে অংশে স্পর্শ ঘটেছে সেই অংশটুকু ধুয়ে ফেলতে হবে যেখানে অঙ্গিরাঃ বলেন যে এমতা-বস্থায় একবার আচমন করলেই কাজ হয়ে যায়। নিত্যাচার পদ্ধতি গ্রন্থে বলা হয়েছে যে চণ্ডাল বা পুক্কস শুদ্ধাবস্থায় থাকলে সেই সময় স্পর্শ ঘটে গেলে কিছুই করতে হয়না। মনু (১০ ১৩) বলেন যে একমাত্র চণ্ডাল ছাড়া সূত, মাগধ, আয়োগব, বৈদেহিক, ক্ষত্ প্রভৃতি জাতিকে স্পর্শ করলে স্নান করতে হয় না। 'অস্পৃশ্য' শব্দটির প্রথম প্রত্যক্ষ উল্লেখ পাওয়া যায় বিষ্ণুধর্মসূত্রে (৫।১০৪), যে পর্যায়ে চন্ডাল, ম্লেচ্ছ ও পারসিকদের স্থান দেওয়া হয়েছে।

বস্তুত মনু চন্ডাল ছাড়া আর কোন জাতিকেই অস্পৃশ্য বলে স্বীকার করেন না। তাঁর ভাষ্যকারদ্বয় এবং অন্যান্য স্মৃতি ও নিবন্ধকাররা চণ্ডাল

ছাড়া অপরাপর জাতির উপর সদয়। চণ্ডালদের উপর শাস্ত্রকারদের এতটা ক্রোধের কারণ কি তা নির্ণয় করা অতীব দুরূহ। শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা মানতে গেলে চণ্ডাল শূদ্র পুরুষ ও ব্রাহ্মণ নারীর সংকর, যেখানে চর্মকার শূদ্র পুরুষ ও বৈশ্য নারীর সংকর। সেই হিসাবে প্রথমোক্তের জাতিগত মর্যাদা শেষোক্তদের চেয়ে বেশি হতে বাধ্য। কিন্তু বাস্তবে চণ্ডাল অধিকতর নিন্দিত। বর্তমান লেখকের ধারণা ব্রাহ্মণকন্যার সংগে যৌনসংসর্গের ব্যাপারটা শাস্ত্রকাররা এতই অনুচিত ও আপত্তিকর মনে করতেন যে এই জাতীয় মিলন যাতে না হতে পারে সেই দৃষ্টিকোণে চণ্ডালদের এমন হেয় ও ঘৃণ্য হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। অবশ্য এ ধারণা সঠিক নাও হতে পারে। সে যাই হোক চণ্ডালের ছায়া মাড়ানো পাপ এমন কথা অন্তত মনু বলেননি। তিনি (৪।১৩০) বলেছেন যে কেউ যেন জেনেশুনে কোন দেবমূর্তির ছায়া, গুরুর ছায়া, রাজার ছায়া, স্নাতকের ছায়া, আচার্যের ছায়া, বাদামী রঙের কাকের ছায়া এবং বৈদিক যজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তির ছায়া না মাড়ায়। এতে চণ্ডাল বা নিম্নজাতির ছায়া মাড়ানোর কোন উল্লেখই নেই। কিন্তু এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মেধাতিথি বলেন যে এখানে 'ছায়া' বলতে 'চণ্ডাল এবং অনুরূপ জাতির ছায়াকে' বুঝিয়েছে। মনুস্মৃতির অপর ব্যাখ্যাকার কুল্লুক মেধাতিথির বক্তব্যকে যুক্তিসিদ্ধ করার জন্য একটু কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, মনু যে 'চ' শব্দটির উল্লেখ করেছেন (চ' শব্দের অর্থ 'এবং') সেটা আসলে চণ্ডাল শব্দের আদ্যাক্ষর। বস্তুত চণ্ডাল, অন্ত্যজ প্রভৃতি জাতিদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র ও সেগুলির টীকাগ্রন্থে অনেক পরস্পর বিরোধী কথা আছে যা থেকে নিম্নোক্ত কয়েকটি সিদ্ধান্তে আসা যায়। প্রথম, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের ব্যাপারটিকে আগের যুগের ধর্মশাস্ত্রকাররা অপবিত্রতা-অপরিচ্ছন্নতা-দূষণ প্রভৃতি ধর্মাচরণ ও শুদ্ধাচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জটিল মনস্তাত্ত্বিক ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত করেছিলেন। দ্বিতীয়, এই সকল ধারণা ক্রমশ কতকগুলি বৃত্তির উপর আরোপিত হয় যেগুলি অপবিত্র বৃত্তি হিসাবে গণ্য হয়। তৃতীয়, এই সকল বৃত্তিজীবী জাতিরা, নিজেদের পেশার জন্যই অন্যান্য জাতির থেকে পবিত্রতা-অপবিত্রতা বা পরিচ্ছন্নতা-অপরিচ্ছন্নতার ভিত্তিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, এবং অন্যান্য পরিচ্ছন্ন বৃত্তিজীবীরা তাদের স্পর্শ বা সংক্রমণ থেকে বিরত হতে থাকে। চতুর্থ, এই ভাবে গড়ে ওঠা অস্পৃশ্য জাতিদের সামাজিক অবস্থান, কর্তব্য-অকর্তব্য প্রভৃতি বিষয়সমূহকে সুনির্দিষ্ট করার প্রয়োজনে পরবর্তী-কালের স্মৃতিকাররা পূর্ববর্তীদের রচনাংশ থেকে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী, বুদ্ধি-

বিবেচনা ও বাস্তব পরিস্থিতির ভিত্তিতে কিছু কিছু নির্দেশ প্রণয়ন করেন যেগুলির মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই কিছুটা অনৈক্য ও পরস্পরবিরোধিতা দেখা যায়। অস্পৃশ্য জাতিদের একটা মোটামুটি পরিচয় পরবর্তী অনুচ্ছেদে দেওয়া হল।

৪॥ নিম্ন পর্যায়ের জাতিসমূহ

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে চণ্ডাল, শ্বপচ, মৃতপ প্রভৃতি জনগোষ্ঠী ঐতিহাসিকভাবেই ধর্মশাস্ত্রসমূহের যুগ থেকে (খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের পর থেকেই) জনসাধারণের অপরাপর অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করেছিল, অপবিত্রতা, হীন পেশা, অধম-বর্ণসংকরত্ব, ভিন্ন নৃগোষ্ঠী যে কোন কারণেই হোক। অন্যান্য নিম্ন বৃত্তিধারী জাতিরাও এভাবে বিছিন্ন হতে শুরু করে। জাতকসমূহেও দেখা যায় চণ্ডাল প্রভৃতি জাতি কার্যত অস্পৃশ্য এবং তারা আবর্জনা পরিষ্কার প্রভৃতি হীনধরনের কাজ করে থাকে। কৌটিল্য সংকর জাতিসমূহের বৈধ অস্তিত্ব, অন্তর্বিবাহ ও শাস্ত্রনির্দিষ্ট পেশা মেনে নিয়ে তাদের শূদ্রবর্ণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, কিন্তু চন্ডালদের সম্পর্কে বলেছেন যে অন্য মিশ্রজাতিরা যেন তাদের থেকে দূরে থাকে। বৌধায়ন (১।৮।৯।১১) ও মনু (১০।১৯, ৩৭-৩৯, ৫১) শ্বপাক নামক আরও একটি চণ্ডালের অনুরূপ জাতির উল্লেখ করেছেন, কৌটিল্য (কাংলের অনুবাদ ২৯৮) যাদের উগ্র পুরুষ ও ক্ষত্রি নারীর সংকর বলে বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত এরাই পতঞ্জলি কথিত শ্বপচ (পাণিনি ৩।১।১৩৪ এর ভাষ্য)। পতঞ্জলি মৃতপ নামক অনুরূপ আর একটি জাতির কথা বলেছেন। সম্ভবত শ্বপচ, মৃতপ প্রভৃতি পরবর্তীকালে ডোম বলে পরিচিত হয়েছে। হেমচন্দ্র তাঁর 'দেশিনাম-মালা' গ্রন্থে বলেন যে ডুম্ব (ডোম) শব্দটি শ্বপচেরই দেশী নাম। তিনি একথারও উল্লেখ করেছেন যে চণ্ডালরা লাঠি ঠুকে ঠুকে পথ চলত যাতে অন্যের সংগে তাদের স্পর্শ না হয়। এই কারণে তাদের দেশী নাম ঝজ্ঝার। রাজ-তরঙ্গিনী গ্রন্থে কলহণ বলেন যে রাজা চক্রবর্মা হংসী এবং নাগলতা নামে দুই ডোমকন্যার প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন। এদের শ্বপাকি বলে অভিহিত করা হয়েছে। তবে এই সকল জাতির পতিতদশা একদিনেই হয়নি, বা সর্বত্র একই ভাবে হয়নি। অল-বিরুণী বলেছেন যে ডোম ও চণ্ডাল জাতিপ্রথার বাইরে অবস্থিত এবং তারা আবর্জনা পরিষ্কার প্রভৃতি কাজ করে থাকে, যদিও অল-বিরুণীর বহু বহু পূর্বে পতঞ্জলি চণ্ডাল, মৃতপ প্রভৃতিদের শূদ্র হিসাবে গণ্য

করেছিলেন। কাশ্মীর অঞ্চলে ডোম ও চণ্ডালরা নীচজাতি বলে গণ্য হলেও, রাজতরঙ্গিনী থেকে জানা যায় যে তারা সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করতে পারত, এবং তাদের মধ্যে বিচক্ষণেরা উপরতলার মানুষদের সঙ্গেও নানা ধরনের সম্পর্ক রাখত। বস্তুত চণ্ডাল প্রভৃতির প্রতি ধর্মশাস্ত্র সমূহে যে ধরনের ব্যবহারের নির্দেশ আছে তা যে সর্বত্রই মেনে চলা হত তার প্রমাণ নেই। রামায়ণে গুহক-চণ্ডালের সঙ্গে রামচন্দ্রের প্রীতিপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লিখিত হয়েছে, পক্ষান্তরে বৌদ্ধগ্রন্থে দেখা যায় শ্রেষ্ঠীকন্যা চণ্ডালকে দেখার পর গোলাপজল দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলছে।

বঙ্গদেশে চণ্ডালদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী অন্য নিম্নজাতির তুলনায় উদার। এখানে তাদের সংখ্যা তিরিশ লক্ষের মত, বেশিরভাগই পূর্ববঙ্গের বাসিন্দা। নমঃশূদ্র নামে যারা পরিচিত, আমরা আগেই বলেছি যে তাদের সঙ্গে উচ্চবর্ণের মানুষদের দৈহিক বৈশিষ্টের পার্থক্য চোখে পড়ে না। তারা আটটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত, যারা নিজেদের মধ্যে খাওয়াদাওয়া-বিবাহাদি ক্ষেত্রে পার্থক্য বজায় রাখে। পেশায় তারা মোটের উপর কৃষিজীবী ও নৌচালক, যদিও বর্তমানে নানা উচ্চতর পেশায় নিযুক্ত। তফশীলী জাতিভুক্ত হওয়ার কারণে, সরকারী সুযোগ সুবিধা ঠিকমত নিজেদের অনুকূলে নিতে পারার দরুন, বঙ্গদেশের অন্যান্য তফশীলী জাতিদের মধ্যে তারা কুলীন হিসাবে গণ্য হয়। ভারতের অন্যত্র চণ্ডাল বা নমঃশূদ্র বলে পরিচিত জাতির সন্ধান পাওয়া যায় না, তবে সিমলা পাহাড় অঞ্চলের চনাল নামে এক জাতি আছে, যাদের পেশা মৃত পশুর ছাল ছাড়ানো ও চর্মকারবৃত্তি। তাদের সঙ্গে চণ্ডালদের নামগত সাদৃশ্য বর্তমান। তফশীলী জাতিদের তালিকায় চণ্ডাল পর্যায়ের জাতি হিসাবে চনাল ও চণ্ডাল তামিলনাড়ু, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব ও হরিয়ানায়, নমঃশূদ্র আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে এবং ডোম বিহার, তামিলনাড়ু, উড়িষ্যা, রাজস্থান ও পশ্চিমবঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত হয়েছে।

ডোমাদের বসতি সারা ভারত জুড়ে। বঙ্গদেশে ডোমরা যে একদা সামরিক জাতি হিসাবে প্রসিদ্ধ হয়েছিল, তার ইঙ্গিত প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বর্তমান। পাঞ্জাবে ডোমরা নৃত্যগীতবাদ্য, আবর্জনা পরিষ্কার ও বেতের কাজকর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করে। কুমায়ুন ও গাড়োয়ালে ডোমরা কৃষিজীবী ও কারুশিল্পী। বিহার ও উত্তরপ্রদেশে দুই ধরনের ডোম বর্তমান, স্থায়ী বাসিন্দা ডোম যারা ঝুড়ি-মাদুর তৈরি করে এবং ফরাশের কাজ করে এবং যাযাবর ডোম যারা অপরাধমূলক কাজকর্ম করে। অন্ধ্রপ্রদেশে তারা মোটা-

কাপড় বয়ন করে, এবং দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থানে তারা বাজীকর এবং নানা দৈহিক কসরৎ দেখিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। দাক্ষিণাত্যের পার্বত্য অঞ্চলের ডোমরা চার শ্রেণীতে বিভক্ত—ভূমিশ্রমিক, তাঁতী ও ধাতুর কারিগর ; বেত এবং অপরাপর নিম্ন বিষয়ের কারিগর ; ঝাড়ফুঁককারী, মালবাহক ও চর্মকার ; এবং সংগীতশিল্পী, তপস্বী ও দর্জি। পাঞ্জাব অঞ্চলে ডুম বা মিরাশী নামে একটি জাতি আছি, যারা ধর্মে মুসলমান, এবং পেশায় প্রধানত গাইয়ে-বাজিয়ে। এদের কথা আগে বলা হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের ডোম্বার বা ডোম্মাররা ডোম শ্রেণীভুক্ত ও নিম্নবৃত্তি সম্পন্ন। ডোমসদৃশ অপরাপর জাতিদের মধ্যে পাঞ্জাবের চুহ্‌রা, রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রের ভাংগি-মেথর, বংগদেশের ভুইমালি এবং হাড়ি এবং উড়িষ্যার হাড্ডিরা উল্লেখযোগ্য, যাদের প্রধান বৃত্তি আবর্জনা পরিষ্কার করা। অন্ধ্র প্রদেশের মালা এবং তামিল-নাড়ুর পারিয়ানরাও এই একই বৃত্তি অনুসরণ করে। এছাড়া মালারা চামড়ার কাজ করে এবং পারিয়ানরা ভূমিশ্রমিকের কাজ করে। এই দুই জাতির মারাঠী প্রতিরূপ মহার নামে পরিচিত।

চণ্ডালশ্রেণীর জাতিদের মত চর্মকার শ্রেণীর জাতিরাও রীতিমত প্রাচীনত্ব দাবি করতে পারে। চর্মকারের বৃত্তি বৈদিক সাহিত্যেও উল্লিখিত। মনু দুই ধরনের চর্মকারের উল্লেখ করেছেন—কারাবর এবং ধিগ্‌বন। প্রথমটি সম্ভবত সেই পেশার মানুষ যারা পশুদেহ থেকে চামড়া কর্তন করে এবং চামড়া তৈরি করে। দ্বিতীয়টি, যারা চামড়ার কাজ করে, যেমন মুচি। সে যাই হোক, চর্মকারেরা উত্তরভারতে ব্যাপকভাবে চামার হিসাবে প্রসিদ্ধ। চামড়ার কাজ ছাড়াও তাদের একাংশ দৈহিক পরিশ্রমের কাজ করে। মুচি বা মোচিরা চামারদের শাখা হলেও সর্বত্র তাদের মর্যাদা সমান নয়। গুজরাত ও মহারাষ্ট্রের কোন কোন অঞ্চলের মুচিদের তফশিলী জাতির তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। চামাররা কিন্তু অস্পৃশ্য হিসাবে গণ্য হয়না। বংগদেশের চামাররা তাদের উদ্ভব সন্ত রবিদাস থেকে টেনে থাকে। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের অধিকাংশ চর্মকার রবিদাসপন্থী। বংগদেশের চামারদের এক অংশ শ্রীনারায়ণ সম্প্রদায় ভুক্ত। উত্তর ভারতের চামারদের মধ্যে সৎনামী অনেক আছে যারা মাছ মাংস, পেঁয়াজ প্রভৃতি ভক্ষণ করেনা বা মদ্যপান করে না। বিহারের চামাররা গোঁড়া হিন্দু, হিন্দু দেবদেবীর পূজা করে, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে মৈথিলী ব্রাহ্মণদের পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করে। জৌনপুরের চামাররাও গোঁড়া হিন্দু। দক্ষিণ ভারতে মাদিগা এবং চাক্কিলিয়ানরা চামারের কাজ করে। মালাদের একটা অংশও এই পেশায় নিযুক্ত।

শুধু অস্পৃশ্যদের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের কোরি উল্লেখযোগ্য। বিহারে এই রকম সতেরটি জাতি আছে যাদের মধ্যে দোসাধ ও মুসাহাররা সংখ্যায় বেশি। বংগদেশের রাজবংশী কোচ এবং বাগদি, তামিলনাড়ুর পাল্লান, শানার এবং তিয়ান এই পর্যায়ের অন্তর্গত। বংগদেশের রাজবংশী-কোচরা ভূমাধিকারী জাতি এবং বাগদি, বাউরি, কৈবর্তদের মত তাদেরও জালিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। অনেক রাজবংশী-কোচ উপবীত ধারণ করে ক্ষত্রিয়ত্বের মর্যাদা লাভে ইচ্ছুক। বিহারী মুসাহার, বাঙালী বাগদি এবং তামিল পাল্লানরা ভূমি-শ্রমিক। পাল্লান এবং পাল্লি পৃথক জাতি, শেষোক্তরা শূদ্র এবং তাদের স্পর্শ বিশেষ দোষণীয় নয়। বিহারী দোসাধরা চুরি ডাকাতি করে জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের বেশ কিছু অংশ দৈহিক শ্রমজীবী। শেষ-মধ্যযুগে এদের একটা অংশ স্থানীয় রাজশক্তি সমূহের সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত ছিল। কিছু কিছু কারিগর জাতিও অস্পৃশ্য, যেমন উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের কোরি জাতি যারা পেশায় তন্তুবায়। বিহার ও উত্তরপ্রদেশের পাশিরা তাড়ি সংগ্রহক। দক্ষিণের তিয়ান ও শানাররাও একই পেশায় নিযুক্ত।

৫ ॥ জাতি-নাম সমূহের তাৎপর্য

বিভিন্ন জাতি-নামের নানাধরনের সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ভাষা-তাত্ত্বিক তাৎপর্য বর্তমান। বৃত্তির নাম থেকে অসংখ্য জাতিনাম স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠেছে। আমরা আগে দেখেছি বানিয়া বা বণিক জাতি স্বাভাবিকভাবেই তাদের বাণিজ্যিক পেশার দৌলতে ওই নামে পরিচিত হয়েছে। তামিল চেট্টি সংস্কৃত শ্রেষ্ঠী থেকে এসেছে। পাঞ্জাব অঞ্চলে জাঠ শব্দটির দ্বারা কৃষিজীবী বোঝায়, যেমন তামিলে বেল্লাল এবং কন্নড়ে ভোক্কালিগা। কুর্মী এবং কুনবি বলতেও বোঝায় কৃষিজীবী। মধ্যপ্রদেশের লোধা জাতিও কৃষিজীবী, লোধা শব্দের অর্থ 'যে মাটির চাপড়া ভাঙে'। পশুপালক জাতিনাম সমূহ, যেমন গোয়ালা বা গাওলি, গোপ প্রভৃতি সংস্কৃত 'গো' বা গাভীবাচক শব্দ থেকেই উদ্ভূত। লোহার, তাম্বাত, কাসার, থথেরা প্রভৃতি ধাতুর কারিগর জাতির নাম তারা যে ধাতু নিয়ে কাজ করে সেই ধাতু থেকেই গড়ে উঠেছে। বুনকর, জোরিয়া, তাঁতী, কোষ্ঠি, পটওয়া, পত্তানুলকারণ, সালে প্রভৃতি জাতি তন্তুবায়-বৃত্তি অনুসরণকারী; কুম্বার, কুম্ভার, কুমাবরা কুম্ভকার-বৃত্তি অবলম্বী; তিলি বা তেলি তৈলকার, তিল বা তেলের কারবারী; সোনি বা সোনার স্বর্ণকার; বারহাই, তর্খন, তচ্ছন, সুতার প্রভৃতি তক্ষণ বা

সূত্রধর ; লুনিয়া ও অগ্রি জাতি লবণ প্রস্তুতকারক ; বারি জাতি গাছের পাতা দিয়ে ঠোঙা তৈরী করে, বার শব্দটির অর্থ রোপণ ; তাম্বুলী বা তামলিদের নামকরণ তাম্বুল বা পান থেকে ; ধারুকার শব্দটির অর্থ দড়ি প্রস্তুতকারী। বাঁশফোড়ের অর্থ যারা বাঁশের কাজ করে ; চামার বা চাম্ভারের নামকরণের উৎস চর্ম, যা নিয়ে তারা কাজ করে ; কাহার শব্দের অর্থ জলবাহক ; পাশিরা 'পাশ বা ফাঁসের সাহায্যে গাছে ওঠে বা শিকার ধরে ; গদারিয়া শব্দটি প্রাচীন হিন্দী গাদর থেকে এসেছে যার অর্থ ভেড়া ; এই জাতি মেষপালক। কাজেই পেশার নামে জাতির নামকরণ খুবই স্বাভাবিকভাবে ঘটে। এছাড়া বহু জাতিনাম আছে যেগুলি উপজাতি সমূহের নাম থেকে সোজাসুজি এসেছে, যেমন অরোরা, গুজর, লোহানা, ভাটিয়া, মীনা, ভীল, ডোম, ওরাওঁ, মুণ্ডা, সাঁওতাল, কোচ, আহির, মহার, নায়ার, মারাঠা, গোন্দ, খন্দ প্রভৃতি। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নামে জাতির নামকরণের কিছু দৃষ্টান্ত পূর্বে দেওয়া হয়েছে।

আবার এমন কিছু জাতি আছে যাদের নাম তাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। উত্তরপ্রদেশের ও বিহারের মুসাহাররা ভূমিশ্রমিক, যাদের নামের অর্থ ইঁদুর-খেকো। ভাঙ্গি, যারা পেশায় মেথর, ভঙ্গ শব্দ থেকে এসেছে, অর্থাৎ যারা ভেঙে গিয়ে অন্য কোন সত্তায় পরিণত হয়েছে। উড়িষ্যায় ভুলিয়া বলে একটি তাঁতী জাতি আছে ; নামটির উৎস 'ভুলনা' বা 'ভুলে যাওয়া'। মধ্যপ্রদেশের একটি কৃষিজীবী জাতির নাম দাঙ্গি ; তারা আগে খুবই দাঙ্গাবাজ ছিল, যে কারণে এই নামকরণ। ওই অঞ্চলেরই একটি তন্তুবায় জাতি পনেক নামে পরিচিত ; নামটি এসেছে পানি-কা বা জলবহনকারী থেকে, যা তাদের পূর্বতন পেশা ছিল। গুজরাতের দুবলা জাতির নামের অর্থ যারা দৈহিকভাবে দুর্বল। ওই অঞ্চলের নাইকদা জাতির নাম নায়ক থেকে এসেছে, অবশ্য তুচ্ছার্থে। দাক্ষিণাত্যের রামোসি, যাদের পেশা প্রধানত চুরি ডাকাতি, রামবংশী শব্দটির সংক্ষিপ্ত রূপ, কেননা তারা খোদ রামচন্দ্রের বংশধরত্বের দাবিদার। তামিলনাড়ুর কল্লান জাতির নামের অর্থ চোর। তিয়ান, যারা তাড়িসংগ্রাহক, অর্থের বিচারে 'দক্ষিণী', কেননা তারা নিজেদের সিংহলজাত বলে মনে করে। পারিয়া শব্দটির অর্থ ঢাকজাতীয় বাদ্য। দক্ষিণের অস্পৃশ্য পারিয়া জাতির নামকরণের উৎস ওই ঢাকের বাদ্য। কিছু জাতিনামের উৎস জন্মদোষ অর্থাৎ একালের সংকরত্ব। উড়িষ্যার কায়স্থদের সেবাদাসী হিসাবে ভণ্ডারি জাতির মেয়েরা কাজ করে। উভয়ের মিলনজাত সন্তান শাগিরদাপেশা নামক জাতিতে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে

রাজপুত পুরুষ ও ভীল রমনীর সন্তানরা ভীলাল নামে পরিচিত। মধ্য-ভারতের বিদুর জাতিও এইরূপ দুই জাতিভুক্ত নরনারীর মিলন জাত।

গোবিন্দ সদাশিব ঘুর্যে বলেন যে বিভিন্ন উপবর্ণ বা শাখাজাতির (ইংরাজীতে যাদের বলা হয় সাব-কাস্ট) নামসমূহ পর্যালোচনা করলে সাতটি বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে। প্রথম আঞ্চলিক বা এলাকাগত পার্থক্য; দ্বিতীয়, মিশ্র উদ্ভব; তৃতীয়, পেশাগত বৈশিষ্ট্য; চতুর্থ, পেশাগত কৌশল বৈশিষ্ট্য; পঞ্চম, সাম্প্রদায়িক পার্থক্য; ষষ্ঠ, প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠানগত পার্থক্য; এবং সপ্তম, আরও কয়েকটি অনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য।

আঞ্চলিক বা এলাকাগত পার্থক্য অনুযায়ী জাতিনাম বা শাখাজাতি নামের পার্থক্য বহু ক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্ট করা যায়। মধ্যপ্রদেশের আহির শাখাজাতি-সমূহের মধ্যে জিঝোটিয়াদের নামকরণ জঝোটি বা বুন্দেলখণ্ডের নামানুসারে, নারওয়ারিয়া নারওয়ার থেকে, কনৌজিয়া কনৌজ থেকে, এবং কোসারিয়া কোসল বা ছত্তিশগড় থেকে। বারাইদের শাখাজাতিগুলির মধ্যে চৌরাশিয়াদের নামকরণ হয়েছে মির্জাপুরের চৌরাশী পরগণা থেকে, পানাগরিয়া জবলপুরের পানাগর থেকে, মহোবিয়া মহোবা থেকে, জৈসোয়ার রায় বেরিলী জেলার জৈস থেকে এবং গঙ্গাপারি গঙ্গার পার থেকে। বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র তথা দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য বৈদিক নামকরণের ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতার প্রভাব সুস্পষ্ট। ব্রাহ্মণদের বিভিন্ন শাখার নামকরণ বহু ক্ষেত্রে স্থাননামের ভিত্তিতে হয়েছে যেমন কনৌজিয়া, মৈথিল, জিঝোতিয়া, সারস্বত (সরস্বতী নদী অঞ্চল), গৌড়, কোংকনস্থ, দেশস্থ। গুজরাতী ব্রাহ্মণদের বিভিন্ন শাখা স্থাননাম অনুসারী, যথা অগ্রবাল, দেশবাল, হরসোলা, ঝারোলা, মোধ, নাগর, ওসবাল, পোরবাল, শ্রীমালী, সোরাঠিয়া প্রভৃতি। তেলুগু ব্রাহ্মণদের নামের ক্ষেত্রে বেলনাড়, বেঙ্গি-নাড়., কসল-নাড়., মুর্লকি-নাড়ু তেলগ-নাড়ু প্রভৃতি স্থানের ইঙ্গিত আছে।

বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী এবং পেশাগত জাতির সংমিশ্রণে কিছু জাতির উদ্ভব হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের পানচাষী বরই (বারুই) জাতির একটি শাখাজাতি আছে যারা কুম্ভারধঙ্গ নামে পরিচিত এবং বরই ও কুম্ভকারদের সংকর হিসাবে কথিত। বাঁশের কারিগর বাসোর জাতির একটি শাখা ডুমার বা ডোম-বাসোর নামে পরিচিত। ধুবেলা ধোবির সঙ্গে অন্য জাতির সংমিশ্রণ। মধ্যপ্রদেশের কোরচামারা চামার এবং কোরির (তন্তুবায় জাতি) সংমিশ্রণ। মারাঠাদেশের তন্তুবায় জাতি সালি কয়েকটি উপশাখায় বিভক্ত যথা আহির, মারাঠা ও

চান্ভার। এই উপশাখাগুলি সংকর জাতীয়। এই ধরনের মিশ্র শাখাজাতিদের মধ্যে মধ্যপ্রদেশের ধীমার (গোন্দ উপজাতি থেকে ভেঙে আসা, এবং ধীবর ও পাল্কীবাহকদের সংমিশ্রণ), গুজরাতের গুজর (এরা ধেদদের শাখাজাতি এবং উত্তরাঞ্চলের গুজরদের থেকে পৃথক), মহারাষ্ট্রের গাউলিদের (গোয়ালা) শাখাজাতিরা যেমন আহির, কুনবি, কুরুব ও মারাঠা, গোন্ধলিদের শাখাজাতি যেমন ধঙ্গর, ও কুম্ভার, কোলিদের শাখাজাতি যেমন আগ্রি, আহির ও ভীল, কুনবিদের শাখাজাতি যেমন মানওয়া, কুম্ভার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখানে জেনে রাখা দরকার যে এই সব সংমিশ্রণজাত শাখাজাতির নামে অন্য বড় জাতি থাকলেও তাদের সংগে এই শাখাজাতিগুলির কোন সম্পর্ক নেই। আহির বলতে যে বড় গোয়ালাজাতি বোঝায় তার সংগে চামারদের শাখাজাতি আহির বা কোলিদের শাখাজাতি আহিরের কোন সম্পর্ক নেই। অনুরূপভাবে মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের কৃষিজীবী বড় জাতি কুনবিদের সংগে নাতি বা নাপিতদের শাখাজাতি কুনবিরা সম্পর্কশূন্য। অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিশ্রণজাত শাখাজাতি কোন প্রসিদ্ধ বড় জাতির নাম গ্রহণ করেছে।

একই পেশার নানা উপবিভাগের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা জাতির সংখ্যা বড় কম নয়। মধ্যপ্রদেশের চামারদের শাখাজাতিগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বুদলগিররা বুদলা বা চামড়ার তৈলপাত্র তৈরী করে, জিংগররা চামড়ার আসন তৈরি করে ও কাটওয়ারা শুধুই চামড়া কাটে। ধীমারদের শাখাজাতিগুলির মধ্যে বানসিয়ারা বাঁশের কাজ করে এবং বন্ধাইয়ারা দাঁড় তৈরি করে। কুনবি চাষীদের মধ্যে তিলোলে নামক একটি শাখাজাতি আছে যারা শুধু সর্ষের মত তেল সম্পর্কিত বিষয়েরই চাষ করে। বেলগাঁও অঞ্চলের লোনারিদের দুটি শাখাজাতির মধ্যে একটি মিথ বা লবণ প্রস্তুতকারী এবং অপরটি চুনে বা চুন প্রস্তুতকারীরূপে পরিচিত। মালীদের শাখাজাতিগুলি ফুল-মালী, কছা-মালী, জিরে-মালী ও হলদে-মালী নামে পরিচিত, প্রত্যেকের কাজের ক্ষেত্র পৃথক। মধ্যপ্রদেশের তন্তুবায় কোণ্টিদের দুটি শাখাজাতির মধ্যে পটুইরা রেশমতন্তু নিয়ে কাজ করে, সুতসালেরা কার্পাসতন্তু নিয়ে। মধ্যপ্রদেশের ধীমারদের অন্যান্য শাখাজাতিদের মধ্যে সিংগারিয়ারা পানফলের চাষ করে, তাণ্ডিওয়ালারা পেষাই করার পাথরে শান দেয়, ধুরিয়ারা চাল-চিঁড়ে বিক্রয় করে, সোনঝারারা স্যাকরার দোকানের ধুলো থেকে স্বর্ণবিন্দু আহরণ করে, কাশাধানিয়ারা পুণ্যার্থীদের ফেলা পয়সা জল ছেঁচে তোলে। গরপাগারি-যোগীরা ঝাড়ফুঁকের কাজ করে, মনিহারি যোগীরা পাথরের মালা বিক্রয় করে, বিকনাথরা রিঠা

বিক্রয় করে। মধ্যপ্রদেশের কুনবিদের নানা শাখাজাতির মধ্যে খইরেরা খয়ের তৈরি করে, ধানোজরা হাঁস-মুরগী পালন করে, লোনহারেরা লবণ প্রস্তুত করে। লোনারিয়া নামক মাহারদের একটি শাখাজাতিও লবণ প্রস্তুত করে। ধংগরদের দুটি শাখাজাতির মধ্যে মেন্ধেরা ভেড়া পালন করে (মেন্ধি অর্থাৎ মেড়া বা ভেড়া) এবং মাষকেরা মহিষ পালন করে। মাংগদের শাখাজাতিগুলির মধ্যে মাংগ-গারুড়ীরা সাপ খেলায়, তোকারফোড়রা বাঁশের কাজ করে, নাদে-রা নাদ বা দড়ি তৈরি করে, মাংগমোচিরা চামড়ার কাজ করে, কাকররা চামড়ার দড়ি তৈরি করে। নাবি বা নাপিতদের শাখাজাতির মধ্যে বাজনুরি বিবাহের শোভাযাত্রায় বাজনা বাজায়, মশালজি মশাল নিয়ে আগে চলে। মহারাষ্ট্রের মহারদের মধ্যে পন্যারা তালপাতা প্রভৃতি দিয়ে পাখা, টোকা প্রভৃতি তৈরি করে এবং বেলেরা মাদুর তৈরি করে। মধ্যপ্রদেশের এরণ্ডি তেলিরা কেবল এরণ্ড বা রেড়ির তেলই উৎপাদন করে। শুধু পেশার উপবিভাগই নয়, পেশাগত কৌশলপার্থক্যের উপরও ভিত্তি করে নানা শাখাজাতি গড়ে উঠেছে, যাদের সন্ধান পাওয়া যায় বিশেষ করে কুম্ভকার, তন্তুবায় ও তৈলকারদের ভিতর।

ধর্মবিশ্বাস, রীতিনীতি ও আচারঅনুষ্ঠানের পার্থক্যও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্মণ জাতিসমূহের ক্ষেত্রে এই পার্থক্যের ভিত্তিতে নানা শাখাজাতি বিপুল ভাবে গড়ে উঠেছে। মধ্যযুগে নানা ভক্তিবাদী লোকায়ত ধর্ম গড়ে ওঠার কথা আমরা আগে বলেছি। বিভিন্ন সাধকের আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি কিভাবে জাতিতে পরিণত হয়েছে তারও ইংগিত পূর্বে দেওয়া হয়েছে। রীতিনীতির পার্থক্যের ব্যাপারে কিছু উদাহরণ দেওয়া যায়। বোম্বাই অঞ্চলে বেরড নামক একটি জাতি আছে যার দুটি শাখার মধ্যে কারে বা অশুদ্ধরা সর্বপ্রাণীর মাংসভক্ষণ করে এবং শিথিল যৌনজীবন যাপন করে এবং বিলে বা শুদ্ধরা মোটামুটি হিন্দু ধরনের জীবনযাপন করে। এইভাবে একই জাতি দুটি শাখাজাতিতে বিভক্ত হয়েছে। মোগের নামক কন্নড়ভাষী ধীবর জাতি শুধু উত্তরাধিকার প্রথার ভিত্তিতে তিনটি শাখাজাতিতে বিভক্ত যথা অলিয়াসন্তান (মাতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকার), মকলসন্তান (পিতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকার) এবং রান্ডেসন্তান (বিধবার পুনর্বিবাহজাত সন্তান)। এছাড়া আরও অনেক শাখাজাতি আছে যাদের উৎপত্তি বা নামকরণের কোন সন্তোষজনক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রে নানা অদ্ভুত কারণে তাদের নামকরণ হয়। সৎনামী চামারদের একটি শাখাজাতিকে চুংগিয়া-চামার বলে কেননা তারা পাতা দিয়ে তৈরি চোঙার সাহায্যে ধূমপান করে। মাহারদের

একটি শাখাজাতির নাম ধার্মিক। এই নামকরণের মধ্যে রসবোধের পরিচয় আছে কেননা এই জাতির সকলেই অবৈধ সন্তান। পারধিদের একটি শাখার নাম লংগোটি কেননা তারা কৌপীন পরিধান করে। চামারদের একটি শাখা-জাতি দাইজন্য বলে পরিচিত কারণ তাদের মেয়েরা দাই-এর কাজ করে, যেটা তাদের কৌলিক পেশা বিরুদ্ধ। ধীমারদের একটি শাখাজাতির নাম নাধা কেননা তারা নদীকূলে বাস করে। এইরকম নানা অদ্ভুত কারণে বিভিন্ন শাখাজাতির নামকরণের আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

৬ ॥ উপবর্ণ বা শাখাজাতি

ধর্মশাস্ত্রসমূহের বক্তব্য অনুযায়ী অনুলোম বা প্রতিলোম সংকর জাতি-সমূহ উপবর্ণ নামে পরিচিত এবং অনুলোম-সংকর জাতিগুলি শুদ্ধ এবং প্রতিলোম-সংকর জাতিগুলি অশুদ্ধ হিসাবে বিবেচিত। ইংরাজীতে সাব-কাস্ট বলে একটি বিশেষ শব্দ ব্যবহার করা হয় যে শব্দটির দ্বারা কখনও কখনও অনুলোম-প্রতিলোম-সংকর জাতিসমূহকেও বোঝানো হয় আবার পেশাদার জাতিদেরও বোঝায়, এবং এগুলির উপবিভাগকে বলা হয় সাব-সাবকাস্ট। বালগংগাধর টিলক সাব-কাস্ট বলতে উপ-জাতি এবং সাব-সাবকাস্ট বলতে পোত-শাখা শব্দদ্বয় ব্যবহার করেছেন। তবে বাংলায় এই পরিভাষাদ্বয় ব্যবহার করা যাবে না, কেননা এখানে উপজাতি বলতে ট্রাইবদের বোঝায়। আমরা কাস্ট শব্দটির পরিবর্তে জাতি, সাব-কাস্টের পরিবর্তে শাখাজাতি এবং সাব-সাবকাস্টের পরিবর্তে উপশাখাজাতি শব্দত্রয় ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় মনে করি। কিন্তু এখানে একথা বলা প্রয়োজন যে এই তিনটি শব্দের দ্বারা (ইংরাজী এবং বাংলা উভয়ই) ব্যক্ত ধারণাগুলি মোটেই সুনির্দিষ্ট নয় এবং জাতি (কাস্ট), শাখাজাতি (সাবকাস্ট) ও উপশাখাজাতির (সাব-সাবকাস্ট) সীমা-রেখাও খুব স্পষ্ট নয়। ধর্মশাস্ত্রে বর্ণ বলতে চাতুর্বর্ণকেই বোঝান হয়েছে, এবং চাতুর্বর্ণের মিশ্রণজাত সমুদয় জাতিকেই উপবর্ণ আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলিকে উত্তম, মধ্যম ও অধম তিন প্রকারের সংকর শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী আভীর বা আহির নিছকই একটি উপবর্ণ, আমাদের ভাষায় শাখাজাতি বা সাবকাস্ট। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমরা আহিরদের জাতি হিসাবেই উল্লেখ করি, শাখাজাতি হিসাবে করি না, সাবকাস্ট না বলে কাস্ট বলি, আবার আহিরদের বিভিন্ন শাখাকেও কখনও জাতি (কাস্ট) কখনও শাখাজাতি (সাবকাস্ট) বলে উল্লেখ করি। এ ব্যাপারে নানা

গোলমাল আছে। এছাড়া শাখাজাতিগুলি সত্যই কোন বড় জাতি ভেঙে গড়ে উঠেছে কিনা, অথবা কোন আঞ্চলিক ক্ষুদ্র জাতি নানা কারণে নিজেদের কোন বড় জাতির শাখা হিসাবে পরিচিত করেছে কিনা (দুটো পদ্ধতিই ঐতিহাসিক-ভাবে জাতি প্রথার ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে) অথবা কোন বড়জাতি এবং তৎ-জাত বলে কথিত শাখা জাতিদের মধ্যে কোন অনিবার্য কার্যকারণ সম্পর্ক আছে কিনা, অঞ্চলভেদে-ভাষাভেদে জাতি ও তার কল্পিত শাখাগুলির বাস্তব সম্পর্ক কি, ইত্যাদি নানা বিষয়ে বহু সংশয়ের অবকাশ আছে, যেগুলি থেকে কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। তবে এবিষয়ে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত তাঁদের অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণলব্ধ ধারণাসমূহের ভিত্তিতে সমস্যাগুলিকে আমরা ভালভাবে বোঝার চেষ্টা করতে পারি।

এ বিষয়ে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কেটকারের বক্তব্য থেকে জাতি ও শাখাজাতি-দের সম্পর্কে ঐতিহ্যগত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেন: "কুড়ি কোটি হিন্দু বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীগত উপাদানে গঠিত।...তারা তিন হাজারেরও অধিক জাতিতে বিভক্ত, এবং অধিকাংশ জাতিরই শাখাজাতি আছে। এদের মধ্যে একটি জাতি, কেবল ব্রাহ্মণরাই, আটশোর উপর শাখাজাতিতে বিভক্ত।...জাতি বলতে দুটি বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সামাজিক গোষ্ঠীকে বোঝায়।... এই রকম গোষ্ঠীর প্রত্যেকটিরই একটি বিশেষ নাম আছে, যার দ্বারা একটি সাধারণ নামের পরিপ্রেক্ষিতে তারা একত্রভাবে পরিচিত হয়। বৃহত্তর গোষ্ঠী-গুলি কার্যত আরও বৃহত্তর গোষ্ঠীর উপবিভাগ, যেগুলির স্বাধীন নাম আছে। তাই আমরা দেখি যে এই গোষ্ঠীগুলির অনেকগুলি পর্যায় আছে এবং 'জাতি' শব্দটি যে-কোন পর্যায়ের গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হতে পারে। 'জাতি' এবং 'শাখাজাতি' শব্দদ্বয় চূড়ান্ত নয়, আপেক্ষিক এবং তাৎপর্যের দিক থেকে তুলনামূলক।...যখন আমরা মারাঠা ব্রাহ্মণ ও কোংকন-ব্রাহ্মণের কথা বলি, প্রথমটিকে জাতি এবং দ্বিতীয়টিকে শাখাজাতি বলে গণ্য করি। আবার মারাঠা-ব্রাহ্মণরা দক্ষিণী বা দ্রাবিড় ব্রাহ্মণজাতির নিরিখে শাখাজাতি। এই বিভাগ ও উপবিভাগসমূহ বিভিন্ন আদর্শের ভিত্তিতে প্রবর্তিত হয়েছে। এইভাবে কুড়ি কোটি হিন্দু এমনভাবে বিভক্ত ও উপবিভক্ত হয়েছে যে এমনও জাতি আছে যারা পনেরটি বংশের বাইরে বিবাহ করতে পারেনা।" কেটকারের বক্তব্যে শাখাজাতি সমূহের একটা দিক প্রকাশ পেলেও এই বক্তব্যের মধ্যে যে অতিসরলীকরণ রয়েছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

ই.এ. ব্লান্ট উত্তরভারতের জাতিসমূহের ক্ষেত্রে শুধু শাখাজাতির উপরই

গুরুত্ব আরোপ করেননি, উপশাখাজাতির কথাও বলেছেন। জাঠ, আহির ও কুর্মিদের অজস্র শাখাপ্রশাখার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে একটি বিশেষ শাখাজাতির নামই সেই শাখাজাতির উদ্ভবের প্রাথমিক প্রমাণ যে নামগুলি স্থানীয়, ভৌগোলিক, পেশাগত, সম্প্রদায়গত, টোটেম প্রভৃতি আদিম বিশ্বাসগত, সামাজিক প্রথা অনুসারী, কোন প্রাচীন কিংবদন্তী অনুসারী, ধর্মীয় বিশ্বাস সংক্রান্ত, পুরাণাশ্রিত প্রভৃতি হতে পারে। হাটন রিজলী অনুসরণে জাতির উপবিভাগ থেকেই শাখাজাতিসমূহের উদ্ভবের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। রিজলী শাখাজাতিসমূহের উদ্ভবের পিছনে স্থানান্তর গমন ও প্রথাবদলের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন যে কোন জাতি অন্যত্র স্থানান্তর গমন করে বসবাস করতে শুরু করার পর নিজেদের ছোট গণ্ডীর মধ্যেই বিবাহাদি সম্পর্ক স্থাপন করে, এবং এইভাবে তারা একটি শাখাজাতিতে পরিণত হয়। প্রাথমিকভাবে নিজ গণ্ডীকে চিহ্নিত করার জন্য তারা নিজেদের পূর্বতন জাতিনাম বজায় রেখেই তার পূর্বে স্থাননাম যোগ করে যেমন জৌনপুরিয়া, কনৌজিয়া, তিরহুতিয়া, বারেন্দ্র ইত্যাদি। অবধিয়া কুর্মি এবং কনৌজিয়া কুর্মি, কুর্মিদের এই দুই শাখা স্থানীয়তার প্রয়োজনেই গড়ে উঠেছে। এ. এম. টি. জ্যাকসন বলেন যে মহারাষ্ট্রের শাখাজাতিসমূহের একটা বিপুল অংশের পিছনে ভৌগোলিক নাম বর্তমান এবং এর সমতুল্য উদাহরণ ভারতের সর্বত্রই পাওয়া যায়। রিজলী আরও বলেন যে বিভিন্ন উপবিভাগে ভাগ হয়ে যাবার মনোভাব ভারতীয় সমাজের একটা বৈশিষ্ট্য। এই মনোভাবের পিছনে যে ধারণাটি কার্যকর তা হচ্ছে এই যে যারা ভিন্ন ভাষায় কথা বলে, ভিন্ন এলাকায় বাস করে, ভিন্ন দেবতার পুজো করে, ভিন্ন সামাজিক প্রথা পালন করে, ভিন্ন পেশা অনুসরণ করে অথবা একই পেশা ভিন্নভাবে অনুসরণ করে, তারা মোটের উপর ভিন্ন জাতি।

এই প্রসঙ্গে ইরাবতী কার্ভে কিছুটা ভিন্ন কথা বলেন। তাঁর মতে তথাকথিত শাখাজাতিসমূহ মোটেই কোন জাতির উপবিভাগ বা বিশেষ বিকাশ নয়। এগুলি প্রকৃতপক্ষে জাতিই। বাস্তবে হিন্দুসমাজে জাতিপ্রথার মধ্যে যা আছে তা হল জাতিগুচ্ছ, অনেকগুলি জাতির বা প্রচলিত-অর্থে-শাখাজাতির জোট যা কোন একটি ব্যাপক জাতিনামকে কেন্দ্র করে আবর্তিত যেমন ব্রাহ্মণ, কুনবি, সোনার, কুম্ভার প্রভৃতি। তাঁর মতে হিন্দু সমাজে তিনপ্রকার জোট বর্তমান জাতি, জাতিগুচ্ছ এবং বর্ণ। তিনি বলেন যে পুরাতন নামকরণের পদ্ধতি অনুযায়ী কুম্ভার জাতির প্রতিটি উপবিভাগই

একটি করে শাখাজাতি হিসাবে পরিচিত এবং তারা একত্রে কুম্ভার জাতি নামে কথিত। এইভাবে এমনকি ক্ষুদ্রতম অন্তর্বিবাহকারী গোষ্ঠীর নামকরণের ফলে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে এগুলি যেন প্রকৃতই কোন জাতির উপবিভাগ, কিন্তু বাস্তবে তা নয়।

কাথলীন গাফ তাঞ্জোর জেলার শৈব ও স্মার্ত তামিল ব্রাহ্মণদের উপবিভাগগুলি পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে প্রতিটি উপবিভাগ কয়েকটি একান্ত আঞ্চলিক অন্তর্বিবাহকারী শাখাজাতিতে বিভক্ত, যাদের এলাকা দশটি থেকে কুড়িটি গ্রাম নিয়ে। আদ্রিয়ান সি, মেয়ার মধ্যভারতের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সমীক্ষা চালিয়ে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে এসেছেন। প্রতিটি মানুষই তিনটি সংস্থার অন্তর্গত—জ্ঞাতি, শাখাজাতি এবং জাতি, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে শাখাজাতিত্ব জ্ঞাতিত্ব বন্ধন ছাড়া আর কিছু নয়, এবং তা একটি শাখাজাতিবাচক নামের দ্বারা পরিচিত এবং তার কার্যকর প্রভাবের ক্ষেত্রও একটা বিশেষ এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ শাখাজাতির বৈশিষ্ট্য স্থানীয়তা ও জ্ঞাতিত্ব। একটি শাখাজাতির সম্পর্কের এলাকা কুড়ি থেকে তিরিশ মাইলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, খুব বেশি হলে তা পঞ্চাশ মাইল।

জি. এস. ঘুর্যে স্বীকার করেন যে শাখাজাতি প্রকৃতপক্ষেই জাতি, কিন্তু শাখাজাতির গঠনগত ও কার্যকর দিক সম্পর্কে ইরাবতী কার্ভের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য আছে। তাঁর মতে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সাধারণভাবে গোটা জাতিপ্রথার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কোন শাখাজাতির জাতিকাঠামোয় মর্যাদার স্থানটা যে জাতির শাখা হিসাবে তা পরিচিত সেই জাতির মর্যাদার উপর নির্ভরশীল, এবং ঐই শাখাজাতির চিরাচরিত পেশা, ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতি বিষয় যে জাতির শাখা হিসাবে তা পরিচিত তার বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু নিজ গোষ্ঠীগত জীবনচর্যা, সামাজিক সম্পর্ক ও অন্তর্বিবাহসংক্রান্ত নিয়মকানুন শাখাজাতির নিজস্ব এক্তেয়ার ভুক্ত। প্রতিটি গোষ্ঠীই, তা ছোট বা বড় যাই হোক না কেন, জাতি বা শাখাজাতি হিসাবে সুনির্দিষ্ট নামসহ পরিচিত। যদি কোন গোষ্ঠীর এলাকা বড় হয় তাহলে ভাষাগত পার্থক্য সেই গোষ্ঠীর কার্যকর পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। যে কোন ভাষাগত এলাকায় পঞ্চাশ থেকে দুশোর মত বৃহৎ গোষ্ঠী এবং পাঁচশো থেকে দু-হাজারের মত ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বর্তমান। ব্যক্তির মূল সামাজিক সম্পর্ক ও জীবনচর্যা তার ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু জাতিকাঠামোয় মর্যাদা প্রভৃতির প্রশ্নে তাকে তার বৃহত্তর গোষ্ঠীর দোহাই

দিতে হয়। ঘুর্যের মতে বৃহত্তর জাতির সংগে শাখাজাতির একটা আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক সর্বদাই বর্তমান, অন্ততে শাখাজাতি সমূহ সেই রকম দাবিই করে থাকে। এই সম্পর্কের ভিত্তি বাস্তব হতে পারে আবার নাও হতে পারে। শাখাজাতি বড় জাতির উপবিভাগ হতে পারে, আবার না হলেও সেই উপ-বিভাগত্ব দাবি করতে পারে। শাখাজাতি নানা কারণে গড়ে ওঠে এবং কারণ-গুলিও নানা শর্তাধীন। শাখাজাতি বলতে সেই রকম শ্রেণী বোঝায় যা জাতির লোকদের কাছে পরিচিত, পক্ষান্তরে জাতি বলতে সেই রকম শ্রেণী বোঝায় যা সমগ্র জনসমাজের কাছে পরিচিত।

তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাখাজাতিসমূহের উদ্ভব মূল জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ফলে ঘটেছে। উত্তরপ্রদেশের সরওয়ারিয়া ব্রাহ্মণরা তাদের উদ্ভব সম্পর্কে বলে যে তাদের পূর্বপুরুষরা রাবণবধরূপে রামের ব্রহ্মহত্যা পাপ নিবারণ করার জন্য যজ্ঞ করেছিল এবং তার বিনিময়ে দান গ্রহণ করেছিল। ফলে তারা তাদের মূল জাতি কনৌজিয়া ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয় এবং তারা সরযূর পারে পৃথক বসতি করে এবং সংযূপারিয়া বা সরওয়ারিয়া বলে পরিচিত হয়। এক্ষেত্রে মূল জাতির সংগে তাদের শাখাজাতির বিচ্ছিন্নতার কারণ হিসাবে একটি কিংবদন্তীর দোহাই দেওয়া হয়েছে। মহারাষ্ট্র ও কোংকণের গৌড় সারস্বত ব্রাহ্মণদের শাখাজাতিসমূহের নাম বড়দেশকর, ভলওয়ালিকর, কুদলদেশকর, লোটলিকর, পেডনেকর, সাশতিকর, শেনবি প্রভৃতি। এক্ষেত্রে এই শাখাজাতিগুলির পার্থক্য বা বিচ্ছিন্নতার কারণ ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক, যারা যে অঞ্চলের তারা সে নামে পরিচিত হয়েছে, 'কর' শব্দটির অর্থ 'কোন স্থান বা বিষয় হতে'। কালওয়ার, লোহার, নাই, তেলি প্রভৃতিদের মধ্যে ব্যাহুত নামক শাখাজাতি গড়ে উঠেছে যারা নিজেদের সমাজ থেকে বিধবা-বিবাহ বাতিল করেছে। কুর্মিদের সাইথওয়ার শাখাজাতিও ব্রাহ্মণ প্রভাবে বিধবাবিবাহ বিরোধী হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রথার পরিবর্তন শাখাজাতি গড়ে ওঠার কারণ। মালব অঞ্চলে রামখোরি রাজপুতেরা নিছকই একটি সংকীর্ণ এলাকায় আবদ্ধ থাকার পরিণামে পৃথক শাখাজাতিরূপে গণ্য হয়েছে। বৃত্তিবদলের ফলে শাখাজাতির উদ্ভবের নিদর্শন পাওয়া যায় বঙ্গদেশের সদ্গোপদের মধ্যে, যারা গোপবৃত্তির পরিবর্তে কৃষিবৃত্তি গ্রহণ করে সৎশূদ্র পর্যায়ের ভিন্ন জাতিতে পরিণত হয়েছে। অনুরূপভাবে নাপিতদের একটি শাখা মোদকের বৃত্তি অবলম্বন করে মধুনাপিত নামক উচ্চতর মর্যাদার শাখাজাতিতে পরিণত হয়েছে।

আবার গুজরাতের নাগর ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে শাখাজাতি গড়ে ওঠার ব্যাপারটা একেবারেই ভিন্ন ধরনের। তারা বহিরাগত হিসাবে বিবেচিত যারা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম থেকে সপ্তম শতকের মধ্যে এদেশে এসেছিল। তাদের ছয়টি প্রধান শাখা যেগুলির মধ্যে বডনগরাদের স্থান সর্বোচ্চ। এই ছয়টি শাখার নাম গুজরাতের ছয়টি শহরের নাম অনুসারে হয়েছে। বিশনগর বা বিশালনগরী ব্রাহ্মণরা চৌহান বংশীয় রাজা বিশালদেবের কাছ থেকে দান হিসাবে পাওয়া গ্রামসমূহে বসতি স্থাপন করলে বড়নগরারা তাদের সঙ্গে সম্পর্কছেদ করে। গুজরাতের ঔদীচ্য ব্রাহ্মণরাও উত্তরাঞ্চল থেকে এসে রাজকীয় অনুগ্রহে বসতি স্থাপন করে। যারা আগে এসেছিল তারা সহস্রা নামে পরিচিত এবং যারা পরে এসেছিল তারা তোলাকিয়া নামে পরিচিত। প্রথমোক্তরা শেষোক্তদের চেয়ে বেশি সামাজিক মর্যাদার দাবিদার এবং শেষোক্তদের সঙ্গে তারা সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করে না। সহস্রাদের দুটি উপশাখাজাতি আছে শিহোরা এবং সিদ্ধপুরিয়া, উভয় নামই দুটি নগরের নামানুসারে গড়ে উঠেছে। আবার গুজরাতের বানিয়া শাখাজাতিদের ক্ষেত্রে যাদের সংখ্যা পঞ্চাশের কাছাকাছি—তিনটি সামাজিক স্তর বর্তমান, যথা বিশা (এক-কুড়ি), দশা (আধ কু ড়) এবং পঞ্চা (সিকি-কুড়ি)। এই তিন স্তরের মধ্যে খাওয়াদাওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধানিষেধ না থাকলেও বিবাহাদি সম্পর্ক স্থাপিত হয়না। গুজরাতের মোচি বা চর্মকারদের শাখাজাতিগুলির ক্ষেত্রে কাজ ও কারিগরির প্রকারভেদের ভিত্তিতে বিভাজন ঘটেছে যেমন চালগর (যারা চাল তৈরি করে), জিংগগর (যারা আসন তৈরি করে), পখারি (যারা ঘোড়ার সাজ তৈরি করে) প্রভৃতি। ওই মোচি জাতির আরও কয়েকটি শাখা ভিন্ন ধরনের পণ্যের কারিগরি অবলম্বন করেছে যেমন চন্দলগার (লাক্ষাদন্ড প্রস্তুতকারী), চিতার (চিত্রকর), মিনগার (এনামেলের সামগ্রী প্রস্তুতকারক), পানগার (সোনারূপার তবক নির্মাতা) এবং রসনিয়া (প্রলেপকার)। এরা ভিন্নধর্মী সামগ্রীর প্রস্তুতকারক হিসাবে নিজেদের মোচিদের অন্য শাখার তুলনায় শ্রেষ্ঠ হিসাবে দাবি করে এবং সম্প্রতি এরা নিজেদের একেবারেই পৃথক জাতি বলে গণ্য করতে শুরু করেছে।

দক্ষিণভারতে জাতি থেকে ছিটকে শাখাজাতি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে নানা বৈচিত্রময় পদ্ধতি দেখা যায়। দক্ষিণের স্মার্ত ব্রাহ্মণদের একটা অংশ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে দীক্ষা নিয়ে শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। শ্রীবৈষ্ণবরাও পরবর্তীকালে দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, বড়কলই ও তেনকলই। এই দুই শাখার মধ্যে বিবাহ হয় না। উভয় শাখাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে অন্তর্বিবাহ প্রথা অনুসরণ করে

এবং নিজেদের পৃথক জাতি বলে গণ্য করে। এদের ক্ষেত্রে বিভাজন আদর্শগত। তামিলনাড়ুর কৃষিজীবী সোলিয়-বেল্লালদের শাখাজাতিদের মধ্যে বেল্লাল-চেট্টিরা বাণিজ্যজীবী, কোদিক্কলরা পানপাতার উৎপাদক এবং কনকিলি-নাত্তাররা কনকিলিনাড়ু অঞ্চলের বাসিন্দা। কোঙ্গ-বেল্লালদের কয়েকটি শাখা-জাতি হচ্ছে সেন্দলাই (লাল মাথার মানুষ) পদিতলই (সেনাবাহিনীর চালক), বল্লিকই (রৌপ্যহস্ত), পবলমকত্তি (প্রবাল পরিধানকারী), মলইয়াদি (পাহাড়ের নিম্নাঞ্চলের বাসিন্দা), তোল্লকাটু (বড় গর্তওয়ালা কানযুক্ত), আত্তনগরই (নদীর তীরবর্তী) প্রভৃতি। এখানে বিভাজনের কোন সামঞ্জস্যপূর্ণ মান নেই, যেন ট্রেনকে ভাগ করা হচ্ছে ইলেকট্রিক, এক্সপ্রেস, এবং মিটার-গেজ। এক্ষেত্রে বিভিন্ন পৃথক জাতি একটা বড় জাতি-নামকে আশ্রয় করেছে, এক ভেঙে বহু নয়, বহু জুড়ে এক। সালেম জেলার শানারদের দুটি শাখা জাতি বর্তমান, কোঙ্গা-শানার ও কল্যাণ শানার যারা নিজেদের সর্বতোভাবে পৃথক জাতি বলে মনে করে, এবং পরস্পরের মধ্যে কোন সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করে না। পার্থক্যের হেতু কিন্তু খুবই সামান্য। দুটি শাখাজাতি জনৈক মুপ্পনের প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর থেকে যথাক্রমে উদ্ভূত বলে নিজেদের গণ্য করে।

৭ ॥ জাতি প্রথায় মাতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকার ও বিবাহ

জাতিকাঠামোর বিভিন্নস্তরে অবস্থিত নানা জাতি ও শাখাজাতির ক্ষেত্রে মাতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকার ও বিবাহপ্রথা বর্তমান আছে। এই প্রথা প্রাচীন যুগে প্রচলিত মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার (যার সত্যমিথ্যা নির্ধারণ করা অসম্ভব) অবশেষ কিনা, নৃবিজ্ঞানীদের এই বিতর্কমূলক বিষয়ে প্রবেশ না করেও, এই বিষয়ের জানা তথ্যগুলি এখানে আমরা উপস্থাপিত করছি।

খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের উপজাতিরা শি-কুর বা ক্লান, কুপোহ্ বা কুর এবং ইংগ বা পরিবারে বিভক্ত যারা বিশ্বাস করে, লোংগ-জাইদ-না কা-কাইনথেই অর্থাৎ 'নারী থেকেই গোষ্ঠীর উদ্ভব।' খাসিদের মধ্যে বংশধারা মা থেকে মেয়েতে বর্তায়, পরিবার গঠিত হয় মা ও তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে যারা দিদিমা (মায়ের মা) এবং প্রদিদিমার বংশধর, যেখানে পুরুষের কোন স্থান নেই। পুরুষ যদি ভাই হয় সে সেই পরিবার বা কুলের অন্তর্গত যেখানে সে বিবাহ করে, আর যদি সে স্বামী হয় তাহলে সে নিছকই উ-শোণ্গ-খা বা জন্মদাতা, স্ত্রীর পারিবারিক জীবনে বা আচার-অনুষ্ঠানে তার কোন

ভূমিকাই নেই। সম্পত্তির অধিকারী একান্তভাবেই মেয়েরা, সবচেয়ে ছোট মেয়ের ভাগ সবচেয়ে বেশি। সমগ্র উপার্জন কুর বা ক্লানের অধীন যা বিভিন্ন ইংগ বা পরিবারে ভাগ হয়ে যায় যেখানে মাতাই একমাত্র প্রধান ও সকল সম্পর্কের উৎস। খাসি, সিনটেংগ এবং লিনগমদের উত্তরাধিকার আইন একই। গারোদের মধ্যে সম্পত্তি মা থেকে মেয়েতে বর্তায়, এবং নিজ অধিকারে পুরুষদের উত্তরাধিকারত্ব হয় না। স্বামী স্ত্রীর পরিবারে বাস করে এবং ছেলেমেয়েরা স্ত্রীর পরিবারভুক্ত হয়। গারোদের কুলসমূহ বিভিন্ন মাহারি বা মাতৃপরিবারে বিভক্ত। পিতা বা স্বামী বাইরের লোক, তবুও স্ত্রীর পরিবারে তার অবস্থা তদারক করার জন্য সে তার নোকরুম বা ভাগ্নেকে সেখানে রেখে দেয়। এই নোকরুম পরে তার মামা-মামীর ছোট মেয়েকে বিবাহ করে। এই ছোট মেয়ে নোকনা নামে অভিহিত এবং সম্পত্তির প্রকৃত উত্তরাধিকারিনী।

এই উপজাতীয় মাতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকার ও বিবাহপ্রথা কিছুটা পরিবর্তিত আকারে মালাবার অঞ্চলের নায়ারদের মধ্যে বর্তমান যারা নিজেদের ক্ষত্রিয় জাতি হিসাবে গণ্য করে। নায়ারদের যৌথ পরিবার তারওয়াদ নামে কথিত যা গঠিত হয় প্রমাতামহী, মাতামহী, মাতা ও তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে। যদি তারওয়াদ আকারে খুব বড় হয়ে যায় তাহলে তা ক্ষুদ্রতর এককসমূহে ভাগ হয়ে যায়, যেগুলিকে বলা হয় তাবাঝি (তা শব্দের অর্থ মা, বাঝি বলতে বোঝায় বংশধারা) যা গঠিত হয় মাতামহী, মাতা ও তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে। তার-ওয়াদের সম্পত্তি সমভাবে তাবাঝিসমূহের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। এই বিশেষ ধরনের যৌথপরিবারের ভিত্তি হচ্ছে নায়ারদের মাতৃতান্ত্রিক বিবাহপ্রথা যেখানে স্বামীরা মাঝেমধ্যে আগন্তুক ছাড়া আর কিছু নয়। নায়ার মেয়েদের বিবাহ-রীতি বিচিত্র। তারা যৌবনে পদার্পণ করলে একজনের সঙ্গে তাদের একটা আনুষ্ঠানিক বিবাহ হয় যা তালিকেট্টু কল্যাণম নামে পরিচিত, কিন্তু এই বিবাহের ফলে স্বামীর স্ত্রীর উপর দাম্পত্য অধিকার থাকে না, এমন কি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে জীবনে দেখা নাও হতে পারে। আসলে এই বিবাহ পুরাকালে অনুষ্ঠিত আনুষ্ঠানিক পুষ্পমোচনের উত্তরাধিকার যা এই অঞ্চলে একদা প্রচ-লিত বয়ঃসন্ধি আচারের অঙ্গ ছিল। এর পর নায়ার কন্যারা আরও বিবাহ করতে পারে, এমন কি একাধিক বিবাহও, যা সম্বন্ধম নামে পরিচিত। এই বিবাহও কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর পাকাপাকি বন্ধনের পরিচায়ক নয়, এবং যে কোন মুহূর্তেই তা ভেঙে যেতে পারে। কন্যা তার মা-দিদিমার বাড়িতেই থাকে এবং তার সন্তানাদি সেখানেই মানুষ হয়। নায়ার মেয়েদের ক্ষণিকের স্বামী হয়ে

যারা আসে তাদের একটা বড় অংশই নাম্বুদিরি ব্রাহ্মণদের উত্তরাধিকার ও বিবাহভাগ্য বঞ্চিত ছেলেরা। নাম্বুদিরিদের মধ্যে একমাত্র জ্যেষ্ঠপুত্রই সম্পত্তির অধিকারী হয় এবং সেই অধিকারবলে তারা নিজ জাতির একাধিক মেয়েকে বিবাহ করে। ফলে তার অবশিষ্ট ভাইদের বিয়ের জন্য স্বজাতি থেকে মেয়ে পাওয়া দুষ্কর হয়।

খাসি ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপজাতিদের মধ্যে উত্তরাধিকার মা থেকে মেয়েতে বর্তায় যা মাতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকার ব্যবস্থার সাধারণ নিয়ম। কোন কোন ক্ষেত্রে যেখানে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে উত্তরণের ঝোঁক আছে সেখানে উত্তরাধিকার পুরুষ থেকে পুরুষে হস্তান্তরিত হলেও হস্তান্তরের ধারাটা নারীকেন্দ্রিক হয়, যেমন মামা থেকে ভাগ্নেতে। মহাভারতে (৮।৪৫।১৩) বলা হয়েছে যে আরট্ট ও বাহীকদের মধ্যে ভাগ্নেই মামার সম্পত্তির অধিকারী হয়। দক্ষিণ ভারতে এই রীতি অলিয়া-সন্তান নামে পরিচিত। ত্রিবাংকুরের রাজারাও উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে এই নিয়ম অনুসরণ করতেন। সোজা বা বাঁকা যেমনই হোক ভারতবর্ষের নানা জাতির মধ্যেই মাতৃতান্ত্রিক বংশধারা ও উত্তরাধিকার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে বিশেষ করে কেরালা ও সন্নিহিত অঞ্চলের অম্বট্টন, অম্পলবাসী, চাক্কিয়ার, কবটি, কৃষ্ণবকর, কুদুনি, কুরুব, কুরুকল, মালায়ারায়ন, মারাবান, পারায়ান, পুলায়ান, সমন্তন, উল্লাদন, বারিয়ার, বিল্ল, বিসবন প্রভৃতির মধ্যে, কর্ণাটকের আগাসা, বেদার, বেণ্টা, গুদিগারা, হেলব, হোলোয়া, কুম্বর, মাদিগা, নত্তুবন ও বান্নদের মধ্যে এবং দক্ষিণের অপরাপর অঞ্চলের চেরুমান, গোঁড়, কাল্লান, কলসী, কোরাগা, কোট্টাই, বেল্লাল, কন্নুবন, মালি, মান্নান, মাপ্পিলা, তিয়ান, ওয়েনা প্রভৃতির মধ্যে। মধ্যপ্রদেশের বেদিয়া বা বেল্লিয়া এবং তৎসহ হালাবা, কৈকরি, কুর্মি, মাঙ্গ, রজঝর প্রভৃতির মধ্যেও মাতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকার ব্যবস্থার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। ওরাওঁ এবং সাঁওতালদের মধ্যে জামাই শ্বশুরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলে তার প্রথম পুত্রকে মাতামহের নাম দিতে হবে এই রকম রীতি বর্তমান।

মাতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকার প্রথা মাতৃতান্ত্রিক বিবাহব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাদাগাদের মধ্যে নিয়ম আছে যে হবু জামাইকে ভাবী শ্বশুরের গৃহে কয়েক বছর বাধ্যতামূলক শ্রমদান করতে হবে, লাবানের কন্যা রাহেলকে লাভ করার জন্য জেকব যেমন তার খামারে সাত বছর বেগার খেটেছিল। মাতৃতান্ত্রিক বিবাহ, উত্তরাধিকার ও আবাস ব্যবস্থার ফলে পরিবারে মাতুলের প্রভাব স্বাভাবিক ভাবেই বেড়ে যায় যার প্রমাণ পাওয়া যায় দক্ষিণের ভোণ্ডারী,

বোন্টুক, দন্ডাসি, জলারি, বোগী, কাদির, মারাবান, মুকাদোরা, পারায়ান, তেবেয়া, তোত্তিয়ান, তসকল, উপ্পারা, বলিজা, বনাজিগা, গঙ্গাদিকারা, ওক্কালু, গণিগা, গোল্ল, হলিকর, ওক্কলিগা, হোলেয়া, ইদিগা, কিলেক্যাতা, কোমতি, কোরাচা, কুম্বর, মাদিগা, মন্দারু সদারু, তিগব প্রভৃতির ক্ষেত্রে এবং মধ্যভারতের ভুঁইয়া, চামার, গোয়ারি, গোন্দ, হালবা, কামার, কৈকারি, মালি, মাংগ, রজঝর প্রভৃতির ক্ষেত্রে। দক্ষিণ ভারতে ভাগ্নী অথবা মাতুলকন্যাকে বিবাহ করার যে রীতি আছে তা ধর্মসূত্র সমূহে সমর্থিত হয়েছে। হালবা এবং কাদিরদের মধ্যে মাতুলকন্যাকে বিবাহ করার রীতি খুবই জনপ্রিয়। দক্ষিণ ভারতে এই রীতি মেনারিকম নামে পরিচিত।

এছাড়া কোন কোন জাতি ও উপজাতির মধ্যে নারীদের বহুপতিগ্রহণের রীতি আছে। এ বিষয়ে নায়ারদের রীতির কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। মহাভারতে (৮।৪০।২৪ ২৫) আরট্ট, বাহীক, সিন্ধু-সৌবীর, মদ্রক প্রভৃতিদের মেয়েদের মধ্যে যৌন স্বাধীনতার কথা উল্লিখিত আছে। কুন্তীও এক অর্থে বহুপতীক ছিলেন। দ্রৌপদী ছাড়াও জটিলা ও বাক্ষী একসংগে একাধিক পতি গ্রহণ করেছিলেন একথা মহাভারতে বলা হয়েছে। তবে এক নারীর বহু পতি গ্রহণ মাতৃতান্ত্রিক বিবাহ বা উত্তরাধিকার প্রথার সংগে সর্বক্ষেত্রে সম্পর্কিত নয়। নীলগিরি পাহাড়ের টোডাদের মেয়েরা বহুপতি গ্রহণ করে, যার মূলে কারণ টোডাসমাজে শিশুকন্যা হত্যার প্রথা। এক নারীর বহুপতি গ্রহণের রীতি মাদুরার কল্লান, কেরালার কনিয়ান, মান্নান, মুদবর ও তোত্তিয়ান এবং তেলুগু কাপু বা রেড্ডিদের মধ্যে বর্তমান, এবং এই প্রথার অবশেষের পরিচয় পাওয়া যায় নীলগিরির বাগাদা, চেরুমান বা পুলিয়ান, তেলুগু যোগী, কমড় কাম্পিলিয়ন, খোন্দ এবং নয়াদি কৃষিজীবীদের মধ্যে। বহুপতি গ্রহণের রীতির অবশেষ এখনও টিঁকে আছে মধ্যপ্রদেশের ভুইয়া, বারি, চামার, গোওরি, বকুঁ, হোসংগাবাদের জাদাম, গুজর, পুবীজাঠ প্রভৃতির মধ্যে। তিব্বত সম্পর্কে প্রতিটি রচনাতেই এই প্রথা সম্পর্কে উল্লেখ আছে। লাহুলে নারীর বহুপতি গ্রহণ একটি সর্বস্বীকৃত সামাজিক বিষয়। সরাজ, সিমলা পাহাড়, উত্তর শতদ্রুর মানাউর জেলা, হিন্দুকুশ ও চিত্রলের নানা জাতির মধ্যেই এই প্রথা বর্তমান।

পঞ্চম অধ্যায়

জাতিপ্রথার ধারাবাহিক ইতিহাস

১ ॥ গুপ্তযুগে জাতিপ্রথা

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৈদিক সাহিত্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে জাতিবর্ণপ্রথা সম্পর্কে যে সকল তথ্য পাওয়া যায় সেগুলি সংকলিত হয়েছে যা থেকে জাতিপ্রথা গড়ে ওঠার একটা ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়। চাতুর্বর্ণের যে আদর্শ ধর্মসূত্রসমূহে উপস্থাপিত করা হয়েছিল, এবং অসংখ্য বৃত্তিজীবী জাতিকে চাতুর্বর্ণের কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করার যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল, গুপ্তযুগে তা সর্বাংশেই সামাজিক রীতিসিদ্ধ হয়েছিল। হিউয়েন সাঙ এদেশে জাতিবর্ণপ্রথাকে বেশ প্রতিষ্ঠিত আকারেই দেখেছিলেন। কৌটিল্য (২।৪) নগরের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন বর্ণের বাসস্থান নির্দিষ্ট করেছেন যথা উত্তরদিকে ব্রাহ্মণ, পূর্বদিকে ক্ষত্রিয়, দক্ষিণদিকে বৈশ্য এবং পশ্চিমদিকে শূদ্র। বরাহমিহির তাঁর বৃহৎ সংহিতা গ্রন্থে (৫৩।৭০, ৮৪, ৯১ ; ৭২'৪) বিভিন্ন বর্ণের জন্য অনুরূপ স্থান, উচ্চবর্ণসমূহের জন্য বিভিন্ন ধরনের ছত্র ও চামর এবং চণ্ডাল প্রভৃতি নিম্নজাতির জন্য নগরপ্রান্তের কৌণিক দিকগুলি বসতির জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। তবে ধর্মশাস্ত্র অনুমোদিত বিভিন্ন জাতিবর্ণের উপযুক্ত বৃত্তি অনুসরণের ক্ষেত্রে ভিন্ন চিত্র পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা বৈশ্য ও শূদ্রের বৃত্তি গ্রহণ করেছে তার পর্যাপ্ত প্রমাণ আছে। কদম্ব রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ময়ূরশর্মা ব্রাহ্মণ হয়েও ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। মহারাজ মাতৃবিষ্ণু বিখ্যাত ব্রাহ্মণ সাধক ইন্দ্রবিষ্ণুর প্রপৌত্র ছিলেন। মহাসামন্ত প্রদোষশর্মা গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারভুক্ত ছিলেন। হিউয়েন সাঙ উজ্জয়িনী, জিঝোটি এবং মহেশ্বরপুরে ব্রাহ্মণ রাজা, থানেসর এবং পারিযাত্রে বৈশ্য রাজা এবং সিন্ধু ও মতিপুরে শূদ্র রাজার শাসন দেখেছিলেন। তিনি এবং তাঁর সংগীরা তক্ক দেশে ব্রাহ্মণকে স্বহস্তে লাঙ্গল দ্বারা কৃষিনিরত দেখেছিলেন। দশকুমার চরিতে (নির্ণয় সাগর ২৬) বিন্ধ্য অঞ্চলে ব্রাহ্মণ দস্যুদের উল্লেখ আছে যারা কিরাতদের বৃত্তি অবলম্বী। পঞ্চম শতকের দুটি উৎকীর্ণ লেখে উত্তর গাঙ্গের অঞ্চলের নগরে ক্ষত্রিয় বণিক এবং মালবে বসতিকারী ভিন্নবৃত্তি-

ধারী গুজরাত থেকে আগত তন্তুবায়দের উল্লেখ আছে। এসব থেকে কৌলিক বৃত্তি পরিবর্তনের নজীর পাওয়া যায়।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে অনুলোম এমনকি প্রতিলোম বিবাহেরও অনেক নজীর পাওয়া যায়। গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা প্রভাবতী গুপ্তার সঙ্গে ব্রাহ্মণ বাকাটক বংশের রুদ্রসেনের বিবাহ হয়েছিল, আবার কদম্ববংশের ব্রাহ্মণ কাকুংস্থবর্মার কন্যাদের সঙ্গে গুপ্ত এবং অন্যান্য বংশের রাজাদের বিবাহ হয়েছিল। বাকাটকরাজ দেবসেনের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী সোমের পূর্বপুরুষরা ক্ষত্রিয়-রমণীর পানিগ্রহণ করেছিলেন। রাজা হর্ষবর্ধন বৈশ্য ছিলেন, অথচ তাঁর কন্যার সঙ্গে বলভীর ক্ষত্রিয় রাজার বিবাহ হয়েছিল। স্বয়ং বাণভট্টের পিতার শূদ্রা স্ত্রী ছিল। সমকালীন সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায় যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা এমনকি গণিকাদের কন্যা ও দাসীদের বিবাহ করতেও পরাঙ্মুখ নয়। মৃচ্ছকটিকে ব্রাহ্মণ চারুদত্ত কর্তৃক বসন্ত সেনাকে বিবাহ করার এবং ব্রাহ্মণ শর্বিলক কর্তৃক দাসী মদনিকাকে বিবাহ করার বৃত্তান্ত আছে। দশকুমারচরিতে রাজপুত্র কর্তৃক চম্পার এক গণিকাকন্যাকে বিবাহের কাহিনী বর্ণিত আছে। এই সকল কাহিনী থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে বিবাহসংক্রান্ত স্মৃতিশাস্ত্র সম্মত বিধানসমূহ খুব কঠোরভাবে গুপ্তযুগে প্রযুক্ত হতনা। চৈনিক পর্যটকদের বৃত্তান্ত অনুযায়ী গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণদের সর্বোচ্চ সামাজিক মর্যাদা ছিল। ব্রাহ্মণরা জঘন্য অপরাধে অপরাধী হলেও তাদের প্রাণদণ্ড হত না, নির্বাসন এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণই ছিল তাদের চরম শাস্তি (কাত্যায়ন স্মৃতি ৫।৪৮৩)। স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত এই বিধানের সমর্থন সমকালীন সাহিত্য থেকে পাওয়া যায়। মৃচ্ছকটিকে দেখানো হয়েছে যে হত্যাপরাধে অভিযুক্ত চারুদত্ত তার ব্রাহ্মণত্বের জন্যই প্রাণদণ্ড থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল। বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্রাহ্মণ মন্ত্রীকে ব্রাহ্মণত্বের জন্যই প্রাণদণ্ড না দিয়ে অন্ধ করা হয়েছে, এ কাহিনী দশকুমার চরিতে বর্তমান।

নিম্নপর্যায়ের জাতিসমূহের ক্ষেত্রে চণ্ডালদের সম্পর্কে ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙের বক্তব্য পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। তাঁদের বিবরণের সমর্থন সমকালীন স্মৃতিগ্রন্থ ও সাহিত্য উভয় সূত্র থেকেই পাওয়া যায়। স্মৃতিশাস্ত্র অনুযায়ী চণ্ডাল অশনাক্ত মৃতদেহ বহন, ঘাতকবৃত্তি প্রভৃতি নিম্নপর্যায়ের কাজকর্ম করবে, তারা রাত্রে গ্রামে ও নগরে প্রবেশ করবেনা, এবং দিনের বেলায় পথে ঘাটে তাদের জাতিস্বাচক চিহ্ন ব্যবহার করবে। একথা চৈনিক পরিব্রাজকদ্বয়ও বলেছেন। মৃচ্ছকটিক ও মুদ্রারাক্ষস নাটকদ্বয়েও এই একই

বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। লংকাবতারসূত্রে চণ্ডাল, ডোম ও কৈবর্তদের বিশেষভাবে মাংসভক্ষণকারী জাতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কাদম্বরীতে রাজসভায় একটি চণ্ডাল বালিকাকে নিজের আবেদন পেশ করতে দেখা গেছে, তবে তাকে ভয়াবহ অস্পৃশ্য বলে গণ্য করা হয়নি। সে একটু দূরে দাঁড়িয়ে লাঠি ঠুকে রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। দশকুমারচরিত, হর্ষচরিত এবং কাদম্বরীতে পুলিন্দ, শবর, কিরাত প্রভৃতি আরণ্যক জাতিগুলির বিশদ বর্ণনা আছে। এই সকল আরণ্যক জাতি উপজাতীয় পর্যায় থেকে জাতিকাঠামোর মধ্যে সে যুগে এসেছিল কিনা বলা যায়না। গুপ্তযুগে যে সমাজে দাসপ্রথা ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ ও কাত্যায়ন বলেছেন যে কোন অবস্থাতেই ব্রাহ্মণকে দাস করা যাবে না। কাত্যায়ন বলেন যে কোন স্বাধীন নারী দাসকে বিবাহ করলে দাস পর্যায়ভুক্ত হয়। কিন্তু কোন দাসী যদি তার গর্ভে প্রভুর সন্তান ধারণ করে তাহলে সে দাসীত্ব থেকে মুক্ত হয়ে পুনরায় স্বাধীন হবে। দাসপ্রথা নিয়ে আমরা অন্যত্র আলোচনা করব।

২॥ গুপ্তোত্তর যুগে জাতিবর্ণপ্রথা

খ্রীষ্টীয় অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত জাতিপ্রথা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য আমরা প্রধানত প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র সমূহের উপর রচিত টীকাভাষ্য, পরবর্তীকালে রচিত স্মৃতিশাস্ত্র ও পুরাণসমূহের উপর প্রধানত নির্ভরশীল। এযুগে ব্রাহ্মণদের অধিকতর সামাজিক সুযোগ সুবিধার পরিচয় পাওয়া যায়। মৎস্যপুরাণে (২১৭।১৬৩-৬৪) বলা হয়েছে গুরুতর অপরাধে অপরাধী হলেও ব্রাহ্মণকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবেনা, তাকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া যেতে পারে বা অপরাধসূচক কোন চিহ্ন তাকে ধারণ করানো যেতে পারে। মনু ৮।১২৪ এর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে মেধাতিথি বলেন যে ব্রাহ্মণকে এমনকি বেত্রাঘাত বা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করাও চলবে না। তার প্রথম অপরাধ মার্জনা করতে হবে। যাজ্ঞবল্ক্য ২।২১-এর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বিজ্ঞানেশ্বর সুমন্তুর মত উদ্ধৃত করে বলেন যে আততায়ী যদি ব্রাহ্মণ হয় তাকে নিহত করা চলবে না। অবশ্য বৃদ্ধ-হারীত (৯।১৪৯ ৫০) এবং মৎস্যপুরাণ (২২৭। ১১৫-১১৭) ও তৎসহ বিশ্বরূপ (যাজ্ঞবল্ক্য ৩।২১২ প্রসঙ্গে) আততায়ী ব্রাহ্মণকে হত্যার অনুমোদন করেন। যাজ্ঞবল্ক্য ১।২২৪-এর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে অপরার্ক স্কন্দপুরাণ উদ্ধৃত করেছেন, যেখানে মনু ৩।১৪৯ অবলম্বনে বলা হয়েছে যে যিনি ব্রাহ্মণ গ্রহীতাদের যোগ্যতার প্রশ্ন না তুলে নিঃসঙ্কোচে

দান করেন তিনি দেবতা ও পিতৃগণকে সন্তুষ্ট করেন। ব্রাহ্মণদের প্রতি এত আনুকূল্য সত্ত্বেও, গুণাগুণের ভিত্তিতে ব্রাহ্মণদের শ্রেণীবিচারের প্রবণতা পুরাণসমূহে বর্তমান। বরাহ পুরাণে (১৪৪৫, ১৯০।৮৩৮৪) সেই জাতীয় ব্রাহ্মণদের একটি তালিকা দেওয়া আছে যারা চেহারায় বা পেশায় বা আচরণে শ্রাদ্ধাদির ব্যাপারে নিমন্ত্রিত হওয়ার অযোগ্য। যাজ্ঞবল্ক্য ৩।৩০-এর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে অপরার্ক বলেন যে দেবলক শ্রেণীর ব্রাহ্মণরা (অর্থাৎ যারা কোন দেবতার পূজা তিন বছর ধরে অর্থের বিনিময় করে থাকে) স্পর্শেরও অযোগ্য। মৎস্যপুরাণে (১৬।১৬) বলা হয়েছে যে ত্রিশংকু, বর্বর, ওড্র, অন্ধ্র, টক্ক, দ্রাবিড়, কোংকন প্রভৃতি ম্লেচ্ছদেশে বসবাসকারী ব্রাহ্মণদের শ্রাদ্ধাদির ব্যাপারে নিমন্ত্রণ করা চলবে না।

এই যুগের বর্ণব্যবস্থার কাঠামোয় কার্যত দুটি বর্ণেরই উপস্থিতি দেখা যায়, ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র। ব্রাহ্মণোত্তর সকল জাতিই শূদ্রের পর্যায়ভুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে। শূদ্রদের সম্পর্কে পরবর্তী ধর্মশাস্ত্রসমূহে কঠোরতর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। সংস্কার প্রকাশ গ্রন্থে পরাশর উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে শূদ্রের অন্ন ভোজন, শূদ্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, শূদ্রের সংগে একাসনে উপবেশন এবং শূদ্রের কাছ থেকে পাঠগ্রহণের চেয়ে অপকর্ম আর কিছু নেই। স্মৃতিচন্দ্রিকায় একটি অনামা স্মৃতি থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে শূদ্রের রন্ধন করা খাদ্য গ্রহণ করা ব্রাহ্মণের পক্ষে সর্বক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ। যাজ্ঞবল্ক্য ৩।২৯২-এর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে অপরার্ক বলেন যে কোন দ্বিজ শূদ্রকে দেখামাত্র তার আচার অনুষ্ঠান বাতিল করবে এবং শূদ্রের সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটলে তাকে স্নান করে শুদ্ধ হতে হবে। অবশ্য গর্গের মতে শূদ্র বা নিষাদকে স্পর্শ করলে আচমনের দ্বারাই শুদ্ধ হওয়া যায়। সংস্কার প্রকাশ ও স্মৃতিচন্দ্রিকায় লঘুব্যাস উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে যেখানে শূদ্র বাস করে তার চতুঃসীমার মধ্যে বেদপাঠ করা চলবে না।

শূদ্র জাতিসমূহের বাস্তব অবস্থার পরিচয় মনুস্মৃতির মেধাতিথি রচিত ভাষ্য থেকে পাওয়া যায়। মনু ৮৪১৩-১৪ প্রসংগে মেধাতিথি বলেন যে শূদ্রের শাস্ত্রনির্দিষ্ট কাজ দ্বিজাতিদের সেবা, যা তার মোক্ষলাভের সহায়ক। কিন্তু এটা হচ্ছে অর্থবাদ বা তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ যা থেকে একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে সে দাসের পর্যায়ভুক্ত। মেধাতিথি সুস্পষ্ট বলেন যে শূদ্র স্বাধীন মানুষ, এবং যথেচ্ছ অর্থ বা সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার তার আছে। মনু ৮।৪.৫-য় উল্লিখিত শূদ্রশিষ্য শব্দটির প্রসঙ্গে মেধাতিথি বলেন

যে ব্যাকরণ ও অপরাপর লৌকিক জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শূদ্রের শিক্ষকতা করতে কোন বাধা নেই। শূদ্রের ধর্মীয় অধিকার সম্পর্কে মেধাতিথি মহাভারত ১২।৬৩।১২-১৪ অনুসরণে বলেন যে শূদ্রের জীবনে গার্হস্থ্য ছাড়া অন্য কোন আশ্রমের প্রয়োজন নেই, ব্রাহ্মণদের সেবার দ্বারাই সে চতুরাশ্রমের ফল লাভ করে (মনু ৬ ৯৭ প্রসঙ্গে)। কোন দেবতার আরাধনা করার ক্ষেত্রে তার কোন বাধা নেই, শ্রৌত-অনুষ্ঠান সমূহের অধিকার তার না থাকলেও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান সে করতে পারে (মনু ৩।৬৭, ৩।১২১, ৯০ ১২১ প্রসঙ্গে)। বিশ্বরূপ (যাজ্ঞবল্ক্য ১।১৩ প্রসঙ্গে) বলেন যে শূদ্র সংস্কারবিহীন নয়, মন্ত্রপাঠ ব্যতিরেকে সে সংস্কারাদি পালন করতে পারে।

মেধাতিথির মতে (মনু ১০ ৪১ প্রসঙ্গে) দ্বিজাতির শূদ্র ব্যাতিরেকে অনুলোম বিবাহজাত সন্তানরা উপনয়নাদি সংস্কারের অধিকারী এবং দ্বিজাতি সংক্রান্ত সমস্ত সুযোগ সুবিধাই তারা পেতে পারে। মনু প্রভৃতির মতানুযায়ী অম্বষ্ঠরা ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের সংকর যাদের পেশা কৃষিকাজ এবং চিকিৎসা, কিন্তু বৃহদ্ধর্মপুরাণ (২।১৩-১৪) অনুযায়ী তারা শূদ্র শ্রেণীভুক্ত। উশন (২৬-২৭) ভিষক নামক একটি পৃথক জাতির উল্লেখ করেছেন যারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সংকর হিসাবে কথিত এবং যাদের পেশা চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষ ও গণিতচর্চা। করণরা প্রাচীনতর স্মৃতিগ্রন্থ সমূহে (গৌতম ৪ ১৭, মনু ১০।২৭, যাজ্ঞবল্ক্য ১।৯২) বৈশ্য ও শূদ্রের সংকর বলে ঘোষিত, কিন্তু বৃহদ্ধর্ম-পুরাণের মতে তারা শূদ্র শ্রেণীভুক্ত। একথা কায়স্থদের ক্ষেত্রেও খাটে (বেদ-ব্যাস-স্মৃতি ১।১০-১১)। চণ্ডালদের প্রসঙ্গে অগ্নিপুরাণে (১৫১।১০-১১) বলা হয়েছে যে তারা ঘাতকবৃত্তি প্রভৃতি নিম্ন পেশার অধিকারী, যারা বাস করবে গ্রামের সীমানার বাইরে। মেধাতিথিও অনুরূপ কথা বলেছেন এবং সোপাক (চণ্ডাল ও পুক্কসের সংকর), সূত, মাগধ, আয়োগব প্রভৃতিকে চণ্ডাল পর্যায়ভুক্ত করেছেন। চণ্ডালের ছায়াস্পর্শে অপবিত্রতা ঘটে একথা মেধাতিথি স্বীকার করেননি। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ (যাজ্ঞবল্ক্য ৩.৩০ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানেশ্বর কর্তৃক উদ্ধৃত), ষটত্রিংশন্মত (অপরার্ক কর্তৃক উদ্ধৃত) এবং বৃদ্ধ হারীতে (৯।৩৫ -৮৪) বৌদ্ধ, শৈব, পাশুপত, লোকায়ত, জৈন, কৌল প্রভৃতি ধর্মীয় সম্প্রদায় সমূহকে প্রায় অস্পৃশ্য হিসাবেই বর্ণনা করা হয়েছে।

এযুগের লেখসমূহের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে ব্রাহ্মণরা তাদের শাস্ত্র-নির্দিষ্ট বৃত্তি অবলম্বন করার সুবাদেই ভূমিদান পেত, কিন্তু ভিন্ন বৃত্তিধারী ব্রাহ্মণদের পরিচয়ও বিভিন্ন লেখ থেকে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ গর্গ এবং তাঁর

বংশধররা বঙ্গের পালবংশীয় রাজাদের মন্ত্রী হিসাবে কাজ করেছেন। ব্রাহ্মণরা অশ্ববিক্রয় করছে, সেনাপতি, দণ্ডনায়ক এমনকি দৌবারিকেরও কাজ করছে এরকম খবর বিভিন্ন লেখ থেকে পর্যাপ্তভাবে পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয় কৃষিজীবী এবং ক্ষত্রিয় বণিকেরও উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণদের শাখাজাতিসমূহের কথাও বিভিন্ন লেখ থেকে জানা যায়, যেমন বলভীর মৈত্রকদের লেখসমূহে নাগর বা সপাদলক্ষ ব্রাহ্মণদের প্রভৃতি উল্লেখ আছে। অষ্টম-নবম শতকের পাণ্ড্যদের লেখসমূহে বৈদ্যদের উল্লেখ আছে। হূণদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার প্রমাণও বিভিন্ন লেখ থেকে পাওয়া যায়।

অনুলোম ও প্রতিলোম সংকর জাতিসমূহেয় যে তালিকা যাজ্ঞবল্ক্য দিয়েছেন স্মৃত্যর্থসার গ্রন্থে মোটামুটি সেই তালিকাই উদ্ধৃত হয়েছে সামান্য পরিবর্তনসহ। বিজ্ঞানেশ্বর বলেন যে এই তালিকা উদাহরণমূলক, বাস্তবে মিশ্রজাতির সংখ্যা সীমাহীন। বৈজয়ন্তী গ্রন্থে (৮।১।১০৮-১১) ৬৪টি জাতি উল্লিখিত হয়েছে, চারটি মূলবর্ণ, বারোটি অনুলোম-প্রতিলোম জাতি এবং তাদের আটচল্লিশটি শাখা-প্রশাখা। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে (২।১৩-১৪) ৪১টি সংকর জাতি উল্লিখিত, ২০টি উত্তম-সংকর, ১২টি মধ্যম সংকর এবং ৯টি অধম সংকর। বৈশ্যজাতিদের স্বতন্ত্র সত্তা এযুগে অন্তর্হিত হয়েছিল এবং বৈশ্যের অন্ন গ্রহণ করা শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করার মতই ব্রাহ্মণদের কাছে পাতক-কর্মরূপে বিবেচিত হয়েছিল। রাজপুতদের বিভিন্ন শাখার মধ্যে পরমার, চৌলুক্য, চাহমান ও প্রতিহাররা হিন্দু হয়ে যাওয়া গুর্জর ও হূণদের থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, পক্ষান্তরে গাহড়বাল এবং চন্দেল্লরা প্রধানত গোন্দ এবং ভরদের থেকে উদ্ভূত হয়েছিল বলে পণ্ডিতরা কেউ কেউ মনে করেন। নবম শতক থেকেই সাহিত্য ও লেখসমূহে কায়স্থদের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং একাদশ শতকের মধ্যে তারা একটি প্রভাবশালী জাতিতে যে পরিণত হয়েছিল তার প্রমাণ আছে। অন্ত্যজ জাতিসমূহের মধ্যে বৈজয়ন্তী গ্রন্থে (৮২।১৮১) চণ্ডাল, রজক, চর্মকার, বেণ, বুরুল, কৈবর্ত, মেদ ও ভিল্লের উল্লেখ আছে। দক্ষিণ ভারতে কয়েকটি জাতির মধ্যে বলঙ্গই (ডান-হাতি) এবং ইড়ঙ্গই (বাঁ-হাতি) ভেদের সূত্রপাতও একাদশ শতক থেকে।

বৃহদ্ধর্ম পুরাণে যারা উত্তম সংকর বলে বর্ণিত হয়েছে তাদের তালিকা নিম্নরূপ: করণ (লেখক ও পুস্তককর্মদক্ষ, সৎশূদ্র হিসাবে পরিগণিত) অম্বষ্ঠ (বৈদ্য, বৃত্তি চিকিৎসা, তত্ত্বের দিক থেকে বৈশ্য কিন্তু ধর্মকর্মানু-ষ্ঠানের ব্যাপারে শূদ্র হিসাবে পরিগণিত), উগ্র (বৃত্তি ক্ষত্রিয়ের, বাস্তবে

শূদ্র), মাগধ (সূত বা চারণ ও সংবাদবাহীর বৃত্তি অবলম্বী), তন্তুবায়, গান্ধিক-বণিক (গন্ধদ্রব্যের বিক্রয় যে বণিকের বৃত্তি), নাপিত, গোপ কর্মকার তৈলিক বা তৌলিক, কুম্ভকার, কাংসকার, শাংখিক বা শংখকার, দাস (কৃষিজীবী বারজীবী (বারুই), মোদক, মালাকার সূত (বৃত্তি উল্লিখিত নেই, গায়ক, সম্ভবত পণ্ডিত ব্রাহ্মণ), রাজপুত্র (রাজপুত) ও তাম্বলী (তাম্বুলী, তামলি)। মধ্যম সংকর পর্যায়ে বারোটি উপবর্ণ যথা তক্ষণ (খোদাইকর), রজক, স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, আভীর (আহির, গোয়ালা), তৈলকার, ধীবর, শৌণ্ডিক, নট, শারাক (শাবক, শারক, শাবায়, সম্ভবত দক্ষিণের শানারের প্রতিরূপ) শেখর ও জালিক। অধমসংকর বা অন্তজ পর্যায়ের নয়টি উপবর্ণ যথা মলেগ্রহী, কুড়ব, চণ্ডাল, বরুড়, তক্ষ, চর্মকার, ঘট্টজীবী (বা ঘণ্টজীবী খেয়াঘাটের রক্ষক, মাঝি, পাটনী), ডোলাবাহী (ডুলিবেহারা, বর্তমান দুলিয়া বা দুলে), মল্ল (মালো)। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বর্ণিত বর্ণবিন্যাসে সৎ ও অসৎ দুই শ্রেণীর শূদ্রবর্ণের পরিচয় পাওয়া যায়। সৎশূদ্র পর্যায়ের জাতিগুলি নিম্নরূপ : করণ, অম্বষ্ঠ, বৈদ্য (অম্বষ্ঠের শাখাজাতি), গোপ, নাপিত, ভিল্ল (উপজাতি থেকে রূপান্তরিত), মোদক, কুবর, তাম্বুলী, স্বর্ণকার (পরে পতিত ও অসৎশূদ্র পর্যায়ে অবনমিত), মালাকার, কর্মকার, শংখকার, কুবিন্দক (তন্তুবায়), কুম্ভকার, কংসকার সূত্রধার (পরে অসৎশূদ্র পর্যায়ে অবনমিত) ও চিত্রকার (অসৎশূদ্র পর্যায়ে অবনমিত)। অসৎশূদ্র পর্যায়ের জাতিগুলি হচ্ছে স্বর্ণকার, সূত্রধার, চিত্রকার, অট্টালিকাকার, কোটক (ঘরবাড়ি তৈরি যাদের বৃত্তি), তীবর (ধীবর), তৈলকার, লেট, মল্ল, চর্মকার, শুণ্ডি, পৌণ্ড্রক (পোদ), মাংসচ্ছেদ (কসাই), রাজপুত্র (রাজপুত) কৈবর্ত, রজক, কোয়ালা গঙ্গাপুত্র, যুঙ্গী (যুগী, যোগী), আগরী (উগ্র, আগুরি) প্রভৃতি। এদেরও নীচে যারা বর্তমান তারা হল ব্যাধ, ভড়, কোল, কোঞ্চ, হড্ডি (হাড়ি), ডোম, জোলা, বাগতীত (বাগদি), ব্যালগ্রাহী বা মলেগ্রহী, চণ্ডাল, ইত্যাদি। উভয় পুরাণের বর্ণনা ও বিভাজনের ক্ষেত্রে স্থানে স্থানে বৈষম্য দৃষ্ট হয়।

৩। মধ্যযুগে জাতিবর্ণপ্রথা

ভারত-ইতিহাসে মধ্যযুগের প্রকৃত সূচনা গুপ্তোত্তর যুগ থেকে হলেও এখানে আমরা দিল্লী সুলতানী ও মুঘল আমলকেই মধ্যযুগ বলে গণ্য করব। এই যুগের জাতিবর্ণপ্রথার সম্যক পরিচয়ের জন্য পূর্ববর্তী যুগে রচিত ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতিশাস্ত্র সংগ্রহের টীকা ও ভাষ্য, এবং সেগুলি অবলম্বনে রচিত

নিবন্ধ সাহিত্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বিভিন্ন পুরাণ-উপপুরাণ ধর্ম-নিরপেক্ষ সাহিত্য এবং লেখসমূহের সাক্ষ্যও যথেষ্ট মূল্যবান। এযুগে জাতি-প্রথার কার্যকর দিকসমূহের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন গৃহস্থরত্নাকর গ্রন্থে যদিও বলা হয়েছে যে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ব্রাহ্মণ সর্বদা স্নান-পূজা আহ্নিকসহ তার শাস্ত্রনির্দিষ্ট শুদ্ধবৃত্তিতে নিযুক্ত থাকবে, পরাশর-মাধবে (১ ৪২ ৷-২৬) বলা হয়েছে যে কলিযুগে কৃষি ব্রাহ্মণের অবশ্য পালনীয় উপজীবিকা হতে বাধ্য, কেননা এযুগে যাগযজ্ঞ বিরল। শুধু কৃষিই নয় অন্যান্য বৃত্তি অবলম্বনের ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যোগ্যতা অনুযায়ী ব্রাহ্মণদের একটা শ্রেণীভেদ করার প্রবণতাও দেখা যায়। গৃহস্থরত্নাকরে (২৪৯) বলা হয়েছে যে, যারা বেদপাঠের যোগ্য তারা যেন বেদেরই চর্চা করে। যারা বেদের অংশ বিশেষ পাঠ করেছে তারা যেন সেটুকুই বজায় রাখে, আর যারা শুধু গায়ত্রী মন্ত্রটুকুই জানে তারা যেন পুরাণ পাঠ করে। পরাশর-মাধবে (১ ৩৪৯-৫০) বলা হয়েছে যে অতিথি সংকার সকলেরই কর্তব্য, তবে ক্ষত্রিয় বা অন্যজাতি অতিথি হলে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী খাদ্য ও আসন দিতে হবে, ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে তদুপরি আশ্রয়।

শূদ্রদের প্রতি একটা দ্বিমুখী মনোভাবের পরিচয়ে পাওয়া যায়। একটি সম্পূর্ণ তত্ত্বগত ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টিভঙ্গী যেখানে একমাত্র দ্বিজাতির সেবাই তাদের কর্তব্য বলে ঘোষিত হয়েছে (পরাশর-মাধব ১ ৪১৮ ২০, বৃহদ্ধর্মপুরাণ ৩।৪ ৫, ২৪ ২৫, ৩১-৩২) অপর দিকে তাদের বাস্তব অবস্থার গুরুত্বও স্বীকার করা হয়েছে। যেমন বৃহদ্ধর্মপুরাণে (৩ ৪, ১৫ ৩২) যদিও শূদ্রের বেদপাঠ ও বেদশ্রবণ নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছে, একই সঙ্গে সেখানে তারা পুরাণপাঠ ও পুরাণশ্রবণের যোগ্য এবং গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণের অধিকারী বলে ঘোষিত হয়েছে। গৃহস্থরত্নাকরে বলা হয়েছে যে সৎশূদ্রদের কাছ থেকে (এখানে পাঁচটি বিশেষ শূদ্রজাতি উল্লিখিত হয়েছে) ব্রাহ্মণ খাদ্যগহণ করতে পারে, কাঁচা-খাবার বটেই, বিপদে পড়লে রান্না করা খাবারও। শূলপাণিও যাজ্ঞবল্ক্য ১।১৬৬র উপর মন্তব্য করতে গিয়ে একই কথা বলেছেন, যদিও পরাশর-মাধবে (৩ :৭১-৮১) এ বিষয়ে কিছুটা গোঁড়ামির পরিচয় আছে। মদনপারিজাত, বিবাদরত্নাকর, বিবাদচিন্তামনি প্রভৃতি গ্রন্থে জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে শূদ্রদের স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়েছে। অপরাধ ও শাস্তির ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের তুলনামূলক প্রাক্তন সুযোগ সুবিধাগুলি মদনপারিজাত, প্রায়শ্চিত্তসার প্রভৃতি গ্রন্থে বজায় রাখা হয়েছে। জাতি হিসাবে ক্ষত্রিয় শব্দটির প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা

ভীষণভাবে লক্ষ্য করা যায়। রাজা, রাজাত্মীয় এবং উচ্চস্তরের রাজপুরুষরা মাঝে মাঝে ক্ষত্রিয় আখ্যায় ভূষিত হলেও শব্দটির প্রয়োগ সাধারণত গৌরবার্থে, জাত্যার্থে নয়। বৈশ্যদের উল্লেখ তত্ত্বমূলক অংশে থাকলেও টীকা-ভাষ্য ও নিবন্ধ গ্রন্থসমূহে তাদের শূদ্রদের সমজাতীয় হিসাবে গণ্য করা হয়েছে এবং শূদ্রদের আচরণবিধি তাদের উপর প্রযুক্ত হয়েছে। অনুলোম সংকর জাতিগুলি সচরাচর সৎ-শূদ্রের মর্যাদা পেয়েছে এবং প্রতিলোম-সংকর জাতিগুলি অসৎ-শূদ্রের। চণ্ডালদের সম্পর্কেও প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গীর কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। লেখমালা ও সাহিত্যের সাক্ষ্য থেকে দক্ষিণভারতে কতকগুলি বিশেষ শাখাজাতির পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ ছাড়া চেট্টি (শ্রেষ্ঠী বা বণিক), বীর-পঞ্চাল (পাঁচটি কারিগর জাতি), কৈক্কোল (তন্তুবায়), অম্বট্টন (অম্বষ্ঠ, এতদঞ্চলে বৈদ্য নয়, নাপিত), তোত্তিয়ার, সৌরাষ্ট্র, রেড্ডি ও কুরুম্বরদের ব্যাপক উল্লেখ পাওয়া যায়। নিম্নস্তরের অন্ত্যজপর্যায়ের জাতিসমূহের মধ্যে দোম্বর (বাজিকর ও গণক), যোগী ও মারাবারদের সংবাদও বিশেষভাবে পাওয়া যায়।

মুসলমান আধিপত্যের যুগে হিন্দু নিবন্ধকাররা কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করে, অর্থাৎ যেভাবে কূর্ম নিজেকে তার শক্ত খোলার মধ্যে গুটিয়ে রাখে, হিন্দু সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। এই সকল নিবন্ধকারদের মধ্যে দ্বাদশ শতকের লক্ষ্মীধর, ত্রয়োদশ শতকের হেমাদ্রি, চতুর্দশ শতকের চণ্ডেশ্বর, ষোড়শ শতকের পদ্মনাভ মিশ্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আকবরের রাজস্বমন্ত্রী তোডরমলের আনুকূল্যে তোডরানন্দ নামক কোষধর্মী নিবন্ধগ্রন্থ রচিত হয়েছিল। সপ্তদশ শতকে মিত্রমিশ্র বীরমিত্রোদয় রচনা করেন এবং অনন্ত-দেব স্মৃতিকৌস্তুভ। অপরাপর স্মার্তদের মধ্যে বঙ্গদেশের রঘুনন্দন ও রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, কামরূপের পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ এবং মহারাষ্ট্রের কমলাকর ভট্ট উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই পুরাতন ধর্মশাস্ত্রোক্ত বক্তব্যসমূহকে বাস্তবতার নিরিখে পুনর্মূল্যায়ন করেছিলেন, এবং পুরাতন বিধিসমূহকে বদলে ফেলার কোন প্রয়োজন উপলব্ধি করেননি।

নানা কারণে জাতিপ্রথাবিরোধী কিছু কিছু আন্দোলন মধ্যযুগে শুরু হয়েছিল। অবশ্য এ আন্দোলনের সূত্রপাত বহু বহু পূর্বকাল থেকে। তত্ত্বের দিক থেকে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের জাতিপ্রথা ও ব্রাহ্মণ্যবিরোধিতা সুবিদিত, যদিও বাস্তবে এই দুটি ধর্মমতই যে জাতিপ্রথার কবলিত হয়েছিল, তাও আমরা দেখেছি। সহজিয়া বৌদ্ধরা জাতিপ্রথার তীব্র বিরোধিতা করেছে।

সরহপাদ প্রভৃতির রচনায় জাতিপ্রথা যে কত অলীক তা প্রতিপাদন করা হয়েছে। রামানন্দ, কবীর, নানক, প্রমুখ মধ্যযুগের উদার ধর্মমত সমূহের প্রবক্তারাও জাতিপ্রথার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছেন। ব্রাহ্মণ্য প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলন দক্ষিণের শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত তেনকলইরা শুরু করেছিল। শ্রীবৈষ্ণবদের অপর শাখা বড়কলইরা ছিল জাতিপ্রথা ও ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের ঘোর সমর্থক। তেনকলইদের মতে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া নয়, শূদ্ররাও তার অধিকারী হতে পারে, এবং জ্ঞানী শূদ্র অনায়াসেই ব্রাহ্মণ গুরুর স্থান অধিকার করতে পারে। তেনকলইদের এই বক্তব্য নিছকই তাত্ত্বিক স্তরে আবদ্ধ ছিলনা। ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত একটি তামিল তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যে বেঙ্কটপতিদেবের রাজ্যকালে একজন শূদ্র পুরোহিত তাঁর অনুগামীদের সাহায্যে মুত্তু কৃষ্ণপ নায়কের উপস্থিতিতে কণ্ডিয় দেববক্ষে বৃদ্ধাচলমের রাজা বলে ঘোষণা করেন।

দক্ষিণের তেনকলইদের ভাবধারা উত্তরে নিয়ে যান হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের লেখক গোপাল ভট্ট যিনি চৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভারতীয় ভক্ত ছিলেন। তিনি স্কন্দপুরাণের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের মত শূদ্র ও নারীরাও শালগ্রামশিলা পূজার অধিকারী। হরিভক্তিবিলাসের (৫ ৪৯১-১৩) টীকায় ওই একই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করেন সনাতন গোস্বামী, বায়ু, নারদীয় ও ভাগবত পুরাণ এবং তৎসহ হয়শীর্ষ পাঞ্চরাত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে। তিনি ভাগবত পুরাণ (৪।২১।১২) এবং শ্রীধর স্বামীর টীকার ভিত্তিতে প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেন যে নীচ জাতিতে জন্মগ্রহণ করলেও বৈষ্ণবরা ব্রাহ্মণদের সমতুল্য, এমনকি ব্রাহ্মণদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। চৈতন্যদেবের কিছু অব্রাহ্মণ ভক্ত ব্রাহ্মণদেরও শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন নি। বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ডের বাসিন্দা নরহরি সরকার জাতিতে বৈদ্য ছিলেন কিন্তু অনেক ব্রাহ্মণ তাঁর শিষ্যত্ব অবলম্বন করেছিল। নরোত্তম ঠাকুর ছিলেন কায়স্থ, অথচ গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী, দ্বিজ বসন্ত প্রভৃতি প্রখ্যাত ব্রাহ্মণরা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। সপ্তদশ শতকের মহারাষ্ট্রের সাধক তুকারাম শূদ্র ছিলেন, কিন্তু অসংখ্য ব্রাহ্মণ তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন। আসামের শংকরদেব এবং তাঁর প্রধান শিষ্য মাধবদেব কায়স্থ ছিলেন, যাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে ব্রাহ্মণরা দ্বিধাবোধ করে নি। কিন্তু যে কথা আমরা আগে বারবার বলেছি, জাতিপ্রথার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন মূলত মানুষের নৈতিকতাবোধ থেকে উদ্ভূত, কিন্তু জাতিপ্রথা একটি অতি জটিল সামাজিক-অর্থনৈতিক পদ্ধতির পরিণাম, যার

উৎস ও স্বার্থ বহুমুখী। ফলে জাতিপ্রথা বিরোধী সম্প্রদায়গুলিই নানা ঐতিহাসিক কার্যকারণে নিজেরাই জাতিতে পরিণত হয়েছে। আবার বহু ক্ষেত্রে এও দেখা গেছে যে জাতিপ্রথা-বিরোধিতাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠা সম্প্রদায়ের মধ্যেই জাতিপ্রথার অনুপ্রবেশ হয়েছে। যেমন শংকরদেব-মাধবদেবের কিছু শিষ্য যথা গোপালদেব, হরিদেব, দামোদরদেব প্রভৃতি স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই ব্রাহ্মণ্যপ্রাধান্যবাদী উপসম্প্রদায়ের পত্তন করেন এবং তাঁরা বামুনিয়া গোঁসাই বলে পরিচিত হন।

রামচরিতমানসের সুবিখ্যাত লেখক তুলসীদাস, সাধক হিসাবে যাঁর খ্যাতি বহুবিস্তৃত, ছিলেন জাতিবর্ণপ্রথার ঘোরতর সমর্থক। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে কলিযুগের অনাচার প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে শূদ্ররাও এ যুগে বলতে শুরু করেছে যে তারাও ব্রাহ্মণদের চেয়ে কোন অংশে ছোট নয়। ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলেন যে শূদ্ররাও আজকাল ব্রাহ্মণদের শিক্ষাদাতার ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তারাও উপবীত ধারণ করা শুরু করেছে, এমনকি দান গ্রহণ করতেও তাদের আপত্তি নেই। তিনি আরও বলেন যে তেলি, কুমোর, চণ্ডাল, কিরাত, কোল, কালোয়াররা বউ মারা গেলে মাথা মুড়িয়ে গেরুয়া বসন ধারণ করছে এবং ব্রাহ্মণদের নিজেদের পদধূলি বিতরণ করছে ; শূদ্ররা জপ করছে, ব্রতপালন করছে, উচ্চাসনে বসে পুরাণ পাঠ করছে। এই সবই ঘোর কলির লক্ষণ (রামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ৪৮৩)। নিবন্ধকারেরা অব্রাহ্মণদের এইসকল কার্যকলাপ বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। শূদ্রের শালগ্রামশিলা পূজার অধিকার তাঁরা অস্বীকার করেছেন। মহারাষ্ট্রের নিবন্ধকার কমলাকর ভট্ট শূদ্রদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু তিনি বলেছেন যে শূদ্রদের পক্ষে পুরাণপাঠ বা পুরাণোক্ত মন্ত্রোচ্চারণ বিধেয় নয়, এজন্য ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করা তাদের কর্তব্য। তবে লক্ষ্মীধর শূদ্রদের এই অধিকার স্বীকার করে নিয়েছেন। কমলাকর শূদ্রদের রামমন্ত্র এবং শিবমন্ত্র গ্রহণের অধিকার দিয়েছেন। তিনি এবং রঘুনন্দন উভয়েই শূদ্রদের ব্রতপালনের অধিকার মেনে নিয়েছেন, কিন্তু মন্ত্রপাঠের জন্য তাদের ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করতে হবে এই বিধান দিয়েছেন।

ষোড়শ শতকের নিবন্ধকারদের মধ্যে বঙ্গদেশের নবদ্বীপের হরিহর ভট্টাচার্যের পুত্র রঘুনন্দনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিন্দুদের সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থার উপর তিনি আঠাশটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন যেগুলি একত্রে স্মৃতিতত্ত্ব নামে পরিচিত। অর্ধশতাব্দীরও কম সময়ের মধ্যে তাঁর নাম ও রচনা সমগ্র উত্তর ও পশ্চিম ভারতে পরিব্যাপ্ত হয়। কমলাকর ভট্ট ১৬১২

খ্রীষ্টাব্দে রচিত নির্ণয়সিন্ধু গ্রন্থে রঘুনন্দনের বক্তব্যসমূহ বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করেছেন। রঘুনন্দন ব্রাহ্মণ্যবাদের ঘোরতর সমর্থক ছিলেন। তাঁর মতে ব্রাহ্মণরাই একমাত্র দ্বিজাতি হিসাবে গণ্য। মনুসংহিতা এবং বিষ্ণুপুরাণের ব্যাখ্যা অনুসরণে তিনি বলেন যে মহাপদ্ম নন্দের সময় থেকেই ক্ষত্রিয়দের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে। বৈশ্য এবং অম্বষ্ঠরা শাস্ত্রনির্ধারিত পথ থেকে বিচ্যুত হবার জন্যই বর্ণপরিচয় হারিয়ে শূদ্রে পরিণত হয়েছে। কাজেই বর্ণ দুটি—দ্বিজ (ব্রাহ্মণ) এবং শূদ্র। কমলাকর ভট্টও রঘুনন্দনের এই মত সর্বাংশে সমর্থন করেন। কেশব পণ্ডিত অবশ্য ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেন (না করে উপায় ছিল না, কেননা তিনি শিবাজী ও তাঁর পুত্রদের অধীনে বিচারবিভাগে কাজ করেছেন, এবং শিবাজী নীচ জাতিভুক্ত হলেও নিজেকে ক্ষত্রিয় বলে ঘোষণা করেছিলেন)। উড়িষ্যার প্রতাপরুদ্রদেব একটি নিবন্ধধর্মী গ্রন্থ লিখেছিলেন যেখানে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের স্বাধীন সত্তা স্বীকৃত হয়েছে। সপ্তদশ শতকের অনন্তদেব বলেন যে গ্রামে কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদের বসতি, পুর-সমূহে ক্ষত্রিয়রাও বাস করে, পত্তন-সমূহে বৈশ্যদের প্রাধান্য, খেট-সমূহে উচ্চ তিন বর্ণের প্রাধান্য, এবং নগর সকলের জন্যই। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে রঘুনন্দনের দ্বিবর্ণ বিভাগ মোটামুটিভাবে স্বীকৃত হলেও সর্বত্র স্বীকৃত ছিল না। শিবাজীর রাজ্যলাভের পর সমস্যাটি একটি নূতন ধরনের মোড় নেয়। রঘুনন্দন শূদ্রদের শুধু একটি সংস্কারই অনুমোদন করেছিলেন যা হচ্ছে বিবাহ। গাগাভট্টের সহায়তায় শিবাজী (যিনি নিজে শূদ্র ছিলেন এবং ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি তারিখে নিজেকে ক্ষত্রিয় বলে ঘোষণা করেন) স্যেনবি, চন্দ্রসেনীয়, কায়স্থ, মারাঠা এবং আরও কয়েকটি শূদ্র জাতিকে ষোড়শ-সংস্কারের অধিকারী বলে ঘোষণা করেন।

৪ ॥ জাত্যুৎকর্ষ, জাত্যপকর্ষ, কৌলিন্যপ্রথা প্রভৃতি

গৌতম (৪.১৮-১৯ ইত্যাদি) বলেন যে অনুলোম বিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষ বা নারীর পক্ষে জাতিস্তরের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী সপ্তম বা পঞ্চম পুরুষে জাতির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ ঘটে। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে হরদত্ত বলেন ব্রাহ্মণ পুরুষ ও ক্ষত্রিয়া নারীর সংযোগজাত কন্যা সবর্ণা হিসাবে পরিচিত হয়। সেই কন্যার সঙ্গে যদি কোন ব্রাহ্মণের বিবাহ হয়, এবং তারা যদি বংশানুক্রমিকভাবে ব্রাহ্মণদের সঙ্গেই সম্পর্ক করে তাহলে সাত পুরুষে জাত্যুৎকর্ষ ঘটে তারা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণে পরিণত হয়, কিন্তু যদি সম্পর্ক নিম্নবর্ণের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে ঘটে

তাহলে জাত্যপকর্ষ হয় এবং পাঁচ পুরুষেই তারা নিম্নতর জাতিতে পরিণত হয়। এই নিয়মটি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মনুর মতে (১০। ৬৪-৬৫ ইত্যাদি) ব্রাহ্মণ ও শূদ্রনারীর কন্যা পারশবা নামে কথিত এবং তাদের জাত্যুৎকর্ষ বা জাত্যপকর্ষ পূর্বোক্ত নিয়মের অধীন। যাজ্ঞবল্ক্য ১।৯৬-এর উপর মিতাক্ষরা ভাষ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিবাহজাত কন্যাকে অম্বষ্ঠা, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের বিবাহজাত কন্যাকে নিষাদী, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বিবাহজাত কন্যাকে মাহিষ্যা, ক্ষত্রিয় ও শূদ্রের বিবাহজাত কন্যাকে উগ্রা এবং বৈশ্য ও শূদ্রের বিবাহজাত কন্যাকে করণী বলা হয়েছে, এবং তাদের জাত্যুৎকর্ষ বা জাত্যপকর্ষের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত নিয়মই কার্যকর। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে (১।৮।১৩-১৪) জাত্যুৎকর্ষের একটি ভিন্ন ধরনের উদাহরণ আছে। যদি কোন নিষাদ (ব্রাহ্মণ পুরুষ ও শূদ্রনারীর সংকর) কোন নিষাদীকে বিবাহ করে (এবং যদি বংশপরম্পরায় এটা ঘটে) তাহলে পঞ্চম পুরুষে তাদের শূদ্রত্ব দূর হয় এবং তারা উপনয়নাদি সংস্কার ও বৈদিক যজ্ঞের অধিকারী হয়। কিন্তু বাস্তবে এই রীতি কতটা অনুসরণযোগ্য ছিল তাতে সন্দেহ আছে। যাজ্ঞবল্ক্য দু'ধরনের জাত্যুৎকর্ষ বা বা জাত্যপকর্ষের কথা বলেছেন, বিবাহঘটিত এবং পেশাঘটিত। শেষেরটিই অধিকতর বাস্তব। তিনি বলেন যে শূদ্রের বৃত্তি পুরুষানুক্রমে অবলম্বন করলে ব্রাহ্মণের জাত্যপকর্ষ ঘটে। এরকম কিছু উদাহরণ ইবেটসন পাঞ্জাব অঞ্চল থেকে দিয়েছেন যেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে পুরুষানুক্রমে হীনবৃত্তি অবলম্বন করার ফলে ব্রাহ্মণ ভিন্ন জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

তবে মধ্যযুগেও অসবর্ণ বিবাহের যে ব্যাপক প্রচলন ছিল তার প্রমাণ আছে। বঙ্গদেশের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে পাল আমলের রাজা লোকনাথের পিতৃ ও মাতৃবংশের পরিচয়ে জানা গেছে যে উচ্চবর্ণের পুরুষের সঙ্গে নিম্নবর্ণের নারীর বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। ভবদেব ব্রাহ্মণের বিদগ্ধা শূদ্রা স্ত্রীর কথা উল্লেখ করেছেন। জীমূতবাহন ব্রাহ্মণের শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি এমনও বিধান দিয়েছেন যে সমবর্ণের স্ত্রী বিদ্যমান না থাকলে অব্যবহিত নিম্নবর্ণের স্ত্রী হলেও চলতে পারে। সবর্ণে বিবাহই সাধারণ নিয়ম ছিল, এই অনুমান সহজেই করা চলে, কিন্তু শূদ্রবর্ণ পর্যন্ত নিম্নবর্ণে অনুলোম বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। তবে ব্রাহ্মণদের পক্ষে শূদ্রনারীকে বিবাহ করা ধীরে ধীরে সমাজে যে নিন্দনীয় হচ্ছিল তারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মনু ও বিষ্ণুস্মৃতির বক্তব্য ব্যাখ্যা করে জীমূতবাহন বলেন যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যাকে বিবাহ করতে পারে, তবে

তার পক্ষে শূদ্রাকে বিবাহ করা অনভিপ্রেত। সবর্ণা স্ত্রী বর্তমান না থাকলে নিম্নবর্ণা স্ত্রী যজ্ঞভাগী হতে পারে এই বিধান জীমূতবাহন দিলেও এই নিম্ন-বর্ণের সীমারেখাটা তিনি শূদ্রা স্ত্রী পর্যন্ত টানেন নি। অন্যত্র তিনি বলেছেন যে ব্রাহ্মণ শূদ্রার গর্ভে সন্তানের জন্মদান করলে তাতে কোন নৈতিক অপরাধ হয় না, স্বল্প সংসর্গদোষ তাকে স্পর্শ করে মাত্র এবং নামমাত্র প্রায়শ্চিত্ত করলেই সে অপরাধ কেটে যায়। এক্ষেত্রে শাস্ত্রকারদের দ্বৈধীভাব লক্ষণীয়। তবে প্রতিলোম বিবাহ মধ্যযুগে অবৈধ হিসাবে গণ্য হয়েছিল।

বঙ্গদেশে বিশেষ করে জাত্যুৎকর্ষ ও জাত্যপকর্ষের ক্ষেত্রে বল্লালসেনের নাম জড়িয়ে আছে। বল্লালচরিত নামে দুটি গ্রন্থ প্রচলিত, লেখকদের নাম আনন্দ ভট্ট ও গোপাল ভট্ট। দুটি গ্রন্থই ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের লোককাহিনীর উপর নির্ভর করে রচিত, যার বিষয়বস্তুর উপর বল্লালসেন নামক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের আরোপ ঘটেছে এই মাত্র। দুটি গ্রন্থেরই উদ্দেশ্য জাতিকাঠামোয় কয়েকটি বিশেষ বণিকজাতির নিম্ন মর্যাদার ব্যাখ্যা করা। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে তাঁতী, গন্ধবণিক, কর্মকার, তৌলিক, কুমোর, শাঁখারি, কাঁসারি, বারুজীবী, মোদক, মালাকার প্রভৃতিকে উত্তম সংকর পর্যায়ে গণ্য করা হয়েছে, অথচ স্বর্ণকার-সুবর্ণবণিকদের ধীবর-রজকের সঙ্গে জল-অচল মধ্যম সংকর পর্যায়ে রাখা হয়েছে। বল্লালচরিতে এই জাতীয় সমস্যার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে যুদ্ধার্থে বল্লালসেন সুবর্ণ বণিকদের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহে ব্যর্থ হওয়ায় ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের শূদ্রের স্তরে নামিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাদের কাছ থেকে দান গ্রহণ করলে বা তাদের পূজা-অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করলে বা তাদের শিক্ষাদান করলে ব্রাহ্মণরাও পতিত হবে এইরকম বিধান দিয়েছিলেন। বণিকরা তখন প্রতিশোধ নেবার জন্য দ্বিগুণ ত্রিগুণ মূল্য দিয়ে সমস্ত দাসভৃত্যদের হাত করে ফেলে। এতে উচ্চবর্ণের লোকদের খুবই অসুবিধা হয়। তখন বল্লাল বাধ্য হয়ে কৈবর্তদের জলচল সমাজে উন্নীত করে দেন এবং তাদের নেতা মহেশকে মহামাণ্ডলিকের পদ প্রদান করেন। মালাকার কুম্ভকার, কর্মকার প্রভৃতিরাও সৎশূদ্র পর্যায়ে উন্নীত হয়। বণিকশ্রেণী যারা বৈশ্য হিস্যবে দ্বিজাতির অন্তর্গত ছিল এবং যারা উপবীত ধারণ করত তাদের দ্বিজত্ব বিলুপ্ত হয়। অনেক বণিক দেশ ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে গিয়ে দ্বিজত্ব বজায় রাখে।

কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তনের সঙ্গেও বল্লাল সেনের নাম জড়িয়ে আছে। কিন্তু তিনিই যে এই প্রথার প্রবর্তক তার কোন প্রমাণ নেই। তাঁর রচিত দানসাগর ও

অদ্ভুতসাগর গ্রন্থদ্বয়ে এই প্রথার কোন উল্লেখ নেই। বঙ্গদেশের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে, উড়িষ্যার দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণদের মধ্যে এবং মিথিলার ব্রাহ্মণদের মধ্যে কৌলিন্য প্রথা একদা বহুল প্রচলিত ছিল। কৌলিন্যের অনুরূপ প্রথা ভারতবর্ষের অন্যত্রও ব্রাহ্মণদের মধ্যে দেখা যেত, তবে বঙ্গদেশেই এই প্রথার প্রাবল্য ছিল বেশি। কৌলিন্য বলতে বোঝায় গুণের ভিত্তিতে সৃষ্ট একটি কাল্পনিক উচ্চশ্রেণী, মূলত ব্রাহ্মণদের মধ্যেই। এই গুণের সংখ্যা ছিল নয়টি : আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, শান্তি, তপস্যা, ও দান। এই গুণগুলির ভিত্তিতে উত্তর-রাঢ়ীয় ও দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থরাও নিজেদের মধ্যে কৌলিন্যপ্রথা প্রচলন করে। এই প্রথা প্রবর্তনের ফলে কুলীন আখ্যায় ভূষিত ব্রাহ্মণদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায় যদিও তাদের মধ্যে আচার বিদ্যা বিনয় প্রভৃতি নবধা কুললক্ষণের রীতিমত ঘাটতি ছিল। ষোড়শ শতকের শেষের দিকে দেবীবর মিশ্র বা দেবীবর ঘটক মেলবন্ধন নামক একটি নিয়ম প্রবর্তন করেন। যারা সে-আমলে কুলীন বলে বিবেচিত ছিল তাদের দোষগুণ অনুযায়ী তিনি ছত্রিশটি মেল বা দলে বিভক্ত করেন। এই ছত্রিশটি মেলের মধ্যে বাইশটি প্রকৃতির নামে তিনটি উপাধির নামে এবং পাঁচটি দোষের নামে পরিচিত। শেষের পাঁচটির নাম ছায়া, পারিহাল, শুঙ্গ-সর্বানন্দী, প্রমোদিনী ও হরিমজুমদারী। প্রতিটি মেলের অন্তর্গত ব্যক্তিরা সমপর্যায়ের কুলীন যাদের বিবাহাদি সেই মেলের মধ্যেই করা দরকার। নতুবা মেলভঙ্গে পতিত হতে হবে। উদয়নাচার্য নামক এক পণ্ডিত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনুরূপ রীতি প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। সে যাই হোক, এর ফলে বিবাহের গণ্ডী অনেক সংকীর্ণ হয়ে যায়। যোগ্যপাত্রের অভাবে বহুবিবাহের প্রচলন হয়। কুলীনের মর্যাদার জন্য শ্রোত্রিয় ও বংশজরা কুলীন পাত্রকে কন্যাদান করে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করে। ফলে শ্রোত্রিয় ও বংশজদের মধ্যে নিজ শ্রেণীতে কন্যা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এই সুযোগে ঘটক শ্রেণীর ব্রাহ্মণরা নামগোত্রহীন মেয়ে আমদানী করে যথেষ্ট কন্যাপণ নিয়ে শ্রোত্রিয় ও বংশজদের সঙ্গে বিবাহ দিতে শুরু করে। এদের 'ভরার মেয়ে' বলা হত। এদের মধ্যে নানাজাতের মেয়ে থাকত এবং এমনকি মুসলমানেরও। অন্যদিকে কুলীনদের মধ্যে বিবাহ একটা বাণিজ্য এবং বহুক্ষেত্রে জীবনোপায় হয়ে ওঠে। কুলীনের কুলরক্ষার তাগিদে বৃদ্ধের সঙ্গে বালিকার অথবা বালকের সঙ্গে বৃদ্ধার বিবাহ চালু হয়। অনেক কুলীনের মেয়ে সারা জীবন অবিবাহিতা থেকে যায়।

৬ ॥ ইংরাজ আমলে জাতিপ্রথা

ভারতবর্ষে ইংরাজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও জাতিপ্রথার গঠনগত ক্ষেত্রে কোন গুণগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি যদিও কার্যকারিতার ক্ষেত্রে কোন কোন দিকে সুদূর প্রসারী পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল যেগুলির প্রকৃতি আমরা বিশ্লেষণের চেষ্টা করব। ইংরাজ অধিকার যদিও এদেশে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রচলন ঘটাতে কিয়দংশে কার্যকর হয়েছিল, যদিও কিছু কলকারখানা স্থাপিত হয়েছিল এবং যোগাযোগ ব্যবস্থারও কিছু উন্নতি হয়েছিল, তৎসত্ত্বেও ভারতবর্ষের মত একটি বিরাট দেশে উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোন বৈপ্লবিক পালাবদল ঘটেনি, উৎপাদন ব্যবস্থার পুরাতন চেহারাটাই বজায় ছিল। ভারতবর্ষের জাতিসমূহের সর্বাধিক অংশ কৃষিজীবী হওয়ার জন্য, এবং কৃষিগত উৎপাদন ক্ষেত্রে চিরাচরিত রীতির বিশেষ কোন পরিবর্তন না হওয়ার জন্য, কৃষিজীবী জাতিসমূহের মধ্যে ব্যাপক কোন সামাজিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ তীব্রভাবে দেখা যায়নি। অকৃষিজীবী পেশাদার জাতিদের মধ্যে যাদের কাজের ক্ষেত্রে পদ্ধতি বা কলাকৌশল পরিবর্তন করার কোন প্রশ্ন ওঠেনা যেমন গোয়ালা, নাপিত, মোদক, রজক প্রভৃতি, তাদেরও চিরাচরিত সামাজিক-ব্যবস্থা পরিবর্তনের আগ্রহ দেখা যায়নি। কিন্তু কয়েকটি জাতি শোচনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল যাদের কৌলিক বৃত্তির সঙ্গে যন্ত্র-শিল্পের প্রত্যক্ষ সংঘাত লেগেছিল, বিশেষ করে তন্তুবায়, কর্মকার প্রভৃতি জাতির, যারা বিদেশে উৎপন্ন যন্ত্রনির্মিত পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় স্বাভাবিকভাবেই পিছু হটে গিয়েছিল। কার্ল মার্কস ভারতের গ্রামসমূহকে স্বয়ংসম্পূর্ণ আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর অনুগামী ঐতিহাসিকেরা আজকাল এটা মানেন না। কিন্তু আক্ষরিকভাবে তাঁর কথাটা ঠিক না হলেও বিভিন্ন বৃত্তিজীবী জাতির কাজকর্মের সমন্বয়ে সর্বত্রই একটা আঞ্চলিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা ছিল, ইংরাজ অধিকারের পর যেটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। উচ্চবর্ণের জাতিসমূহের ক্ষেত্রে একটা জোরালো সামাজিক সচলতার সৃষ্টি হয়েছিল কেননা ইংরাজী শিক্ষার কল্যাণে তাদের জীবিকার ক্ষেত্রে নানা সম্ভাবনার উন্মোচন ঘটেছিল, এবং নূতন লাভজনক পেশাসমূহের সুবাদে মোটামুটিভাবে ইংরাজী-শিক্ষিত উচ্চপর্যায়ের জাতিগুলির জীবনচর্যার ক্ষেত্রে একটা সমজাতীয়তার সূত্রপাত হয়েছিল। ইংরাজ আমলে এরাই ভদ্রলোকশ্রেণী হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। ইংরাজী শিক্ষিত এই ভদ্রলোক শ্রেণীর জাতিগুলির ক্ষেত্রে জীবনযাত্রার একটি সাধারণ পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল। বস্তুত সরকারী বা সওদাগরী অফিসের কর্মচারী, শিক্ষক,

দালাল, আধুনিক চিকিৎসক, আইনজীবী প্রভৃতি পেশাদাররা ব্রাহ্মণই হোক আর কায়স্থই হোক আর বৈদ্যই হোক, এমনকি যদি আরও নীচু থেকে কেউ কেউ এসে থাকে তারাও নূতন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একটা সমজাতীয়তার পর্যায়ে পেঁাছেছিল, এবং এই শ্রেণীর মানুষেরা একটি রিগ্রুপিং বা নূতন সামাজিকগোষ্ঠী বা জাতি গঠনের চেষ্টা করেছিল। অসবর্ণ বিবাহ প্রভৃতি জাতিপ্রথা বিরোধী ধ্যান ধারণার জনপ্রিয়তা এই শ্রেণীর মধ্যেই দেখা দিয়েছিল, কিন্তু তা জাতিপ্রথাকে পুরোদস্তুর ভেঙে দেওয়ার জন্য ততটা নয় যতটা নিজেদের সামাজিক পরিবেশ অনুযায়ী নূতন জাতি সৃষ্টি করার প্রয়োজনে। যেমন একজন বড় সরকারী পদাধিকারীর কন্যার সংগে লাভজনক পেশায় নিযুক্ত চিকিৎসক পাত্রের অসবর্ণ বিবাহ হতে পারে। এখানে পুরাতন জাতির বেড়াটা ভাঙলেও সমমর্যাদার একটি নূতন বেড়া গড়ে উঠেছে যার বাইরে যাওয়া চলবেনা। স্বাধীন ভারতে এই পদ্ধতিটি অধিকতর স্পষ্ট, এই গ্রন্থের উপসংহার অংশে আমরা যা দেখব।

নিম্ন পর্যায়ের জাতিসমূহের ক্ষেত্রেও কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করার মত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে বা প্রত্যক্ষ ইংরাজ শাসনকালে স্থানীয় কোন ব্যবস্থা বা প্রথার উপর সচেতনভাবেই কোন হস্তক্ষেপ করা হয়নি। গোড়ার দিকে কোম্পানী নানাস্থানে জাতি-আদালত স্থাপন করেছিল যার দ্বারা জাতি-সমূহের নিজস্ব জাত-আইন ও স্বতন্ত্রতার মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। এক্ষেত্রে এটাও স্মরণীয় যে ইংরাজ আমলে ভারতবর্ষের সবটাই ইংরাজদের প্রত্যক্ষ অধিকারে ছিলনা, দেশীয় রাজ্য ছিল অসংখ্য এবং এই সকল রাজ্যের রাজাদের কাছ থেকে ইংরাজরা কর ও নানা সুযোগ সুবিধা নিলেও সেই সকল রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে তারা বিরত ছিল। ইংরেজদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন প্রদেশ সমূহে আইন শৃংখলা পরিস্থিতি যথেষ্ট ভাল ছিল এবং প্রজার জীবনে নিরাপত্তাও ছিল। কিন্তু তাদের নেপথ্য শোষণ দেশের অর্থনীতিকে সামগ্রিকভাবে পংগু করে দিয়েছিল, পেশাদার জাতিরা তো বটেই এমনকি কৃষিজীবীদের অবস্থাও শোচনীয় হয়েছিল, এবং তাদেরও অনেকে কৌলিক বৃত্তি ত্যাগ করে শহরাঞ্চলে অন্য জীবিকার খোঁজে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু দুর্দশার মাত্রা বৃদ্ধি সত্ত্বেও নিম্নবৃত্তিজীবী জাতিদের ক্ষেত্রে জাতিগত সংহতি অনেক বেড়েছিল। বস্তুত ওই সংহতিই তাদের জাতিগত অস্তিত্বকে টিঁকিয়ে রেখেছিল এবং আজও রেখেছে। এমনকি যারা কলকার-খানায় কাজ নিয়েছিল তাদের মধ্যে শ্রেণীগত চেতনার পরিবর্তে জাতিগত

চেতনাই অধিকতর প্রবল ছিল, এবং আজও আছে। কোম্পানী প্রবর্তিত জাতি-আদালত ব্যবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, কেননা ইংরাজ প্রবর্তিত দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিধিসমূহ যথেষ্ট উন্নত হওয়ায়, এবং সেখানে কোন জাতিপার্থক্য না থাকায়, উচ্চনীচ নির্বিশেষে তা সকলেরই আস্থা অর্জন করেছিল। এমনকি জাতি-আদালত থাকাকালীনই বঙ্গদেশে জাতিবিরোধ সংক্রান্ত মামলা কোম্পানীর আদালতে দায়ের করাই অধিকতর জনপ্রিয় ছিল, কেননা সেখানে সুবিচারের সম্ভাবনাটা বেশি থাকত। এছাড়া ইংরাজ প্রশাসকগণ ভারতের জাতি ও শাখা-জাতিদের সম্পর্ক বিস্তৃত অনুসন্ধান করেছিলেন, যাঁদের প্রদত্ত রিপোর্টের কল্যাণেই আজ জাতিপ্রথা নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা সম্ভবপর হয়েছে। অনুন্নত জাতিগুলির উন্নতির জন্য তাঁরা নানা সুপারিশ করেছিলেন, যেগুলির কিছু কিছু গৃহীতও হয়েছিল যার পরিণামে অল্পসংখ্যক হলেও অবদমিত জাতিদের মধ্য থেকেও কিছু শিক্ষিত ও সচেতন ব্যক্তি নিজেদের মানবিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হন। কিন্তু যেটা চোখে পড়ার মত তা হচ্ছে এই যে অবদমিত জাতিগুলি নিজ মানবিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া সত্ত্বেও সঙ্গত কারণেই জাতিপ্রথা ভেঙে দেবার জন্য কোন আন্দোলন করেনি। তাদের লক্ষ্য ছিল প্রচলিত জাতিকাঠামোর মধ্যেই অধিকতর মর্যাদার স্থানলাভ।

ইংরাজ শাসকরা ভারতীয় সমাজব্যবস্থাকে মোটামুটিভাবে অটুট রেখেই এদেশে শাসনকার্য চালাবার পক্ষপাতী ছিলেন, যদিও অবদমিত জাতিগুলির স্বার্থে কিছু কিছু আইন প্রণয়নও তাঁরা মাঝে মধ্যে করেছেন। যেহেতু ইংরাজ সরকারের ভারতীয় কর্মচারীরা মুখ্যত উচ্চবর্ণের লোক ছিলেন এই সকল আইন প্রণীত হলেও সেগুলি যথাযোগ্যভাবে কার্যকর হবার সুযোগ পায়নি। এই সকল আইনের মধ্যে ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের কাস্টস্-ডিসেবিলিটিজ রিমুভাল অ্যাক্টকে প্রথম সুস্পষ্ট পদক্ষেপ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে, যদিও এই আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্র ছিল অতিশয় সীমাবদ্ধ। এছাড়া সিপাহী বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা ইংরাজ শাসকদের বাস্তববাদী করে তুলেছিল। স্যার লেপেল গ্রিফিন জানিয়েছিলেন যে বিদ্রোহ নিবারণের জন্য জাতিপ্রথা একটি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। কলকাতায় সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল জেমস কার লিখেছেন : "জাতিপ্রথার অস্তিত্ব আমাদের শাসনের স্থায়িত্বের পক্ষে প্রতিকূল এরকম ধারণার প্রতি সন্দেহ করার কারণ আছে। বরং এই ব্যবস্থাকে এর পক্ষে অনুকূল বলে বিবেচনা করা যেতে পারে যদি আমরা বিচক্ষণতা এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে কাজ করি। এই ব্যবস্থার মূল ভাবটা জাতীয় ঐক্যের বিরোধী।" বস্তুত বহু

জাতিতে বিভক্ত জনসমাজ শাসকশ্রেণীর স্বার্থের খুবই অনুকূল হয় যে কারণে মুসলমান আমলেও এই ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করার কোন বিশেষ প্রচেষ্টা হয়নি এমন কি মুসলমান সমাজেও জাতিপ্রথা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কোন বাধা দেওয়া হয়নি, যদিও ইসলামধর্ম সর্বতোভাবে জাতিপ্রথা বিরোধী। এমনকি রোমান ক্যাথলিক গীর্জাও ধর্মপ্রচারের উৎসাহে জাতি ব্যবস্থাকে বহাল রেখেছিল এবং তা অনুমোদন করেছিল, যদিও তা খ্রীস্টধর্মের আদর্শবিরোধী। পোপ পঞ্চদশ গ্রেগরী ভারতের খ্রীস্টীয় গীর্জাসমূহের ক্ষেত্রে এবং দীক্ষিতদের মধ্যে জাতিপ্রথা বহাল রাখা অনুমোদন করেছিলেন।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের বিধবা বিবাহ আইন কয়েকটি নিম্নপর্যায়ের জাতির ক্ষেত্রে ক্ষতির কারণ হয়েছিল, কেননা এই আইন অনুযায়ী পুনর্বিবাহিতা বিধবাকে তার পূর্বস্বামীর সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, অথচ ভারতবর্ষে এমন জাতি বহু ছিল এবং এখনও আছে যাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বিধবাবিবাহ প্রচলিত এবং পুনর্বিবাহিতা বিধবা পূর্বস্বামীর সম্পত্তিগত সুযোগ সুবিধা থেকে একান্তই বঞ্চিত নয়। এই সমস্যার সমাধানকল্পে আদালতগুলি একটি যুক্তিসঙ্গত ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এবং বলেছিল যে বিধবা বিবাহ আইনে পুনর্বিবাহিতা বিধবার পূর্বস্বামীর সম্পত্তির উপর অধিকারলোপ শুধু তাদের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হবে যারা এই আইনের বলে পুনর্বিবাহ করেছে, অন্যক্ষেত্রে এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জাতিগুলি যে বিধান মেনে চলে সেটাই বৈধ বলে মেনে নেওয়া হবে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের বিশেষ বিবাহ আইন জাতিপ্রথার উপর প্রথম প্রত্যক্ষ আঘাত, কেননা অন্তর্বিবাহই হচ্ছে জাতিপ্রথার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। এই আইনে বলা হল যে, যে কোন ভারতীয় যে কোন জাতি বা মতাবলম্বী হোক না কেন যে কোন জাতি-ধর্মভুক্ত মেয়েকে বিবাহ করার অধিকারী যদি তারা পারস্পরিক বিবাহ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এই আইনে জাতি ও ধর্ম উভয় বিষয়ই প্রত্যাখ্যাত হবার ফলে —কেননা এখানে পাত্র ও পাত্রী উভয় পক্ষকেই ঘোষণা করতে হত যে তারা কোন বিশেষ ধর্ম ও জাতি মানেনা—নানা ধরনের সমস্যার উদয় হয়। এই আইন প্রণয়নের পিছনে কেশবচন্দ্র সেনের যথেষ্ট উদ্যোগ ছিল, কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত ব্যস্তবাগীশ ধরনের মানুষ, সবদিক না ভেবেই এই আইন তৈরী হয়েছিল। এই আইনের ফলে ব্রাহ্মরা খুবই বেকায়দায় পড়ে যায়। কেননা এই আইনের প্রয়োগক্ষেত্র থেকে ব্রাহ্মদের বাদ দেওয়া হয়েছিল কারণ প্রিভি-কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্রাহ্মরাও ছিল হিন্দু। কাজেই ব্রাহ্মরা

নিজেদের মধ্যে যে অসবর্ণ বিবাহ চালু করেছিল তারা হিন্দু হিসাবে ঘোষিত থাকার জন্য সেই বিবাহ বৈধ বলে গণ্য হতে পারেনি। এই জন্য ব্রাহ্মদের ওই আইনের বক্তব্য অনুযায়ী বিবাহ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে বিবাহকে বৈধ করতে হত এবং সেক্ষেত্রে তাদের ঘোষণা করতে হত যে তারা কোন জাতি বা ধর্মভুক্ত নয়। দ্বিতীয় ঘোষণাটি করা ব্রাহ্মদের পক্ষে খুবই বিড়ম্বনাকর ছিল। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের বিশেষ বিবাহ সংশোধনী আইনের দ্বারা এই অসুবিধাগুলি বহুলাংশে দূর করা হয় যাতে বলা হয় যে হিন্দু, শিখ, জৈন ও ব্রাহ্মদের ক্ষেত্রে 'আমরা কোন ধর্মে বিশ্বাস করিনা' এই রকম কোন ঘোষণার প্রয়োজন নেই। তৎসত্ত্বেও এই আইনের সুযোগ গ্রহণকারীদের অনেক সুবিধা ত্যাগ করতে হত। এই আইনের সাহায্যে অসবর্ণ বিবাহ করলে পাত্র ও পাত্রী উভয়কেই হিন্দুর কয়েকটি বিশেষ ব্যক্তিগত অধিকার ত্যাগ করতে হত। যে যৌথ পরিবারের তারা অন্তর্গত ছিল তাদের সেই পরিবারের সদস্যতা বিলুপ্ত হত এবং পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারত্বের অধিকারও তারা হারাত। তারা পোষ্যপুত্র গ্রহণের অধিকারী হত না। তাদের নিজেদের অর্জিত সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন প্রযুক্ত হত, হিন্দু আইন নয়।

সচেতন ও তত্ত্বগতভাবে ব্রাহ্মরা জাতিপ্রথাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, কেননা ব্রাহ্মধর্মের মূল তত্ত্বের সঙ্গে জাতিপ্রথার কোন সামঞ্জস্য ছিলনা। যদিও ব্যক্তিগতভাবে অনেক ব্রাহ্মই বিবাহাদির ক্ষেত্রে জাতিপ্রথার বাইরে যায়নি তৎসত্ত্বেও প্রত্যেক ব্রাহ্মই এটা আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করেছিল যে ঈশ্বরের একত্ব, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক সমতার যে আদর্শ তারা প্রচার করে জাতিপ্রথা মেনে তা করা যায় না, কাজেই আজই হোক আর কালই হোক এ প্রথার মায়া ত্যাগ করতে হবে। বস্তুত উচ্চবর্ণের মধ্যে জাতিপ্রথার বিরোধিতা ব্রাহ্মদের মধ্যে রীতিমত প্রকট ছিল এবং অনেক ব্রাহ্মই স্বচ্ছন্দে অসবর্ণ বিবাহ করেছিল, এবং এই রকম বিবাহের সংখ্যা বড় কম ছিল না। মহারাষ্ট্রের প্রার্থনাসমাজও তত্ত্বের দিক থেকে ব্রাহ্মদের অনুরূপ এবং প্রার্থনাসমাজীরাও জাতিপ্রথার বিরুদ্ধবাদী ছিল। কিন্তু কিছু কট্টর ব্রাহ্ম যেভাবে গায়ের জোরে সামাজিক শাসনকে উপেক্ষা করে জাতির বেড়া অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিল প্রার্থনাসমাজীরা অতদূর অগ্রসর হতে পারেনি, যদিও তাদের মধ্যেও কিছু কিছু অসবর্ণ বিবাহ ঘটেছিল। স্বামী দয়ানন্দ প্রবর্তিত আর্যসমাজ কিন্তু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী এইক্ষেত্রে অবলম্বন করেছিল। আর্যসমাজ জাতিপ্রথা অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করেনি, কিন্তু জাতিপ্রথার খারাপ দিকগুলিকে বর্জন করেছিল।

আর্যসমাজ নিজেকে সম্পূর্ণ বেদ নির্ভর বলে ঘোষণা করায় তাদের চাতুর্বর্ণের যথার্থতা মেনে নিতে হয়েছিল। কিন্তু তারা শূদ্রদের বেদপাঠের অধিকার দিয়ে নিম্নজাতি সমূহের ক্ষোভ যেমন একদিকে প্রশমিত করেছিল অপরদিকে তাদের সামাজিক মর্যাদাও বাড়িয়ে দিয়েছিল। আর্যসমাজের জনপ্রিয়তার এটা একটা বড় কারণ। মানুষমাত্রেই প্রকৃতিতে রক্ষণশীল এটা বুঝেই আর্যসমাজীরা পুরাতন গৌরবময় বৈদিক সমাজের পবিত্রতা ফিরিয়ে আনার ধ্বনি তুলেছিল, এবং সেই কারণেই জনসমর্থনও পেয়েছিল প্রচুর।

অবদমিত জাতিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে, জাতিতে যিনি ছিলেন মালী। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনাতে সত্যশোধক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন যার উদ্দেশ্য ছিল জাতিবর্ণ নির্বিশেষে মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে অব্রাহ্মণ বালক-বালিকাদের শিক্ষার জন্য তিনি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এবং ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে শুধুমাত্র অস্পৃশ্যদের জন্য তিনি রক্ষণশীলতার দুর্গস্বরূপ পুনা শহরে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন যখন দিনের বেলায় অস্পৃশ্যরা পথে হাঁটতেই ভয় পেত। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা, জনপ্রতিনিধিত্ব-মূলক সংস্থা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সর্বশ্রেণীর যাতে ন্যায়সঙ্গত প্রতিনিধিত্ব থাকে সে ব্যাপারেও তিনি চেষ্টা করেছিলেন। জাতিপ্রথার স্বৈরা-চারের বিরুদ্ধে তিনি লেখনী চালনা করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম "সোসাল স্লেভারি ইন দ্য গাইস অব ব্রাহ্মণিকাল রেলিজিয়ন আণ্ডার দ্য সিভিলাইজড্ বৃটিশ রুল।" এই গ্রন্থে তিনি লিখেছেন ঃ 'এমন কি বৃটিশ শাসনেও নিরক্ষর অব্রাহ্মণ জনতা অসংখ্য দুর্দশায় আচ্ছন্ন, কেননা আইন প্রয়োগের দায়িত্ব যে সকল কর্মচারীর উপর ন্যস্ত তাদের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ। এখানে একই ধরনের কঠোরতার সঙ্গে জাতিকাঠামোর মর্যাদার স্তরগুলি অনুসরণ করা হয়। এমন কি পুনা শহরেও যেখান থেকে ব্রাহ্মণরা জল নেয় সেখান থেকে অব্রাহ্মণরা জল নিতে পারে না। ব্রাহ্মণরা শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে কর্তৃত্ব করে। পাঠ্যপুস্তকসমূহ এমনভাবে রচিত হয় যে সেখানে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও শাস্ত্রসমূহের দুর্বলতার দিকগুলি চাপা থাকে। গ্রামের বিপুলসংখ্যক অধিবাসী বিশেষ করে কৃষকেরা বিদ্যাশিক্ষার বিলাস ভোগ করতে অপারগ। তারা অশিক্ষিত এবং সেই কারণেই তথাকথিত শিক্ষিতদের দ্বারা সর্বদাই প্রবঞ্চিত হয়। কষ্টার্জিত অর্থ তারা ধর্মীয় বিশ্বাস এবং কুসংস্কার সমূহের স্বার্থেই ব্যয় করে। হয় তারা তাদের প্রতি যে অবিচার করা হয় সে বিষয়ে অজ্ঞ, না

হয় তারা জেনেশুনেও কিছু করতে অপারগ, অজ্ঞতা এবং দারিদ্রের জন্য। তাদের অভিযোগসমূহ কেউ গ্রাহ্যই করেনা, প্রতিকার করা তো দূরের কথা।" ফুলের মতে বৃটিশরাজ এক্ষেত্রে তার যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করেনি, তথাপি তাঁর বিশ্বাস ছিল বৃটিশ সরকার অবদমিত জাতিসমূহের ক্ষেত্রে পরিত্রাতার ভূমিকা নিতে পারে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতায় তিনি খুশি হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে বিদ্রোহ সফল হলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটত, ব্রাহ্মণ পেশোযাদের রাজত্বেব পুনরভ্যুত্থান ঘটত, চিরাচরিত হিন্দুধর্মের খারাপ দিকগুলি আবাব মাটি ফুঁড়ে জেগে উঠত, অবদমিতের জেগে ওঠার সকল আশা আকাঙ্ক্ষাই চূর্ণ হত। পেশোয়াদের আমলের বর্ণনা দিতে গিয়ে ফুলে লিখেছেন: "যদি ব্রাহ্মণ কোন নদীর তীরে হাজির হত, এবং যদি দেখা যেত যে কোন শূদ্র কাপড় কাচছে, তাহলে শেষোক্তকে কাপড়-চোপড় নিয়ে অন্যত্র চলে যেতে হত, কেননা তার অস্তিত্ব ব্রাহ্মণকে অপবিত্র করতে পারে। শূদ্রস্পৃষ্ট একফোঁটা জলই ব্রাহ্মণকে অপবিত্র করার পক্ষে যথেষ্ট, এবং সে রকম ঘটলে ব্রাহ্মণ তাকে হস্তস্থিত ভারি পিতলের পাত্র দিয়ে আঘাত করার অধিকারী ছিল। অভিযোগ করে কোন লাভ ছিলনা, কেননা শাসন ছিল ব্রাহ্মণদেরই। বরং সেক্ষেত্রে অভিযোক্তাকেই শাস্তি পেতে হত।"

ফুলের তুলনায় চিৎপাবন ব্রাহ্মণ বালগঙ্গাধর টিলক অনেক বেশি লেখা-পড়া জানা লোক ছিলেন। বিদেশ ভ্রমণ করেছেন, দেশের জন্য দণ্ডভোগও করেছেন অনেক, এবং মানসম্মানও পেয়েছেন যথেষ্ট। অক্লান্ত স্বাধীনতা-সংগ্রামী টিলকের মৃত্যুকালে তাঁর অনুগামী স্বাধীনতাসংগ্রামীরা তাঁর শয্যা-পার্শ্বে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বলেন যে 'চলে যাবার আগে আপনি এটুকু শান্তি মনের মধ্যে নিয়ে যান যে ইংরাজদের দিন ফুরিয়ে এসেছে, আমরা শীঘ্রই স্বাধীন হচ্ছি।' এই কথায় মৃত্যুপথযাত্রী টিলক উৎসাহের আধিক্যে বিছানায় উঠে বসেন, তাঁর দুই চোখ প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। প্রফুল্ল স্বরে তিনি বলেন 'তাহলে বলছ, ইংরাজরা আর থাকছে না, পেশোয়ারা আবার ফিরে আসছে। কী আনন্দ।' এইখানে টিলকের সঙ্গে ফুলের দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য। ফুলে পরিষ্কার বলেন যে এ দেশে সামাজিক অবিচারের ইতিহাস হাজার হাজার বছরের পুরোনো। ব্রিটিশ শাসন থাকল কি গেল সেটা বড় কথা নয়। তারা আজ আছে, কাল থাকবে না। সামাজিক দাসত্বের বিনাশই একমাত্র প্রয়োজন। সেটা কবে হবে? এখানে একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে ফুলের চিন্তাভাবনা অবদমিত সর্বসাধারণকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল।

তথাকথিত নিম্নবর্ণের জাতিগুলিই সেখানে মুখ্য ছিল না। তাঁর চোখে ব্রাহ্মণ শোষক সমাজের প্রতীক, অব্রাহ্মণ শোষিত সমাজের। মার্কসের ভঙ্গীতে না হলেও তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেছেন যে ভারতীয় সমাজের ইতিহাস ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের সংঘর্ষের ইতিহাস। কতিপয় অবদমিত বিশেষ চিহ্নিত জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সংগ্রাম করেন নি, তাঁর সংগ্রাম চেতনা ছিল অনেক ব্যাপক এবং তা সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে। এই কারণেই ফুলে ব্রাহ্মণ বা অব্রাহ্মণ কোন দল থেকেই বিশেষ সমর্থন পান নি। একেবারে সর্বনিম্ন স্তরটা বাদ দিলে (এবং সে আমলে এই স্তরটির স্বাধীন চিন্তার কোন মানসিকতাই গড়ে ওঠে নি) অব্রাহ্মণ অবশিষ্ট জাতিগুলির চিন্তাভাবনা ছিল ভিন্নরূপ। ফুলের মত তারা কোন শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখে নি, সে সমাজ তাদের কাম্যও ছিল না, এবং এই উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করার ব্যাপারে তারা ছিল একান্তই অনাগ্রহী। অব্রাহ্মণ মধ্যশ্রেণীর জাতিগুলি এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে অগ্রসর জাতিগুলি কিছুটা ব্রাহ্মণ বিরোধিতা করতে রাজি ছিল নিছকই স্বার্থ, বৈষয়িক সুযোগসুবিধা ও সামাজিক মর্যাদালাভের প্রেরণায়, ফুলের মত কোন মহৎ আদর্শ নিয়ে নয়। রিজলী সাহেব ১৯০১ সালের আদমসুমারিতে এদেশে স্বীকৃত সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী জাতিসমূহকে সন্নিবেশিত করেন এবং মর্যাদার বিভিন্ন শর্তাবলীকে চিহ্নিত করেন যার ফলে অনেক জাতিই ওই শর্তাবলীর ভিত্তিতে নিজেদের জাতীয় মর্যাদা বাড়িয়ে নিতে উদ্যোগী হয়। তারা তাদের জাতির মাতব্বর এবং সদস্যদের নিয়ে নানা সভাসমিতি করে এবং এইভাবে নানা 'জাতি-সংরক্ষিণী সভা' গড়ে ওঠে। ১৯১১-র মাদ্রাজ সেন্সাস অধিকর্তা লিখেছেন: "একজন ভারতীয় ভদ্রলোক এ বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে গত কয়েক বছরে, বিশেষ করে এই আদমসুমারি প্রস্তুত হবার উপলক্ষে, কয়েকটি ক্ষেত্রে জাতিগত চেতনার অসাধারণ পুনরুত্থান লক্ষ্য করা গেছে। অসংখ্য জাতি-সভা গড়ে উঠেছে, প্রতিটির লক্ষ্য যে সামাজিক গোষ্ঠীর তা প্রতিনিধি তার মর্যাদা উপরে তুলে ধরা।" ১৯২১-এর বেঙ্গল সেন্সাসে বলা হয় যে "উচ্চতম জাতিসমূহ ব্যতিরেকে প্রায় সকল জাতির নেতারাই আদমসুমারিকে চাপ দেবার এবং সামাজিক মর্যাদার দাবির স্বীকৃতি আদায়ের সুযোগ বা মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে, যে স্বীকৃতি তারা তাদের চেয়ে উচ্চ জাতিদের কাছ থেকে পায় নি।" এই সময় থেকে বিভিন্ন জাতি তাদের মুখপত্র প্রকাশ করতে আরম্ভ করে, এবং এই ধারা আজও বজায় আছে। প্রত্যেকেরই বক্তব্য, তারা আগে উঁচু জাতি ছিল, হয় ব্রাহ্মণ, নয় ক্ষত্রিয়,

নয় বৈশ্য থেকে তারা উদ্ভূত হয়েছে ; কিন্তু কতিপয় প্রাচীন আমলের দুর্বৃত্তের চক্রান্তে (বঙ্গদেশে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই দুর্বৃত্ত বল্লাল সেন) তাদের মর্যাদাহানি ও অধোগতি হয়েছে, এবং এখন যখন কলিতে সাহেব অবতাররা এসেছেন তখন সেই প্রাচীন অন্যায়ের প্রতিকার হতে বাধা কোথায় ? কোন কোন জাতি খোদ দেবতাদের থেকেই নিজেদের উদ্ভব দাবি করে বসে, এবং তাদের পূর্বপুরুষ দেবলোকে কোন অনাচার করার দরুন (বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পার্বতীর নগ্নদেহ দর্শন এবং তজ্জন্য শিবের অভিশাপ) তারা পতিত হয়। এখন রিজলী সাহেবরা চেষ্টা কর'ল সেই পাতিত্য দূর হতে পারে। যেখানে মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলের সংগ্রামের মূল কথা ছিল জাতিপ্রথার গোড়া ঘেঁসে কোপ মারা, সেখানে ব্রাহ্মণেতর জাতিসমূহ আরও অনেক বেশি মাত্রায় জাতিপ্রথা অভিমুখী হয়েছিল। কথাটা তিক্ত হলেও সত্য। এর পরিণামটা শুভ হয় নি।

তবে জ্যোতিরাও ফুলে অতি মহৎ আদর্শ প্রচার করলেও এবং জাতিপ্রথার কুৎসিত দিকগুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও, জাতিপ্রথার কার্যকারিতার দিকগুলি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। নীচুতলার মানুষেরা যে শোষিত ও নিপীড়িত হয়, এটা সর্বদেশ ও সর্বকালেরই অতি বাস্তব কথা। অন্য দেশের মত এখানেও নিম্নস্তরের জাতিরা শোষিত ও উৎপীড়িত। কিন্তু জাতিপ্রথার যেটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য তা হচ্ছে এই যে এই প্রথা প্রত্যেক জাতিরই পেশা, ব্যবহারের ক্ষেত্র, নিজস্ব সামাজিক আইন কানুন, সমস্ত বিষয়ই সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে, এবং প্রতিটি জাতিরই স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকৃত হয়েছে, যেখানে অন্য জাতির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। একটা জাতি অন্য একটা জাতিকে অপবিত্র মনে করতে পারে, তাদের ছায়া না মাড়াতে পারে, কিন্তু তাদের নিজস্ব জাতিগত ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। জাতিকাঠামোয় উচ্চজাতি এবং প্রভাবশালী জাতির মধ্যে যে রীতিমত পার্থক্য বিদ্যমান তা আমরা আগেই দেখেছি। বৈষয়িক দিক থেকে যারা ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী জাতি তারা কিন্তু জাতিকাঠামোর মধ্যস্তরে অবস্থিত। তারা উপরে উঠতে চায় এই শর্তে যে তারা আরও মর্যাদা চায়, তাদের নীচে যারা আছে তারাও ওই একই ভাবে অধিকতর মর্যাদা পেতে ইচ্ছুক। কাজেই জাতিকাঠামোয় নিম্নস্তরের জাতিরা যদি অধিকতর মর্যাদার জন্য লালায়িত হয় তাতে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। ব্রাহ্মণদের প্রতি ফুলে প্রাপ্যেরও অধিক দোষারোপ করেছেন। ব্রাহ্মণদের হাতে সামাজিক ক্ষমতা কিছু ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু পুঁজিবাদী কিংবা আধুনিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির উচ্চশ্রেণীর

মানুষদের মত তাদের হাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তিন প্রকার ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ হয় নি। অতিরিক্ত ব্রাহ্মণ্য বিরোধিতার জন্য ফুলে ব্রাহ্মণেতর জাতিগুলিকে ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োগ করতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি এটা খেয়াল করেন নি যে, যে-সকল ব্রাহ্মণরা নিম্নবর্ণের পৌরোহিত্য করে তাদের সামাজিক মর্যাদা শূদ্রদের চেয়ে অধিক নয়। বঙ্গদেশে বিশেষ বিশেষ পুজার ক্ষেত্রে বরাবরই শূদ্র পুরোহিতের ভূমিকা আছে। ধর্ম-ঠাকুরের পুরোহিতরা শূদ্র। দুর্গাপুজায় বিভিন্ন শূদ্রজাতির বিশেষ ভূমিকা আছে। অনেক প্রসিদ্ধ গ্রামদেবতার পুজার ক্ষেত্রে এই বিধি বর্তমান যে আগে সেই দেবতার পুজা করবে নিম্ন জাতির পুরোহিত, পরে ব্রাহ্মণ পুরোহিত পুজায় বসবে। গাজন-চড়কে যাবা সন্ন্যাস গ্রহণ করে তারা নীচজাতীয়, কিন্তু সেই সময় উচ্চবর্ণের লোক তাদের পদধূলি গ্রহণ করতে দ্বিধা করে না। বস্তুত কলকাতা হাইকোর্ট বহু পূর্বেই জানিয়েছিল যে পৌরোহিত্যের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ জাতির কোন একচেটিয়া অধিকারের আইন নেই। যে কোন ব্যক্তি যাকে খুশি পুরোহিত হিসাবে রাখতে পারে এবং তাতে ব্রাহ্মণ জাতির অধিকার ভঙ্গ হয় না। পরে মাদ্রাজ হাইকোর্টও অনুরূপ ঘোষণা করে। এ বিষয় নিয়ে বঙ্গদেশ বা উত্তরভারতে কোন সমস্যা হয় নি। কিন্তু ফুলের আন্দোলনের ফলে মহারাষ্ট্রে কিছু কিছু অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের প্রত্যাখ্যান করায় কোন কোন পুরোহিত জাতি-অধিকার ভঙ্গের মামলা ঠুকে দেয়। ফলে বোম্বাই হাইকোর্ট আদেশ দেয় যে অব্রাহ্মণকে পুরোহিত হিসাবে নিয়োগ যে কেউ করতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে যারা পূর্বে কুলপুরোহিত ছিল তাদের কিছু ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

ভি. আর. সিন্ধে, যিনি তাঁর সারা জীবনই নিম্নবর্ণের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য ব্যয় করেছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে সারা ভারতবর্ষ চষে বেড়িয়েছিলেন, তাঁর মারাঠী ভাষায় রচিত গ্রন্থ 'অস্পৃশ্যাতেচ প্রশ্ন'-এ লিখেছেন যে বঙ্গদেশে সীমাবদ্ধ পরিসরে জাতপাতের বেড়া ভাঙার কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন বরাহ-নগরের শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ; শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতবর্ষের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পথিকৃৎ, তবে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকদের কল্যাণসাধন, তাদের নৈতিক উন্নতি, সুরাপান বর্জন, ধর্মীয় শিক্ষা-দান প্রভৃতি। যে সব শ্রমিকদের মধ্যে তিনি কাজ করতেন তাদের মধ্যে বহু সংখ্যক ছিল চন্ডাল ও অপরাপর নীচজাতীয় ব্যক্তি যাদের সঙ্গে একত্র ওঠাবসা ও পানভোজন করতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত

ও সমাজসংস্কারক রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর নানা বক্তৃতায় বিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় সাধক একনাথের শিক্ষা ও উপদেশ প্রচার করেছিলেন যাতে অস্পৃশ্যতা বর্জনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। ভাণ্ডারকর জনৈক মহার জাতীয় ধর্মগুরুকে জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি সর্বদাই বলতেন যে মহাররা শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ পেলে দেশকে সত্যই কিছু দিতে পারবে। ভাণ্ডারকরের এই বক্তব্য অন্তত আম্বেদকরের ক্ষেত্রে সত্য হয়েছিল, যিনি মহার জাতিভুক্ত ছিলেন। অস্পৃশ্য অন্ত্যজদের জন্য কিছু করা উচিত এরকম একটা চেতনা উচ্চবর্ণের যুক্তিশীল মানুষদের মধ্যেও দেখা দিয়েছিল, ছোঁয়াছুঁয়ি প্রভৃতি জাতিপ্রথার কদর্য দিকগুলি তারা বর্জন করার চেষ্টা করেছিল। শহরাঞ্চলে স্বাভাবিক কারণেই ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপার লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, সেখানে মানুষকে নানা ধান্দায় যেতে হয়, নানা স্থানে খাওয়া দাওয়া করতে হয়, কাজেই জাতপাত দেখতে গেলে চলে না। ১৯২৪-এর ৬ই মার্চ তারিখের ফরোয়ার্ড পত্রিকায় খবর ছিল যে নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, কুষ্ঠিয়া এবং অপরাপর স্থানের ব্রাহ্মণরা আগ্রহের সঙ্গেই নমঃশূদ্র, রজক, মাঝি প্রত্যেকের হাত থেকেই জলগ্রহণ করেছে, এবং এই অনুষ্ঠানে বুড়ো ভট্চায, মুখুজ্জে, বাঁড়ুজ্জেরা আগ্রহের সঙ্গেই অংশগ্রহণ করেছে। আসলে অব্রাহ্মণ ও অবদমিত জাতিসমূহের ক্রমবর্ধমান আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক স্বার্থের অনুপ্রবেশ প্রভৃতির ভবিষ্যৎ তাৎপর্য তাদের চোখে ধরা পড়েছিল। বৃহত্তর হিন্দু সমাজের স্বার্থে উচ্চবর্ণের মানুষদের মধ্যে একটা নমনীয় মনোভাব গ্রহণের প্রেরণা দেখা দিয়েছিল। নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছিল, যেমন ত্রিবাংকুরের বৈকম অঞ্চলের যে রাস্তাগুলি অস্পৃশ্যদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল সেই সকল পথ দিয়ে অস্পৃশ্যদের নিয়ে উচ্চবর্ণের মানুষেরা মিছিল করেছিল। নিম্নবর্ণের মানুষদের জন্য মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া এই সময় থেকেই শুরু হয়, অর্থাৎ বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে। আসলে র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পূর্বাভাস উচ্চবর্ণের হিন্দুরা যথাসময়েই পেয়েছিল, এবং নিজস্ব পদ্ধতিতে এই সমস্যার মোকাবিলা করেছিল, যদিও তারা সফল হয়নি। অবদমিত জাতিসমূহের ব্যাপারে গান্ধীজী এবং আম্বেদকর কারোরই ভূমিকা উচ্চবর্ণের মানুষেরা পছন্দ করেনি। ১৯২৫-এর গোড়ার দিকে বোম্বাই শহরের উচ্চবর্ণের কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি একটি সভা আহ্বান করে গান্ধীজীর নিন্দা করে।

অব্রাহ্মণদের জন্য বিভিন্ন চাকুরি ও প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থায় আসন সংরক্ষণের জন্য প্রথম জোরালো দাবি জানান কোলহাপুরের মহারাজ শাহু-ছত্রপতি। ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থার কাঠামোর সম্পর্কে আলোচনার জন্য ভারতসচিব মন্টাগু যখন চেমসফোর্ডের বড়লাটত্বের সময় এখানে আসেন তখন কোলহাপুরের মহারাজা সংরক্ষণের প্রশ্নটি বেশ ভালভাবে তুলে ধরেন। তাঁর নিজের ভাষায়, "যে অর্থে হোম-রুলের কথা এখানে বলা হচ্ছে তা নিছকই একটি স্বৈর-অভিজাততন্ত্রে পরিণত হবে যদি জাতিপ্রথাকে বর্তমান অবস্থায় থাকতে দেওয়া হয়। এর অর্থ অবশ্য এই নয়, আমি আবার বলছি, আমি হোম-রুলের বিরুদ্ধে। নিশ্চয়ই আমরা তা চাই। বর্তমান অবস্থায় আমাদের বৃটিশ সরকারের রক্ষণ এবং পরিচালন প্রয়োজন যতক্ষণ না পর্যন্ত কুফলসমূহ অকার্যকর হচ্ছে। যাতে প্রস্তাবিত হোম-রুল স্বৈর-অভিজাততন্ত্রের কবলিত না হতে পারে সে জন্য আমাদের অন্তত দশ বছরের জন্য সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজন। আমাদের দাবিগুলি কি এটা আমাদের তা শেখাবে। একবার আমরা সেগুলি জেনে গেলে পরে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের পরিবর্তন ঘটানো যেতে পারে।" শাহু ছত্রপতির অনুগামী ও জীবনীকার রাও বাহাদুর এ. বি. লাট্ঠে, যিনি নিজে জৈন ছিলেন এবং জৈনধর্মের উপর ভাল বই লিখেছিলেন, বলেন যে যতক্ষণ না পর্যন্ত হিন্দুদের মধ্য থেকে জাতিপ্রথা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রভৃতি রাজনৈতিক সংরক্ষণ অবদমিত জাতিসমূহের পক্ষে অত্যাবশ্যক, যদিও এই সকল ব্যবস্থার পরিণাম শুভ হবে না। বিশেষভাবে চাকরির ক্ষেত্রে অব্রাহ্মণদের জন্য পদ সংরক্ষণের দাবি ওঠে। অনেকে একথাও বলতে শুরু করেন যে যেহেতু অব্রাহ্মণ জাতিদের কাছ থেকে রাজকর কম আদায় হয়না সেই হেতু চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে তাদের জন্য সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা থাকা উচিত। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য অন্তত এই পর্যায়ে সংরক্ষণওয়ালারা অস্পৃশ্য অন্ত্যজদের কথা চিন্তা করেনি, যদিও তাদেরই ঘাড়ে বন্দুক রেখে নিজেদের চাকরি-বাকরি, কৌন্সিলের মেম্বারশিপ প্রভৃতির উপর গুলি ছুড়ছিল। বস্তুত সংরক্ষণ-ওয়ালাদের মধ্যে ছিল অনগ্রসরদের মধ্যে অগ্রসর জাতিগুলি এবং ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণ বাদ দিয়ে মধ্যপর্যায়ের জাতিগুলি, অর্থনৈতিক দিক থেকে যারা মোটেই অনগ্রসর ছিল না। এমনকি কলকাতার মারোয়াড়িরাও নিজেদের শোষিত ও অবদমিত ঘোষণা করে সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিত্ব দাবি করেছিল। কিন্তু পাশাপাশি আরও কিছু ঘটনা ঘটেছিল যেগুলি এই

অব্রাহ্মণ মধ্যশ্রেণীর জাতিগুলির সুখস্বপ্নে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছিল। ১৯২৫ সালের পর থেকে নানা স্থানে জাতি-দাঙ্গা শুরু হয় এবং অতি নিম্নপর্যায়ের কিছু জাতি ভয়ানকভাবে মারমুখী হয়ে ওঠে। বলাই বাহুল্য এই সকল হিংসামূলক ঘটনার প্রেরণা সমান্তরালভাবে অনুষ্ঠিত ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাসমূহ থেকে এসেছিল, যার মূল কথা ছিল সন্ত্রাস সৃষ্টির দ্বারা দাবি আদায় করা। এই হাঙ্গামাগুলি মূলত মধ্যশ্রেণীর জাতিসমূহের এবং নিম্ন-শ্রেণীর জাতিসমূহের মধ্যেই সংঘটিত হয়েছিল। ফলে, একদিকে জাতিগত মর্যাদার প্রেরণা, একান্তভাবেই স্বীকৃত উচ্চবর্ণের প্রতি হীনমন্যতাবোধ, বৈষয়িক ও অপরাপর সুযোগ সুবিধার জন্য উচ্চবর্ণ-বিরোধিতা, এবং অপর-দিকে একান্ত নিম্নদের সঙ্গেও মানসিক সাযুজ্যের অভাব, তাদের সংগে অর্থ-নৈতিক ও অন্যান্য স্বার্থের বিরোধ, এবং তা থেকে উপজাত রক্তাক্ত সংঘাত, প্রভৃতি বিষয় এই মধ্যশ্রেণীর জাতিগুলিকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছিল তারা বেড়ার কোন দিকে থাকবে। মোটামুটিভাবে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকেই বর্ণহিন্দু এবং তালিকাভুক্ত অনুন্নত জাতি বা তফশিলী জাতিদের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

৬ ।। অবদমিত জাতিসমূহের ক্ষেত্রে সামাজিক বৈষম্যের ধরন

তফশিলী বা তালিকাভুক্ত-জাতি নামক শব্দটির ব্যবহার ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন প্রবর্তিত হবার পর থেকে চালু হয়েছিল। আগে ডিপ্রেস্‌ড কাস্ট বা অবদমিত জাতি অথবা এক্সটিরিয়র-কাস্ট বা বাইরের (অর্থাৎ চাতুর্বর্ণের বাইরের) জাতি এই সকল শব্দের সাহায্যে জাতিকাঠামোর নিম্নস্তরের জাতি-গুলিকে বোঝানো হত। ১৯৩১-এর আদমসুমারির পূর্বে ভারত সরকার অবদমিত এবং পিছিয়ে পড়ে থাকা জাতিগুলির একটি বিস্তৃত তালিকা প্রণয়নের নির্দেশ দেন। এই তালিকা থেকে মুসলমান, খ্রীস্টান ও উপজাতিদের বাদ দেওয়া হয়। কোন্ কোন্ জাতিকে এই তালিকাভুক্ত করা হবে তা নির্ণয়ের জন্য নয়টি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রথম, সংশ্লিষ্ট জাতিটি সৎ-ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে কাজ পায় কিনা, অর্থাৎ সৎ-ব্রাহ্মণরা তাদের পৌরোহিত্য, বিবাহাদি সংস্কার, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি বিষয়ে তাদের জন্য কাজ করে কিনা ; দ্বিতীয়, সংশ্লিষ্ট জাতিটি নাপিত, জলবাহক (ভারি), দর্জি প্রভৃতির কাছ থেকে কাজ পায় কিনা (যারা বর্ণ হিন্দুদের জন্য কাজ করে) ; তৃতীয়, সংশ্লিষ্ট জাতিটি তাদের সংস্পর্শ বা নৈকট্যের দ্বারা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের

অপবিত্র করে কিনা ; চতুর্থ, সংশ্লিষ্ট জাতিটির নিকট থেকে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা জলগ্রহণ করে কিনা ; পঞ্চম, সংশ্লিষ্ট জাতিটি জনগণের ব্যবহার্য কতকগুলি বিশেষ বস্তু থেকে বঞ্চিত কিনা, যেমন রাস্তা, ফেরিঘাট, কূপ, জলাশয়, বিদ্যালয় প্রভৃতি ; ষষ্ঠ, সংশ্লিষ্ট জাতিটি হিন্দু মন্দিরে প্রবেশের অধিকারী কিনা ; সপ্তম, সংশ্লিষ্ট জাতিটির শিক্ষিত ব্যক্তিরা উচ্চবর্ণের জাতিসমূহের অন্তর্গত অনুরূপ শিক্ষিত ব্যক্তিদের সংগে সমমর্যাদার অধিকারী কিনা ; অষ্টম, সংশ্লিষ্ট জাতিটি তাদের অজ্ঞতা, অশিক্ষা বা দারিদ্রের জন্যই অবদমিত কিনা ; এবং নবম, সংশ্লিষ্ট জাতিটি নিছকই তার পেশার কারণে অবদমিত কিনা।

হাটনের মতে উপরিউক্ত শর্তাবলীর ক্ষেত্রে যথেষ্ট ত্রুটি বর্তমান যেখানে কতকগুলি অনির্ণেয় ধারণা আছে। সৎ ব্রাহ্মণ বলতে কি বোঝায় ? উচ্চবর্ণ এবং নিম্নবর্ণের সীমারেখাটা কি ? অপবিত্রতার সংজ্ঞা কি ? সাধারণ ব্যবহার্য কোন পথে চলতে গিয়ে যদি রাম মনে করে যে তার থেকে তিরিশ গজ দূরে থেকে শ্যাম তাকে অপবিত্র করছে, এবং শ্যাম যদি পথ ছেড়ে দিতে রাজি না হয়, তাহলে অপবিত্র হবার বা রাস্তা থেকে সরে যাবার দায়িত্ব রামের, শ্যামের নয়। কাজেই পথ চলার ক্ষেত্রে বাধানিষেধ ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কূপের ক্ষেত্রে পার্থক্যটা অবশ্য স্পষ্ট, এবং স্কুলের ক্ষেত্রে আরও বেশি, কিন্তু সেখানেও কোন বাঁধা মানদণ্ড নেই, যেমন অমুক অমুক জাতির ছেলেরা একত্রে বসবে, অমুক অমুক জাতির ছেলেরা বাইরে বসবে এরকম কোন বিশেষ নিয়ম সর্বত্র খাটে না। এ সমস্তই অঞ্চল, মানসিকতা প্রভৃতি নানা উপাদানের উপর নির্ভর-শীল। একটা বিশেষ জাতি এক অঞ্চলে অবদমিত হতে পারে আবার সেই জাতি অন্য অঞ্চলে অবদমিত নাও হতে পারে। মধ্যপ্রদেশের ক্ষেত্রে দেখা যায় একই জাতির মর্যাদা বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন প্রকার। এক অঞ্চলের বিচারে যে জাতি অবদমিতের তালিকায় পড়ে অন্য অঞ্চলের বিচারে সে জাতি অবদমিতের তালিকায় পড়ে না। আবার এও দেখা গেছে যে হিন্দু আওতায় এসে যাওয়া উপজাতি তাদের খাদ্যাভ্যাস ও অন্যান্য কারণে অন্ত্যজের কোঠায় স্থান পেয়েছে অথচ তাদেরই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা রাজপুত বা ক্ষত্রিয় হিসাবে গণ্য হয়ে গেছে। আবার এমনও অনেক জাতি আছে যারা, যদিও নিম্ন বলে গণ্য, এমনকি উচ্চবর্ণের কাছে জলচলও নয়, তথাপি নিজেদের জাতি-সংগঠনের জোরে এবং শিক্ষাদীক্ষা লাভের কল্যাণে এমন একটা পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যাতে তারা নিজেদের জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় সংরক্ষণ প্রয়োজন

মনে করে না, যে-কারণে কেরালার ইরুবানরা এবং বঙ্গদেশ ও আসামের সাহা, তেলি ও মাহিষ্যরা অবদমিতের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে।

১৯৩৫-এ তালিকাভুক্ত বা তফশিলী জাতিসমূহের প্রসঙ্গ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি করে যা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। এই সময়কার ও তার কিছু আগের অবদমিত জাতিসমূহের বিচিত্র এবং অনিশ্চিত অবস্থা সম্পর্কে কিছু খবর এখানে পেশ করা যায় যা থেকে বিষয়টি বুঝতে কিছু সুবিধা হবে। ১৯২৯-এ মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত একটি অস্পৃশ্যতা-বিরোধী সম্মেলনে এই বলে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় যে রেস্তোরাঁ, কফিখানা, চুল কাটার সেলুন প্রভৃতিতে অবদমিত জাতিসমূহের লোককে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না, এবং সেই সকল জায়গায় দর্পের সঙ্গে এই মর্মে নোটিশ জারি করা আছে। ১৯৩১-এ মধ্যপ্রদেশের আদমসুমারির অধ্যক্ষ লিখেছেন যে রেলগাড়িতে যখন উচ্চবর্ণের হিন্দুর পাশে কোন অস্পৃশ্য বসে যায়, তা নিয়ে কেউ আপত্তি করে না। এটা সকলেই মেনে নিয়েছে। কিন্তু যে অফিসার রেলগাড়ির ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থায় আপত্তি করে না, সেই একই ব্যক্তি কার্যোপলক্ষে কোন ঝাড়ুদারকে কোন ক্যাম্পে নিয়ে যাবার সময় ভিন্ন গোযানের ব্যবস্থা করে। পুনার পার্বতী মন্দির, নাসিকের কালারাম মন্দির, আসামের হাজো মন্দির প্রভৃতি ধর্মস্থান অহিন্দু খ্রীস্টান ও মুসলমানদের প্রবেশাধিকার দিয়ে ঔদার্য দেখায় কিন্তু কোন অবদমিত জাতিকে সেখানে প্রবেশ করতে দেয় না। কেরালার ইরুবা বা তিয়ান-দের ঠিক অবদমিত জাতি বলা যায় না, যাদের মধ্যে শিক্ষিত ও সঙ্গতিসম্পন্ন লোক অনেক আছে, কিন্তু গুরুবায়ুর মন্দিরে তাদের প্রবেশাধিকার নেই। পথ চলার ক্ষেত্রে অস্পৃশ্য এবং অবদমিতের উচ্চবর্ণের সঙ্গে সমান অধিকার অবশ্যই ১৯৩০-এর আগে বাস্তবে কার্যকর হয়েছিল, এবং সে-দিন অবশ্যই বিগত হয়েছিল যে সময়ে আন্দে-কোরাগারা পিকদানি গলায় বেঁধে পথ চলত। একদলা তাদের থুতুও অপবিত্র বলে গণ্য হত। তৎসত্ত্বেও ১৯৩২-এর ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে 'দি হিন্দু' পত্রিকায় পুরদ-বান্নান নামক একটি জাতির খবর প্রকাশিত হয়েছিল যাদের পক্ষে দিবাভাগে রাস্তায় বেরুনো নিষিদ্ধ ছিল। কূপ থেকে জল তোলার ক্ষেত্রে একটা অলিখিত নিয়ম চালু ছিল যে অবদমিত জাতিরা তা তুলতে পারবে না, তারা পাত্র নিয়ে অপেক্ষা করবে, অন্যান্য জাতির লোকেরা জল তুলে দেবে। বিদ্যালয়ে অবদমিত ছাত্রদের প্রবেশাধিকার প্রসঙ্গে ১৯২৮-২৯-এ বোম্বাই প্রদেশের ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন একটি রিপোর্টে বলেছিলেন যে সরকারী সাহায্য বা অনুদান প্রাপ্ত বিদ্যালয়ে

এ সমস্যা বিশেষ ছিল না কেননা সে সকল স্থানে অবদমিত ছাত্রদের প্রবেশাধিকার বন্ধ করলে সরকারী অনুদান বন্ধের ভয় ছিল। তবে তিনি সুরাটের একটি বিদ্যালয়ের উল্লেখ করে বলেছেন যে ওই বিদ্যালয়ের অবদমিত জাতির ছাত্ররা উচ্চবর্ণের লোকদের অপ্রত্যক্ষ হুমকিতে বিদ্যালয় ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। কোন কোন বিদ্যালয়ে অবদমিত জাতির ছাত্ররা পৃথক বসাই পছন্দ করত কেননা তারা জানত যে যদি তারা তাদের আইনসংগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যায়, তাহলে তারা লেখাপড়ার যেটুকু সুযোগ পাচ্ছে তাও পাবে না। মহাত্মা গান্ধীর কর্মক্ষেত্র কাইরায় একটি বিদ্যালয়ের উদ্বোধনের প্রথম দিনে (বিদ্যালয়টি একটি মিউনিসিপাল বিদ্যালয় ছিল), ১৯৩১-এর এপ্রিলে, ধেদ জাতীয় বালকদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হলেও, পরে উচ্চবর্ণের অভিভাবকদের আপত্তিতে তারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। অথচ সিন্ধুপ্রদেশে এবং বোম্বাই প্রদেশের মধ্য ও দক্ষিণ বিভাগে অবদমিত জাতির ছাত্রদের বিদ্যালয়ে প্রবেশে কোন বাধা ছিল না। আসাম প্রদেশেও অবদমিত জাতির ছাত্ররা শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে কোন বাধা পায় নি। পক্ষান্তরে দক্ষিণ ভারতে জাতিগত বৈষম্য এত তীব্র ছিল যে অবদমিত জাতির ছাত্রদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন করতে হয়েছিল। ১৯৩১-এর জুলাই মাসে ঘোষণা করা হয় যে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে অবদমিত জাতির ছাত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক। এর পরিণামে অনেক বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়, কেননা উচ্চবর্ণের লোকেরা বহুস্থানেই সেই সকল বিদ্যালয় থেকে নিজেদের ছেলেদের সরিয়ে নিয়ে আসে। এই ব্যাপার নিয়ে ওই বছরের নভেম্বরে বরোদায় হাংগামা হয়। কিন্তু ঘোষণাটির উদ্দেশ্য বৃহত্তর ক্ষেত্রে সফল হয়েছিল। বংগদেশে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে রুরাল প্রাইমারী এডুকেশন বিল পাশ হলে আইনসভায় উচ্চবর্ণের কিছু সদস্য আপত্তি করে, কিন্তু এই আইন কার্যে পরিণত হতে কোন বাধা ঘটে নি। এই সকল ব্যাপার থেকে প্রমাণিত হয় যে কোন কোন অঞ্চলে অবদমিত জাতিসমূহকে বৈষম্যের শিকার হতে হলেও, তাদের স্বাভাবিক অধিকারগুলি ধীরে ধীরে স্বীকৃত হচ্ছিল।

মন্দিরে প্রবেশের ক্ষেত্রে সমস্যাটি ছিল অধিকতর জটিল, যদিও আমরা আগে বলেছি যে সাধারণভাবে এটা কোন সমস্যা ছিল না। কয়েকটি বিশেষ নামকরা মন্দির এই পার্থক্য বজায় রেখেছিল। মহাত্মা গান্ধী স্থিতাবস্থা বজায় রেখে সমস্যাটির সমাধান করার চেষ্টা করেছিলেন। অবদমিত জাতিদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন যে যেহেতু মানবহৃদয়ই দেবতার মন্দির সেই হেতু

আলাদা করে মন্দিরে যাবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই তত্ত্বকথা বিশেষ ফলদায়ক হয় নি কেননা মন্দির প্রবেশের সংগে সামাজিক মর্যাদা ও অস্পৃশ্যতার প্রসংগ বিশেষভাবে সম্পর্কিত। এই বিষয়ে ব্রাহ্মণদের মনোভাবের পক্ষে কয়েকটি যুক্তি একেবারে উপেক্ষণীয় ছিল না। আমরা আগে দেখেছি যে পবিত্রতা-অপবিত্রতার ধারণা নানা যুগঅর্জিত ঐতিহাসিক কারণে ভারতীয় মনে একান্তই বদ্ধমূল ছিল। নৃতত্ত্ববিদ অনেক পরবর্তীকালে যে কথা বলেছেন, অস্পৃশ্য-অন্ত্যজদের একটি বড় অংশই ছিল উপজাতিদের থেকে আগত, যাদের খাদ্যাভ্যাস, আচার-আচরণ তাদের অপবিত্রতার কোঠায় ফেলেছিল, এবং এই কারণেই তাদের মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হত না। এই প্রসংগে তৎকালীন অব্রাহ্মণদের মুখপত্র জাস্টিস পত্রিকা লিখেছিল যে "বহু শতাব্দী ধরে এই লোকেরা, যাদের মধ্যে অধিকাংশ এই সেদিনও ভূতপ্রেত পূজা করত, নিজেদের ধর্মস্থানেই পূজা করে সন্তুষ্ট ছিল। তারা যদি এখন জোর করে হিন্দুমন্দিরে প্রবেশ করতে চায় তার দ্বারা তারা নিজেদের জনপ্রিয় করবে না। আমরা মনে করি না তাদের মন্দির প্রবেশ থেকে বিরত করে একটা খুব ভয়ানক অন্যায় করা হয়েছে।...নিজেদের অবস্থা ভাল করার উপরেই তাদের নজর দেওয়া উচিত, গায়ের জোরে তাদের এমন অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া উচিত নয়, যে অধিকারের কথা কয়েক বছর আগেও শোনা যায় নি।" এখানে কয়েকটি কথা স্মরণীয়। কয়েকটি তীর্থস্থান ও মন্দির চিরকালই সর্বজাতির জন্য খোলা ছিল। সকল মন্দিরেই বৈষম্য করা হত না। দ্বিতীয়ত, নিম্নবর্ণের মানুষও কয়েকটি বিশেষ সামাজিক রীতিনীতি মেনে পরিপূর্ণ মর্যাদার সঙ্গেই মন্দির নির্মাণ ও মন্দির ব্যবহারের অধিকারী ছিল। রাণী রাসমণি জাতিতে ছিলেন জেলে। তিনি দক্ষিণেশ্বরে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, কিন্তু সামাজিক রীতি মেনে তিনি তাঁর নির্মিত মন্দির আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মণকে অর্পণ করেন। মন্দিরের তিনি ছিলেন কর্ত্রী, তাঁর মালিকানা ও প্রভাব ছিল বাস্তব, তাঁর প্রবেশাধিকার ছিল অবাধ। সবই তিনি করেছিলেন ও পেয়েছিলেন শুধু কয়েকটি ফর্মালিটি মেনে। ধনগর্বে তিনি যদি ওগুলি না করতেন তাহলে অবশ্যই সমাজ তাঁকে বয়কট করত। স্বাভাবিকভাবে সকল বর্ণ ও জাতির মানুষেরাই মন্দির প্রবেশের বিষয়ে কয়েকটি বিধান বরাবরই মেনে চলত, এবং এখনও চলে। এছাড়া বৈষ্ণব এবং শাক্ত-তান্ত্রিক ধর্মস্থানগুলি বরাবরই সকলের জন্য উন্মুক্ত।

তৎসত্ত্বেও মন্দির প্রবেশের ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে অনেক অশান্তি ও

হাঙ্গামা হয়েছিল। অগ্রসর শ্রেণীর হিন্দুদের অনেকেই মন্দিরের দ্বার সকল জাতির মানুষের সামনে খুলে দেবার জন্য আন্দোলন করেছিলেন নিছকই সাধারণ ন্যায়বোধে উদ্দীপ্ত হয়ে। মহাত্মা গান্ধী এজন্য অনশন পর্যন্ত করেছিলেন। এই সব আন্দোলনের দ্বিমুখী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। কিছু কিছু মন্দির কর্তৃপক্ষ এই দাবি মেনে নিয়েছিল আবার কোথাও কোথাও এই দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, এবং পরিণামে দাঙ্গাহাঙ্গামাও ঘটেছিল। ১৯৩০-এর ফেব্রুয়ারি মাসে বোম্বাইতে তেলুগু সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিচালিত আটটি মন্দিরের দরজা সর্বশ্রেণীর জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছিল। পক্ষান্তরে ১৯৩০-এর ৩রা মার্চ নাসিকের কালারাম মন্দিরে অবদমিতদের প্রবেশের জন্য হাঙ্গামা বাধে। পর বৎসরের ডিসেম্বর মাসে ওই নাসিকেই রামকুন্ডে স্নানের ব্যাপারে হাঙ্গামা হয়। সিঙ্গনালুর প্রভৃতি স্থানেও মন্দিরে প্রবেশের অধিকার নিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ক্ষেত্রে মতের বিভাজন ঘটে গিয়েছিল। একাংশ উদারপন্থী অপরাংশ রক্ষণশীল। কিন্তু আরও একটি প্রশ্ন যা জনচিত্তে আবেদন জাগিয়েছিল তা হচ্ছে এই যে যাদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার নেই তাদের হিন্দু বলে গণ্য করা যাবে কিনা। এর উত্তরটা মোটামুটি ছিল এই রকম : তারা অবশ্যই হিন্দু কেননা তারা হিন্দু দেবতাদেরই উপাসক। কিন্তু এই হিন্দুমনস্কতার কয়েকটি স্তর বিদ্যমান, এবং যারা যে স্তরের তাদের ধর্মীয় অধিকারের ক্ষেত্র ঠিক ততটুকুই বিস্তৃত। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে এই যে এই স্তরগুলির কোন সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই। মহার ও চামাররা নিঃসন্দেহে হিন্দু, কিন্তু পাঞ্জাবের চুহ্রাদের কি তা বলা যাবে? কেননা হিন্দুর গ্রামে তারা হিন্দুর মত, মুসলমানদের গ্রামে তারা মুসলমানদের মত, শিখদের গ্রামে তারা শিখদের মত। ১৯৩১-এর আদমসুমারিতে তারা নিজেদের আদিধর্মী বলে লিখিয়েছিল। আদিধর্মী শব্দটির প্রয়োগ এই অর্থে যে তারা হিন্দু ধর্ম অনুসরণ করলেও হিন্দুসমাজের অন্তর্গত নয় বা তারা দূরবর্তী হিন্দু। অনুরূপভাবে আরও কোন কোন অবদমিত জাতি আদি-হিন্দু বা আদি-দ্রাবিড় হিসাবে নিজেদের পরিচিত করেছিল।

আরও কতকগুলি বিষয় আছে যা থেকে অবদমিত জাতিগুলির সামাজিক দুর্দশাভোগের পরিচয় পাওয়া যায়। অলংকার ধারণের ক্ষেত্রে তাদের অনেক বাধানিষেধের সম্মুখীন হতে হত। অনেক জাতির পক্ষে স্বর্ণালংকার ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ছিল। এমন ঘটনার কথা জানা গেছে যে চামাররা রাজপুতদের মত পোশাক ব্যবহারের ফলে প্রহৃত হয়েছে। আদি-দ্রাবিড়দের ক্ষেত্রে কয়েকটি

বাধানিষেধ ছিল, যথা কোন আদি-দ্রাবিড় সোনা বা রুপার অলংকার পরিধান করতে পারবে না ; তাদের পুরুষেরা হাঁটুর নীচে পরিধের বস্ত্র ঝোলাতে পারবে না ; তাদের পুরুষরা কোট বা শার্ট বা বেনিয়ান পরতে পারবে না ; তারা মানানসই করে চুল কাটতে পারবে না ; তারা গৃহে মাটির পাত্র ছাড়া অন্য কোন পাত্র ব্যবহার করতে পারবে না ; তাদের মেয়েরা দেহের ঊর্ধ্বাংগ আবরণ করতে পারবে না ; তাদের মেয়েরা ফুল ব্যবহার করতে পারবে না ; এবং তারা ছাতা ও পাদুকা ব্যবহার করতে পারবে না। এছাড়া অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা কার্যত মিরাশদারদের দাসে পরিণত হয়েছিল। বংগদেশে নমঃশূদ্রদেরও একদা পালকি চড়ার অধিকার ছিল না। অর্থনৈতিক দিক থেকে পূর্বাঞ্চলের অবদমিতেরা হতাশাজনকভাবে দরিদ্র ছিল না, কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে তাদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। দক্ষিণ ভারতে তারা সামাজিক দিক থেকে প্রচন্ডভাবে বঞ্চিত হলেও, পেশার দিক থেকে ভূমিনির্ভর হবার দরুন তারা খুব দরিদ্র ছিল না। উত্তরাঞ্চলে কিন্তু কৃষিজীবী নিম্নবর্ণের লোকেরা দক্ষিণের তুলনায় অধিকতর দরিদ্র ছিল। এক্ষেত্রে একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য যে সকল অবদমিত জাতিই সামাজিক বৈষম্যের শিকার হলেও, অর্থনৈতিক ক্ষমতার দিক থেকে সকলেই সমান পর্যায়ে ছিল না। তাদের মধ্যে যারা সমৃদ্ধিশালী তারা জাতিকাঠামোর উপর দিকে ওঠার চেষ্টা করত, এমনকি নিজেদের জাতির মধ্যেই মর্যাদার বিভাজন ঘটাত। এইভাবে হালিক কৈবর্তরা জালিক কৈবর্তদের সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেদের পৃথক জাতি বলে ঘোষণা করে এবং নিজেদের আর অবদমিত বলে পরিচয় দেওয়া থেকে বিরত থাকে। বোম্বাই প্রদেশের মহাররা নিজেদের চামারদের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মানতে রাজি হয় নি। মাদ্রাজ প্রদেশের পাল্লানরা নিজেদের চাকলিদের সমপর্যায়ভুক্ত হিসাবে গণ্য করতে অস্বীকার করে কেননা তাদের মতে চাকলিরা তাদের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর, এমন কি পারাইয়ানদের চেয়েও নীচু, যদিও এই তিনটি জাতিই উচ্চবর্ণের জাতিদের নিকট অস্পৃশ্য।

হাটন বলেন যে ১৯৩১-এর আদমসুমারি এমন সময়ে করা হয়েছিল যখন রাজনৈতিক সংস্কারের পূর্বাভাস দেখা দিয়েছিল, এবং তা বাহ্য (অর্থাৎ অবদমিত) জাতিসমূহের প্রকৃত সংখ্যা নির্দিষ্ট করার পক্ষে প্রচলিত যথেষ্ট অসুবিধাগুলিকে আরও জটিল করেছিল। অবদমিত জাতিসমূহকে রাজনৈতিক প্রয়োজনে ব্যবহার করার সচেতন প্রয়াস এই আদমসুমারির পিছনে ছিল। ইতিমধ্যেই ভারতীয় রাজনীতিতে দ্বিজাতিতত্ত্ব, অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান

দুটি পৃথক জাতি এই তত্ত্ব, রীতিমত শিকড় গেড়ে বসেছিল এবং মুসলমানদের চাকরিবাকরি ও বিভিন্ন প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থায় আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা পাকা হয়ে গিয়েছিল, যে ক্ষেত্রে ইংরাজ সরকারের বিশেষ আনুকূল্য ছিল। অনুরূপভাবে অবদমিত জাতিসমূহকে হিন্দুদের থেকে বিচ্ছিন্ন তৃতীয় একটি সামাজিক-রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে ঘোষণা করার চেষ্টা সরকারী পর্যায়ে হয়েছিল যে প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল অবদমিতদের পৃথকত্ব প্রতিপাদন করে ভারতের রাজনীতিতে ত্রিজাতিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করা এবং এই ভাবে ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে ইংরেজদের স্বার্থেই দুর্বল করা। এই প্রসংগটি আমরা জাতিপ্রথা ও রাজনীতি নামক অনুচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব।

৭ ॥ তফশিলী জাতি

আমরা আগে বলেছি যে ১৯৩৫-এর ভারতশাসন আইনে কয়েকটি অবদমিত জাতিকে তফশিলী বা তালিকাভুক্ত (সিডিউলড) বলে ঘোষণা করা হয়। এই বিশেষ পরিভাষাটি সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয় সাইমন কমিশন কর্তৃক। এই তালিকাভুক্তির উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয় যে অনুন্নত ও অবদমিত জাতিসমূহের কল্যাণের জন্যই তাদের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে যাতে এই তালিকাভুক্ত জাতিদের কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায়, কিন্তু গভীরতর উদ্দেশ্য ছিল অবদমিত জাতিদের নিয়ে রাজনীতি করা, তারা যে বর্ণহিন্দুদের চেয়ে পৃথক এটা প্রতিপাদন করে একটি তৃতীয় শক্তির প্রতিষ্ঠা করা, যা প্রধানত বর্ণহিন্দু প্রভাবিত স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে। এ বক্তব্যের ইংগিত আমরা আগে দিয়েছি, এবং পরে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করব। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত অবদমিত জাতিদের নিয়ে যে রাজনীতি করা হয়েছিল তার ইতিহাস ওই আলোচনা প্রসংগে জানা যাবে।

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে অবদমিত জাতিসমূহকে অন্যান্যদের সমপর্যায়ে আনার সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাসমূহ প্রশংসনীয়ভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রণয়নে যাঁর ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল তিনি নিজেই ছিলেন তফশিলী জাতিভুক্ত ভীমরাও আম্বেদকর, যিনি আধুনিক ভারতের মনু বলে খ্যাত হয়েছেন। সংবিধানের ১৫ ধারায় বলা হয়েছে যে ধর্ম, নৃগোষ্ঠী, জাতি, লিংগ ও স্থানের ভিত্তিতে কারো প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা হবে না। ১৬ ধারায় বলা হয়েছে যে সকলের জন্য সমান সুযোগ দেওয়া হবে। কিন্তু যারা পিছিয়ে পড়ে আছে

তাদের বিশেষ সুযোগ না দিলে সকলকে সমান সুযোগ দেওয়ার ব্যাপারটা বাস্তবে অর্থহীন হয়ে পড়ে। এটা অনুধাবন করেই সংবিধানের ১৬।৪ উপ-ধারায় বলা হয়েছে যে চাকরি এবং জনপ্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে পিছিয়ে পড়ে থাকা জাতি ও শ্রেণীদের ক্ষেত্রে সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। লোকসভা ও বিধানসভা সমূহে তাদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব থাকবে। শিক্ষাদীক্ষা, অর্থনৈতিক স্বার্থ প্রভৃতির উন্নতি এবং সামাজিক অবিচার ও নিগ্রহের হাত থেকে তাদের মুক্তিবিধানের জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে সে বিষয়ে সং-বিধানে সুস্পষ্ট নির্দেশ বর্তমান। সংবিধানের ৩৪১ ধারায় প্রতিটি রাজ্য সরকার নিজেদের এলাকার কোন্ কোন্ জাতিকে তালিকাভুক্ত করবে সংবিধানের উদ্দেশ্যের সংগে সংগতি রেখে সে বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে অনুন্নত জাতিসমূহকে বোঝানোর জন্য মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত হরিজন শব্দটির বদলে সংবিধান প্রণেতারা সাইমন কমিশন ব্যবহৃত পরিভাষাটিই ব্যবহার করেছিলেন। তালিকাভুক্ত জাতিসমূহের বর্তমান জনসংখ্যা আট কোটির মত। তফশিলী জাতিদের জন্য বর্তমানে লোকসভায় ৭৬টি আসন এবং বিধানসভাসমূহে ৪৯২টি আসন নির্দিষ্ট। তফশিলী জাতিসমূহের সংখ্যা ১.৬২। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে অস্পৃশ্যতাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়।

সংবিধানে অবদমিত জাতিসমূহের প্রতি প্রদত্ত আশ্বাসসমূহ যাতে বাস্তবে কার্যকর হয় সেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে শ্রীযুক্ত এল. এম শ্রীকান্তকে তফশিলী জাতি ও উপজাতিদের কমিশনার নিযুক্ত করেন। শ্রীকান্ত প্রতি বছরের কাজের একটি করে রিপোর্ট প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন যে পদ্ধতি আজও বজায় আছে। এই সকল রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ম্যাট্রি-কুলেশন (অর্থাৎ স্কুলস্তরের শেষ পরীক্ষা) পরীক্ষায় যারা পাশ করেছে তফশিলী জাতিভুক্ত এই রকম ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য যেখানে ১৯৪৫-৪৬-এ ২,২১,০০০ টাকা বৃত্তি দেওয়া হয়েছে সেখানে ১৯৫৩-৫৪-তে সেই টাকা বেড়ে হয়েছে ২৬,৮৬,০০০, ১৯৫৯-৬০-এ ১,৪৩,৮৪০০০, ১৯৬৩-৬৪-তে ২ কোটি ৯৩ লক্ষ। ১৯৫৩-৫৪র বৃত্তিপ্রাপ্তদের সংখ্যা ছিল ১০,৩৯২ যেখানে ১৯৬৩-৬৪-তে ৬০,১৫৭। উচ্চতর ধরনের চাকুরির ক্ষেত্রে তফশিলী জাতিদের থেকে ১৯৫৩-৫৪-তে প্রায় পাঁচ হাজার লোক নিযুক্ত হয়েছিল যেখানে ১৯৬৩ ৬৪-তে এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল ৬১ হাজার। এ ছাড়া অনুন্নত জাতি-সমূহের সার্বিক উন্নয়নের জন্য যেখানে ১৯৫২-৫৩-তে ব্যয় করা হয়েছিল ২

কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা ১৯৬৩-৬৪তে তা দাঁড়িয়েছিল ৬ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকায়। পরবর্তী কুড়ি বছরে সবই চতুর্গুণিত হয়েছে। স্বাধীনতার ৩৫ বছর পরেও তফশিলী জাতিদের প্রতি সংরক্ষণমূলক নীতি চালিয়ে যাবার ব্যাপারে ভারতের প্রায় সকল রাজনৈতিক দলই একমত।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ভারত সরকার তফশিলী জাতিসমূহের প্রতি আন্তরিক মনোভাব বরাবর পোষণ করেছেন এবং এবিষয়ে অর্থব্যয়েও কোন কার্পণ্য করা হয়নি। এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে শিক্ষাদীক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তফশিলী জাতিসমূহের যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে, এবং চাকুরি ক্ষেত্রে সংরক্ষণ এমন একটা পর্যায়ে পেঁছে গেছে যা বর্ণহিন্দুদের রীতিমত ক্ষোভের কারণ হয়েছে (বস্তুত এই উপলক্ষে নানাস্থানে হাঙ্গামাও হয়ে গেছে এবং এখনও হচ্ছে, পত্রপত্রিকায় এই সংরক্ষণের বিরুদ্ধে ইদানীং নানা লেখালেখি হচ্ছে, এবং বর্ণহিন্দুদের মধ্যে একটা চলিত কথাই হয়ে গেছে যে সিডিউল্ড কাস্ট হতে না পারলে চাকরি-বাকরি পাওয়া বা প্রমোশনের সম্ভাবনা নেই), কিন্তু তৎসত্ত্বেও বারো কোটি তফশিলী জাতি-উপজাতির সংখ্যার তুলনায় তা কতটুকু? অযথার্থ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ফলে পঞ্চান্ন কোটি মানুষের দেশে বেকার সমস্যা এত ভয়াবহ, এবং সেই সংখ্যা বর্ণহিন্দুদের ক্ষেত্রেও এত বেশি, যে তাদের ক্ষোভের যথার্থ কারণ আছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে তারা ভ্রান্ত অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে দায়ী না করে তফশিলী জাতিদের গালাগালি করেই গায়ের জ্বালা মেটাচ্ছে। (এখানে মনে রাখা দরকার যে চাকরি সংরক্ষণের দাবিতেই এদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জন্ম হয়েছিল যার চরম পরিণতি পাকিস্তানের সৃষ্টি)। এই ভ্রান্ত বুদ্ধিকে উৎসাহ দেবার মত স্থূলবুদ্ধি ও অপরিণামদর্শী পেশাদার রাজনীতিবিদ্‌দেরও অভাব নেই। এ বিষয়ে সুষ্ঠু সরকারী নীতি কি হওয়া উচিত, বর্তমান ব্যবস্থা বদলে কোন নূতন ধরনের শ্রেণীবিভাগ করা যায় কিনা—অনেকে যেমন মনে করেন যে অর্থনৈতিক সামর্থ্যের ভিত্তিতে অগ্রসর-অনগ্রসর এই দুই ভাগ রাখা উচিত এবং শেষোক্তদের ক্ষেত্রে জাতিধর্মনির্বিশেষেই সুযোগসুবিধার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা উচিত—সেটা এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুর পক্ষে প্রাসঙ্গিক নয়, তবে প্রচলিত সংরক্ষণনীতির সঙ্গে আরও কয়েকটি বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং সেগুলি নানা জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করেছে। প্রথমটি হল বর্তমান আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা তফশিলী জাতিদের সমস্যা সম্পর্কে কতটা আন্তরিক; দ্বিতীয়টি হল সংরক্ষণের সুযোগ সুবিধা সকল তফশিলী জাতির ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযুক্ত হয়েছে কিনা, অন্য

কথার কয়েকটি বিশেষ তফশিলী জাতিই এক্ষেত্রে একচেটিয়া ভাবে অন্যদের বঞ্চিত করে সরকারী সুযোগ সুবিধা ভোগ করে কিনা ; তৃতীয়টি হল সুযোগ প্রাপ্তেরা এবং সুযোগ পেয়ে যারা বরাত ফিরিয়ে ফেলেছে তারা তাদের জাতি-পরিচয়, বিশেষ করে নগরাঞ্চলে, বহাল রাখতে চায় কিনা, সহজ কথায় তারা নিজেদের উচ্চবর্ণের জাতি বলে পরিচিত করে কিনা ; এবং চতুর্থ, তফশিলী জাতিদের প্রতি উচ্চবর্ণের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়েছে কিনা। জাতিবিরোধ ও সংঘর্ষের ঘটনাগুলি এখনও কেন ঘটে, এই সব সংঘাতের মূলে জাতি বিশেষের ভূমিকা কি অথবা সেগুলির অন্য কারণ আছে? প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরই দুরকম হতে পারে, এবং দুরকম উত্তরের মধ্যেই আপেক্ষিক সত্যতা থাকতে পারে, যা আমরা জাতিপ্রথা ও রাজনীতিপ্রসঙ্গে আলোচনার কালে দেখব।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

১ ॥ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে জাতিপ্রথা

সার হেনরি মেইন তাঁর বিখ্যাত 'এনসেণ্ট ল' গ্রন্থে জাতিপ্রথাকে মনুষ্যসৃষ্ট সবচেয়ে বিপর্যয়কর এবং জঘন্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলে উল্লেখ করেছেন। রিচার্ড ফিক, যিনি বৌদ্ধযুগের উত্তরপূর্ব ভারতের সামাজিক অবস্থা নিয়ে গবেষণা করে বিখ্যাত হয়েছিলেন, জাতিপ্রথা সম্পর্কে বলেছেন যে এটা ব্রাহ্মণ বা পুরোহিতশ্রেণীর দ্বারা উদ্ভাবিত একটি সামাজিক ব্যবস্থা যার একমাত্র লক্ষ্য ছিল ব্রাহ্মণদের স্বার্থ ও প্রতিপত্তি রক্ষা। শেরিং যিনি হিন্দুজাতি ও উপজাতিদের নিয়ে তিনখন্ডে বিরাট গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলেন যে জাতি-প্রথার চেয়ে ক্ষতিকারক কোন ব্যবস্থা মনষ্যজাতিকে নিগ্রহের জন্য উদ্ভাবিত হয়নি। এটি একটি কুৎসিত, কঠিন, ঘৃণ্য এবং নিষ্ঠুর সামাজিক প্রথা। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে জাতিপ্রথা সামাজিক শৃংখলা ও পরিচ্ছন্নতার সহায়ক এবং হিন্দুসমাজের সকল শ্রেণীর সংযোগের হেতু, তাহলে একথা বলতে বাধা নেই যে এই সকল উদ্দেশ্য নিশ্চিতভাবে কোন সরলতর এবং কম শত্রুতামূলক পদ্ধতির দ্বারা সাধন করা যেত। এই রকম একটি মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী, এত অদ্ভুত বিস্তৃত এবং জটিল পরিকল্পনার উদ্ভাবন, যে পরিকল্পনা কুড়ি কোটি মানুষকে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে তৈরি করা হয়েছে, নিঃসন্দেহে কোন প্রয়োজনীয় ও মঙ্গলদায়ক উদ্দেশ্যের মুখ চেয়ে হয়নি। এই প্রথার উদ্ভবের পিছনে একটি গূঢ় মতলব প্রচ্ছন্ন, যা হচ্ছে ব্রাহ্মণদের সর্বোচ্চ গৌরবে ভূষিত করা, তাদের গর্বকে তোষণ করা এবং তাদের ইচ্ছাকে সকলের উপর চাপিয়ে দেওয়া। ভারতীয়দের মধ্যে আমরা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করতে পারি। বঙ্কিম গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের জন্য সারাজীবন চেষ্টা করেছিলেন। তৎসত্ত্বেও তাঁর বিপুল গ্রন্থ সাহিত্যে তিনি দ্বিধাহীনভাবে জাতিপ্রথাকে হিন্দুর সকল দুর্গতির কারণ বলে ঘোষণা করতে কুণ্ঠিত হন নি। হিন্দুধর্ম ও সমাজের নানা বিষয়কে, এমন কি নানা আপত্তিকর বিষয়কেও, তিনি যুক্তিগ্রাহ্য করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু জাতিপ্রথাকে যুক্তিগ্রাহ্য করার সহস্র সুযোগ থাকলেও, তিনি সে চেষ্টা করেননি।

আবার জাতিপ্রথার গুণগান করার মত লোকেরও অভাব হয়নি। সিডনি লো তাঁর ভিসন অব ইণ্ডিয়া গ্রন্থে লিখেছেন : "এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে জাতিপ্রথা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রাজনৈতিক আঘাত ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করে ভারতীয় সমাজের মৌলিক স্থায়িত্ব ও সন্তোষ বিধানের কারণ হয়েছে। এই ব্যবস্থা প্রত্যেক মানুষকে তার স্থান, তার জীবনচর্যা, তার পেশা, তার বন্ধুমহলের যোগান দেয়। এই ব্যবস্থা শুরু থেকে তাকে একটি সংগঠনের আওতায় নিয়ে আসে, সামাজিক ঈর্ষার দংশন এবং অপূর্ণ আশার জ্বালা থেকে তাকে রক্ষা করে।" মেরেডিথ টাউনসেন্ড লিখেছেন : "আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে জাতিপ্রথা একটি আশ্চর্য আবিষ্কার, একধরনের সমাজতন্ত্র যা হিন্দুসমাজকে যুগের পর যুগ ধরে মাৎস্যন্যায় এবং যন্ত্র শিল্পপ্রধান ও প্রতিযোগিতামূলক জীবনের দুর্দশা থেকে রক্ষা করে এসেছে। শুরুতে এটি একটি স্বয়ংক্রিয় দুর্বল বিধান বলে প্রতিভাত হলেও আসলে সবচেয়ে শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়নের সমতুল্য।" আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে আবে দুবোয়া যিনি মিশনারী হিসাবে ভারতে পনের বছরেরও অধিক কাজ করেছিলেন, নির্দ্বিধায় লিখেছেন : "আমি মনে করি জাতিপ্রথা নামক প্রতিষ্ঠানটি হিন্দু জাতিসমূহের প্রবর্তিত বিধানাবলীর সবচেয়ে আনন্দদায়ক প্রচেষ্টা। এবং আমি নিশ্চিত যে যখন সমগ্র ইউরোপ বর্বরতার অকুলপাথারে নিমগ্ন ছিল, ভারতীয় জনসাধারণ জাতিপ্রথার দৌলতেই কখনও সে অবস্থায় পড়ে নি, তারা মাথা উঁচু রেখেছে, জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্পকলা ও সভ্যতাকে বজায় রেখেছে এবং পুষ্ট করেছে।"

শেরিং, ফিক প্রভৃতির মত প্রসঙ্গে কানে বলেছেন যে এমন কোন প্রমাণ দাখিল করা যায় না যার ভিত্তিতে বলা চলে যে জাতিপ্রথা কয়েকজন মতলব-বাজ ব্যক্তির সৃষ্টি যারা তাদের পরিকল্পনা একটা গোটা মহাদেশের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল। জাতিপ্রথায় বিরুদ্ধে যা খুশি বলা যেতে পারে, কিন্তু ইতিহাস-সচেতন যে কোন ব্যক্তিরই এটুকু স্বীকার করা উচিত যে এ প্রথা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সৃষ্টি বা উদ্ভাবন হতে পারে না। যুগের পর যুগ ধরে নানা ঐতিহাসিক ঘটনাচক্রে এই প্রথা দাঁড়িয়ে গেছে। এর পর কানে কিছুটা উষ্মার সঙ্গে বলেছেন : "সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, কারিগরী ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে জাতিপ্রথার দানকে শেরিং-এর মত লেখকেরা এড়িয়ে গেছেন। এই প্রথার যে সকল দোষকে তাঁরা অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করেন সেগুলি উনিশ ও বিশ শতকের যন্ত্রসভ্যতার বিস্তারের ফলেই প্রকটিত হয়েছে। এই সমালোচকেরা

জাতিপ্রথার সব অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার বৈশিষ্ট্যের দিকটি এড়িয়ে গেছেন যা কার্যত যুগের পর যুগ ধরে বহিরাক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ যুদ্ধবিগ্রহের ফলে উৎপন্ন মাৎস্যন্যায় থেকে ভারতীয় সমাজকে রক্ষা করে এসেছে। ব্রাহ্মণদের প্রচণ্ড নিন্দা করতে গিয়ে এই সমালোচকেরা একেবারেই ভুলে গেছেন যে বিরাট ও বিচিত্র সংস্কৃত সাহিত্য ব্রাহ্মণদের সৃষ্ট এবং তাদেরই প্রচেষ্টায় রক্ষিত হয়েছে। জাতিপ্রথার অধীনে কোন মানুষই সমাজে অপ্রয়োজনীয় নয়, তার আচরণই তার জাতির মর্যাদার দ্যোতক। যে যুগে সমস্ত কাজই হাতের দ্বারা হত, তখন এই জাতিপ্রথাই বিভিন্ন কারিগর ও পেশাদার শ্রেণীকে নিরাপত্তা এবং নিজ বৃত্তিগত কলাকৌশল রক্ষা করার সুযোগ দিয়েছে। সর্বোপরি কি ধরনের সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা বাঞ্ছনীয় এবং এই প্রথার বিকল্প কি হতে পারে সে বিষয়ে এই সমালোচকেরা কিছুই পরিষ্কার করে বলেন নি। তাঁদের চোখের সামনে যে আদর্শ সমাজ বর্তমান সে তো যন্ত্র শিল্প ও ধনের ভিত্তিতে গঠিত পশ্চিমী সমাজ। কিন্তু সে সমাজও জাতিপ্রথা-ভিত্তিক সমাজের চেয়ে কোন অংশে ভাল নয়, বরং ক্ষেত্রবিশেষে অধিকতর নিকৃষ্ট।"

ব্লাণ্ট বলেন যে জাতিপ্রথার বহিরঙ্গটা কয়েকটি বিশেষ ধারণার দ্বারা চিহ্নিত থাকলেও এই ব্যবস্থার ভিতরের দিকটা সর্বদাই পরিবর্তনশীল এবং নমনীয়। এটা কোন এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। এটা সতত সঞ্চরমান এবং বিবর্তনধর্মী, যে বিবর্তন আজও চলছে। নূতন জাতি ও শাখা-জাতির আবির্ভাব হচ্ছে, আবার পুরাতনেরা অন্তর্হিত হচ্ছে। জাতি-সংশ্লিষ্ট প্রথাসমূহের দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। এর নকশা বদলায় কিন্তু ছকটা বজায় থাকে। প্রমথনাথ বসু বলেন যে জাতিপ্রথা নিঃসন্দেহে মানুষকে বর্বরদশা থেকে উপরে তোলে, কিন্তু তাকে প্রত্যাশিত পর্যায়ে পৌঁছে দেয় না, মধ্যপথে ছেড়ে দেয়। জাতিপ্রথার উপর এইরকম নানাজনের নানা মন্তব্য উদ্ধৃত করা যায়, কিন্তু এই প্রথার ভালো-মন্দের বিচার করাটা প্রথাটিকে বোঝার পক্ষে অনুকূল নয়। এই প্রথা সম্পর্কে কারো ব্যক্তিগত বোধ, বা পছন্দ অপছন্দের উপর প্রথাটির অস্তিত্ব নির্ভর করে না। যে সকল বিশেষ সামাজিক-ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে এই প্রথা গড়ে উঠেছে, বিশেষ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উপাদান এই প্রথাকে টিঁকিয়ে রেখেছে, অর্থাৎ যে সকল বাস্তব শর্তের উপর এই ব্যবস্থা নির্ভরশীল, সেগুলির কার্যকারিতা ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বজায় থাকবে। ব্যবস্থা কতদূর নৈতিক বা অনৈতিক, কতটা বাঞ্ছনীয় বা অবাঞ্ছনীয়, কোন ব্যক্তি এ বিষয়ে কি মত পোষণ

করে, তার উপর এই ব্যবস্থার অস্তিত্ব নির্ভরশীল নয়। এমনকি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগেও এই প্রথার স্থায়িত্ব বিধান করা অথবা এই প্রথাকে বিলোপ করা সম্ভবপর নয়। বটবৃক্ষের মত শিকড় চালিয়ে টি'কে থাকার রস যতদিন এই ব্যবস্থা সংগ্রহ করতে পারবে ততদিন টি'কে থাকবে।

এই প্রসঙ্গে নির্মলকুমার বসুর বক্তব্য আমরা একটু বিস্তৃতভাবেই উদ্ধৃত করছি। বসুজ মহাশয় বলেন: "প্রথমেই চোখে পড়ে ভারতবর্ষীয় সমাজ বহু জাতির সংশ্লেষের দ্বারা রচিত হইয়াছে। অপরাপর দেশেও তাহাই হয়, এবং বিজেতা জাতির প্রভাবে বিজিত জাতি অনেক ক্ষেত্রে স্বীয় রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক স্বাতন্ত্র হারাইয়া ফেলে। একে অপরকে শোষণ করিয়া একটি নূতন উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা নির্মাণ করে। আবার দিন যায়, উৎপাদনের নূতন এক কৌশল অধিকৃত হওয়ার ফলে আবার মানুষে মানুষে সম্পর্কের হেরফের হয়। ভারতবর্ষে যে তেমন হয় নাই, তাহা নহে। তাহাই ঘটিয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যেও ভারতবর্ষের প্রতিভা এক নূতন দিকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, যাহার ফলে নানা রাজনৈতিক উত্থানপতন ও ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যেও ভারতবর্ষ স্বীয় সংস্কৃতিকে মরণের অপঘাত হইতে বাঁচাইতে সমর্থ হইয়াছিল। সেই কৌশলটি আমরা বর্ণব্যবস্থার মধ্যে দেখিতে পাই। প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-তত্ত্ববিদগণের মতে বর্ণব্যবস্থা সকল সমাজেই প্রযোজ্য। যেখানে বহু জাতি মিলিত হইতেছে, তাহাদিগকে চারি মৌলিক বর্ণে স্থান দিয়া, সংশ্লিষ্ট করিয়া একটি বৃহত্তর সমাজ গঠন করা যায়। সমাজের প্রয়োজনে, স্বীয় গুণ বা প্রতিভা অনুসারে যে-যে কাজ করে, সে যদি সেই কাজেই নিযুক্ত থাকে, এবং সমাজও যদি এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে যে সে ব্যক্তি বা তাহার পরে অনুরূপ বৃত্তিধারী ব্যক্তি অনাহারে মরিবে না, সকলে পরস্পরের সহযোগিতার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করিবে, তাহা হইলে পরস্পরের বাহুবন্ধনে যে দৃঢ় সমাজ গড়িয়া উঠে, তাহার শক্তি বেশি হয়। উপরন্তু গ্রাম্য সমাজে এই সহ-যোগিতার অতিরিক্ত আরও একটি ব্যবস্থার দ্বারা মানুষকে পরম আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল। যে, যে সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত, তাহার কুল বা জাতির আচার যেমনই হউক না কেন, সে সেই আচার বজায় রাখিয়াও হিন্দু সমাজে স্থান পাইত।...বর্ণগত সমাজের অন্তরে যে অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড বর্তমান ছিল, এবং স্বধর্ম পালনের যে আশ্বাস বহু জাতি লাভ করিয়াছিল, তাহারই কারণে ভারতীয় সমাজে বিজিতের বিদ্রোহ দেখা দেয় নাই; অথবা দেখা দিলেও বেশি দূর পর্যন্ত তাহা অগ্রসর হইতে পারে নাই।...অথচ ব্রাহ্মণদের মতলব যে

কেবলই খারাপ ছিল, এমন ভাবিবার কোন হেতু নাই। তাহারা বর্ণব্যবস্থার অন্তর্বর্তী অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড স্থাপন এবং স্বধর্মে অধিকারের স্বীকৃতির ভিতর দিয়া যে ঔদার্য ও গঠনকুশলতা দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। দুঃখ এইখানে যে, তাঁহারা বিজিতকে ঠিক নিজেদের সমান আসন দিতে সমর্থ হন নাই। সেই ভেদবিষে সংশ্লেষমূলক সমাজের দেহ উত্তরোত্তর দুর্বল ও পংগু হইয়া পড়িল। যেমন সমাজের বিভিন্ন জাতি একত্র হইয়া বাহিরের শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে নাই।...সংশ্লেষের যে আদর্শ লইয়া হিন্দুসমাজ রচিত হইয়াছিল, উৎপাদন ব্যবস্থাকে একান্তভাবে কুল বা জাতি-গত বৃত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা দেখা গিয়াছিল, কার্যত তাহা কিন্তু কোনদিনই ষোল আনা প্রতিপালিত হয় নাই। এক জাতি হইতে অপর জাতিতে পরিণত হওয়ার ইতিহাস আজও বিরল নহে, পূর্বকালেও বিরল ছিল না। বৃত্তির পরিবর্তন, স্থানান্তরে গমন ও বসবাস, আচারভ্রষ্ট হওয়ার কারণে অথবা শুদ্ধতর আচার গ্রহণের ফলে নূতন নূতন জাতির উদ্ভব হইয়াছে; কিন্তু সকলে মৌলিক নীতি দুইটিকে মানিয়া চলিয়াছে। দেশাচার বা লোকাচার পালনের স্বাধীনতা ও বৃত্তিতে কুল বা জাতিগত অধিকারের বিরুদ্ধে কেহ আপত্তি করে নাই। সেইজন্য মুসলমান অধিকারকালে যখন রাজশক্তি অন্য পথে চলিল, যখন সমাজের শিক্ষিত চাকুরিজীবী মুসলমান সরকারের নিকট প্রীতিলাভের চেষ্টা করিতেছিল, তখনও গ্রাম্যসমাজে বর্ণ-ব্যবস্থার মেরুদণ্ড অভগ্ন থাকার কারণে হিন্দুসভ্যতা টিঁকিয়া গিয়াছিল। যে সকল দরিদ্র, শোষিত শূদ্র জাতি অত্যাচারিত হইত, বৃত্তিমূলক বর্ণব্যবস্থা বজায় রাখার ব্যাপারে, পরস্পরের মধ্যে ছুৎমার্গ, উচ্চনীচ বোধ কায়েমী রাখার বিষয়ে, তাহাদেরও উৎসাহের অভাব ছিল না। আজও যখন অস্পৃশ্যতা বর্জনের আন্দোলন চলিতেছে, তখন হাড়ি, ডোম, বাগদি প্রভৃতি জাতি ব্রাহ্মণ কায়স্থর সহিত মর্যাদার সমত্ব লাভে খুশি হইলেও পরস্পরের মধ্যে পুরাতন সম্পর্ক পরিবর্তন করিতে আগ্রহান্বিত হয় না। অর্থাৎ শোষিতগণের মধ্যে বর্ণব্যবস্থার প্রতি আনুগত্যের ন্যূনতা যথোপযুক্তভাবে আজও ঘটে নাই।... ইহার মূলে শুধু ব্রাহ্মণের শঠতা অথবা শূদ্রগণের অন্ধ কুসংস্কার আছে বলিয়া নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। জগতের অন্যত্র যেরূপ সামাজিক বিদ্রোহ ঘটিয়াছে, ভারতবর্ষে তাহা শুধু জাতীয় নির্বীর্যতার কারণে ঘটে নাই বলিলে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দায় হইতে খালাস পাওয়া যায় না। মূলে রহিয়াছে, আপামর সাধারণের মনে বর্ণব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য। বর্ণব্যবস্থার অর্থ-

নৈতিক ভারকেন্দ্রের স্থৈর্যের বশেই ভারতীয় সংস্কৃতির স্থৈর্য সম্ভব হইয়াছিল। সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করিবার বিশেষ আবশ্যকতা আছে।"

২ ॥ জাতিপ্রথার স্থায়িত্বের কারণ

জাতিপ্রথার অসংখ্য ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এই প্রথা কেন যুগের পর যুগ ধরে স্থায়ী হয়েছে এবং তা কেন এখনও বর্তমান আছে সে বিষয়ে সামান্য কিছু আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। একটা কথা সর্বাগ্রে মনে রাখার প্রয়োজন যে ভারতবর্ষের সামাজিক বিবর্তনের পদ্ধতি নানা কারণেই অন্যদেশের চেয়ে স্বতন্ত্র। ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক কারণে অতীতে এদেশে মানুষের জীবন-ধারণের জন্য কঠোর সংগ্রামের প্রয়োজন না থাকায়, বিস্তৃত উর্বর ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যের জন্য, খাদ্যসংগ্রহ বা খাদ্যোৎপাদনে কোন অসুবিধা না থাকায়, বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাতের সুযোগ অল্পই ছিল। এই জন্য একটা সহনশীলতার আবহাওয়া বরাবরই বিরাজ করত। কোন আগন্তুক জনগোষ্ঠী কোন এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আপত্তির কোন কারণ ছিল না। এরা এদের মত থাকত, তারা তাদের মত থাকত, নিজের গোষ্ঠীগত ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র বজায় রেখেই। এই স্বাতন্ত্র-চেতনাই কিন্তু জাতিপ্রথার একটা বড় বৈশিষ্ট্য, যা থেকেই পরে বিধান গড়ে উঠেছিল যে একের বৃত্তি ও সমাজজীবনে অন্য জাতির হস্তক্ষেপ বা অনুপ্রবেশ চলবে না। নির্মলকুমার বসুর উপরে উদ্ধৃত অভিমতের মধ্যে একটা কথা অবশ্য উল্লেখ করা হয়নি, যদিও বসুজ মহাশয় তাঁর "হিন্দু সমাজের গড়ন" গ্রন্থের অন্যত্র তা বলেছেন, যা হল, জাতির প্রতি—সে জাতি জাতিকাঠামোর যে স্তরেই থাকুক না কেন—জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিদের অসীম আনুগত্যের বহু কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে অধিকাংশ জাতিই অতীতে ছিল উপজাতি, যারা নানা ঐতিহাসিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বৃহত্তর হিন্দু-সমাজের অঙ্গীভূত হয়েছে এবং কোন বৃত্তি অবলম্বন করে জাতিতে পরিণত হয়েছে। আমরা ইতিপূর্বে বারবার বলেছি যে এদেশে উপজাতি ও জাতির মধ্যকার সীমারেখা সর্বদা স্পষ্ট নয়। প্রাক্তন উপজাতীয় জ্ঞাতিত্ব-বন্ধনই পরবর্তী পর্যায়ে জাতির প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্যে রূপান্তরিত হয়েছে। এর ইতিমূলক দিক অনেক আছে, কিন্তু নেতিমূলক দিকটি হল যে এই জাতি-আনুগত্যের বেড়া টপকে বৃহত্তর ন্যাশানাল আদর্শে উত্তরণ বড় সহজ ব্যাপার নয়, অতীতে তা ঘটে নি, বর্তমানে সর্বভারতীয়ত্ববোধ গড়ে ওঠার পক্ষে এই

জাতি-আনুগত্য প্রতিকূলতার সৃষ্টি করছে। দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতিক কারণেই এদেশে জীবনসংগ্রাম তীব্র না হওয়ায়, প্রয়োজনের খাতিরে এখানে জীবনের নানাক্ষেত্রে তেমন কোন উদ্ভাবনা ঘটেনি, প্রাচীন উৎপাদন পদ্ধতিরও বিশেষ পরিবর্তন হয় নি, ফলে একই ধরনের অলস-মন্থর জীবনযাত্রা যুগের পর যুগ ধরেই বহাল রয়েছে। জাতিপ্রথার স্থায়িত্বের এটাও একটা বড় কারণ।

বহুপূর্বে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ইউরোপীয় সমাজকে পোলিটিকাল সোসাইটি আখ্যা দেওয়া যেতে পারে, যেখানে ভারতীয় সমাজ মূলত সিভিল সোসাইটি। এখানে বরাবরই রাষ্ট্রযন্ত্রের ভূমিকা জনজীবনের ক্ষেত্রে গৌণ। এখানে প্রতিটি জাতিই, ছোট হোক বড় হোক, নিজস্ব সমাজ এবং সেই সমাজের আইনকানুনের দ্বারা পরিচালিত। রাজার কর্তব্য বর্ণাশ্রম রক্ষা, প্রতিটি জাতিই যাতে নিজস্ব বৃত্তি অক্ষুণ্ণ রেখে টি঳কে থাকতে পারে সেদিকে নজর রাখা। পক্ষান্তরে ইউরোপের ইতিহাস বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর অবিরত সংঘর্ষের ইতিহাস যেখানে একপক্ষের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ বা দাসত্ব ভিন্ন এই সংঘাতের নিবৃত্তি ঘটে নি। এবং এই অবিরত সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতেই রাষ্ট্রীয় শক্তির ভূমিকা সমাজজীবনে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে, এবং রাষ্ট্রশক্তির অন্তর্কাঠামো মানুষের ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন ও সমাজজীবন নিয়ন্ত্রণ করেছে। অবশ্য রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি ছিল ধর্ম বা চার্চ, কিন্তু রাষ্ট্রশক্তির মত শেষোক্ত শক্তিও ছিল ব্যক্তি ও সমাজজীবনের উপর পূর্ণ কর্তৃত্বের দাবিদার। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিই ছিল জাতিবিদ্বেষ, ভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মানুষদের বলপূর্বক উৎসাদন, এবং সেটা সম্ভব না হলে তাদের দাসে পরিণত করে রাখা। ভারতবর্ষে শূদ্রদের ক্ষেত্রে অবশ্যই বৈষম্য করা হয়েছে, কিন্তু সে বৈষম্য মূলত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে (যেটা এক অর্থে কিছুটা সুবিধাভোগ, কেননা জটিল ও কালহরণকারী আচার অনুষ্ঠানের ঝামেলা ভোগ করার দায় থেকে তারা বেঁচে গিয়েছিল) এবং সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে। কিন্তু শূদ্র দাস নয়, পরাধীন নয়, তার ধন ও প্রাণের মালিক তার প্রভু নয়, তার কৌলিক বৃত্তি তার নিজস্ব, তার ধনসঞ্চয়ে কোন বাধা নেই, সে স্বাধীন মানুষ, এমনকি নিজ প্রচেষ্টায় সে যদি রাজপদ অর্জন করে, সে অধিকারও তার আছে। ভারতের ইতিহাসে অনেক শূদ্র রাজারও উল্লেখ আছে। বরং বলা যায় ভারতবর্ষে শূদ্রদের সকল স্বাভাবিক মানবিক অধিকার ও স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, তবে অন্য তিন বর্ণের ক্ষেত্রে কিছু অধিকতর সুযোগ সুবিধা বরাদ্দ করা হয়েছে যে ব্যবস্থার সঙ্গে প্রাচীন

গ্রীস ও প্রাচীন রোমের বৈষম্যমূলক ও উৎপীড়ননির্ভর সমাজব্যবস্থার কোন তুলনাই হয় না। আধুনিক যুগের ইউরোপীয় মানসিকতায় জাতিবিদ্বেষ ও ভিন্ন নৃগোষ্ঠীর প্রতি বিদ্বেষ মজ্জাগত। আমরা পরে দেখব যে কোটিখানেক ইহুদীকে দৈহিকভাবে নিশ্চিহ্ন করে হিটলার এমন কিছু অন্যায় করেন নি যা ইউরোপীয় মানসিকতার বিরোধী, যে মানসিকতার উৎস মহাজ্ঞানী প্লেটো থেকে অনুসন্ধান করতে কোন অসুবিধা নেই। ইউরোপের তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা, অন্যান্য রাষ্ট্রশক্তির প্রতিভূরা, এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে গণহত্যা চালিয়ে ভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মানুষদের নির্বংশ করার কাজে যে সাফল্যলাভ করেছিলেন, সে তুলনায় হিটলার আর কতটুকু করেছিলেন ?

ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, এমনকি একই ধর্মের ভিন্ন শাখাবলম্বী, ভিন্ন নৃগোষ্ঠী এবং ভিন্ন ভাষার মানুষকে বলপূর্বক হত্যা ও উৎখাত করার নজীর ইউরোপের ইতিহাসে অনেক পাওয়া যায়, শার্লামান থেকে হিটলার পর্যন্ত যার ধারাবাহিকতা বর্তমান। এই অধ্যায়েরই পরবর্তী অংশে আর্যপ্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার কালে আমরা দেখব যে ইউরোপীয় মনীষী ও দার্শনিকদের একাংশ কিভাবে জাতিবিদ্বেষী মনোভাবসমূহকে প্ররোচিত করেছিলেন। ভারতবর্ষে এই রকম কোন জাতিবিদ্বেষ এবং তজ্জনিত গণহত্যার ঐতিহ্য নেই, এবং তা না থাকার একটা বড় কারণই হচ্ছে জাতপ্রথা, যা প্রতিটি গোষ্ঠীকেই তার স্বকীয়তা বজায় রেখে বেঁচে থাকার অধিকার দেয়, যদিও কোন প্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠী কোন অর্বাচীন গোষ্ঠীকে তাদের সাংস্কৃতিক মান অনুযায়ী ভাল চোখে বা মন্দ চোখে দেখে থাকে। আলাউদ্দীন খলজী দশ হাজার নব মুসলমানকে হত্যা করেছিলেন, কিন্তু সেটা তাদের বিদ্রোহ দমনের মানসেই, কোন জাতিবিদ্বেষের প্রেরণায় নয়। তাছাড়া আলাউদ্দীন খলজী প্রকৃত অর্থে ভারতীয় ঐতিহ্য-লালিত ছিলেন না। মধ্যযুগে ভারতীয় রাজশক্তি যে মাঝে মাঝে উৎপীড়কের ভূমিকা নেয় নি তা নয়, কিন্তু সে উৎপীড়নের লক্ষ্য বিশেষ কোন নৃগোষ্ঠী বা জাতি কোনদিনই ছিল না। মধ্যযুগে ধর্মান্তরিত করার ঘটনা আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যে ব্যক্তির উপর জবরদস্তিরও উদাহরণ আছে। কিন্তু ব্যাপকভাবে গায়ের জোরে কোন এলাকার জনসাধারণকে ধর্মান্তরিত করার নজীর নেই। ভারতে প্রচলিত জাতিপ্রথা বাবরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই প্রথার গুণাগুণ তিনি অবশ্য বিচার করেন নি, তবে এই প্রথার ব্যবহারিক দিকটি তাঁর নজর এড়ায় নি। তিনি লিখেছেন যে

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে একটা সুবিধা হচ্ছে যে এখানে কাজ জানা লোকের অভাব নেই, যে কোন কাজের জন্যই নির্দিষ্ট গোষ্ঠী আছে। বস্তুত জাতিপ্রথার অর্থ-নৈতিক দিকটা মুসলমান শাসকদের দৃষ্টি এড়ায় নি এবং এই প্রথাকে বিপর্যস্ত করার চিন্তা কারো মাথাতেই আসে নি। মুঘল যুগে ভারতে বৈদেশিক আগন্তুকরা—বিশেষ করে থেভেনোট, কারেরি, পিয়েত্রো দেল্লা ভাল্লে, মনসেরেট, বার্ণিয়ের, তাভার্নিয়ে সকলেই—জাতিপ্রথার বৃত্তিমূলক দিকের উপরেই গুরুত্ব দিয়েছেন এবং একথাও বলেছেন যে নিম্নবৃত্তিধারী জাতিদের মেয়েরাও তাদের বৃত্তিতে সুদক্ষ হওয়ার জন্য অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী এবং সেই হিসাবে অধিকতর স্বাধীনতাও তারা ভোগ করে থাকে। আমরা আগেই দেখেছি যে এদেশে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের জীবনে জাতিপ্রথার বৃত্তিমূলক দিকগুলি ষোল আনাই কার্যকর ছিল এবং বহুল পরিমাণে অন্তর্বিবাহের দিকটিও। একথা দক্ষিণের খ্রীস্টানদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। জৈনরা জাতিপ্রথার বিরোধী হলেও নিজেদের মধ্যে একধরনের জাতিপ্রথা গড়ে তুলেছিল। মধ্যযুগের নব-ধর্ম আন্দোলনসমূহের ফলে হিন্দুদের থেকে যে সকল সংস্কারবাদী ধর্মীয় সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল সেগুলিও কালক্রমে জাতি হিসাবেই পরিচিত হয়েছিল। এই সকল বিচিত্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছোটখাট বিবাদ-বিসংবাদ থাকলেও একপক্ষ কখনও কল্পনা করে নি যে অন্য পক্ষের অবলুপ্তি ব্যতিরেকে তাদের টিঁকে থাকা অসম্ভব। এই শেষোক্ত মনোভাবটি গড়ে উঠেছিল ইংরাজ আমলের শেষের দিকে এবং এই মনোভাবের মূলে নিঃসন্দেহে পশ্চিমী রাষ্ট্রচিন্তা ও রাজনৈতিক আচরণের প্রভাব বিদ্যমান। এই মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের হত্যা ও বলপূর্বক উৎখাত করার ঘটনাসমূহের মধ্য দিয়েই ভারত-বিভাগ সম্পন্ন হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই মনোভাবেরই ব্যাপ্তি ঘটেছে ভিন্ন নৃগোষ্ঠী ও ভাষাগোষ্ঠীর লোকদের ক্ষেত্রে, শুধু ভারতবর্ষেই নয়, ভারতবর্ষের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহেও। এই মনোভাব কিন্তু সম্পূর্ণভাবেই ভারতীয় ঐতিহ্যবিরোধী।

ইংরাজ আমল থেকেই জাতিপ্রথাকে রাজনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা শুরু হয়। আমরা পরে দেখব যে এদেশে বৃটিশ শাসকেরা নিজেদের অনুন্নত ও নিম্নবর্ণের জাতিদের রক্ষাকর্তার ভূমিকার ভান বেশ সাফল্যের সংগে করতেই সমর্থ হয়েছিল, যার ফলে এমনকি আম্বেদ-করের মত প্রতিভাবান নেতাও অনুন্নত জাতিদের নিরাপত্তার স্বার্থে বৃটিশ শাসনের স্থায়িত্ব চেয়েছিলেন। এই ভূমিকা গ্রহণ করতে গিয়ে বৃটিশ সরকার সুপরিকল্পিতভাবে অনুন্নত জাতিদের মধ্যে নূতন করে স্বাজাত্যচেতনার এবং

অন্য জাতির প্রতি বিদ্বেষের বীজ বপন করেছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর কংগ্রেস সরকার বিভিন্ন জাতি সম্পর্কে অবিকল বৃটিশ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে এবং নিজেদের অনুন্নত জাতিসমূহের মুরুব্বির ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পায়। বিরোধী দলগুলিও এক্ষেত্রে কোন ভিন্ন ভূমিকা নেয় নি। জাতি নিয়ে রাজনীতির নানা কলাকৌশল আমরা এই গ্রন্থের একটি পৃথক অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে দেখিয়েছি। সোজা কথা, মুখে জাতিপ্রথা বিরোধী কথা বললেও সকল রাজনৈতিক দলই জাতিগত সংকীর্ণতাসমূহকে প্রশ্রয় দিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক মুনাফা তোলার প্রত্যাশী, এবং এই ব্যাপারে তারা যে সংশ্লিষ্ট জাতিগুলির সহযোগিতা পায় না তা নয়। আধুনিক শিক্ষা, প্রশাসন ও উৎপাদনব্যবস্থার সুযোগে উচ্চবর্ণের, বিশেষ করে ইংরাজী শিক্ষিত লোকদের কর্মক্ষেত্রের সীমা সম্প্রসারিত হওয়ায়, এই স্তরে যে সামাজিক সচলতার সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে জাতিপ্রথার বাঁধন কিছুটা শিথিল হলেও, মধ্যস্তরের বাণিজ্যজীবী ও কৃষিজীবী জাতিদের মধ্যে তা মোটেই শিথিল হয় নি, এমনকি আর্থিক দিক থেকে তারা সমৃদ্ধতর হওয়া সত্ত্বেও, যেননা এই সকল জাতি আধুনিক শিক্ষার সুযোগ বেশি নেয় নি এবং এদের জীবনসংগ্রাম কখনও এমন তীব্র হয় নি যাতে অভ্যস্ত বৃত্তি থেকে অন্যত্র সরে আসতে হয়। আবার মধ্যপর্যায়েব এমন অনেক সমৃদ্ধ জাতি বর্তমান যারা নানা ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের অন্তর্গত যার প্রভাব তাদের সমাজজীবনের উপর এত বেশি যে তারা তাদের সাম্প্রদাযিক নেতৃত্বের নির্দেশের বাইরে যেতে অপারগ। রাজস্থানী, গুজরাতী, ও কর্ণাটকী জৈনরা, যদিও তারা নানা জাতিতে বিভক্ত, নিজ নিজ গচ্ছ বা শাখার প্রধানদের নির্দেশের বাইরে যেতে পারে না। কর্ণাটকের লিঙ্গায়ৎরা তাদের সাম্প্রদায়িক নেতৃত্বের নির্দেশ ভঙ্গ করতে পারে না। এমনকি পশ্চিমভারতের মুসলমান শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত বোহরা বণিকজাতি তাদের পারিবারিক জীবনেও সাইয়্যনা বা ধর্মগুরুর নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য, যা থেকে বিচ্যুতি ঘটলে ধর্মচ্যুত হতে হয়। শিখরা যদিও প্রকৃত অর্থে ধর্মীয় সম্প্রদায়, যাদের মধ্যে জাঠ, রাজপুত, গুজর প্রভৃতি বহু জাতির মানুষই আছে, তৎসত্ত্বেও তারা পুরোদস্তুর জাতির মত ব্যবহার করে। যদিও পাঞ্জাবের নানা হিন্দু পরিবারে শিখ আছে (অনেক হিন্দু পরিবারই মানত হিসাবে একটি সন্তানকে শিখ ধর্মে দীক্ষা দেওয়ায়) শিখরা কিন্তু হিন্দুদের সঙ্গে বৈবাহিক এবং অপরাপর সামাজিক সম্পর্কে আসতে চায় না।

যে-স্তরে জাতিপ্রথার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি বিক্ষোভ থাকার কথা, সমাজ-

কাঠামোর সেই নিম্নস্তরেই জাতিপ্রথার প্রাধান্য সবচেয়ে বেশি, কেননা এখানে জীবিকার জন্য জাতব্যবসা অবলম্বন এবং আত্মরক্ষার জন্য স্বজাতির মধ্যে সংহতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। উচ্চবর্ণের মানুষদের সম্পর্কে কিছু অভিযোগ থাকলেও নিম্নবর্ণের জাতিরা জাতিপ্রথার অবসান কামনা করেনা, তবে জাতি-কাঠামো না ভেঙে এই কাঠামোর মধ্যে তারা অধিকতর মর্যাদা প্রার্থী। শুধু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে মধ্য ও নিম্ন পর্যায়ের এমন জাতি খুব কমই আছে যাদের কোন নিজস্ব জাতিগত সংগঠন নেই। পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত পঞ্চাশটির মত জাতিপত্রিকার সন্ধান পাওয়া গেছে—যদিও সেগুলির প্রকাশ কিছুটা অনিয়মিত—যেখানে সংশ্লিষ্ট জাতির নানা খবর প্রকাশিত হয়। এদেশে জাতিপ্রথা টিঁকে থাকার আরও একটি বড় কারণ হল যে এখানে অসবর্ণ বিবাহের সুযোগ খুবই কম, কেননা অনাত্মীয় নারীপুরুষের মেলামেশার সুযোগ এখানে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, যেটুকু সুযোগ আছে তারও সদ্ব্যবহার করা প্রত্যেকের পক্ষে সম্ভব নয়, এমনকি পরিবার উদারপন্থী হলেও। মেটু বা জীবনসঙ্গী-সঙ্গিনী যোগাড় করাও একটা আর্ট, যাতে সকলে অভ্যস্ত নয়। কাজেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে, এমনকি উদারপন্থী পরিবারেও, ছেলে বা মেয়েকে বিবাহের জন্য অভিভাবকদের উপর নির্ভরশীল হতে হয়, এবং তাঁরা স্বাভাবিক কারণেই স্বজাতির মধ্য থেকেই পাত্র বা পাত্রীর সন্ধান করেন। ইদানীং আরও একটি সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে যা এক নূতন ধরনের জাতিপ্রথা গড়ে ওঠার ইঙ্গিতবহ। যুগ পরম্পরায় প্রচলিত জাতিকাঠামোয় সামাজিক মর্যাদার স্তরভেদ অবশ্যই বর্তমান, কিন্তু স্বাধীন ভারতে অর্থ ও পদকৌলিন্যের ভিত্তিতে সামাজিক মর্যাদার একটি নূতন স্তরভেদ গড়ে উঠেছে যা প্রচলিত জাতি-ব্যবস্থায় ছোট-বড় ভেদের চেয়ে অনেক বেশি নির্মম, কেননা এই নূতন ব্যবস্থায় ভেদের উপকরণ গুলিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়। প্রচলিত জাতিকাঠামোয় মর্যাদার ভেদ থাকলেও সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই, কিন্তু বর্তমানের র‍্যাংক ও স্ট্যাটাস চেতনা সেক্ষেত্রেও সম্মতি দেয়না। অন্যান্য দেশেও অর্থ ও পদকৌলিন্যের ভিত্তিতে সামাজিক স্তরভেদ বর্তমান, কিন্তু এখানে সেই পার্থক্য, সম্ভবত সমান্তরাল জাতিসংস্কারের প্রভাবেই, বিশেষ করে সমাজ কাঠামোর উপরতলায় এক ধরনের নূতন জাতিবিন্যাসের সূচনা করছে যেখানে কেবল মাসিক দশহাজারীর সঙ্গে দশহাজারীরই সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। আবার নীচের স্তরেও নূতন জাতি গড়ে ওঠার লক্ষণ দেখা যায়। কিভাবে নানা উপজাতির মানুষ জাতিতে পরিণত হয়েছে

তা আমরা আগে দেখিয়েছি। ভারতীয় ব্যবস্থায় আজও পর্যন্ত একমাত্র জাতিই কোন ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর সামাজিক স্বীকৃতির মাধ্যম। পশ্চিমবঙ্গের পটুয়াদের একাংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলেও তারা মুসলমান সমাজে সমমর্যাদা পায়না, আবার দেবদেবীর ছবি এঁকে পেট চালালেও তারা হিন্দু নয়। কাজেই তাদের সামাজিক অস্তিত্ব পটুয়া জাতি হিসাবেই। কোন কেন স্থানে যে সব হরিজনরা সম্প্রতি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে তারা প্রতিষ্ঠিত মুসলমান সমাজে স্থান পাবে না, তাদের সংগে অন্য শ্রেণীর মুসলমানরা বিবাহাদি সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করবে না, ফলে ভবিষ্যতে তারা টিঁকে থাকবে একটি জাতি হিসাবেই, পটুয়াদের মতই যে জাতি ধর্মে মুসলমান আচারে হিন্দু ১৯৬৩ সাল থেকে পশ্চিমবংগ সরকার যে খাদ্যনীতির প্রবর্তন করেন, এবং যা আজও বজায় আছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন গ্রামের অনেক দুস্থ পরিবারের মানুষজন—যাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই মানুষ আছে শহরাঞ্চলে বেআইনীভাবে চাল যোগান দেওয়ার পেশা গ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে একটা নূতন জাতি গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা গেছে, কেননা এই মানুষগুলির, দিবা রাত্রির অধিকাংশ সময় ট্রেনে বা স্টেশনে কাটার দরুন এবং এদের মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশি হবার দরুন, পুরাতন পারিবারিক ও সামাজিক জীবন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যেহেতু এই পেশাটি ঝুঁকিবহুল, যারা এই পেশায় নিযুক্ত তাদের মধ্যে সংহতিবোধ প্রবল। যৌন-নৈতিকতার দিক থেকে স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে কিছুটা শিথিলতা বর্তমান। এই পেশায় নিযুক্ত নারীদের সন্তানদের পিতৃ পরিচয় সর্বদা সুনির্দিষ্ট নয় বলেই এই সমাজে মাতৃপ্রাধান্য বর্তমান। একটা জাতিরূপে পরিচিত হওয়ার সকল পূর্বশর্তই এদের মধ্যে বর্তমান। পুরাতন জাতি ও ধর্মের পরিচয় এরা হারিয়ে ফেলেছে। তবে এদের মধ্যে আঞ্চলিক ভাগ আছে। এরা যে শীঘ্রই কোন জাতি-নাম গ্রহণ করে প্রচলিত জাতিকাঠামোয় স্থান পাবে এমন কথা এখানে বলা হচ্ছে না, তবে যেটা আমরা বলতে চাইছি তা হচ্ছে এই যে ভারতীয় সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবেশে নানা নূতন জাতি গড়ে ওঠার সম্ভাবনা এখনও বর্তমান।

৩ ॥ জাতিপ্রথা ও আর্যপ্রসঙ্গ

জাতিপ্রথা আর্যসভ্যতার দান এই রকম একটা ধারণা সকল মহলেই প্রচলিত আছে। এই ধারণাটির মূল কথা হল বাইরের কোন দেশ থেকে উন্নত মানের সভ্যতার অধিকারী আর্যজাতি একদা ভারতে প্রবেশ করেছিল, এবং

স্থানীয় অনার্য জাতিগুলিকে পরাজিত করে এখানে একটি উন্নততর সভ্যতার প্রসার ঘটিয়েছিল। এই যুক্তিকে প্রসারিত করে আরও বলা হয় যে এদেশে প্রাথমিক বর্ণভেদের প্রবর্তন হয় আর্যবর্ণ ও অনার্যবর্ণ (বিকল্পে দাসবর্ণ বা দস্যুবর্ণ) দিয়ে। একথাও বলা হয় যে চাতুর্বর্ণের প্রথম তিনবর্ণ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, আর্যবর্ণের অন্তর্গত, শূদ্রেরা অনার্য বা দাসবর্ণ। পরে অবশ্য এই সকল বর্ণের মধ্যে কিছুটা পারস্পরিক সংমিশ্রণ ঘটে, এবং এই সংকরত্বের ফলেই উপবর্ণসমূহের উদ্ভব হয়।

বহুল প্রচলিত এই মতবাদটির কিন্তু কোন ভিত্তি নেই, এবং সবচেয়ে বড় কথা আর্য নামক কোন জাতির বাস্তব অস্তিত্ব যে কোনদিন ছিল তার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নেই। এদেশে বৈদিক সাহিত্য নামে সুপ্রাচীনকালে রচিত একটি বিপুল সাহিত্য সম্ভার আছে যা থেকে আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষদের জীবনযাপন সম্পর্কে বহু তথ্য জানা যায়। বলা হয় যে এই বিপুল সাহিত্যসম্ভার আর্যদের সৃষ্টি, কিন্তু গোটা বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে এই বক্তব্যের সমর্থনে কোন ক্ষীণতম ইঙ্গিতও নেই। এই সাহিত্যের স্রষ্টা কারা ছিল, তারা কোন্ দেশ থেকে এসেছিল, তারা বেঁটে ছিল না লম্বা ছিল, কালো ছিল না ফর্সা ছিল, তা জানার কোন উপায় নেই। বৈদিক সাহিত্যে ও পরবর্তী-কালের সংস্কৃত সাহিত্যে অবশ্য আর্য শব্দটি নানা প্রসঙ্গে বহুবার উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু জাতি অর্থে আর্য শব্দটি কোথাও ব্যবহৃত হয়নি। আর্যজাতির অস্তিত্বের কোন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণও নেই।

ষোড়শ শতকে ফিলিপো সাসেটি নামক জনৈক ফ্লোরেন্সবাসী সংস্কৃতের সঙ্গে ইউরোপের কয়েকটি প্রাচীন ভাষার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছিলেন। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে স্যার উইলিয়াম জোন্স কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রদত্ত একটি ভাষণে সংস্কৃতের সঙ্গে বিভিন্ন প্রাচীন এশীয় ও ইউরোপীয় ভাষার একটি গঠনগত সাধারণ ভিত্তি প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেন, যা পরবর্তীকালে ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য নামে অভিহিত হয়। ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দটিকে একটি বিশেষ পারিভাষিক অর্থে সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেন প্রখ্যাত মিশরতত্ত্ববিদ টমাস ইয়ং। মোটামুটি ভাবে ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য শব্দটি কয়েকটি এশীয় ও ইউরোপীয় ভাষার গঠনগত সাদৃশ্যের দ্যোতক, বড় জোর যে শব্দটিকে একটি ভাষা-পরিবার অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে। এর সঙ্গে কোন জাতির সম্পর্ক নেই। ইতিহাসের কোন একটি নির্দিষ্ট যুগে এশিয়া ও ইউরোপের

নানাস্থানে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মানুষ এই ভাষা-পরিবারের অন্তর্গত ছিল এমন ধারণা করা যেতে পারে। ম্যাকস্মূলারের মত ভাষাতত্ত্ববিদ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে আর্যজাতি বলে কিছু হতে পারেনা, কোন নৃগোষ্ঠীকেই আর্য বলে চিহ্নিত করা যায় না, কেননা আর্য একটি ভাষা-পরিবারের নাম।

সে যাই হোক এই পরিবারের কয়েকটি ভাষার অস্তিত্ব ইউরোপে আবিষ্কৃত হবার ফলে (যদিও এই পরিবারের সর্বপ্রধান ভাষার সর্বপ্রাচীন প্রামাণ্যতম নিদর্শন ঋগ্বেদ) ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ তাঁদের সমকালীন স্বাজাত্যের প্রেরণায় এই ভাষাগুলিকে এমন কোন নৃগোষ্ঠীর সংগে সম্পর্কিত করতে চেয়েছিলেন যাদের দৈহিক লক্ষণ ইউরোপীয়দের অনুসারী, যাদের তাঁরা নামকরণ করেছিলেন নর্ডিক। এইভাবে একটি আর্যজাতির ধারণা গড়ে ওঠে এবং এমন একটা মতবাদ খাড়া করা হয় যে সুপ্রাচীনকালে ইউরোপের মূল অথবা প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এই সুসভ্য আর্যজাতি তৎকালীন পৃথিবীর নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তাদের উন্নততর সভ্যতার মাধ্যমে প্রাচ্যের অনুন্নত জাতিগুলিকে সভ্য করার দায়িত্ব নিয়েছিল, কিপলিং-এর ভাষায় যাকে বলা হয় হোয়াইট ম্যানস্ বার্ডেন। আসলে জাতিবিদ্বেষের জারকরসে চোবানো আর্য নামক আধসেঁকা ভাষাতাত্ত্বিক ধারণাটি উনিশ শতকের উপনিবেশবাদী ইউরোপীয় রাজনৈতিক স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে, এবং তার অনুশয় আজও বর্তমান। তাই ঐতিহাসিকদের প্রথম ও প্রধান চেষ্টা হয়ে দাঁড়ায় কোন্ কোন্ বিশেষ নৃগোষ্ঠীর মধ্যে এই ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের ভাষাগুলির সর্বাধিক বিকাশ ঘটেছিল তা নির্ধারণ করা, এবং তারই সূত্র ধরে মূল নৃগোষ্ঠীটিকে সনাক্ত করা, আর তাদের উৎপত্তিস্থল (অবশ্যই ইউরোপ) নির্ণয় করা। এই প্রতিযোগিতার প্রথম রাউণ্ডে জার্মান পণ্ডিতেরাই জিতে গিয়েছিলেন। তাঁরা এই ব্যাপারে এতদূর এগিয়ে গিয়েছিলেন যে ক্লাপ্রোথ ইন্দো-ইউরোপীয় এই পারিভাষিক শব্দটির বদলে ইন্দো-জার্মানীয় কথাটির ব্যবহার প্রবর্তন করেন।

যেহেতু আদি আর্য বা তথাকথিত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার সংগে ইউরোপের কয়েকটি দেশের সম্পর্ক ছিল, এবং যেহেতু ইউরোপীয়রা আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠতর, সেই হেতু আর্য নামক ধারণার সংগে শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাও ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়, যার ফলে তথাকথিত আর্যদের বংশধরত্বের দাবিদার হয়ে ওঠে অসংখ্য দেশ, ইউরোপীয় দেশগুলি তো বটেই, সেই সংগে ভারতবর্ষও। আর্য ধারণাটি বৃটিশ শাসনাধীন শিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত ভারতীয়দের

হীনমন্যতা দূরীকরণে কিছুটা সাহায্য করেছিল সন্দেহ নেই। উচ্চবর্ণের ভারতীয়রা ও তাদের তৎকালীন মালিক ইংরাজরা যে আসলে একই গাছের ফল এরকম একটা বিশ্বাস এদেশে সহজেই দানা বেঁধেছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রেও অতীত আর্য ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের আদর্শ নিঃসন্দেহে অনেক প্রেরণা জুগিয়েছিল। সেই হিসাবে আর্য শব্দটি এখানে আজও জনপ্রিয়, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রাচীন জীবনের যা কিছু ভাল দিক তা সবই নাকি ওই আর্য সভ্যতার দান, আর যা কিছু খারাপ সবই নাকি অনার্য! ইদানীং বাংলায় আর্যেতর নামক একটি শব্দের বহুল প্রচলন হয়েছে।

তথাকথিত এই আর্যদের প্রসঙ্গে তথ্যাবলীর সাহায্যে যেটুকু প্রতিপাদন করা সম্ভব তা হচ্ছে এই যে ইউরোপীয়, বিশেষ করে মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপীয় মানসিকতায় যে যুগ-অর্জিত জাতিবিদ্বেষ ও ভিন্ন নৃগোষ্ঠীকে বলপূর্বক নির্বংশ করার প্রবণতা বিশেষভাবে বিদ্যমান, আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে একদিকে সেমেটিক ও শ্লাভ বিদ্বেষ (যদিও শেষোক্তরা আর্য ভাষা পরিবারেরই অন্তর্গত) এবং অপরদিকে অন্য চার মহাদেশের পদানত জাতিসমূহের প্রতি যে বিদ্বেষ বর্তমান, তারই অভিব্যক্তি হিসাবে আর্য নামক ধারণাটিকে রাজনৈতিক প্রয়োজনেই সাদরে বরণ করে নেওয়া হয়েছিল। হ্যাপসবুর্গ রাজতন্ত্রের অধীন পূর্ব ও দক্ষিণ ইউরোপের নৃগোষ্ঠী ও ভাষাগোষ্ঠীসমূহ পশ্চিম ইউরোপের চোখে বরাবরই নিকৃষ্ট হিসাবে গণ্য হত। সেমেটিক বিদ্বেষ ছিল ইউরোপের মজ্জাগত। প্রোটেস্টান্ট মতের প্রবক্তা মার্টিন লুথার ছিলেন প্রচণ্ড ইহুদী-বিদ্বেষী। কোন রকম ভনিতা না করেই তিনি লিখেছেন যে ইহুদীদের মেরে নির্বংশ করতে হবে, তাদের টাকাকড়ি, ধনরত্ন, সোনাদানা, বাজেয়াপ্ত করতে হবে, তাদের সিনাগগ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুড়িয়ে দিতে হবে, এবং ঘরদোর ভেঙে তছনছ করে তাদের বরাবরের জন্য জিপসীতে পরিণত করতে হবে। হিটলারের আর্যপ্রভুত্ব মতবাদের এবং ইহুদীনিধন পরিকল্পনার উৎস আসলে এই লুথারীয় চিন্তাধারা, যদিও হিটলার ক্যাথলিক ছিলেন এবং যদিও লুথারের সময়ে আর্য শব্দটির ব্যবহার ছিল না। আসলে আর্য শব্দটি ইউরোপীয় যুগ অর্জিত 'শ্রেষ্ঠ জাতির' প্রতীক, যে-জাতি অপকৃষ্ট জাতিদের বলপূর্বক উৎসাদন করে নিজস্ব কল্পরাজ্য তৈরি করবে। একা হিটলারই এই ধারণা পোষণ করতেন না।

বস্তুত হিটলার যে নীতি কার্যকর করেছিলেন, তাঁর সমকালীন ও পূর্ব-

বর্তী অনেক লেখক ও দার্শনিক অনুরূপ চিন্তা করেছিলেন, এবং তাঁদের রচনাসমূহের সঙ্গে হিটলারের পরিচয় ছিল। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক ইওহান গোটলীব ফিখ্‌টে প্রচার করেন যে ল্যাটিনরা, বিশেষ করে ফরাসীরা, ও ইহুদীরা অবক্ষয়ী জাতি, এবং জার্মানরাই একমাত্র জাতি হিসাবে বিশুদ্ধ। তাঁর উত্তরাধিকারী ভিলহেলম ফ্রীডরিখ হেগেলও জার্মান জাতির বিধিনির্দিষ্ট শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাস করতেন। এ বিষয়ে শুধু জার্মান লেখকরাই অগ্রণী ছিলেন না। ফরাসী লেখক কাউন্ট জোসেফ আর্থার গোবিনোর মতে নৃগোষ্ঠীগত প্রশ্ন ইতিহাসের সকল সমস্যার নিয়ামক। শ্বেত, পীত ও কৃষ্ণ এই তিন প্রাচীন নৃগোষ্ঠীর মধ্যে শ্বেতরাই শ্রেষ্ঠ, কারণ ইতিহাস দেখায় যে সাদা মানুষদের থেকেই সকল সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে, এবং এই নৃগোষ্ঠীর সহায়তা ব্যতিরেকে কোন সভ্যতাই দাঁড়াতে পারে নি। আর্যরা এই শ্বেত নৃগোষ্ঠীর রত্নস্বরূপ, তবে তাঁর মতে পূর্ব ইউরোপের আর্যজাতি বর্ণ-সংকরদোষে দুষ্ট এবং সেই হিসাবে বিশুদ্ধ নয়। একমাত্র পশ্চিম ইউরোপেই আর্যজাতি নিজস্ব রক্তের বিশুদ্ধতা বজায় রেখেছে। ইংরাজ লেখক হাউস্টোন স্টিউয়ার্ট চেম্বারলেন নানা যুক্তি প্রয়োগে টিউটন বা জার্মান জাতিকেই আর্যত্বের বিশুদ্ধ গুণাবলীর ধারক বলে বর্ণনা করেছেন।

হিটলারের হাজার বছর ব্যাপী আর্য-রাইখের স্বপ্ন সফল না হলেও ইউরোপীয় মানসে সঞ্চারিত আর্য নামক রাজনৈতিক প্রয়োজনসিদ্ধির হাতিয়ারের ভূত এমন গভীরভাবে চেপে আছে যে পণ্ডিতেরা এখনও পর্যন্ত আর্যপ্রসঙ্গ নিয়ে প্রচুর মাতামাতি করেন। প্রত্নতত্ত্ববিদরা একবাক্যে বলেন যে আর্যজাতির অস্তিত্ব সংক্রান্ত কোন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ নেই, অথচ এ বিষয়ে একেবারে সংস্কারমুক্ত হতে সাহস করেন না। ভারতের ক্ষেত্রে, মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার কয়েকটি উৎখনিত জনবসতির কিছু বৈশিষ্ট্যকে তাঁরা আর্য বৈশিষ্ট্য হিসাবে ধরে নিয়েছেন এবং ভারতবর্ষের প্রত্নতাত্ত্বিক কেন্দ্রসমূহে অনুরূপ কোন বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পেলে তাঁরা সেগুলিকে আর্য অধিকারের নিদর্শন হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। উত্তর ও দক্ষিণ বালুচিস্তানের কয়েকটি প্রত্নক্ষেত্রে, সিন্ধুপ্রদেশের আম্রী, ছানহুদরো, ঝুকর, মোহেনজোদারো প্রভৃতি স্থানে, হরপ্পার 'সিমেট্রি এইচ' সমাধিক্ষেত্রে ও আরও নানা অঞ্চলে খননকার্যের দ্বারা উদ্ঘাটিত পুরাতন সংস্কৃতিগুলির উপর কয়েকটি আগন্তুক সংস্কৃতির পরিচয় আবিষ্কৃত হয়েছে, হাতিয়ার ও মৃৎপাত্রের ক্ষেত্রে যেগুলি একটি ভিন্ন পরিচয় বহন করে। এই আগন্তুক এবং অপকৃষ্ট সংস্কৃতিগুলিকে আর্য হিসাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা

হয়েছে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রত্নতত্ত্ববিদদের মধ্যে কোন ঐক্যমত পরিলক্ষিত হয় না, এবং তাঁরাও কেউ এই বিষয়ে জোরের সংগে দাবি করেন না। আমরা আগেই দেখেছি যে ভারতীয় নৃগোষ্ঠীসমূহের ক্ষেত্রে সর্বত্রই মেডিটারেনিয়ান ও অস্ট্রালয়েড উপাদানের প্রাধান্য, পূর্বোত্তরাঞ্চলে কিছু মঙ্গোলয়েড উপাদান আছে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, কাফিরিস্থানে ও চিত্রলে ফর্সা ও দীর্ঘাকার মানুষ দেখা যায়, যাদের কেউ কেউ নর্ডিক আখ্যা দিয়েছেন। শেষোক্তদের চেহারাকে যদি আর্যত্বের বৈশিষ্ট্য হিসাবে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে বলতে হয় তারা এখানকার মোট জনসংখ্যার শতকরা একভাগও নয়। আর্য নামক ধারণাটির সত্যিই কোন সার্থকতা ভারত ইতিহাসের ক্ষেত্রে নেই। (এ বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনার জন্য মৎ-রচিত "প্রাগৈতিহাসিক ভারতবর্ষ" দ্রষ্টব্য, যেখানে আর্য-প্রসঙ্গ সাম্প্রতিক গবেষণাসমূহের সার-সংকলন করা হয়েছে, যা উপরিউক্ত বক্তব্যের স্বপক্ষেই সাক্ষ্য দেয়)।

প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানসমূহের ফলে একটা ধারণা অবশ্যই স্পষ্ট হয়েছে যে প্রত্নাশ্মীয় যুগ থেকে ভারতবর্ষে বরাবরই জনবসতি ছিল এবং এখানে স্বাভাবিক নিয়মেই তাদের মধ্যে, সমভাবে না হলেও, সংস্কৃতির উন্নততর পর্যায়সমূহে উত্তরণ ঘটেছিল। এখানে জাতিপ্রথা গড়ে ওঠার মূলে প্রধানত পেশাদারী শ্রমবিভাগ এবং জনজীবনের অসম বিকাশই দায়ী। জাতিপ্রথা গড়ে উঠেছে দীর্ঘ সামাজিক বিবর্তনের ফলে, ইতিহাসের মধ্য এবং আধুনিক যুগেও অসংখ্য নূতন জাতির সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই এই প্রথাকে ব্যাখ্যা করার জন্য বা এই প্রথার উৎস খুঁজে বার করার জন্য কোন কল্পিত আর্যজাতিকে টেনে আনার দরকার নেই। সুবিশাল বৈদিক সাহিত্য সম্পর্কে বলা চলে যে সেটা প্রাচীন ভারতীয়দের সৃষ্টি, এবং তার সংগে কোন নৃগোষ্ঠীকে সংযুক্ত করার কোন সংগত কারণ নেই।

৪ ॥ জাতিপ্রথা ও সামন্ততন্ত্র

ইংরাজী ফিউডালিজমের কোন পরিভাষা সংস্কৃত অথবা বাংলা ভাষায় নেই। এর কারণ ফিউডাল সিস্টেম বলতে ইউরোপে যা বোঝাত অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠান এদেশে গড়ে ওঠেনি। সামন্তপ্রথা বা সামন্ততন্ত্র কথাটি সম্পূর্ণ হাল আমলের, যে শব্দটির দ্বারা জমিদার জোতদার প্রভাবিত একটা কৃষিভিত্তিক অনগ্রসর সমাজব্যবস্থাকে বোঝানো হয়, মধ্যযুগের ইউরোপীয় ফিউডাল সিস্টেমের একটা ঝাপসা ধারণাকে চোখের সামনে রেখে। ইদানীং রাজনৈতিক

দলগুলির কৃপায় সামন্ততন্ত্র কথাটি খুবই চালু হয়েছে, কাজেই আমরাও ওই শব্দটি ব্যবহার করব। সংস্কৃতে সামন্ত শব্দটি বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে যে অর্থটা মাটির কাছাকাছি তা হচ্ছে 'প্রতিবেশী'।

আগের যুগের ঐতিহাসিকেরা ছাত্রাবস্থায় ইউরোপের, বিশেষ করে ইংলণ্ডের, ইতিহাস পাঠ করেছিলেন, এবং তখনই ফিউডাল সিস্টেম নামক ব্যবস্থাটির সংগে পরিচিত হয়েছিলেন, বিশেষ করে ইংলণ্ডে নর্মান বিজয়ের কাহিনী পাঠকালে। পরে যখন তাঁরা ভারত ইতিহাসের নানা অধ্যায় নিয়ে গবেষণা করেন, বা বই লেখেন, বিশেষ করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, অথবা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি নিয়ে, তখন তাঁরা নির্দ্বিধায় এবং সাদামাটা ভাবে ফিউডালিজম শব্দটি ব্যবহার করেন যে কোন মধ্যযুগীয় অবস্থাকেই বোঝানোর জন্য। যা যথেষ্ট আধুনিক নয় তাকেই ফিউডাল বলে অভিহিত করা হয়েছে। কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল, নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বেণী প্রসাদ, উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল প্রভৃতি যাঁরা হিন্দু রাষ্ট্রতন্ত্র, অর্থনীতি, রাজস্বপ্রথা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে লিখেছেন তাঁরা নানাস্থানেই ইচ্ছামত ফিউডাল শব্দটি ব্যবহার করেছেন, অবশ্য খুবই ব্যাপক অর্থে, এবং তা কোন সমস্যার সৃষ্টি করেনি।

ভারতবর্ষে ভূম্যধিকারের প্রশ্ন নিয়ে অবশ্য পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এখানকার ইংরাজ শাসকেরা ভূমিসংক্রান্ত আইন প্রণয়নের ব্যাপারে প্রমাণ করতে উৎসুক ছিলেন যে প্রাচীন ভারতে ভূমির উপর রাজার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। সার হেনরি মেইন, গিয়র্গ বুহ্লার, ই. ডাব্লিউ হপকিন্স, আর্থার ম্যাকডোনেল, এ. বি. কিথ, ভিনসেন্ট স্মিথ প্রভৃতি প্রাচ্যবিদগণ এটা প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেন যে ভূমি এদেশে চিরকালই রাজকীয় সম্পত্তি ছিল। পক্ষান্তরে পিং এন. ব্যানার্জী, কে. পি. জয়সোয়াল প্রমুখ জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা এই ধারণার বিরোধিতা করেন। প্রথমোক্ত পণ্ডিতেরা মনুস্মৃতি থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে দেখাতে চান যে যেহেতু জনগণের রক্ষাকর্তা হিসাবে রাজা নরদেহে ঈশ্বরতুল্য সেই হেতু তিনিই সকল ভূমির একমাত্র বৈধ মালিক। শেষোক্ত পণ্ডিতেরা জৈমিনীর মীমাংসাসূত্রের শবরভাষ্য, ব্যবহারময়ূখ প্রভৃতি গ্রন্থের সাক্ষ্য থেকে প্রতিপাদন করতে চান যে ভূমির ক্ষেত্রে রাজার মালিকানা ভারতীয় ঐতিহ্যে স্বীকৃত নয়, এবং যদিও রাজা ভূমির উপর কর ধার্য করতে পারেন, কিন্তু কোন বিশেষ ভূমিখণ্ডের অধিকার তাঁকে পেতে গেলে তা ওই ভূমির যথার্থ মালিকের কাছ থেকে তাঁকে

ক্রয় করতে হবে। ভারতবর্ষে ফিউডালিজম বা সামন্ততন্ত্র নিয়ে আলোচনার কালে ভূমির উপর রাজার মালিকানা সংক্রান্ত এই প্রশ্নটি পণ্ডিতেরা বারবার উত্থাপন করেছেন, কিন্তু সেটা যে কেন করা হয়েছে বর্তমান লেখকের কাছে তা বোধগম্য নয়।

অনেকের সহজ বক্তব্য, যখন জমি ছিল, জমির উপস্বত্বভোগী ছিল, জমিদার ছিল, প্রজা ছিল, কৃষক ছিল এবং জমিদারদের নিপীড়নও ছিল, তখন ধরেই নিতে হবে ভারতবর্ষে ফিউডালিজম বা সামন্ততন্ত্র ছিল। বস্তুতই, যে জনপ্রিয় সংজ্ঞাটি আগে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ "জমিদার-জোতদার প্রভাবিত কৃষিভিত্তিক অনগ্রসর সমাজব্যবস্থা", তাই যদি সামন্ততন্ত্র বা ফিউডালিজমের প্রকৃত সংজ্ঞা বলে মেনে নেওয়া হয় তাহলে একথা বলতে অসুবিধা নেই যে ভারতবর্ষেও এই প্রথা বর্তমান ছিল। অন্তত বর্তমান শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই রকম একটি ধারণা বিরাজিত ছিল, এবং এখনও আছে। কিন্তু প্রসঙ্গটির গুরুত্ব কিছুকাল পূর্ব থেকে হঠাৎ খুব বেশি বেড়ে গেছে, বিশেষ করে যখন থেকে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণে ভারত-ইতিহাস ব্যাখ্যা করার প্রবণতা গভীরভাবে উপলব্ধ হয়েছে। মার্কসীয় দৃষ্টিকোণে ভারত ইতিহাস ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা যে আগে হয়নি তা নয়। মানবেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীপদ অমৃত ডাঙ্গে, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি মার্কসবাদীরা এই জাতীয় প্রচেষ্টা করেছিলেন, তবে তাঁরা রাজনীতির জগতের মানুষ হওয়ায়, এবং তাঁদের রচনাবলীতে ঐতিহাসিক তথ্যের চেয়ে রাজনৈতিক তত্ত্ব বেশি হওয়ায়, তাঁদের প্রচেষ্টা খুব একটা ফলদায়ক হয়নি।

পাঁচের দশকের মাঝামাঝি থেকেই অনেক ঐতিহাসিক মার্কসীয় দৃষ্টিকোণে তথ্যাবলীর বিশ্লেষণকে তাঁদের গবেষণার পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করেন, এবং এক্ষেত্রে যিনি অগ্রগণ্য ভূমিকা নেন তিনি হচ্ছেন দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী। তাঁকে অনুসরণ করে অনেকেই এই পদ্ধতি অবলম্বন করেন। মার্কস-কথিত ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী, সমাজবিকাশের ইতিহাসে ফিউডালিজম বা সামন্ততন্ত্র একটি সর্বজাগতিক, গুরুত্বপূর্ণ এবং অবশ্যম্ভাবী পর্যায়। এই সামন্ততন্ত্রের স্ববিরোধিতার মধ্যেই পুঁজিবাদের জন্মবীজ নিহিত, এবং এরই ধ্বংসস্তূপের উপর পুঁজিবাদের বিকাশ, যদিও সামন্ততন্ত্রের বিনাশ একই সময়ে সর্বত্র হয়নি। কাজেই ভারত-ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে—যেখানে ধরে নেওয়া হয় সামন্ততন্ত্রের বিলোপ এখনও পুরোপুরি ঘটেনি—সামন্ততন্ত্র নামক বিশেষ পর্যায়টিকে বোঝার বিশেষ প্রয়োজন থাকাই

বাঞ্ছনীয়, অবশ্য যদি তেমন কোন পর্যায আদৌ থেকে থাকে। সামন্ততন্ত্র সম্পর্কে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণে আলোচনায় সূত্রপাত কবেন অধ্যাপক কোশাম্বী যিনি এদেশে একটি দ্বিস্তর—উপর ও নীচ থেকে—সামন্ততান্ত্রিক বিকাশের তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন, অবশ্যই অনুমানমূলকভাবে। পরবর্তীকালে এই কাজে অগ্রসর হন ডঃ রামশরণ শর্মা যিনি ইন্ডিয়ান ফিউডালিজম নামক অতি সুলিখিত গ্রন্থে বিষয়টি পর্যালোচনা করেছেন। এদেশে সামন্ততন্ত্র বরাবরই ছিল এই বক্তব্য প্রতিপাদন করার মানসেই ডঃ শর্মা কলম ধরেছিলেন এবং সন্দেহ নেই যে প্রভূত পরিশ্রমে তিনি অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শর্মাজী প্রাপ্ত তথ্যাবলী থেকে এমন কিছু পাননি যা থেকে এদেশে সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। ফলে সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য তিনি সামন্ততন্ত্রের সংজ্ঞাই বদলে দিয়েছেন "এ সোসিও-ইকনমিক ফর্মেশন" বা 'সামাজিক-অর্থনৈতিক সংঘটন' বলে। তাঁর নিজের ভাষায়, "হরেক রকম সমাজতন্ত্রী যেমন সমাজতন্ত্রের হরেক রকম সংজ্ঞা দিয়ে থাকেন, ঠিক তেমনই সামন্ততন্ত্রের সংজ্ঞা এক এক পণ্ডিতের কাছে এক এক রকম।" তাঁর মতে রাজা বা শাসকেরা তাঁদের কর আদায়ের অধিকার দান হিসাবে যারা ভূমিলাভ করেছে এমন ব্যক্তিদের হস্তান্তর করার ফলে একটি জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল। এই জমিদার প্রভাবিত সামাজিক অর্থনৈতিক সংঘটনের বৈশিষ্ট্য ছিল কৃষকদের পরাধীনতা, স্বয়ং-সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক এককসমূহ, বাণিজ্যের অবক্ষয়, মুদ্রার সংখ্যাল্পতা এবং ছোট ধরনের ভোগ্যপণ্য উৎপাদন।

কিন্তু যে কোন মনগড়া সংজ্ঞাকেই ফিউডালিজম আখ্যা দেওয়া যায় না। জমি, জমিদার ও ভূমিনির্ভর অর্থনীতি থাকলেই সেক্ষেত্রে ফিউডাল বিশেষণ একান্তই অপ্রাসঙ্গিক। প্রচুর পরিশ্রম করে ডঃ শর্মা যে তথ্যাবলী সংগ্রহ করেছেন এবং সেগুলি নানা অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করেছেন তার শতকরা নিরানব্বই ভাগই হচ্ছে রাজা বা শাসকগণ কর্তৃক ধর্মার্থে ব্রাহ্মণদের ভূমিদান, যার সঙ্গে প্রকৃত ফিউডাল ব্যবস্থার কোন সাদৃশ্যই খুঁজে পাওযা যায় না। একথা সত্য যে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণকে ধর্মার্থে ভূমিদানকালে রাজারা পূর্বে ওই ভূমি-ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে যে কর পেতেন সেই কর সংগ্রহ ও ভোগ করার অধিকার দান গ্রহীতাদের দিয়েছিলেন। এই যুক্তিকে আরও একটু টেনে নিয়ে না হয় বলা গেল দান হিসাবে পাওয়া এই সব জমির ব্রাহ্মণ মালিকদের কেউ কেউ জমিদার হয়েছিলেন। কিন্তু যে কোন ধরনের জমিদারী প্রথাই সামন্তপ্রথা নয়, এবং দুটি ব্যবস্থাকে গুলিয়ে ফেলারও

কোন কারণ নেই। ডঃ শর্মা যদি প্রাপ্ত দানলেখসমূহ থেকে অন্তত পাঁচ শতাংশও ধর্মনিরপেক্ষ দানলেখ খুঁজে পেতেন যেখানে প্রদত্ত ভূমির ক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে কিছু বাধ্যবাধকতার সম্পর্ক বর্তমান, তা হলেও না হয় কথা ছিল।

আসলে যে কথাটা অনেকেই এড়িয়ে গেছেন তা হচ্ছে এই যে জাতিপ্রথা যেমন ভারতীয় সমাজের একটি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য, অন্যদেশে সামাজিক শ্রেণী বিভাগ ও পেশাভেদ থাকলেও যেমন সে-সকল দেশে জাতিপ্রথার মত অন্তর্বিবাহ এবং নিজস্ব সামাজিক আইনকানুন ও আচার অনুষ্ঠানের দ্বারা গণ্ডীবদ্ধ বিভিন্ন পেশাদার গোষ্ঠীর বিচ্ছিন্ন সহাবস্থানের পরিচয় পাওয়া যায়না, তদনুরূপ ফিউডাল সিস্টেম বা সামন্ততন্ত্র মধ্যযুগের ইউরোপের একটা একান্তই নিজস্ব ব্যাপার, জাতিপ্রথার মতই তা একটি স্বতন্ত্র সামগ্রিক জীবনধারা যা খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্র অনুমোদিত। ফিউডালিজম শব্দটি এসেছে ল্যাটিন ফিউদুম থেকে যার অর্থ এমন কোন জমির টুকরো যার অধিকারীকে কয়েকটি বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে হয়। এই হিসাবে কোন জমি বা জমির স্বত্ব, যা এক পক্ষের অধিকার ও সুবিধা এবং অপরপক্ষের বাধ্যবাধকতা ও কর্তব্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, বাস্তব ফিউডাল প্রথার গোড়ার কথা। এই প্রথায় রাজা সব জমির মালিক। তাঁর কাছ থেকে বড় বড় ব্যারণ বা প্রধান সামন্তরা —তাঁরা যাজকও হতে পারেন, সম্ভ্রান্তও হতে পারেন—জমির অধিকার পান। বিনিময়ে রাজা তাঁদের কাছ থেকে কর ও যুদ্ধকালে নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্যের যোগান পাবার অধিকারী। প্রধান ব্যারণগণ আবার অনুরূপ শর্তে তাঁদের জমিগুলি ছোট ব্যারণদের মধ্যে ভাগ করে দেন। এই ভাবে শর্তাধীনে ভাগ হতে হতে সর্বশেষ পর্যায়ে জমি যাদের হাতে চাষের জন্য আসে, তাদের কোন জমির মালিকানা থাকে না। তারা নিছকই ভূমিদাস সার্ফ বা ভিলেন। গোটা ব্যবস্থাটা হচ্ছে একটা পিরামিডের মত, চুড়ায় রাজা, তাদের নীচে প্রধান সামন্তগণ (টেনান্টস-ইন-চীফ), তার নীচে ছোট সামন্তরা (সাব-টেনান্টস), তার নীচে আরও ছোটরা (মেন-টেনান্টস) এবং সর্বনিম্নে ভূমির মালিকানাহীন ভূমিদাসেরা।

এই প্রথাকে যুক্তিসিদ্ধ করা হয়েছিল এইভাবে : প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত ও সম্পত্তিগত নিরাপত্তার প্রয়োজন। এই নিরাপত্তা ছোট জমির মালিক পেতে পারে বড় জমিদারের আশ্রিত হয়েই, জমিদাররা বড় বড় সামন্তের আশ্রিত হয়েই, বড় বড় সামন্তরা রাজার আশ্রিত হয়েই, জমির অধিকার মানেই মানুষ

ও সম্পদের উপর অধিকার, যা নিরাপত্তা ও প্রতিরোধের প্রয়োজনে ব্যয় করা যায়। এই জমির অধিকারকে ধারাবাহিক আনুগত্যের দ্বারাই বজায় রাখা যায়, ছোট বড়র অধীন, বড় তার চেয়েও বড়র অধীন, বৃহত্তর বৃহত্তমের অধীন। এমনকি রাজাও কাগজ-কলমে পোপের সামন্ত, কেননা তাঁর জাগতিক অধিকারের ইজারা পোপের আধ্যাত্মিক অধিকারের থেকেই। স্বয়ং পোপও খ্রীস্টের সামন্ত, এবং খ্রীস্ট খোদ-ঈশ্বরের। একজনকে তার উপরজনের প্রভুত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে গীর্জা সাক্ষী করে স্বীকার করতে হত। পক্ষান্তরে প্রভুকেও গীর্জা সাক্ষী করে অধীনস্থের রক্ষকতার প্রতিশ্রুতি দিতে হত। তখনকার দিনের প্রচলিত কথাই ছিল ঃ "প্রভু ব্যতিরেকে কোন মানুষের অস্তিত্ব নেই। মানুষ ব্যতিরেকে কোন প্রভুর অস্তিত্ব নেই। প্রভুহীন মানুষ মানেই ভূমিহীন মানুষ। সে সমাজবর্জিত, কেননা সে রক্ষকবিহীন।"

ভারতবর্ষের সমাজ জাতিপ্রথা ভিত্তিক, যার সঙ্গে মধ্যযুগের ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের কোন সাদৃশ্যই নেই। জাতিপ্রথা এবং সামন্ততন্ত্রের আদর্শ পরস্পরবিরোধী। ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের মূল তত্ত্ব হচ্ছে একটি পবিত্র দায়বদ্ধতা বা ওবলিগেশন, এবং তা ব্যক্তির প্রতি। ঈশ্বরের ক্ষমতা যেমন পোপে হস্তান্তরিত, পোপের জাগতিক ক্ষমতা যেমন রাজায় হস্তান্তরিত, রাজার ক্ষমতা তেমনই সামন্তদের উপর হস্তান্তরিত—এই ভাবে প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিকট দায়বদ্ধ, যেখানে প্রজা তার মনিবের জন্য শ্রমদান করতে বাধ্য, মনিবও বিনিময়ে তাকে রক্ষা করতে বাধ্য, বিভিন্ন মাপের জমিদার বা সামন্তরা তাদের উপরওয়ালাকে বা রাজাকে অর্থ, লোকবল প্রভৃতির যোগান দিতে বাধ্য, বিনিময়ে রাজা তাদের অধিকারসমূহ রক্ষার জন্য ধর্মীয় শপথের দ্বারা অঙ্গীকারবদ্ধ। ভারতবর্ষেও রাজারা যে ভূদান করেননি তা নয়। কিন্তু সে দান প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ধর্মার্থে, নিছকই পুণ্যলাভের আশায়, এবং কোন ক্ষেত্রেই গ্রহীতা দাতার নিকট কোন বাধ্যবাধকতার দায়ে আবদ্ধ নয়। এমন কোন ভূমিদান-লেখের উল্লেখ পাওয়া যায়না যেখানে রাজা কর ও সামরিক সাহায্যলাভের বিনিময়ে ভৌম অধিকার হস্তান্তরিত করেছেন। আসলে শর্মাজীরা ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের দার্শনিক দিকটাকে উপেক্ষা করেছেন, যে দায়বদ্ধতার তত্ত্ব আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। সে তত্ত্বের প্রয়োগক্ষেত্র ভারতবর্ষ নয়। এখানকার জাতিসমাজের আদর্শ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এখানে কৌলিকবৃত্তি অনুসরণই জাতির ধর্মরূপে বিবেচিত, এবং এক্ষেত্রে কোন হস্তক্ষেপ বা দায়বদ্ধতার প্রশ্ন নেই। এখানে রাজাই সকলের রক্ষক, এবং সেই হিসাবে তাঁর কর্তব্য প্রতিটি

জাতির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র রক্ষা করা। এই রক্ষকতার মজুরি হিসাবেই তিনি কর-স্বরূপ উৎপাদনের ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করার অধিকারী।

ভারতবর্ষের আবাদযোগ্য জমির প্রাচুর্যের দরুন, জমির উপর মালিকানার প্রশ্ন বহুলাংশেই ছিল গৌণ। ইউরোপে ভূমির মালিকানার ব্যাপারটা যেমন সুনির্দিষ্ট ছিল এখানে তেমন ছিলনা। এখানে ভূমিব্যবস্থা এক এক অঞ্চলে এক এক রকম, মালিকানার ধরনও ছিল তাই। এমনকি বর্তমান শতকের গোড়ার দিকেও কোন কোন জায়গায় আবাদী জমি সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হত না। সেই জমিতে যে বা যারা ফসল উৎপন্ন করত, সে বা তারা সেই ফসলের মালিক হত। অনেক ক্ষেত্রে পতিত জমি চাষ করলে বা জঙ্গল 'হাসিল' করে চাষযোগ্য জমি বার করতে পারলে সেই জমির মালিকানা পেতে অসুবিধা হত না। ভারতবর্ষের বহু স্থলেই জমি যৌথ পারিবারিক সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হত, যার উপর কোন ব্যক্তির মালিকানা থাকত না। ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের একটি প্রধান বনিয়াদ ছিল জ্যেষ্ঠের অধিকার, অর্থাৎ বড় ছেলেই সকল সম্পত্তির মালিক, যাকে বলে ডকট্রিন অফ প্রাইমোজেনিচার। এর ফলে সম্পত্তি বা জমিদারীর উপর বরাবর অখণ্ড অধিকার বজায় রাখা যেত। বস্তুত এই কারণে আজও ইউরোপে অনেক মধ্যযুগীয় জমিদারী বর্তমান। ভারতীয় উত্তরাধিকার-বিধি সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে প্রভুর সঙ্গে অধীনস্থের দায়বদ্ধতা কিভাবে থাকবে, যেখানে প্রভুরাই খণ্ডিত থেকে খণ্ডিততর হয়ে যায়? এদেশেও জমিদারী-প্রথা ছিল, কেননা যেখানেই ভূমিনির্ভর অর্থনীতি, সেখানেই ভূমির উপস্বত্ব-ভোগী একটি কায়েমী স্বার্থ গড়ে উঠতে বাধ্য। কিন্তু জমিদারদেরও জাতি-প্রথার নির্দেশসমূহ মানতে হত। জমিদারের ক্ষমতা ছিলনা একজাতির মানুষকে দিয়ে অন্যজাতির মানুষের কাজ করানো, যেমন নাপিতকে দিয়ে ডোমের কাজ করানো অসম্ভব ছিল। ফলে প্রত্যেক জমিদারকেই তাঁর এলাকার মধ্যে এমন অনেক পেশাদার জাতিকে পুষতে হত যারা ছিল অনুৎপাদক, অথচ যাদের কাজের সামাজিক প্রয়োজন ছিল। ফলে ভারতীয় ব্যবস্থায় প্রজার শ্রমের উপর অবাধ অধিকার জমিদারের ছিল না।

জাতিপ্রথার সঙ্গে ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের আপাত সাদৃশ্য দুই ক্ষেত্রে দেখা যায়। দুটি প্রথাই স্থানীয় ধর্মব্যবস্থার অনুমোদন পেয়েছিল। হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ জাতিবর্ণপ্রথাকে এত গভীরভাবে সমর্থন করেছে যে এই প্রথা হিন্দুত্বের প্রায় সমার্থক হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে খ্রীষ্টধর্ম ও তার বিরাট সংগঠন সামন্ততন্ত্রের প্রতি বিপুল সমর্থন জ্ঞাপন করেছে। ধর্মীয় অনুমোদন

ছাড়া আর যে ক্ষেত্রে উভয় প্রথার সাদৃশ্য তা হচ্ছে হায়ারার্কি, অর্থাৎ ক্ষমতা, মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠার স্তরভেদ। আসলে হায়ারার্কি কথাটির যোগ্য প্রতিশব্দ বাংলায় নেই। আদিতে এই শব্দটি খ্রীষ্টীয় গীর্জার অন্তর্গত যাজকদের ক্ষমতা ও মর্যাদার স্তরভেদ সূচনা করত, যাজকসম্প্রদায়ের বিভিন্ন পদাধিকারীর ছোট-বড় ভেদ এই শব্দটির দ্বারা বোঝানো হত। পরে এই শব্দটি সামাজিক ভেদাভেদ এবং বিভিন্ন মর্যাদার সামাজিক শ্রেণীপরম্পরা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে। জাতিপ্রথার মধ্যেও একটি হায়ারার্কি বিদ্যমান। জাতিসমাজের যে কাঠামো তাতে বিভিন্ন মর্যাদার সামাজিক শ্রেণীপরম্পরা বর্তমান, যার বিভিন্ন স্তর বিভিন্ন জাতি নিয়ে গঠিত। কিন্তু ফিউডাল-হায়ারার্কির সঙ্গে কাস্ট-হায়ারার্কির মধ্যে একটি গুরুতর বিষয়ে পার্থক্য বিদ্যমান। প্রথম ক্ষেত্রে নিম্নরা উচ্চদের অধীন, উচ্চরা উচ্চতরদের অধীন, উচ্চতররা উচ্চতমদের অধীন এবং একের সংগে অপরের সম্পর্কের মধ্যে নানাপ্রকার দায়িত্ব ও কর্তব্যের বাধ্যবাধকতা বর্তমান। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ জাতিপ্রথার ক্ষেত্রে কোন জাতিই কোন জাতির অধীন নয়, প্রতি জাতিই স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম, এক জাতির প্রতি অপর জাতির যেটুকু বাধ্যবাধকতা তা একান্তই সামাজিক এবং কয়েকটি সুনির্দিষ্ট সামাজিক প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ। এক্ষেত্রে পার্থক্য ও স্তরভেদ শুধুমাত্র মর্যাদার।

ফিউডালিজম যেমন মধ্যযুগের ইউরোপের একটা সার্বিক জীবনচর্যার প্রকাশ, ভারতের ক্ষেত্রে জাতিপ্রথাও তাই। একের সঙ্গে অপরের আকার ও বিষয়-বস্তুর পার্থক্য মৌলিক। এই কারণেই ভারতীয় পরিস্থিতিতে ফিউডালিজম বা সামন্ততন্ত্র শব্দটির ব্যবহার অবাঞ্ছনীয়, যদিও ভারতবর্ষের অর্থনীতি আজও পর্যন্ত ভূমি নির্ভর এবং যদিও ভূমির ক্ষেত্রে এখানে বরাবরই একটা কায়েমী স্বার্থ বর্তমান। তা বলে যে কোন ধরনের জমিদারী প্রথাকেই সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা অনুচিত। তবে মার্কব্লক প্রমুখ লেখকেরা দেখিয়েছেন যে এমনকি ইউরোপ মহাদেশেও সামন্ততন্ত্রের প্রকৃতি সর্বত্র একরকম নয়, এবং সামন্ততন্ত্রের যা মূল তত্ত্ব তার সঙ্গে বাস্তবতার ফারাক বহু ক্ষেত্রেই প্রকট। কাজেই যদি কেউ সামন্ততন্ত্রের সংজ্ঞা যথেচ্ছভাবে পরিবর্তিত করে ওই শব্দটির দ্বারা একটি কৃষিভিত্তিক অনগ্রসর সমাজকে বোঝাতে চান বা কোন সামাজিক অর্থনৈতিক সংগঠন বলতে চান সেক্ষেত্রে আর করার কি আছে? মংরচিত "প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা" নামক গ্রন্থে বিষয়টি আরও বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে।

৫ ।। অন্যান্য দেশে বর্ণভেদের অনুরূপ প্রতিষ্ঠান

জাতিপ্রথার মত একটা সর্বাত্মক ব্যবস্থা ভারতবর্ষের বাইরে প্রচলিত না থাকলেও এক ধরনের বর্ণভেদ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই বজায় ছিল। যদিও ভারতীয় ঐতিহ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতি ও বর্ণ সমার্থক, এই দুই-এর মধ্যে যে কিছু পার্থক্য বর্তমান তা আমরা পূর্বে দেখেছি। বর্ণভেদ মূলত সামাজিক বিভাগ যার ভিত্তি অনেকটা ব্যাপক। পক্ষান্তরে জাতি বলতে একটি সুনির্দিষ্ট ও সার্বভৌম জনগোষ্ঠীকে বোঝায়, যদি তা কয়েকটি বিশেষ শর্ত পূরণ করে। আসলে ভারতীয় সমাজের যেটা বৈশিষ্ট্য তা হচ্ছে অসংখ্য উপবর্ণ বা শাখাজাতির (সাব-কাস্ট) নিজস্ব স্বাতন্ত্র বজায় রেখে অপরের সঙ্গে সহাবস্থান, যাদের মধ্যে অবশ্য সামাজিক মর্যাদার পার্থক্য আছে। পুরাকালে এই সকল জাতিকে চাতুর্বর্ণের কাঠামোর মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু উপরে ব্রাহ্মণ এবং সর্বনিম্নে নিম্নতম বৃত্তিধারীরা ব্যতিরেকে বাকি সকলেরই সামাজিক মর্যাদার স্থানটা কিছুটা এলোমেলো। এমনও দেখা গেছে যে কোন এক অঞ্চলে একটি জাতি প্রধান বলে গণ্য হলেও অন্য অঞ্চলে সেই জাতির তেমন কোন মানমর্যাদা নেই। অন্যান্য দেশেও বৃত্তিধারী জনগোষ্ঠী বর্তমান, বহু ক্ষেত্রেই এই বৃত্তি কৌলিক, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাদের জাতি আখ্যা দেওয়া যায় না, কেননা তাদের একের সমাজ অপরের সমাজ থেকে পৃথক নয়, তাদের আনুগত্য নিজ গোষ্ঠীসমাজের পরিবর্তে বৃহত্তর সমাজের প্রতি। আমরা পূর্বে মধ্যযুগের ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের পরিচয় দিয়েছি। ইউরোপীয় ফিউডাল সমাজেও চাতুর্বর্ণের অনুরূপ তিনটি এস্টেট বা স্তর ছিল। প্রথম এস্টেটটি পরিচিত ছিল নোবিলিটি বা সম্ভ্রান্ত শ্রেণী হিসাবে, দ্বিতীয়টি ছিল ক্লারজি বা যাজকশ্রেণী এবং তৃতীয়টি কমনার বা সাধারণ শ্রেণী। এই তৃতীয় এস্টেটে নানা বৃত্তিধারী মানুষ ছিল এবং বহু ক্ষেত্রেই বৃত্তিগুলি ছিল কৌলিক। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই কৌলিক বৃত্তিধারীরা জাতি নয়, কেননা তাদের কোন নিজস্ব গণ্ডীবদ্ধ সমাজ ছিল না, একই বৃহত্তর সামাজিক রীতিনীতি সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। এখানে যেমন প্রতিটি জাতিসমাজ অন্তর্বিবাহ, নিজস্ব সামাজিক রীতিনীতি ও আইনকানুন, নিজস্ব দেবদেবী ও আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতির দ্বারা স্বতন্ত্র, যে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় অন্য জাতির সঙ্গে একত্রে পানভোজনের ক্ষেত্রে নিষেধ, এমনকি দৈহিক সংস্পর্শের ক্ষেত্রেও নিষেধের মধ্যে পাওয়া যায়, অন্যত্র তা অনুপস্থিত।

তবে মধ্যযুগের ইউরোপের বৃত্তিধারীরা বিভিন্ন ধরনের গিল্ডে সংগঠিত

ছিল। এই গিল্‌ডগুলি প্রধানত অর্থনৈতিক সংগঠন, কারিগরশ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে গঠিত, জাতিপ্রথার মত কোন সামাজিক ব্যবস্থা নয়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গিল্‌ডসমূহের গঠন ও কাজকর্মের ক্ষেত্রে পার্থক্য ছিল। ইংলণ্ডে ত্রয়োদশ শতকের পর থেকেই গিল্‌ডগুলি কৌলিক বা বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে। বিভিন্ন পেশাদারীর এলাকাও সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়, যেমন লণ্ডন শহরে তন্তুবায়দের কেন্দ্র হয় ক্যানন স্ট্রীট, কর্মকারদের স্মিথফিল্‌ড প্রভৃতি। জার্মানীতে যে-কোন কারিগরি বিদ্যাই ছিল একান্তই কৌলিক, এবং বাইরের কেউ যদি কোন পেশা গ্রহণ করতে আগ্রহী হত, তাকে এই মর্মে সার্টিফিকেট দেখাতে হত যে তার জন্মের ক্ষেত্রে কোন গণ্ডগোল নেই, এবং তাকে এই কারিগরি শেখার জন্য অনেক ব্যয় করতে হত। উচ্চ পেশার লোকদেরও গিল্‌ড ছিল। চিকিৎসক, আইনজ্ঞ, অধ্যাপক প্রভৃতি উচ্চ পেশাদাররাও নিজস্ব গিল্‌ড গঠন করত। গিল্‌ডসমূহের মধ্যে সামাজিক মর্যাদার স্তরভেদ ছিল। ফ্লোরেন্স শহরে একুশ ধরনের গিল্‌ড ছিল, যেগুলির মধ্যে মানমর্যাদায় সবচেয়ে খাটো ছিল রুটি প্রস্তুতকারকেরা। প্রাচীন অ্যাংলো-স্যাকসন আইনে বিধান ছিল যে এক বৃত্তির পুরুষ সেই বৃত্তির মেয়েকেই বিবাহ করতে বাধ্য, এবং প্রতিলোম বিবাহ ছিল নিষিদ্ধ, যা অনেকটা জাতিপ্রথার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, কিন্তু পঞ্চদশ শতকের পর থেকে আর এই রকম বিধান ছিল না। রোমক সাম্রাজ্যের শেষ পর্যায়ে ফ্রান্সে বিধান ছিল যে যারা সরকারী প্রতিষ্ঠানে কাজকর্ম করে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ওই বিশেষ পেশাদারদের বাইরে স্থাপন করা চলবে না। কেউ কোন ক্রীতদাসীকে বিবাহ করলে তার গর্ভজাত সন্তানরা বৈধ বলে গণ্য হত না। জার্মানীতে উত্তরাধিকারের ব্যাপারে তাদেরই অধিকার গ্রাহ্য হত যারা যাদের পিতা ও মাতার বংশ সমান মর্যাদার। অ্যাংলো-স্যাকসন যুগের ইংলণ্ডের সমাজ তিনটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—সম্ভ্রান্ত, সাধারণ স্বাধীন মানুষ ও দাস। স্বাধীন মানুষ ও দাসের মিশ্রণজাত একটি চতুর্থ শ্রেণী ছিল যা লায়েট নামে পরিচিত। এই জাতীয় শ্রেণীবিভাগ টিউটন অধ্যুষিত ইউরোপের অপরাপর অঞ্চলেও বর্তমান ছিল। ভেরগেল্‌ড বা নিহত হবার ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থের পরিমাণ সামাজিক মর্যাদার পরিচায়ক ছিল, অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর ভেরগেল্‌ডের সঙ্গে সাধারণ মানুষের ভেরগেল্‌ডের ছিল প্রায় ছয়গুণ ফারাক। বিবাহাদির ক্ষেত্রে স্বশ্রেণী থেকে বিচ্যুত হবার শাস্তি ছিল। অপরাধ ও শাস্তির ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের লোকেরা অধিকতর সুবিধাভোগ করত। কেল্টদের প্রাচীন সাহিত্য থেকে নজীর উত্থাপন করে ম্যাকালিস্টার

দেখিয়েছেন যে এমনকি অতি প্রাচীন কেলটীয় সমাজ খর্বাকার ও কৃষ্ণবর্ণের মানুষদের নিম্নবর্ণের প্রাণী হিসাবে দেখা হত। ভাইকিং যুগের স্ক্যাণ্ডিনেভীয় সমাজ সম্পর্কে এম. ডব্লউ. উইলিয়ামস লিখেছেন যে সেখানকার সম্ভ্রান্ত শ্রেণী শুধুমাত্র আইনকানুন, বিচার এবং ভেরগেলড নির্ধারণের ব্যাপারেই বিশেষ সুবিধা পেত তাই নয়, ভোজসভায় পঙক্তিভেদ ছিল এমনকি সমাধিস্থানেও বিশেষ সুবিধা তাদের দেওয়া হত।

প্রাচীন সভ্যতাগুলির ক্ষেত্রে এক ধরনের বর্ণভেদের পরিচয় পাওয়া যায়। পিরামিড যুগের মিশরে তিনটি সামাজিক শ্রেণী ছিল—ভূম্যধিকারী, মজুর এবং দাস। অষ্টাদশ রাজবংশের সময় ভিন্ন ধরনের চারটি সামাজিক শ্রেণীর পরিচয় পাওয়া যায় যথা সৈন্য, পুরোহিত, কারিগর ও মজুর। হেরোডোটাস মিশরে সাতটি সামাজিক শ্রেণীর (জেনেয়া) কথা বলেছেন যারা বংশানুক্রমিকভাবে একই বৃত্তির অনুসরণ করত এবং বিবাহাদি পানভোজন প্রভৃতি সামাজিক সম্পর্কের ব্যাপারে অন্যের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখত। এই সাতটি শ্রেণী হল পুরোহিত, সৈন্য, পশুপালক, শূকরপালক, ব্যবসায়ী, ভাষ্যকার, এবং নাবিক। দিওদোরস মিশরে পাঁচটি পেশাদার শ্রেণীর কথা বলেছেন, প্লেটো ছয়টি। এই সকল শ্রেণীর মধ্যে একত্র পানভোজন নিষিদ্ধ ছিল। মিশরীয়রা ভিন্ন নৃগোষ্ঠীয় লোকদের সঙ্গেও পানভোজন করত না, বিশেষ করে ইহুদিদের সঙ্গে, যে খবর বাইবেল (জেনেসিস ৪৩।৩২) থেকে পাওয়া যায়। প্রাচীন সুমেরীয় রচনাবলী থেকে পুরোহিত, কর্মচারী, ভূম্যধিকারী এবং দাস এই চারটি সামাজিক শ্রেণীর পরিচয় পাওয়া যায়। হাম্মুরাবির আইনে অপরাধ ও শাস্তির ক্ষেত্রে শ্রেণীবৈষম্য করা হয়েছে। এই আইনে পেশার কৌলিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, এবং একথাও বলা হয়েছে যে যদি কেউ কোন নূতন বৃত্তি অবলম্বন করতে চায় তাহলে তাকে সেই বৃত্তিধারীদের পরিবারে গৃহীত হতে হবে। তবে বিবাহের ক্ষেত্রে হাম্মুরাবির আইন অনেকটা উদার। ইরানের ইতিহাসের প্রাচীনতম পর্যায়ে তিনটি সামাজিক শ্রেণীর পরিচয় পাওয়া যায়—পুরোহিত, যোদ্ধা এবং কৃষক। কারিগর শ্রেণীরও উল্লেখ প্রাচীন ইরানীয় রচনাসমূহে পাওয়া যায়, বিশেষ করে স্বর্ণকার, কর্মকার ও স্থপতি। এই শ্রেণীবিভাগ জরথুস্ট্রের উপর আরোপ করা হয়েছে। শাহনামা অনুযায়ী এই সামাজিক শ্রেণীভেদের স্রষ্টা স্বয়ং দেবতা যিম (যম)। ইরানীয় পুরোহিত শ্রেণীর সঙ্গে ভারতীয় পুরোহিত শ্রেণীর সাদৃশ্য বর্তমান, কেননা যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ প্রাচীন ইরানেও প্রচলিত ছিল এবং ইরানীয় পুরোহিত শ্রেণীর মধ্যে

উপবীত ধারণের রীতি ছিল (শায়স্ত-লা-শায়স্ত গ্রন্থে ইরানীয় উপনয়ন প্রথার যে বর্ণনা আছে তার অনুবাদের জন্য মৎরচিত ইণ্ডিয়ান পিউবার্টি রাইট্‌স গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

প্রাচীন রোমের জনসমাজ তিনটি সুনির্দিষ্ট সামাজিক শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—প্যাট্রিসিয়ান বা অভিজাত, প্লেবিয়ান বা সাধারণ মানুষ এবং দাস। সার্ভিউস তুলিউসের সময় পর্যন্ত একমাত্র প্যাট্রিসিয়ানরাই নাগরিক বলে গণ্য হত। প্লেবিয়ানরা নানা বৃত্তিজীবী গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল, যাদের কোন রাজনৈতিক এমনকি ধর্মীয় অধিকারও ছিল না। ২৮৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দে আইনের দ্বারা প্যাট্রিসিয়ান-প্লেবিয়ান ভেদ তুলে দেওয়া হলেও, বাস্তবে এই ভেদ বরাবরই বজায় ছিল। রোমের থিওডোসীয় বিধি অনুয়ায়ী সকল পেশাই বংশানুক্রমিক ছিল, এমনকি সরকারী ও বেসরকারী পদসমূহও। বিবাহের ক্ষেত্রে নিজ পেশাদারী গোষ্ঠীর বাইরে নিষেধ বর্তমান ছিল। প্রাচীন চীনদেশে চারটি সামাজিক শ্রেণীর পরিচয় পাওয়া যায়—অভিজাত, কৃষক, কারিগর ও বণিক। কনফুসিয়াস এদের সঙ্গে আরও একটি পঞ্চম শ্রেণী যোগ করেন, দাস বা ভৃত্য। চীনেও সকল বৃত্তি পুরোপুরি কৌলিক এবং এক শ্রেণীর সঙ্গে অপর শ্রেণীর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ ছিল। জাপানে দ্বাদশ শতক থেকে উনিশ শতকের মধ্য পর্যন্ত সমাজে পাঁচটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণী ছিল—সামুরাই বা বংশানুক্রমিক যোদ্ধা যা জাপানী সামরিক সামন্ততন্ত্রের স্তম্ভস্বরূপ, কৃষক, কারিগর, বণিক এবং এটাহ্‌ ও হিনিন। এটাহ্‌ এবং হিনিন আসলে একটি শ্রেণীরই দুই ভাগ, যারা অত্যন্ত নিম্ন ধরনের কাজ করত। বৃত্তি ছিল কৌলিক, প্রত্যেকেরই ক্ষেত্রে, তবে বিবাহের ক্ষেত্রে উপরের শ্রেণীগুলির মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ চলতে পারত, অবশ্য বিশেষ অনুমতি নিয়ে।

আর একটু আধুনিক যুগের দিকে এগিয়ে এলে দেখা যাবে যে মেকসিকোয় ইউরোপীয় আধিপত্যের ফলে তিনটি সুনির্দিষ্ট সামাজিক শ্রেণী, অজস্র উপবিভাগ সহ গড়ে উঠেছিল। সর্বোচ্চ শ্রেণী বিশুদ্ধ স্পেনীয় বংশজ, মধ্যবর্তী শ্রেণী মিশ্র বংশজ এবং নিম্ন শ্রেণী স্থানীয় বংশজ। এই মধ্য শ্রেণী, যারা স্পেনীয় ও স্থানীয়দের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে, মেস্টিজো নামে পরিচিত, সেখানকার সবচেয়ে প্রভাবশালী শ্রেণী এবং নানা পেশাদারী গিলুডে বিভক্ত। পেরুতেও মোটামুটি এই তিনটি শ্রেণী বর্তমান। ব্রেজিলে অনুরূপ তিনটি শ্রেণী বর্তমান, মধ্যশ্রেণীটি পর্তুগীজ ও স্থানীয়দের সংমিশ্রণ। এখানে একটি চতুর্থ শ্রেণীও বর্তমান যারা হচ্ছে নিগ্রো। নিগ্রো এবং স্থানীয়দের যারা মিশ্রণ-

জাত তারা মুলাত্তো নামে পরিচিত। এই সকল স্থানে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মিশ্রণ ঘটলেও, এবং তজ্জনিত কিছু সামাজিক ভেদ থাকলেও পরিণামে কোন জাতিপ্রথা গড়ে ওঠেনি। বোর্ণিওর কায়ান এবং কেন্যাকদের মধ্যে তিনটি সামাজিক শ্রেণী বর্তমান—উচ্চ, মধ্য এবং দাস। মাওরিদের মধ্যে চারটি বিভাগ পুরোহিত, পেশাদার, কায়িক শ্রমকারী এবং যুদ্ধবন্দী দাস। সামোয়ানদের মধ্যে ছয়টি শ্রেণী, যাদের মধ্যে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ। হাওয়াইদের সমাজ আরই বা সম্ভ্রান্ত হাকুয়াইনা বা ভূম্যধিকারী ও পুরোহিত এবং চানাকামোরি বা সাধারণ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। এই রকম সামাজিক বিভাগ প্রায় সর্বত্রই বর্তমান আছে। আফ্রিকা মহাদেশের নানা রাষ্ট্র থেকেও এই রকম শ্রেণীভেদের পরিচয় পাওয়া যায়। সর্বত্রই দেখা যায় যে সমাজ জীবনে বংশানুক্রমিক পেশাদারী এবং অন্তর্বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

বর্ণভেদ ও জাতিপ্রথার ব্যাপারে সামাজিক শ্রেণীভেদ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও সামাজিক শ্রেণীভেদই জাতিপ্রথার নিয়ামক নয়, যদিও নানা দেশের সামাজিক শ্রেণীভেদ অবলম্বিত পেশার গুরুত্বের উপর নির্ভরশীল, এবং পেশাগুলিও কৌলিক যার পরিচয় উপরে প্রদত্ত উদাহরণগুলি থেকে আমরা পেয়েছি। বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর পাশাপাশি অবস্থান জাতিবর্ণপ্রথার সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্যমূলক হলেও এই সাদৃশ্যের ভিত্তি মোটেই গভীর নয়। যেমন সিয়ামে, সিয়ামীজ, চৈনিক ও ইউরোপীয়রা পাশাপাশি থাকে এবং এদের নিজস্ব সমাজ আছে। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গরা ভিন্ন সমাজভুক্ত, কানাডায় ইংরেজ এবং ফরাসী কানাডীয়রা ভাষা, ধর্ম ও নৃগোষ্ঠীর থেকে পৃথক। জাতিপ্রথার মত এই সকল ক্ষেত্রেও প্রতিটি গোষ্ঠীর নিজস্ব সমাজ, নিজস্ব বৃত্তি এবং মর্যাদার তারতম্য আছে, কিন্তু জাতিপ্রথার ক্ষেত্রে একটা বৃহত্তর অখণ্ড সমাজভাবনা বর্তমান, যেখানে এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অপর গোষ্ঠীর পার্থক্য সত্ত্বেও অন্যসূত্রে একটা গভীর বন্ধন আছে, যেখানে একের উপযোগিতার স্বীকৃতি ব্যতিরেকে অন্যের অস্তিত্ব অর্থহীন। রিজলীর মতে, এক নৃগোষ্ঠী অপর নৃগোষ্ঠীর উপর জয়লাভের পর প্রাথমিক পর্যায়ে উভয় নৃগোষ্ঠীর মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ ঘটে। যেখানে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে দুই নৃগোষ্ঠীর পার্থক্য কম সেখানে পরিপূর্ণ সংমিশ্রণ ঘটে যায়, কিন্তু যেখানে দৈহিক বৈশিষ্ট্য এবং রঙের পার্থক্য খুব বেশি সেখানে নানা সংকরগোষ্ঠীর উদ্ভব হয় যেমন আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের মুলাত্তো, কোয়াড্রুন বা অক্টোরুন অথবা সিংহলের বুরঘার যারা ডাচ এবং স্থানীয়দের সংমিশ্রণ, ভারতের ক্ষেত্রে নেপালের খস বা

কাংরা উপত্যকার ডোগরা যারা রাজপুত ও আগন্তুক ব্রাহ্মণদের সংকর। ভারতবর্ষের বাইরে এই রকম সংকর জনগোষ্ঠীগুলির স্বাতন্ত্র্য এবং নিজস্ব সমাজ থাকলেও সেগুলিকে নিশ্চয়ই জাতি বলে অভিহিত করা যায় না। পক্ষান্তরে ভারতীয় জাতিপ্রথা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে বর্ণসংকর গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা থাকলেও জাতিপ্রথা শুধুমাত্র এইটুকুর উপর নির্ভরশীল নয়। মোটের উপর এইটুকু বলা যায় যে জাতিপ্রথার নানা উপাদান পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষে নানা ঐতিহাসিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এই সকল উপাদান যে জাতিপ্রথা নামক একটা সর্বাত্মক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তার কার্যকারিতা বজায় রেখেছে তা সকল দিক থেকেই অনন্যত্ব ও অভিনবত্বের দাবি করতে পারে।

৬ ॥ জাতিপ্রথা ও রাজনীতি

প্রাচীন ভারতীয় শাসনব্যবস্থার লক্ষ্যই ছিল বর্ণাশ্রম রক্ষা, অর্থাৎ প্রতিটি জাতিকে নিজ নিজ কৌলিক বৃত্তি অনুযায়ী কাজ করতে দেওয়া, কোন জাতি যাতে নিজ অধিকারের ক্ষেত্র লংঘন না করে, বা অপর জাতির অধিকারের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ না করে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া। মধ্যযুগের শাসকেরাও, জাতিপ্রথা সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব যে রকম ধারণাই থাকুক না কেন, পূর্বের নীতিই অনুসরণ করে এসেছিলেন, যেজন্য সিংহাসন ও ক্ষমতা নিয়ে উপরের পর্যায়ে যতই দ্বন্দ্ব থাকুক না কেন, দেশের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয় নি। ভারতে ইংরাজ রাজত্ব শুরু হবার পর থেকেই অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ থেকে ইংরাজ শাসকগণ যে শিক্ষা লাভ করেছিল তা হচ্ছে এই যে জনসাধারণ যত বেশি পরস্পরের চেয়ে বিচ্ছিন্ন হবে এবং পরস্পর বিদ্বেষপরায়ণ হবে, শাসকদের ক্ষেত্রে সেই অবস্থা নিজেদের স্বার্থের পক্ষে তত অনুকূল হবে। জাতি ও সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র থাকলেও, প্রাক-ব্রিটিশ যুগের উৎপাদন ও অর্থনৈতিক কাঠামোয় ভেদের উপাদানগুলি পরস্পরের পরিপূরক ছিল যার ফলে সমাজদেহে বিক্ষোভের তেমন কোন গুরুতর হেতু ছিল না। কিন্তু ব্রিটিশ অধিকারে নূতন অর্থনৈতিক স্বার্থের আমদানী হওয়ায় পূর্বেকার ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়েছিল এবং এর পরিণামে সমাজদেহে যে বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল ইংরাজ শাসকেরা সুকৌশলে তা লালনপালন করেছিল। প্রাথমিক বিভাজনটা হয়েছিল হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের ও কালক্রমে অন্য ধর্মাবলম্বীদের, দ্বিতীয় পর্যায়ে উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিম্ন-

বর্ণের হিন্দুর। এ বিভাজন বৃত্তি ও মর্যাদার ভিত্তিতে, বা সাংস্কৃতিক পার্থক্যের দরুন, সামাজিক বিভাজন নয়। এর উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক।

প্রতিটি আদমসুমারির পিছনেই যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বর্তমান ছিল, সেক্ষেত্রে জাতি ও শাখাজাতিসমূহের উপর মাত্রাধিক গুরুত্ব আরোপ করার নির্দেশ ছিল, এ কথা স্বয়ং হাটন সাহেব স্বীকার করেছেন, এবং এ ব্যাপারে নিজের ভূমিকার কথা তিনি গোপন করেন নি। বস্তুত বহু শাখাজাতি ও উপশাখাজাতির সৃষ্টি শাসকদের মগজ থেকেই হয়েছিল। কোন জাতির আঞ্চলিক বা স্থানীয় শাখাকে পৃথক জাতি বলে ঘোষণা করার প্রবণতা আদম-সুমারিকারদের মধ্যে বিশেষভাবে বর্তমান ছিল। হাটন সাহেব, যিনি এই ব্যাপারে অতি উৎসাহী ছিলেন, দোষটা অবশ্য অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে জাতি নিয়ে রাজনীতি করার বদনামটা ভারতীয়দের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু মহাসভা একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে ঘোষণা করে যে তথাকথিত অস্পৃশ্যদের অন্যান্য হিন্দুদের সঙ্গে বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের, কূপ, রাস্তা ও মন্দির ব্যবহারের সম-অধিকার বর্তমান। ওই একই প্রস্তাবে পুরোহিত, নাপিত ও রজকেরা যাতে অস্পৃশ্যদেরও কাজ করে সে নির্দেশ দেওয়া হয়, এবং দাবি জানানো হয় যে আদমসুমারিতে সকল হিন্দুকেই জাতিগত বা সাম্প্রদায়িক বিশেষণ ব্যতিরেকেই শুধুমাত্র হিন্দু বলেই লিপিবদ্ধ করতে হবে। এই দাবি শাসকদের পরিকল্পনার বিরোধী ছিল। তাই হাটন সাহেব লেখেন, "১৯৩১ এর আদমসুমারিতে রাজনৈতিক বিবেচনা অন্যান্য সব কিছুকেই ছাপিয়ে গিয়েছিল, এবং যাতে অস্পৃশ্যদের নাম নিছকই হিন্দু হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়, অন্য কিছু হিসাবে নয়, তার বহু প্রচেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু বাহ্যজাতিসমূহ এ বিষয়ে সচেতন ছিল যে তাদের স্বার্থের জন্যই তাদের সংখ্যা নির্দিষ্টভাবে নথিভুক্ত হওয়া উচিত। একই সঙ্গে তারা এ বিষয়েও অচেতন ছিল না যে যত বেশি অবদমিত জাতির সংখ্যা নথিভুক্ত হবে ততই তাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং তা তাদের স্বার্থের অনুকূল হবে। তাই যখন পাঞ্জাবের শারদানন্দ ডিপ্রেসড ক্লাসেস মিশন বাহ্যজাতিসমূহকে আর্য-হিন্দু বলে ঘোষণা করেছিল, অচ্ছুৎ বা দলিত জাতিসমূহের নেতারা তাঁদের অনুগামীদের আদি-ধর্মী বলে ঘোষণা করেছিলেন, যার অর্থ তারা হিন্দুই নয়।"

সিডিউলড কাস্ট বা তফশিলী জাতি নামক ধারণাটির সৃষ্টি হয় সাইমন কমিশনে, উদ্দেশ্য ছিল ভারতবাসীকে হিন্দু, মুসলমান ও তফশিলী এই তিনটি

সুনির্দিষ্ট জনসমাজে বিভক্ত করা। লণ্ডনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে (নভেম্বর ১৯৩১) ভীমরাও রামজী আম্বেদকর অনুন্নত জাতিদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা এবং আইনসভায় তাদের পৃথক প্রতিনিধিত্বের দাবি করেছিলেন। গান্ধীজী এই দাবির বিরোধিতা করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল এই দাবি মেনে নেওয়া হলে হিন্দুসমাজ পাকাপাকিভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়বে। ১৯৩২-এর ১৭ই আগস্ট তারিখে কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড বা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার নীতি ঘোষিত হয় যাতে অনুন্নত জাতিদের জন্য পৃথক নির্বাচনব্যবথা স্বীকৃত হয়। এর প্রতিবাদে গান্ধীজী আমরণ অনশন শুরু করেন। মহাত্মার প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ে একটা আপোস হয় এবং ১৯৩২ এর ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে যারবেদা জেলে পুনা প্যাক্ট রচিত হয়। স্থির হয় যে আইনসভায় কংগ্রেস যে সকল প্রার্থী মনোনয়ন করবে তার একটা নির্দিষ্ট অংশ তফশিলী জাতিদের থেকে নেওয়া হবে। গান্ধীজী নিম্নজাতিদের হিন্দুসমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে ঘোষণা করেন এবং অস্পৃশ্যদের হরিজন আখ্যা দেন। এর পরেও বৃটিশ শাসকেরা এবং মুসলিম লীগ রাজনৈতিক দরকষাকষির ক্ষেত্রে তফশিলী জাতিদের পৃথকত্বের প্রশ্ন বারবার তুলেছিল, কিন্তু তাতে কোন সুবিধা হয়নি। বস্তুত নিম্নপর্যায়ের জাতিসমূহ কোনদিনই নিজেদের অহিন্দু বলে মনে করেনি, কাজেই তাদের একটি তৃতীয় রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে দাঁড় করানো যায়নি, যদিও এবিষয়ে চেষ্টার অভাব হয়নি।

আম্বেদকর নিজে নিম্নবর্ণীয় মাহার জাতিভুক্ত হওয়ায় তাঁকে প্রতিষ্ঠার পথে অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়েছিল যার ফলে এই পোড় খাওয়া মানুষটি অত্যন্ত উগ্রপন্থী হয়ে উঠেছিলেন এবং নিম্নজাতির হিন্দুত্বকেই অস্বীকার করেছিলেন। ১৯৩৫-এর ১৩ই অক্টোবর তিনি নাসিক জেলার ইয়োলা নামক স্থানে ঘোষণা করেন যে অস্পৃশ্যদের হিন্দুসমাজ ত্যাগ করে অন্য ধর্মে আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। জাতীয়তাবাদী নেতারা আম্বেদকরের রাজনীতি, ইংরাজ-আনুগত্য এবং হিন্দুসমাজকে বিভক্ত করার প্রবণতাকে পছন্দ না করলেও তাঁর যোগ্যতা ও প্রতিভাকে সম্মান করতেন এবং স্বাধীন ভারতের সংবিধান ও হিন্দু কোড বিল রচনার ক্ষেত্রে তাঁর উপর গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। আম্বেদকরের উদ্দেশ্য এই দুটি কাজের দ্বারাই সার্থক হয়েছিল—কেননা দুটিই বর্ণহিন্দু স্বার্থের একান্ত বিরোধী—কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁর ক্ষোভ প্রশমিত হয়নি। নিম্নবর্ণের জাতিদের দুঃখ দুর্দশার কারণ যে প্রধানত অর্থনৈতিক, এবং এই কারণেই অনেক উচ্চবর্ণের মানুষেরও সামাজিক মর্যাদা

নিম্নেরও অধম, এটা তিনি বোঝার চেষ্টা করেন নি। যে সকল দেশে জাতিপ্রথা নেই সেখানেও অধিকাংশ মানুষ আর্থিক কারণেই দুর্দশাগ্রস্ত ও সামাজিক মর্যাদারহিত। আম্বেদকরের মত বিরাট প্রতিভা ভারতের সর্বজাতি ও সম্প্রদায়ের দারিদ্র্য-মুক্তির আন্দোলনে একটা বড় ভূমিকা নিতে পারতেন, যেমন নিয়েছিলেন তাঁরই সমকালীন নিম্নবর্ণজাত প্রতিভা ডঃ মেঘনাদ সাহা। কিন্তু আম্বেদকর যে পদ্ধতির আশ্রয় শেষ পর্যন্ত নিয়েছিলেন তা ছিল একান্তই মধ্যযুগীয়। তিনি ভেবেছিলেন যে সদলবলে তাঁর ধর্মান্তর গ্রহণের ফলে হিন্দুসমাজে প্রচুর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হবে এবং তারই পরিণামে নিম্নবর্ণের মানুষদের ক্ষেত্রে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হবে। তা কিন্তু ঘটেনি।

কিন্তু গান্ধীজী মনে করতেন যে জাতিপ্রথার ব্যাপারটিকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা ভারতীয় মনের পক্ষে অসম্ভব। ব্যাপারটিকে ভারতবাসী যেভাবে যুগের পর যুগ ধরে মনের দিক থেকে মেনে এসেছে, এবং মেনে এসেছে এই কারণে যে এই প্রথার কিছু ভাল দিকও আছে, তাতে মুখে হাজার সদিচ্ছার কথা বললেও বাস্তবে এই প্রথা বজায় থাকবেই। কাজেই এই প্রথার কার্যকর দিকগুলোকে অবহেলা না করে, ন্যায়নীতি-বিরোধী দিকগুলিকে বর্জন করলেই কাজ হবে। পক্ষান্তরে বামপন্থী ও প্রগতিশীল বলে যাঁরা নিজেদের পরিচিত করতেন তাঁদের বক্তব্য ছিল জাতিপ্রথা নামক ব্যাপারটি এতই কুৎসিত, মনুষ্যত্বের প্রতি অবমাননাকর, এবং জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের বিরোধী যে এটাকে নির্দ্বিধায় খতম করা দরকার। জওহরলাল নেহরু এবং সুভাষচন্দ্র বসু উভয়েই মনে করতেন যে একবার দেশ স্বাধীন হয়ে গেলেই এই সকল সামাজিক কুপ্রথাকে তাঁরা ফুৎকারে উড়িয়ে দেবেন। তবে ব্যাপারটা যে ফুৎকারে ওড়াবার নয় প্রধানমন্ত্রী হয়ে সেটা নেহরু উপলব্ধি করেছিলেন। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মত চিন্তাশীল মনীষীও কল্পিত যুক্তিভিত্তিক বাস্তবতার মোহে চোখের সামনে জাতিপ্রথার প্রত্যক্ষ বাস্তবতাকে দেখতে পাননি এবং চানও নি। মার্কসবাদীরা তাঁদের তত্ত্বের প্রয়োগক্ষেত্রের ভিত্তি নির্ণয় করতে গিয়ে বুঝতে পারেন নি যে এদেশে শ্রমিকশ্রেণীই সর্বহারা শ্রেণী নয়, এখানকার শ্রমিকরা ইউরোপের মত ভূমির ক্ষেত্রে বৃহৎ মূলধনের প্রবেশের ফলে কৃষিজীবিত্ব থেকে উৎখাত হয়ে শহরে এসে জাতকুল হারিয়ে সর্বহারা শ্রমিকে পরিণত হয়নি, এবং এই শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরা আগে যাদব, আগে গুজর, আগে জাঠ, আগে কুর্মি, আগে মাহার, পরে শ্রমিক। আজও পর্যন্ত এদেশে যন্ত্রশিল্পের স্থান নগণ্য। ভারতবর্ষে প্রকৃত সর্বহারা শ্রেণী বলতে জাতিকাঠামোর

সর্বনিম্ন স্তরের মানুষগুলিকেই বোঝায়, কিন্তু অভিজ্ঞতার নিরিখে এটুকু বলতে বাধা নেই যে এই স্তরে বামপন্থী আন্দোলনের শিকড় কোন দিনই পৌঁছায় নি।

প্রাক-স্বাধীনতা আমলে বোম্বাই প্রদেশে জাতি প্রথাকে ধাপে ধাপে বিলোপ করার একটা নিষ্ফল পরীক্ষা হয়েছিল। পরিকল্পনাটি ছিল বিভিন্ন শাখাজাতি ও উপশাখাজাতিকে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানের নিরিখে প্রথম পর্যায়ে শ্রেণীবদ্ধ করা, এবং পরবর্তী পর্যায়সমূহে এই শ্রেণীগুলির গণ্ডী ছোট করে আনা। এতে উল্টো ফল হয়েছিল, নিম্নজাতিগুলির স্বজাতিপ্রীতি আরও বেড়ে গিয়েছিল, এবং জাতিতে জাতিতে হানাহানিও বেড়েছিল। প্রতিটি জাতিরই বক্তব্য ছিল যে তাদের চেয়ে নিম্ন জাতি যদি তাদের সমান হয় তাহলে তাদের মর্যাদা আর কোথায় রইল? আসলে প্রতিটি জাতিরই একটা উত্তপ্ত স্বাতন্ত্রবোধ আছে যা কোন জাতিই খোয়াতে রাজি নয়। জাতিপ্রথার আসল সংজ্ঞা হওয়া উচিত "ক্লাস্টার অব অটোনোমাস য়্যাণ্ড ফাংশানলি ইণ্টাররিলেটেড সেল্ফ-কণ্টেণ্ড ইউনিটস গ্রুপড্ ইন এ হায়ারার্কি বিয়িং কনজয়েণ্ড বাই দ্য ফোর্সেস অব সাইমালটেনিয়াস লাভ য়্যাণ্ড হেট্রেড।" এ হচ্ছে আঙুরফলের মত স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সার্বভৌম এককসমূহের গুচ্ছ, একটি বিশেষ কাঠামোর মধ্যে ধৃত। এগুলি পরস্পরের সঙ্গে প্রয়োজন ও কাজের সূবাদে সম্পর্কিত, এবং পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা এবং ঘৃণা যুগপৎ উভয় সম্পর্কই কার্যকর।

বস্তুত এই উত্তপ্ত স্বাতন্ত্রবোধ ছোট-বড় প্রত্যেকটি জাতিকেই নিজস্ব জাতি-গত অবস্থার উন্নতিবিধানে যথেষ্ট উদ্দীপ্ত করে। কিন্তু এই স্বাতন্ত্রবোধই তাদের অন্যান্য সমপর্যায়ের জাতিদের সঙ্গে, এবং তাদের চেয়ে কিছু উচ্চ এবং কিছু নিম্ন জাতির সমবায়ে কোন বৃহত্তর উদ্দেশ্যের জন্য ঐক্যবদ্ধ করতে পারে না। এইচ. এল. স্টিভেনসন মনে করেন যে যখন বৃটিশ সংকার জনসাধারণের নির্বাচিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রণয়ন করে তখন থেকেই ভারতের নানা প্রদেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে কিছুটা রাজনৈতিক উচ্চাশার উন্মোচন হয়, এবং এই উপলক্ষ্যেই নানা থানে অসংখ্য জাতিসভা গড়ে ওঠে। কিন্তু জাতি-সভার ব্যাপারটা আরও প্রাচীন। মহারাষ্ট্রে এম. জি. রানাডে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংগঠন হিসাবে গড়ে ওঠা দক্ষিণ-সভা বা জ্যোতিরাও ফুলের সত্যশোধক-সমাজের মত সংগঠন বিভিন্ন জাতিসভার পূর্বসূরী। বনমালী নামক জনৈক সমাজসংস্কারক ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই-এর নিকটবর্তী দাদরে ক্ষাত্রিয়সভার প্রতিষ্ঠা করেন। বিংশ শতকের তৃতীয় দশকের মধ্যে সারা

দেশে অসংখ্য জাতিসভা গড়ে ওঠে এবং বিভিন্ন জাতির মুখপত্রসমূহ প্রকাশিত হতে শুরু করে। এগুলি স্বজাতির প্রতি আনুগত্য, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উচ্চাশার পরিচায়ক, কিন্তু এগুলিতে প্রতিফলিত দৃষ্টিভঙ্গী কোন-দিনই কোন বিশেষ জাতির স্বাজাত্যের সীমা অতিক্রম করেনি। এই কারণেই অনুন্নত জাতিদের একটি তৃতীয় শক্তিরূপে গণ্য করে বৃটিশ সরকার নিজেদের রাজনৈতিক প্রয়োজনে যে একটি ত্রিজাতিতত্ত্ব সৃষ্টিতে আগ্রহী হয়েছিল তা সফল হয়নি। মুসলমানদের নিয়ে যে-রকম রাজনৈতিক দল গড়া গিয়েছিল, নিম্নবর্ণের মানুষদের নিয়ে সেইরকম কিছু করা যায়নি। মাদ্রাজ প্রদেশের অব্রাহ্মণদের রাজনৈতিক সামাজিক দল হিসাবে যে জাস্টিস পার্টি গড়ে উঠেছিল তা জনচিত্তে বিশেষ কোন সাড়া জাগাতে না পেরে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে উৎখাত হয়ে যায়। এই দলের ঘোষিত ব্রাহ্মণ্যবিরোধিতাকে অবলম্বন করে ই. ভি. রামস্বামী নাইকার দ্রাবিড় কাজাগম দল গঠন করেন ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। পরে সি. এন. আন্নাদুরাই-এর নেতৃত্বে এই দল ডি. এম. কে. নামে পুনর্গঠিত হয় এবং তামিলনাড়ুতে রাজনৈতিক ক্ষমতালাভও করে। তথাকথিত আর্য ও সংস্কৃত ঐতিহ্যবিরোধী এই দল কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণদের বর্জন করতে পারেনি, বরং দলকে শক্তিশালী করার জন্য রাজনৈতিক বিচক্ষণতার সঙ্গে সাগ্রহে ব্রাহ্মণদের গ্রহণ করেছে। বহুপূর্বে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল ভারতীয় গণমনস্তত্ত্ব ও রাজনীতি সম্পর্কে তাৎপর্যকর মন্তব্য করেছিলেন যে এখানে কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে প্রকৃত কার্যকর ভূমিকায় যদি দেখতে চাওয়া হয় তাহলে সেই সকল ক্ষেত্রে অভিজাত ও শিক্ষিত সমাজের মানুষকে আনতে হবে।

বার্নার্ড কোহন জৌনপুর জেলার মাধোপুরে একটি সামাজিক-রাজনৈতিক সমীক্ষা করে জানিয়েছেন যে ১৯৩৭-এর প্রাদেশিক নির্বাচনের সময় নুনিয়া, চামার ও অন্যান্য অস্পৃশ্য জাতিসমূহ ঠাকুর অর্থাৎ রাজপুত ভূম্যধিকারীদের বিরুদ্ধে একজোট হয়েছিল, কিন্তু এই ঐক্য বেশিদিন থাকেনি। ১৯৪৮-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রধানত নিম্নবর্ণের মানুষদের নিয়ে গঠিত প্রজাপার্টি সাফল্য লাভ করেছিল, এবং এটাও লক্ষণীয় যে এই নিম্নবর্ণের মোর্চার নেতৃত্বে ছিলেন একজন আহির, একজন ব্রাহ্মণ, একজন কান্দু ও একজন তেলী, যা থেকে প্রমাণিত হয় সাধারণ অর্থে এই নির্বাচনী লড়াইয়ে ছোটজাত বড়জাতের ভেদ ছিল না। কিন্তু পঞ্চায়েতে ক্ষমতালাভ করা সত্ত্বেও এই মোর্চা কাজ করতে পারেনি যার কারণ রাজপুত ঠাকুরদের বিরোধিতা। এখানে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির বিভেদটা জাতিভিত্তিক নয়। রাজপুত ঠাকুরদের টাকার জোর এবং উপর

মহলে প্রভাব ছিল বলেই তারা নির্বাচিত পঞ্চায়েতকে গায়ের জোরে ভেঙে দিতে পেরেছিল। মাধোপুরের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একতরফা ঘটেছিল। কিন্তু যে সব জায়গায় দুই পক্ষই সমান শক্তিমান, টাকা ও মুরুব্বির জোর যেখানে দু'তরফেরই আছে, এমন ক্ষেত্রে দুই তরফ যদি দুই জাতিভুক্ত হয়—যেমন কর্ণাটকে ওক্কালিকা ও লিঙ্গায়ৎ, অথবা অন্ধ্রে কাম্মা ও রেড্ডি, সেক্ষেত্রে দুই তরফের সংঘাতকে নিশ্চয়ই দুই জাতির সংঘাত না বলে দুই প্রভাবশালী গোষ্ঠীর সংঘাত বলেই অভিহিত করা সঙ্গত। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে জাতিতে জাতিতে হাঙ্গামা হয় না। ১৯৪৮ এর পর থেকে এদেশে জাতি-হাঙ্গামার সংখ্যা প্রায় দেড় হাজারের কাছাকাছি। এগুলির কারণ হিসাবে যদি নিছকই জাতি-বিদ্বেষকে দায়ী করা যায় সেটা অতি সরলীকরণ দোষে দুষ্ট হবে। এগুলির কারণ প্রথমত বৈষয়িক, দ্বিতীয়ত এক ধরনের স্থূল রাজনীতি যার বিকাশ ঘটেছে স্বাধীনতা-উত্তর কালে। এই নূতন রাজনীতির প্রকৃতি নিয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস সভাপতি থাকাকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন যে বিহারের মন্ত্রীদের জাতি নিয়ে রাজনীতি ওই রাজ্যের প্রশাসনকে বিপর্যস্ত করেছে। কেউ যদি জাতি নিয়ে রাজনীতি করে তবে তাকে দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। এরকম কোন ঘটনা অবশ্য ঘটেনি, বরং বিহার কংগ্রেস সভাপতি সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন যে স্বজাতির প্রতি আনুগত্য দোষণীয় নয়। ভারতের একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চরণ সিংহ নির্দ্বিধায় বলেন, আমি আগে জাঠ, পরে ভারতীয়। সর্দার প্যাটেল বলে-ছিলেন যে ভারতীয় হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিশ্চয়ই পাটিদার হওয়া থেকে বিরত হন নি। ইউ. এন. ধেবর কংগ্রেসের কর্তা থাকাকালীন সৌরাষ্ট্রের কংগ্রেস নেতারা জাতি-রাজনীতির চূড়ান্ত করেছিলেন। ১৯৫৫-র অন্ধ্রের নির্বাচনে জাতি নিয়ে এত বাড়াবাড়ি হয়েছিল যে তখনকার দিনে কংগ্রেসের সমর্থক টাইমস অফ ইণ্ডিয়া পত্রিকা এর জোরালো প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়েছিল। কেরালায় বামপন্থীরা প্রবল, আবার বামপন্থীদের মধ্যে প্রভাবশালী জাতিরা প্রবল। দেশে যখন জাতিপ্রথা বর্তমান আছে, এবং নিজ জাতির প্রতি মানুষের আনুগত্য আছে তখন নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন প্রভৃতি ব্যাপারে স্বাভাবিক ভাবেই যে এলাকায় যে জাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং প্রধান সেই এলাকায় সেই জাতির লোক স্বাভাবিকভাবেই অগ্রাধিকার পাবে। এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। এমনকি পশ্চিমবঙ্গের মত রাজ্যে, যেখানে জাতিপ্রথার তীব্রতা

অনেক কম সেখানেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জাতি, উপজাতি ও সম্প্রদায়ের প্রভাবের ক্ষেত্রের দিকে নজর রাখে। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে জাতি নামক উপাদানটির ব্যবহার অন্য উদ্দেশ্যে হচ্ছে যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জাতিগুলির মঙ্গলামঙ্গলের কোন ব্যাপার নেই। নিছকই ক্ষমতা দখল ও ক্ষমতা বজায় রাখার স্বার্থে জাতিবিদ্বেষ ও জাতিসংঘর্ষকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে এবং এর জন্য তিন পর্যায়ের জাতিদের রঙ্গমঞ্চে নামানো হয়েছে। এই তিনটি পর্যায় হল প্রচলিত জাতিকাঠামোর অন্তর্গত মধ্যশ্রেণীর কিছু জাতি যারা ডমিনাণ্ট-কাস্ট বা প্রভাবশালী জাতিরূপে পরিচিত, তফশিলী জাতি যারা কিছু সাংবিধানিক সুযোগ সুবিধা এ পর্যন্ত পেয়ে আসছে এবং তফশিলী নয় অথচ অনুন্নত এই ধরনের নানা জাতি।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের শাসক দল, অর্থাৎ কংগ্রেস, অবদমিত জাতিসমূহের মুরুব্বি হিসাবেই নিজেদের ভূমিকা ঠিক করে নিয়েছে, এবং এমন একটা ধারণা সৃষ্টি করার প্রয়াস পেয়েছে যে যতদিন আমরা শাসন-তখতে আছি ততদিনই তোমরা নিরাপদ। এক্ষেত্রে ইংরাজ শাসকদের কৌশলের সঙ্গে তাদের কৌশলের কোন পার্থক্য নেই, এমনকি মহাত্মা গান্ধী ব্যবহৃত হরিজন শব্দটির বদলে সাইমন কমিশনে ব্যবহৃত সিডিউল্ড কাস্ট শব্দটি বহাল রাখা হয়েছে। সরকারী অনুগ্রহ বিতরণের যে অভাব আছে তা নয়, কিন্তু বৃটিশ শাসকদের মতই সে অনুগ্রহ বিতরণ নিজেদের ক্ষমতার স্বার্থে যার একটি বিশেষ দিক হচ্ছে নিম্নবর্ণের বিভিন্ন শাখাজাতি ও উপশাখাজাতির কিছু মুরুব্বিধরনের মানুষকে হাত করা এবং তাদের মাধ্যমে কিছু সুযোগ সুবিধা ছিটিয়ে নিজেদের ভোট-ব্যাংকে অধিকতর আমানতলাভ, এবং পাশাপাশি কিছু ভয়ের জুজুকে খাড়া করে রাখা, এবং এইভাবে সুকৌশলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও বিদ্বেষের মনোভাবের মূলে ইন্ধন যোগানো এবং মাঝে মাঝে সেগুলির হিংসামূলক বিস্ফোরণ হতে দেওয়া। সকল শ্রেণী, সম্প্রদায় ও জাতির মধ্যেই একটি করে কায়েমী স্বার্থের সৃষ্টি করা এদেশের শাসক ও বিরোধী সকল রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য, এবং এই কায়েমী স্বার্থের মাতব্বরদের সর্বতোভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করা হয় যারা স্বজাতি বা স্বসম্প্রদায়ের মানুষকে প্রভাবিত করে বিভিন্ন রাজনীতিবিদদের অনুকূলে জনমত গঠন করে। ফলে দেশজোড়া এই মাতব্বররা শাসকদের বা হবু-শাসকদের একটা সমান্তরাল শক্তির অধিকারী হয়ে বিরাজ করে, এবং তারা যে-কোন রকম দুষ্কর্মই করুক না কেন, তারা সর্বদাই নিরাপত্তা ভোগ করে।

স্বাধীনতালাভের পর থেকেই কংগ্রেস সরকার সম্পূর্ণভাবে আমলাতন্ত্র-নির্ভর হয়ে পড়ে। পূর্বতন বৃটিশ সরকারের আদর্শে, কোন যুগোপযোগী বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে, কোন সমস্যা বা বিক্ষোভ দেখা গেলে তা চাপা দেবার জন্য কমিশন গঠনের কৌশল তারা পুরোদস্তুর রপ্ত করে ফেলে। শ্রীযুক্ত সাব সেগল তাঁর ক্রাইসিস অব ইন্ডিয়া গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে ভারতীয় আমলাতন্ত্র অতি দ্রুত জাতীয় নেতাদের এমন একটা পর্যায়ে ঠেলে দিতে সমর্থ হয়েছে যেখানে নেতৃত্বের সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্ক শাসক ও শাসিতের সম্পর্কে পরিণত হয়েছে। সর্দার পানিক্করের মতে এই সম্পর্ক ব্যতিরেকে এদেশে বৃটিশ ঐতিহ্যবাহী আমলাতন্ত্রের কাজ করা অসম্ভব। ১৯৫০ এ ভারত সরকার আর. আর. দিবাকরের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করেন যার লক্ষ্য ছিল সংবিধানের আদর্শ অনুযায়ী জাতি ও সাম্প্রদায়িক পার্থক্যসমূহ লোপ করার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় তার সুপারিশ করা। কিন্তু দিবাকর কমিটির সুপারিশ কোনদিনই কার্যকর করা হয়নি। ভারতবর্ষে তফশিলী বা তালিকা-ভুক্ত জাতি-উপজাতি ছাড়াও অনুন্নত জাতির সংখ্যা বড় কম নয়, কিন্তু এই সকল জাতি রাজনৈতিকভাবে শাসকদের নিকট সেই রকম ভীতিপ্রদ হয়ে ওঠেনি যাতে সরকার তাদের স্বার্থরক্ষায় অগ্রসর হয়। ফলে এই সকল জাতিদের সঙ্গে তফশিলী জাতিদের বিরোধ দেখা দেয় এবং এই বিরোধকে সুকৌশলে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে প্রয়োগ করা হয়। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তফশিলী জাতিভুক্ত নয় এমন অনুন্নত জাতিদের জন্য একটি কমিশন গঠিত হয়, এবং এই কমিশনের সুপারিশসমূহ পর্যালোচনার জন্য বারবার নানা ধরনের কমিটি বসে। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগস্ট তারিখে লোকসভায় গোবিন্দবল্লভ পন্থ জানান যে সরকার অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে অনগ্রসরতার মানদণ্ডের প্রশ্নটি বিবেচনা করছেন। পরে এই বিষয়ে ১৯৬১-র মে মাসে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত রাজ্যসমূহের মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠকে স্থির হয় যে তফশিলী নয় এমন কোন অনগ্রসর জাতির ক্ষেত্রে কোন সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। বারো বছর ধরে অনুন্নত জাতিদের মনে নানা প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলে সেগুলির মূলোচ্ছেদ যেভাবে করা হয়েছে, এটা একটা নজীরবিহীন প্রবঞ্চনা।

আবার তফশিলী জাতিদের ক্ষেত্রেও সুযোগসুবিধা প্রদানের ব্যাপারে বৈষম্য করা হয়েছে। কেননা এই সকল জাতিদের মধ্যে কয়েকটি প্রভাবশালী জাতিই প্রদত্ত সুখসুবিধার সিংহভাগ ভোগ করে। যে সকল তফশিলী জাতি

ইতিমধ্যে উন্নতি করেছে তাদের তালিকা থেকে বাদ না দেবার ফলে একটি চিরস্থায়ী পঞ্চম বর্ণের উদ্ভব হয়েছে। ১৯৬১-র ফেব্রুয়ারি মাসে হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত তফশিলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত বিধায়কদের একটি সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে জওহরলাল নেহরু খোলাখুলিভাবেই এই জাতীয় সম্মেলনের অসমীচীনতার কথা বলেন। তিনি একথাও জানান যে চাকরি ও প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে সংরক্ষণের সুযোগ অনন্তকাল চলতে পারেনা। কিন্তু নেহরুর এই ইচ্ছা কার্যকর হয়নি, এমনকি তাঁর ভাষণের বিশ বছর পরেও। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অব সিডিউল্ড কাস্টস, ট্রাইবস য়্যান্ড আদার ব্যাক-ওয়ার্ড ক্লাসেস কেন্দ্রে এবং রাজ্যসমূহে নিজেদের স্বার্থ ঠিকমত রক্ষিত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য বিশেষ মন্ত্রিপদের দাবি করে। ১৯৬৫-র এপ্রিলে এস, এম, সিন্দিয়া তফশিলী জাতিদের স্বার্থরক্ষার জন্য একটি বিশেষ কমিশনের নিযুক্তি দাবি করেন। ২২·৫ শতাংশ চাকরি সংরক্ষণের পক্ষে এবং কোন কোন জাতিকে তফশিলী পর্যায় থেকে বাদ দেবার প্রস্তাবের বিপক্ষে লোকসভায় উত্তেজনাকর বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৬-র ২৬শে আগস্ট তারিখে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়ঃ "তফশিলী জাতিদের মধ্যে যারা একটি নির্দিষ্ট মানের অর্থনৈতিক উন্নতি করতে পেরেছে তাদের তফশিলী জাতি কোটা থেকে বাদ দেবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যে কঠিন আপত্তি উঠেছে তা থেকে প্রমাণিত হয় ক্রমাগত সুযোগ সুবিধাভোগ কিভাবে অনগ্রসরদের মধ্যেও কায়েমী স্বার্থের সৃষ্টি করতে পারে। অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা প্রদান সত্ত্বেও অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের তালিকা সংক্ষিপ্ততর না হয়ে স্ফীততর হয়েছে। তফশিলী জাতিদের ক্ষেত্রে কারা ওই তালিকায় থাকবে তা নির্ধারণের জন্য অর্থনৈতিক গজকাঠিবেই যদি মানদণ্ড না ধরা হয়, তাহলে তফশিলী জাতিরা চিরকালই তফশিলী থাকবে।" ১৯৬৭-র ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে টাইমস অব ইন্ডিয়ার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়ঃ "জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনা-সমূহের ক্ষেত্রে যদি কোন মৌলিক ত্রুটি থেকে থাকে তার কারণ এই নয় যে যে-সকল সুযোগসুবিধা দান করা হয়েছে সেগুলি অলীক। তার আসল কারণ হল এই সব সুযোগসুবিধাগুলি অধিকতর অগ্রসর এবং রাজনৈতিকভাবে অধিকতর সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীদেরই ভোগে লেগেছে, যাদের আদৌ কোন বিশেষ সাহায্যের প্রয়োজন ছিল না।"

আসলে অনুন্নত জাতি, তফশিলী জাতি, সংখ্যালঘু জাতি, উপজাতি ও সম্প্রদায় সকলের ক্ষেত্রেই শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গী বরাবরই রাজনৈতিক বিবেচনার

দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। তফশিলী নয় অথচ অনুন্নত এইরকম জাতিসমূহের ক্ষেত্রে প্রবঞ্চনার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ১৯৬৭-র সেপ্টেম্বরে হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত অল ইণ্ডিয়া ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ফেডারেশনের সম্মেলনে কোন কোন জাতির বিশেষ সুবিধাসমূহ জন্মগত অধিকারে পরিণত হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। ওই সম্মেলনে এই বলে দুঃখ প্রকাশ করা হয় যে কাকাসাহেব কালেলকরের নেতৃত্বে বিভিন্ন রাজ্যে তফশিলী ব্যতীত অপর অনগ্রসরদের যে বিস্তৃত তালিকা প্রস্তুত করা হয় এবং লোকসভায় উপস্থাপিত করা হয় তা ভারতবর্ষের ষাট শতাংশ মানুষের ভাগ্যহীনতার দলিল হওয়া সত্ত্বেও সেদিকে কোন দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। রাজ্য সরকারগুলি তাঁদের নিজস্ব এলাকায় অনগ্রসর জাতিসমূহের যে তালিকা প্রকাশ করেন তাতে দেখা যায় যে প্রতিটি রাজ্যে ষাট-সত্তর শতাংশ লোককে সংরক্ষণের আওতায় আনতে পারলে বিষয়টি ন্যায়সঙ্গত হয়। মহারাষ্ট্র সরকার ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ১২৫টি জাতিকে অনগ্রসর আখ্যা দিয়েছিলেন। ১৯৬৭-তে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১৭৮টিতে। কর্ণাটক (তৎকালীন মহীশূর) সরকার এই উদ্দেশ্যে নাগননাওদা কমিটি গঠন করেছিলেন। এই কমিটি ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে যে রিপোর্ট দেয় তাতে 'অনগ্রসর শ্রেণী' এবং 'অধিকতর অনগ্রসর শ্রেণী' এই দুই পর্যায়ে যথাক্রমে ৮১টি এবং ১৩৫টি জাতিকে তালিকাভুক্ত করা হয়, এবং এই জাতিগুলির মোট জনসংখ্যা ওই রাজ্যের জনসংখ্যার নব্বই শতাংশের মত হয়। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে আসন সংরক্ষণ প্রভৃতি ব্যাপারে কেরালা সরকার প্রতিষ্ঠিত একটি কমিশন পাঁচটি শ্রেণীবিভাগ করে যথা ইঝাভা, মুসলমান, ল্যাটিন ক্যাথলিক, অপরাপর পশ্চাদপদ খ্রীষ্টান এবং অপরাপর পশ্চাদপদ হিন্দু যারা জনসংখ্যার প্রায় আটষট্টি শতাংশ। এই সব থেকে বোঝা যায় যে অনগ্রসরদের জন্য সরকার যে সংরক্ষণ ও সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করেছে তার ফলভোগী তফশিলী জাতিরা অনগ্রসরদের একটি সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। অধিকাংশই সামান্যতম সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত, এবং সেই কারণেই অসন্তুষ্ট। এই অসন্তোষকেই আবার রাজনৈতিক মূলধন হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এটা অবশ্যই শাসক এবং বিরোধী উভয় পক্ষেরই রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার পরিচায়ক। এ-দুরবস্থার কারণগুলিও জানা দরকার।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ভারতের জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রধানত শিক্ষিত এবং নিজ পেশায় প্রতিষ্ঠিত কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের উপরই নির্ভরশীল ছিল, কিন্তু সংসদীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার পর কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে

পেশাদার রাজনীতিবিদদের উদ্ভব হয়, যারা রাজনীতিকেই জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে। এর ফলে বিশেষ করে শাসকদল বা কংগ্রেসের সংসদীয় ও সাংগঠনিক এই দুই শাখার ভেদ স্পষ্টতর হয় এবং প্রথমটি উত্তরোত্তর দ্বিতীয়টির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সাংগঠনিক শাখা রাজ্যভিত্তিক, জেলা ও মহকুমার স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত, এবং এই পর্যায়ের স্থানীয় নেতাদের কাজকর্মের দ্বারাই দলীয় যন্ত্র চালু থাকে, এদেরই উপর নির্বাচনী সাফল্য নির্ভর করে। এই নেতারা দীর্ঘকাল ধরেই রাজ্যস্তরে দল আঁকড়ে থাকেন, এবং স্থানীয় শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, ঠিকাদার, ধনী-চাষী প্রভৃতির সঙ্গে নিজেদের একটি কায়েমী স্বার্থ গড়ে তোলেন, গ্রামস্তরে বিভিন্ন প্রভাবশালী জাতিদের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করেন। কিন্তু তাঁদের যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা হচ্ছে নিজ দলের মধ্যেই অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সমস্যা। এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জন্যই ১৯৬৭-র নির্বাচনে বহু রাজ্যে কংগ্রেস পরাজিত হয়েছিল, যারা জয়লাভ করেছিল তারা কংগ্রেসেরই নানা বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী। আজও পর্যন্ত কংগ্রেসশাসিত রাজ্যগুলিতে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বই সবচেয়ে সংক্রামক ব্যাধি, অকংগ্রেসী রাজ্যগুলিও ব্যতিক্রম নয়। নেতৃত্বের সংসদীয় শাখা মোটামুটি ইংরাজী শিক্ষিত রাজনীতিবিদদের নিয়ে গঠিত, যাঁদের কিছুটা নিজস্ব পরিচিতি আছে। নেহরু যুগের অবসানের পর সংসদীয় কেন্দ্রীয় নেতারা রাজ্য বা আঞ্চলিক সাংগঠনিক শাখার উপর অধিকতর নির্ভরশীল হয়েছেন। কাগজে-কলমে মন্ত্রীদের দায়িত্ব লোকসভা বা বিধানসভায় প্রতি হলেও বাস্তবে সেই দায়িত্ব কিন্তু দলীয় সংগঠনের প্রতি, অর্থাৎ ক্ষমতাসীন দলের সাংগঠনিক শাখাই মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণ করে। আবার সাংগঠনিক শাখার মধ্যেও যেটি প্রধান উপদল বা গোষ্ঠী সেখানে অন্য উপদল বা গোষ্ঠী প্রধান হলে মন্ত্রিসভার অপসারণ সুনিশ্চিত হয়। সাংগঠনিক নেতৃত্ব যাঁদের হাতে সেই সকল নেতা ও কর্মীদের শিক্ষাগত ও মানসিক যোগ্যতার রীতিমত তারতম্য আছে এবং তাদের সামাজিক অবস্থানেরও পর্যায়ভেদ বর্তমান। তাদের দৃষ্টিভঙ্গী একান্তই স্বজনকেন্দ্রিক, বিপক্ষবিরোধী, স্থূল এবং স্থানীয় স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত। ফলে নেতৃত্বের উপর তলায় বা সংসদীয় শাখায় যতই চাকচিক্য থাকুক না কেন, নেতাদের ব্যক্তিগত ক্যারিসমা বা আকর্ষণীয়তা যেমনই হোক না কেন, সে-নেতৃত্ব যতই উদার ভাবনাকে আশ্রয় করতে ইচ্ছা প্রকাশ করুক না কেন, নেতৃত্বের সাংগঠনিক শাখায় বা অন্তর্কাঠামোয় বিপরীতমুখী চিন্তাধারা প্রবাহিত। এই পর্যায়ে সাম্প্রদায়িক, জাতিগত, উপজাতিগত এমনকি এলাকাগত

দাবিদাওয়া রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রধান উৎসে পরিণত হয়, এবং সকল দলেরই নিম্নপর্যায়ের সংগঠানিক নেতৃত্ব, এমনকি একই দলের সাংগঠনিক নেতৃত্বের বিভিন্ন গোষ্ঠী নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য বিচ্ছিন্নতাবাদী ও জাতিবিদ্বেষী মনোভাবসমূহকে প্রশ্রয় দেয়। রাজনীতির বহির্কাঠামোর সঙ্গে অন্তর্কাঠামোর এই পরস্পর বিরোধিতা জাতি-রাজনীতিকে স্তিমিত করার পরিবর্তে আরও উজ্জীবিত করেছে।

এখনও পর্যন্ত রাজনৈতিক শক্তির প্রধান উৎস গ্রাম, কেননা দেশের জনসংখ্যার মোট তিরাশি শতাংশ গ্রামে বাস করে। প্রতিটি গ্রামেই কয়েকটি প্রধান কৃষিজীবী জাতি বর্তমান যারা গ্রামের অধিকাংশ জমির মালিক। এছাড়া কিছু অপ্রধান কৃষিজীবী জাতিও আছে যাদের ভূমির পরিমাণ খুবই অল্প, অথবা যারা ভাড়াটে, ভাগচাষী বা ভূমিশ্রমিক হিসাবে কাজ করে। তদুপরি গ্রামে কারিগর জাতিসমূহ এবং আরও কিছু জাতি বাস করে যাদের কাজ গ্রামসমাজের সেবায় লাগে এবং কৃষিব মরশুমে যারা ভূমিশ্রমিক হিসাবেও কাজ করে। কৃষিজীবী জাতিদের সঙ্গে এই পেশাদার জাতিদের সম্পর্ককে উত্তর ভারতের নানাস্থানে যজমানী-পরিজন সম্পর্ক বলে অভিহিত করা হয়। তবে প্রধান কৃষিজীবী জাতিরাই বাস্তবে গ্রামসমাজের মাতব্বর যদিও জাতিকাঠামোয় তারা মধ্যশ্রেণীর জাতি। সামাজিক প্রতিপত্তি ও মানমর্যাদার প্রশ্নে এই প্রভাবশালী জাতিগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্ক বর্তমান। আবার নিম্ন পর্যায়ের জাতিদের মধ্যেও ভেদ ও সংঘাত লক্ষ্য করা যায়। যেমন, উত্তর প্রদেশের বিজনোর জেলায় সমীক্ষা চালিয়ে সেলিগ হ্যারিসন দেখিয়েছেন যে এখানকার রাজনৈতিক সংঘাত চারটি গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, একদিকে জাঠ বনাম চৌহান রাজপুত, অপর দিকে রাইদাসী সভাভুক্ত চামার বনাম শোষিত সংঘ। আজমগড় জেলায় নানা জাতিবর্ণের মানুষ থাকলেও মূল রাজনৈতিক সংঘাত কিন্তু রাজপুত ও মাল্লাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। রাজস্থানে দুটি প্রধান শক্তি রাজপুত ও জাঠ জাতি হিসাবেই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। ভূম্যধিকারী রাজপুতদের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে জাঠ, আহির, গুজর ও মীনাদের সংযুক্ত মোর্চা গঠিত হয়। গুজরাতের রাজনৈতিক সংঘাত মূলত পাটিদার ও বরইয়াদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কেরালার দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী জাতি নায়ার ও ইঝাভা, বিহারের ভূমিহার, রাজপুত ও কায়স্থ। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ ততটা জাতিবিদ্বেষ নয় যতটা বৈষয়িক ও সামাজিক প্রাধান্যলাভে আগ্রহ। আমরা আগে দেখেছি যে মধ্যশ্রেণীর জাতিগুলির মধ্যে জাতিকাঠামোর আরও

উপরের দিকে ওঠার একটা বিশেষ প্রবণতা আছে। যদিও ব্রাহ্মণের বিধিসম্মত শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করা যায়না, মধ্যশ্রেণীর প্রভাবশালী জাতিরা মনস্তাত্ত্বিক-ভাবে নিজেদের বাস্তব শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চায়, এবং সেখানে একজাতি অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হলে উভয়ের মধ্যে সংঘাতটা স্বাভাবিক হয়ে পড়ে।

কিছুকাল আগে পর্যন্ত বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ গ্রহণই রাজনৈতিক দলগুলির স্বীকৃত কর্মপদ্ধতি ছিল, অর্থাৎ এক একটি দল এক একটি জাতির পক্ষ অবলম্বন করত। ইদানীং এই পদ্ধতির কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯৫২ সালের নির্বাচন থেকেই দেখা গেছে যে পুরোনো আমলের পরিচিত রাজনৈতিক কর্মীদের বদলে নির্বাচন প্রার্থী হিসাবে এমন লোকদের মনোনয়ন দেওয়া শুরু হয়েছে যারা প্রচুর ব্যয় করতে সক্ষম। শ্রীযুক্ত সেগল তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে ভারতীয় শিল্পপতি ও বণিকশ্রেণী কংগ্রেসকে বহু অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছে এবং স্বাধীন ভারতে এই ঐতিহ্য আরও জোরদার হয়েছে। একথা শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বিড়লা-ও লিখেছেন। ফলে রাজনীতিবিদ্ ও তাঁর জ্ঞাতিদের উপরই বণিকশ্রেণীর দাক্ষিণ্য শুধু অকৃপণভাবেই বর্ষিত হয়নি, তার প্রসার ঘটেছে অবসরপ্রাপ্ত শাসনবিভাগীয় ও সমরবিভাগীয় আমলাদের ক্ষেত্রেও, যাদের প্রভাব মন্ত্রী এবং পদস্থ কর্মচারীদের উপর প্রচুর। শিল্পক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মূলধন লগ্নীর পরিমাণ যত বেড়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি বেড়েছে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ যেখানে অনুৎপাদক খাতেও কোটি কোটি টাকা ঢালা হয়েছে এবং হচ্ছে। এর ফলে একদিকে যেমন মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যস্তরের বৃদ্ধি ঘটেছে, অন্যদিকে তেমনই মধ্যস্তরের লোকদের হাতে অনেক কাঁচা পয়সা জমা হয়েছে। ম্যালেনবাউম দেখিয়েছেন যে স্বাধীন ভারতের উদ্যোগীশ্রেণীর একটা বড় অংশ এই মধ্যস্তরের লোকদের থেকে এসেছে এবং এই স্তরটি একটি বিশেষ ধরনের কায়েমী স্বার্থে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে এই স্তর থেকে যে সকল লোক রাজনীতিতে আসে তারা মূলত নানা ধরনের দালালি, কোম্পানির এজেন্সি, পেট্রোলপাম্প, ঠিকাদারি, ছোট শিল্প প্রভৃতির দ্বারা বেশ সমৃদ্ধ। গ্রামাঞ্চলে এরা সচরাচর জোতদার বা ধনীচাষী, চালকল বা হিমঘরের মালিক, আড়তদার অথবা মহাজন ব্যবসায়ী অথবা জমিওয়ালা-শিক্ষক।

বর্তমানে নির্বাচন পদ্ধতি এত জটিল ও ব্যয়বহুল হয়েছে যে শাসক ও বিরোধী সকল রাজনৈতিক দলকেই বিত্তবান সম্প্রদায়গুলির উপর নির্ভর করতে হচ্ছে, নগরাঞ্চলে বণিক, শিল্পপতি ও কালো-টাকার কারবারীদের উপর,

এবং গ্রামাঞ্চলে সেই সব জাতিদের উপর যারা কৃষি, মহাজনী ও অন্যান্য উপায়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অধিকারী হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে মধ্যশ্রেণীর জাতিগুলিই বর্তমান রাজনীতির চাহিদা মেটাতে সক্ষম, এবং সেই হেতু তাদের মুখ চেয়ে কাজ করা এবং তাদের মনোভাবসমূহকে সমর্থন করা রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষে অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। তাই অতি সুকৌশলে এই উচ্চ কৃষিজীবী জাতিদের দিয়ে তফশিলী জাতিদের সুযোগসুবিধা ও সংরক্ষণের বিরুদ্ধে ধুয়া তোলা হচ্ছে। উত্তর ভারতের জাঠ ও গুজরাতের পাটিদারদের ভয়ানকভাবে সংরক্ষণবিরোধী করে তোলা হয়েছে। মহারাষ্ট্রে মারাঠা জাতি সংরক্ষণনীতির এত বেশি বিরোধী হয়ে পড়েছে যে এই প্রশ্নে (১৯৮৩) মহারাষ্ট্রের বিধান-সভা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। উত্তর-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রভাবশালী জাতিদের নিয়ে একটা সামাজিক কোয়ালিশনও গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে প্রধানত আহির (যাদব), জাঠ, গুজর ও ভাট্টিদের নিয়ে। এই সকল জাতি যাতে রাজনৈতিক স্বার্থে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিরত হয়ে সেই উদ্দেশ্যে তাদের একটি সাধারণ ও অভিন্ন উৎস থেকে উদ্ভব হওয়ার উপকথার সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তা প্রচারও করা হচ্ছে। এই সকল ঘটনা অনুন্নত জাতিদের পক্ষে আতংকজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের মধ্যে নিয়ত ক্ষোভ ও নৈরাশ্যের সৃষ্টি হচ্ছে যার পরিণামে কোথাও কোথাও অনুন্নত জাতিদের মধ্যে উগ্রপন্থা প্রশ্রয় পাচ্ছে এবং তাদের নরমপন্থী নেতাদের প্রতিষ্ঠাও ক্রমশ লোপ পাচ্ছে।

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে জাতিপ্রথা এত ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যে প্রচলিত উৎপাদন ও বন্টনব্যবস্থার আমূল রূপান্তর ব্যতিরেকে জাতিপ্রথার অবসান সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও শিল্পায়নের সুফল দেশের মোট জনসংখ্যার তিরিশ শতাংশের উপর বর্তেছে। এর ফলে সমাজের উপর তলায় কিছুটা সচলতার (মোবিলিটি) সৃষ্টি হলেও তার কম্পন সর্বস্তরে উপলব্ধ হয়নি। বৃটিশ আমল থেকেই ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ নিয়ে যারা নানা আধুনিক পেশা অবলম্বন করে মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, স্বাধীন ভারতের নিঃসন্দেহে তাদের কর্মক্ষেত্রের সীমা অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে, এবং এই স্তরে সামাজিক সচলতা স্বাভাবিকভাবে বেশি হওয়ার দরুন জাতিপ্রথার বাঁধন অনেকটা আলগা হয়েছে। দেশজোড়া দ্রুত শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হলে অধিকাংশ মানুষকে কায়ক্লেশে কৌলিক পেশায় আবদ্ধ থাকতে হতনা, জাতিপ্রথার বেড়া আপনিই ভেঙে পড়ত। কিন্তু যাট

কোটি মানুষের দেশে যে গতিতে শিল্পায়ন হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি গতিতে জনসংখ্যা বেড়েছে, যা সামাজিক সচলতার গতি উত্তরোত্তর মন্থর করে দিয়েছে। তদুপরি সরকারী ও বৃহৎ বেসরকারী উদ্যোগে যে সব কলকারখানা গড়ে উঠেছে সেগুলি ততটা শ্রমভিত্তিক নয় যতটা মূলধন ও আধুনিক যান্ত্রিকতা ভিত্তিক। ফলে এগুলিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ তেমন বেশি নয়। বৃহৎ উদ্যোগীদের কথা স্বতন্ত্র, কেননা সেই সকল ক্ষেত্রে নানা ধরনের মানুষের দক্ষতা ও শ্রমশক্তি কাজে লাগে, কিন্তু মধ্যম ও ছোট উদ্যোগীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা নিয়োগ ও পরিচালনার ব্যাপারে স্বজাতি ও স্বসম্প্রদায়ের মানুষ ছাড়া ভাবতে পারে না। নিম্নবর্ণের পেশাদার জাতিসমূহের ক্ষেত্রে কর্ম-সংস্থানের সুযোগ খুব কম থাকায় তারা কৌলিক বৃত্তিতে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হয়। দিনমজুর, ভূমিশ্রমিক, কারিগর ও নিম্নবৃত্তিজীবী মানুষদের কথা পরিকল্পনাকারেরা চিন্তাও করেননি, এমনকি এই সকল শ্রেণীর মানুষদের জন্য কোন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কিছু করার ভানও করা হয়নি। কাজেই নিম্নস্তরে জাতিপ্রথার প্রাধান্য সবচেয়ে বেশি, কেননা এখানে জীবিকার জন্য জাতব্যবসা অবলম্বন এবং আত্মরক্ষার জন্য স্বজাতির মধ্যে সংহতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। কাজেই জাতিপ্রথা প্রত্যাখ্যান করার মত কোন বিকল্প তারা আজও পর্যন্ত খুঁজে পায়নি। ইদানীং কোন কোন লেখক, সম্ভবত কোন রাজনৈতিক তত্ত্বের পূর্বধারণাবশত, দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে স্বাধীন ভারতে আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার ফলে বিভিন্ন জাতি থেকে বহুলোক অন্য পেশায় সরে এসেছে এবং যন্ত্রশিল্পে নিযুক্ত হবার ফলে তারা তাদের জাতিগত সত্তা হারিয়ে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি অর্থনৈতিক শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়েছে। ভারতের বিরাট জনসংখ্যার সর্বস্তরে যদি নূতন উৎপাদন ব্যবস্থার প্রকৃত প্রভাব পড়ত, যে জনসংখ্যার শতকরা তিরাশী ভাগই গ্রামবাসী, তাহলে এই ধরনের ধারণাকে হয়ত প্রশ্রয় দেওয়া যেত, কিন্তু সে রকম কোন লক্ষণ দেখা যায় না। সাদামাটা কথায় যেটুকু বলা যায় তা হচ্ছে এই যে স্বাধীনতা উত্তর অর্থনৈতিক পরিকল্পনাসমূহ এমন কোন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বা পূর্বশর্তের সৃষ্টি করতে পারেনি যেখানে সামাজিক সচলতা জাতিপ্রথার গণ্ডী ভেঙে দিতে সক্ষম।

পরিশিষ্ট

ভারতে দাসপ্রথা

সুপ্রাচীন কাল থেকেই পৃথিবীর নানাস্থানে দাসপ্রথার প্রচলন ছিল। বিশেষ করে প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস ও রোমে দাসপ্রথা সমাজব্যবস্থার অতি-প্রয়োজনীয় অংশ হিসাবে বিবেচিত হত। প্রাচীন গ্রীসের যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বড়াই করতে পশ্চিমী পণ্ডিতরা কখনও ক্লান্ত হননা, সেই গণতন্ত্রে তিন চতুর্থাংশ মানুষই ছিল দাস যাদের ব্যক্তিসত্তার স্বীকৃতি ছিলনা, যাদের জীবন তাদের প্রভুদের মর্জির উপরেই নির্ভর করত। বস্তুত প্রাচীন ইউরোপে ও পশ্চিম-এশিয়ায় দাসপ্রথার এত বিস্তৃতি ছিল যে কোন কোন সমাজতত্ত্ববিদ মানব-ইতিহাসের একটি পর্যায়কে 'দাসতার যুগ' বলে অভিহিত করেছেন। ইউরোপীয় জাতিগুলি পরবর্তীকালে যখন আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে তখন নিজেদের কৃষিক্ষেত্রে এবং অন্যান্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে কাজ করানোর জন্য আফ্রিকা থেকে প্রচুর দাস আমদানী করত, এবং এই দাস ব্যবসা একটি অত্যন্ত সুপরিকল্পিত নিষ্ঠুর ব্যবসাতে পরিণত হয়েছিল। এমন কি আধুনিক যুগেও ইউরোপীয় জাতিদের কাছে দাসব্যবসা অতিশয় লাভজনক বৃত্তি হিসাবে পরিগণিত হত। ওয়েস্টারমার্ক লিখেছেন: 'এই দাস প্রথা, যা বৃটিশ উপনিবেশসমূহে নিষ্ঠুরতার দিক থেকে যে কোন প্রাচীন বা আধুনিক পৌত্তলিক দেশের নিষ্ঠুরতাকে বহুগুণে ছাপিয়ে গিয়েছিল, খ্রীস্টান সরকারদের দ্বারা শুধুমাত্র স্বীকৃতই ছিলনা, প্রোটেস্টান্ট এবং ক্যাথলিক নির্বিশেষে খ্রীস্টীয় যাজকমণ্ডলী এই প্রথার ঘোরতর সমর্থক ছিল।" পশ্চিম-এশীয় দাসপ্রথার উত্তরাধিকার মুসলমান সমাজেও বর্তেছিল যার ফলে মুসলমান নৃপতিগণ শাসিত রাজ্যসমূহে এই প্রথার বিস্তৃতি ঘটেছিল। ভারতবর্ষে দাসপ্রথা যে ছিলনা তা নয়, কিন্তু অন্যান্য দেশের মত এখানে এই প্রথার বাড়াবাড়ি ছিল না, এবং এখানকার সমাজকাঠামোয় দাসের বিশেষ কোন ভূমিকা ছিল না। অতি সীমাবদ্ধ পরিসরে ও অতি সীমাবদ্ধ প্রয়োজনে (যেমন গৃহকর্ম ইত্যাদি) কিছু কিছু দাস কেনাবেচা এখানে চলত, এবং কেউ স্বেচ্ছামূলকভাবেও আত্মবিক্রয় করত, কিন্তু এর পরিসর মোটেই বিস্তৃত ছিল না। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন কোন রাজার কল্পনা করা যায় না যিনি

পরদেশ জয় করে হাজার হাজার মানুষকে শৃংখলিত করে নিয়ে এসেছেন এবং তাদের শ্রম নিজ রাজ্যের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। আসলে ভারতবর্ষের চির-প্রচলিত জাতিবর্ণপ্রথার সঙ্গে দাসপ্রথা খাপ খায় না। তাই মেগাস্থেনেস যথার্থই মন্তব্য করেছিলেন যে ভারতবর্ষে দাসপ্রথা নেই। এর অর্থ, তিনি স্বদেশে যে দাসপ্রথার চিত্র দেখেছিলেন সে-রকম কোন চিত্র এদেশে তাঁর চোখে পড়েনি। বস্তুত সে-আমলেও ভারতবাসী নিজেদের জাতিবর্ণভিত্তিক সামাজিক বৈশিষ্ট্যের কথা জানত, এবং ভারতের বাইরে যে দাসপ্রথা ছিল সে খবরও তারা রাখত। বৌদ্ধ আসসলায়ন সুত্তে বলা হয়েছে যে যবনদের দেশে দুটি বর্ণ, আর্য ও দাস, অর্থাৎ ফ্রীম্যান এবং শ্লেভ। এ ব্যবস্থা যে ভারতীয় ব্যবস্থার চেয়ে পৃথক সে বোধও তাদের ছিল।

ভারতীয় সমাজে দাসপ্রথার গুরুত্ব নগণ্য হলেও, এবিষয়ে যেটুকু তথ্য আমাদের হাতে আছে তা এখানে উপস্থাপিত করা দরকার। ঋগ্বেদে 'দাস' শব্দটি পরাজিত শত্রু অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে এবং এমনও হতে পারে যে বিজেতারা তাদের সত্যই দাস হিসাবে ব্যবহার করেছে (৮।৫।৩৮, ৮।৫৬।৩, ইত্যাদি)। কেউ কেউ মনে করেন যে বিজিত দাসরাই পরে বর্ণকাঠামোয় শূদ্র হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল, যে প্রসঙ্গ আমরা আগে আলোচনা করেছি। 'দাসীর' উল্লেখ, এবং দান বা উপহার হিসাবে তাদের প্রদান বা গ্রহণের উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যের নানাস্থানে আছে (ঋগ্বেদ ৮।১৯।৩৬, তৈত্তিরীয় সংহিতা ২।২।৬।৩, ৭।৫।১০।১, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩৯।৮, কঠ উপনিষদ ১।১।২৫, বৃহদারণ্যক ৪।৪২৩, ৬।২।৭, ছান্দোগ্য ৫।১৩।৩) কিন্তু তারা ক্রীতদাসী অথবা যুদ্ধে জিত নারী, অথবা সাধারণভাবেই দাসী কিনা তা বলা যায় না। তারা স্বাধীন ছিল কিনা, অর্থাৎ তাদের জানমানের মালিক তারা নিজেরা ছিল কিনা, সে বিষয়েও কিছু বলা যায় না। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণসমূহে রাণী বা রাজকন্যাদের সহচরী দাসীদের উল্লেখ আছে, যাদের কারো কারো গর্ভে রাজারাও সন্তান উৎপাদন করেছেন, কিন্তু তারা সর্বস্বাধীনতাবিরহিত ক্রীত বা অধিকৃত দাসী ছিল কিনা বলা শক্ত। একালেও ধনীকন্যার শ্বশুরবাড়িতে তার পিত্রালয়ের দাসীকে নিয়ে যাবার রীতি আছে, কিন্তু সে দাসী নিশ্চয়ই ক্রীতদাসী নয়। মহাভারতে (২।৫২।৪৫, ৩।২৩৩।৪৩, ৪।১৮।২১, ৩।১৮৬।৩৪) সালাংকারা দাসীদের উপহার হিসাবে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এখানে দাসী অর্থে শ্লেভ-গার্ল অথবা সার্ভিং-গার্ল বুঝিয়েছে সেটা খুব স্পষ্ট নয়। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৭।৫।১০।১) যজ্ঞস্থলে মাথায় কলসী নিয়ে নৃত্যরতা দাসী-

দের কথা বলা হয়েছে। এই বিশেষ পরিবেশে তাদের আনুষ্ঠানিক নৃত্যগীত প্রতিপাদন করে যে এখানে দাসী শব্দটি সাধারণভাবে পরিচারিকা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪।৪।২৩) বলা হয়েছে যে যাজ্ঞবল্ক্যের কাছ থেকে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করে প্রীত হয়ে জনকরাজা বিদেহগণ সহ তাঁর দাসত্ব স্বীকার করেছিলেন ঃ সোহং ভগবতে বিদেহান্ দদামি মাং চাপি সহ দাস্যায়। এই দাসত্ব স্বীকার নিশ্চয়ই সৌজন্যবোধক। আবার ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬ ২৪।২) বলা হয়েছে যে গো, অশ্ব, হস্তী, সুবর্ণ, স্ত্রী, দাস, ক্ষেত্র এবং গৃহ মানুষের মহিমাসূচক। এখানে দাস ক্রীত অথবা উপহার হিসাবে প্রদত্ত অথবা বেতন ভোগী পরিচারক। আসলে প্রাচীন সাহিত্যে দাস ও দাসী শব্দ দুটি নানা অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে।

তবুও মানুষ কেনাবেচার ব্যাপারটা যে একেবারেই অপরিচিত ছিল তা নয়, যদিও বিষয়টি অন্যান্য দেশের মত ব্যবসায়িক পর্যায়ে ওঠেনি, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের কাহিনী অনুযায়ী অজীগর্ত তার মধ্যম পুত্র শুনঃশেপকে রোহিতের নিকট শত ধেনুর বিনিময়ে বিক্রয় করেছিল। পুরাণের কাহিনী অনুযায়ী রাজা হরিশ্চন্দ্র নিজেকে বিশ্বামিত্রের নিকট বিক্রয় করেছিলেন এবং তাঁর দাস হয়েছিলেন। মহাভারতের কাহিনীতে দেখা যায় যে দ্যুতসভায় যুধিষ্ঠির নিজেদের দাসত্বের বাজি ধরেছিলেন। তবে আমরা আগে যা বলেছি, বিভিন্ন জাতির লোকের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের শ্রম ও সেবা গ্রহণের যে সুনির্দিষ্ট সামাজিক ব্যবস্থা জাতিপ্রথার মাধ্যমে গড়ে উঠেছিল, তার সঙ্গে ক্রীতদাসত্ব বা দাসশ্রমভিত্তিক সমাজব্যবস্থার সঙ্গতি ছিল না, যে কারণে কোন ব্যক্তির অধীনে কোন ব্যক্তি দাস হিসাবে থাকলেও, সামগ্রিকভাবে তার গুরুত্ব খুব বেশি ছিল না। এখানে প্রতিটি ব্যক্তিরই আনুগত্য যে যে জাতি বা শাখাজাতি বা উপশাখাজাতির অন্তর্গত এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ তার প্রতি। এর বাইরে সুবিস্তৃত দাসপ্রথা বিকাশের সুযোগ খুবই কম, তবুও হয়ত গৃহকর্ম প্রভৃতির প্রয়োজনে অর্থের বিনিময়ে বা জমি, পশু বা অন্য কিছুর বিনিময়ে কিছু মানুষ কেনাবেচা হত, এবং স্বাভাবিকভাবেই এই সব মানুষরা কোন সুনির্দিষ্ট জাতি বা নৃগোষ্ঠী থেকে আসত না। তবু কিছু দাস, সমাজজীবনে তাদের ভূমিকা গৌণ হলেও, বরাবরই বর্তমান ছিল এবং তাদের নিয়ে শাস্ত্রকারদের কিছু সমস্যাও ছিল। এখানে প্রত্যেক জনগোষ্ঠীরই সামাজিক স্থান, ভূমিকা এবং মর্যাদার বিষয়গুলি সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া শাস্ত্রকারদের কর্তব্য ছিল, এবং এক্ষেত্রে তাঁদের খুব

বেশি সমস্যায় কখনও পড়তে হয়নি। কিন্তু বিভিন্ন জাতিবর্ণ থেকে আগত স্বল্পসংখ্যক দাসদের সম্পর্কে তাঁরা কখনও ঐক্যমতে পেঁছাতে পারেন নি, এবং এই প্রসঙ্গে তাঁদের বক্তব্যে কিছুটা পরস্পরবিরোধিতা আছে, যা আমরা দেখব।

জৈমিনি (৬।৭।৬) স্পষ্টভাবে বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি বিশ্বজিৎ যজ্ঞে তার সর্বস্ব দান করে সে কিন্তু তার অনুগত কোন শূদ্রকে দান করার অধিকারী নয়। এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শবর বলেন কার অধীনে কোন শূদ্র কাজ করবে সেটা তার নিজস্ব ব্যাপার। ফলে রাম নামক ব্যক্তি যদি তার অধীনে কর্মরত কোন শূদ্রকে শ্যাম নামক কোন ব্যক্তির নিকট দান করে তাহলে ওই শূদ্র শ্যামের অধীনে কাজ করতে বাধ্য নয়। এক্ষেত্রে সেই শূদ্রের শাস্ত্রসঙ্গত অধিকারের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ হয়ে যাচ্ছে। জৈমিনির নির্দেশ ও শবরের ব্যাখ্যা থেকে দাসপ্রথার মূল ভিত্তিটাই বাতিল হয়ে যায়, কেননা কার কাছে সে কাজ করবে এবং কার কাছে সে কাজ করবে না এটা স্থির করা যদি দাসের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল হয়, তাহলে ব্যাপারটাকে শ্লেভারি বা প্রকৃত দাসত্ব বলা যায় না। জৈমিনি শুধু শূদ্রের কথাই বলেছেন কেননা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য দ্বিজাতির অন্তর্গত হওয়ায় তাদের দাস করা যায় না, তত্ত্বের দিক থেকে। এক্ষেত্রে মনুও এমন কথা বলেছেন যাতে কোন ব্যক্তিকে দাসে পরিণত করা যায় না। মনু (১।৯১, ৮।৪১৩-১৪) বলেন যে শূদ্রের শাস্ত্রনির্দিষ্ট কাজ হচ্ছে উপরের তিন বর্ণের সেবা করা। দ্বিজাতিকে ব্যাপকভাবে সেবা করার জন্যই স্রষ্টা শূদ্রদের সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু এমন নির্দেশ কখনও দেননি যে শূদ্র কারও দাস হবে। শূদ্র চাতুর্বর্ণের অঙ্গ, সেবাধর্মপালনই তার কর্তব্য, কিন্তু সে কোন ব্যক্তির অধীন নয়। অর্থাৎ শাস্ত্রীয় ব্যবস্থায়, অর্থাৎ চাতুর্বর্ণের কাঠামোয়, দাসপ্রথার অবস্থিতি এবং যৌক্তিকতা স্বীকৃত নয়।

তবু তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবের কিছুটা ফারাক থাকে। মেগাস্থেনেসের (স্ট্রাবো ১৫।১।৫৪) চোখে না পড়লেও মৌর্য আমলে যে দাস ছিল তা অশোকের নবম পর্বত-অনুশাসন থেকে প্রমাণিত হয় যেখানে তিনি দাসদের প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। মনুও (৮।২৯৯-৩০০) দাসদের বাস্তব অবস্থিতির কথা জানতেন এবং তিনি বলেছেন যে কোন দাস কোন অপরাধ করলে তাকে সেই রকম শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন যে রকম শাস্তি অনুরূপ অপরাধের জন্য স্ত্রী, পুত্র এবং ভ্রাতাও পেতে পারে। অর্থাৎ শাস্তিদানের ক্ষেত্রে পরিবারের

অপরাপর সদস্যদের সঙ্গে দাসদের পৃথক চোখে দেখা চলবে না। মনু (৮।৪১৫) সাত ধরনের দাসের কথা বলেছেন ঃ যারা যুদ্ধে অধিকৃত হয়েছে, যারা দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির জন্য খাদ্যের অভাবে দাসত্ব স্বীকার করেছে, যারা দাসীর গর্ভে জন্মেছে, যাদের কেনা হয়েছে, যারা পিতামাতা বা আত্মীয়স্বজন কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে, যারা উত্তরাধিকার সূত্রে দাস হয়েছে এবং যারা আইনগত কারণে দাসত্ব স্বীকার করেছে। যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্রাহ্মণ বা দ্বিজাতির অন্তর্গত লোককে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাসে পরিণত করে তার ৬০০ পণ জরিমানা হবে। কৌটিল্য (অর্থশাস্ত্র ৩ ১৩) বলেন যে ম্লেচ্ছরা যদি নিজেদের সন্তানদের বন্ধক দেয় বা বিক্রয় করে সেক্ষেত্রে তারা শাস্তিযোগ্য হবে না, কিন্তু আর্যদের কখনও দাস করা যাবে না। স্বভাবতই এখানে ম্লেচ্ছ বলতে শক, হূণ, যবন প্রভৃতি বহিরাগত জাতিদের বোঝানো হয়েছে, এবং আর্য বলতে চাতুর্বর্ণভুক্ত স্থানীয় অধিবাসীদের বোঝানো হয়েছে। তিনি বলেন এমনকি কোন নাবালক শূদ্রকে তার কোন আত্মীয় বন্ধক দিলে বা বিক্রয় করলে বিক্রেতা এবং ক্রেতা উভয়কেই কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে, অপর তিন বর্ণের ক্ষেত্রে তো কথাই নেই। তবে একান্ত বিপন্ন হলে কোন আর্য নিজেকে বন্ধক রাখতে পারে। কৌটিল্য কয়েক প্রকার দাসের উল্লেখ করেছেন যথা ধ্বজাহৃত (যুদ্ধে জিত), আত্মবিক্রয়ী (যে নিজেকে বিক্রয় করে), উদরদাস বা গর্ভদাস (যারা দাসীর গর্ভজাত), আহিতক (যারা ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে দাসত্ব স্বীকার করে), দণ্ড প্রণীত (যারা কোন অপরাধ করার শাস্তি হিসাবে দাসত্বের দণ্ডাজ্ঞা পায়) প্রভৃতি। তবে প্রতিক্ষেত্রেই অর্থপ্রদানের দ্বারা দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এছাড়া যদি দাসদের বিরুদ্ধে তার মনিব কোন অপরাধ করে, অর্থাৎ যদি তাকে দিয়ে কোন কুকর্ম করায়, অথবা প্রহার করে, অথবা দাসীকে ধর্ষণ করে সেক্ষেত্রে দাস মালিকের আনুগত্য অস্বীকার করে নিজে স্বাধীন হতে পারে, এবং এই ধরনের কাজের জন্য মালিককে রাজদণ্ড ভোগ করতে হয়।

অন্যান্য স্মৃতিকারদের মধ্যে নারদ এবং কাত্যায়ন দাসদের সম্পর্কে সুবিস্তৃত বিধান দিয়েছেন। নারদ শুশ্রূষক বা সেবাকারীদের পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন—শিষ্য, অন্তেবাসী (শিক্ষানবিশ), অধিকর্মকৃৎ (পরিদর্শক), ভৃতক (ভাড়া করা লোক) এবং দাস। তাঁর মতে দাস পনের ধরনের—যারা গৃহে দাসীর গর্ভে জন্মেছে, যাদের কেনা হয়েছে, যারা সংগৃহীত হয়েছে (দান কিংবা অন্যভাবে), যারা উত্তরাধিকার সূত্রে এসেছে, যারা দুর্ভিক্ষের সময়

দাসবৃত্তি গ্রহণ করেছে, যারা বন্ধকীস্বরূপ এসেছে, যারা যুদ্ধে বন্দী হয়েছে, যারা দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে দাসত্ব স্বীকার করেছে, যারা সন্ন্যাসধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছে, যারা কিছুকালের জন্য দাস হিসাবে কাজ করে, যারা শুধুমাত্র খাদ্যের জন্যই দাস হয়, যারা কোন দাসীর প্রতি ভালবাসার জন্য নিজেরা দাসত্ব স্বীকার করে এবং যারা নিজেদের অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় করে। অবশ্য দাসত্ব থেকে সহজে মুক্তি পাবার নানা উপায় আছে। নারদ (৫।০) এবং যাজ্ঞবল্ক্য (২।১৮২) বলেন যে প্রভুর কোন বিশেষ উপকার করলে, বিশেষ করে প্রাণরক্ষা করলে দাস তৎক্ষণেই মুক্ত হয়, অন্যান্য ক্ষেত্রে যে শর্তাধীনে এক ব্যক্তি দাস হয়েছে সেই শর্তের পূরণ হয়ে গেলে দাস মুক্তি পায়। যদি কোন ব্যক্তি অর্থের জন্য নিজেকে দাস হিসাবে বন্ধক দেয় ওই অর্থ প্রত্যার্পণ করে সে মুক্তি পায়, কোন সুন্দরী দাসীর মোহে কেউ যদি দাসত্ব গ্রহণ করে সেই মোহের ভঙ্গ হলে তার মুক্তি পেতে বাধা নেই। যাজ্ঞবল্ক্য (২।১৮২) বলেন যে যদি কাউকে বলপূর্বক দাস করা হয়, অথবা যুদ্ধ বা হামলার দ্বারা কোন ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে গিয়ে দাস করা হয় রাজার কর্তব্য তাকে মুক্তি দেওয়া।

বস্তুত ধর্মশাস্ত্রকারেরা যেভাবে দাসপ্রথাকে দেখেছেন, যেভাবে দাসদের শ্রেণীবিভাগ করেছেন বা তাদের মুক্তির জন্য যে ধরনের নানা বিধান দিয়েছেন, তা থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে এখানে দাসদের গৃহভৃত্যের কাজ করতে হত, মাসিক বা বার্ষিক বেতনের পরিবর্তে আহার ও আশ্রয়ের বিনিময়ে সারাজীবন, এবং কোন দাস ইচ্ছা করলে সহজেই মুক্তি পেতে পারত। এই ব্যবস্থার সঙ্গে অন্যান্য দেশের দাসপ্রথার কোন তুলনাই চলে না। আর তাছাড়া কাউকে দাস হিসাবে রাখার হাঙ্গামাও কম নয়, বিশেষ করে ভারতের মত জাতিবর্ণশাসিত সমাজে। যাজ্ঞবল্ক্য (২।১৮৩) বলেন যে কেউ যদি দাস রাখার ইচ্ছা করে তাহলে তাকে অনুলোমজ দাস হতে হবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ তার নীচের তিন বর্ণের মানুষকে দাস হিসাবে রাখতে পারে, ক্ষত্রিয় কেবলমাত্র বৈশ্য ও শূদ্রকে দাস হিসাবে রাখতে পারে কিন্তু ব্রাহ্মণকে নয়, বৈশ্য একমাত্র শূদ্রকে দাস হিসাবে রাখতে পারে কিন্তু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে নয়, এবং শূদ্র যে উপবর্ণ বা শাখাজাতির অন্তর্গত, দাস রাখতে হলে তাকে আরও নিম্নমর্যাদার লোক পেতে হবে। তবে ভণ্ড ও পলাতক তপস্বী তার কাজের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কোন বৈশ্য বা শূদ্র রাজার অধীনে দাসত্ব করতে পারে। আবার সাধারণভাবে যারা দ্বিজাতির পর্যায়ভুক্ত তাদের দাস হিসাবে রাখলে অধর্ম হবে। কোন ব্রাহ্মণ যদি বেকায়দায় পড়ে দাসত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়, তাহলে তাকে ব্রাহ্মণ

প্রভু খুঁজে নিতে হবে এবং কাত্যায়নের মতে সেই ব্রাহ্মণ দাসকে দিয়ে অব্রাহ্মণের কাজ করানো চলবে না।

কৌটিল্য (৩।১৩) এবং কাত্যায়ন (৭২৩) বলেন যে প্রভু যদি কোন দাসীর সঙ্গে যৌনসংসর্গে লিপ্ত হয় এবং তার ফলে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে সে-ক্ষেত্রে ওই দাসী এবং তার সন্তান স্বাধীন বলে গণ্য হবে। কৌটিল্য আরও বলেন যে দাস-উপার্জিত সম্পদের মালিক তার সন্তান বা জ্ঞাতিগোষ্ঠী, প্রভু নয়। দাসত্ব থেকে মুক্তি একটি অনুষ্ঠানের মারফৎ দেওয়ার কথা নারদ (৪২-৪৩) বলেছেন। প্রভু একটি জলপূর্ণ কলস দাসের স্কন্ধ থেকে গ্রহণ করে সেই কলসটিকে ফাটিয়ে দিয়ে তা থেকে নির্গত জল দাসের মাথায় ছড়িয়ে দিয়ে বলবে যে, তুমি আর দাস নও। ব্যবহারময়ূখ গ্রন্থে কালিকাপুরাণ থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে যদি কোন ব্যক্তি কাউকে পোষ্যপুত্র হিসাবে গ্রহণ করে তাহলে তার চূড়াকরণ, উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কার পালন করা দরকার, নতুবা ওই পোষ্যপুত্র দাস হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রে এই নিয়মের কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। যদি কোন দাস প্রভুর পরিবারের স্বার্থে কোন ঋণ গ্রহণ করে, সে ঋণের দায়িত্ব তার নয় প্রভুর, এমনকি সে যদি প্রভুর বিনানুমতিতেও তা নেয়। দাসকে সাক্ষ্যদাতা হিসাবে ডাকা উচিত নয়, এ বিষয়ে ধর্মশাস্ত্রসমূহ মোটামুটিভাবে একমত, কিন্তু মনু (৮।৭০) বলেন যে অন্য সাক্ষী পাওয়া না গেলে দাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই। ধর্মশাস্ত্রসমূহের বক্তব্য থেকে প্রাচীন ভারতের দাসদের সম্পর্কে দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়। প্রথমটি হচ্ছে দাসদের পারিবারিক জীবনযাপন করার অধিকার ছিল এবং সেখানে প্রভুর হস্তক্ষেপ অবৈধ বলে গণ্য হত, এবং দ্বিতীয়ত তাদের নিজস্ব উপার্জন তারা নিজেরা ভোগ করতে পারত। অন্যান্য স্থানের দাস-প্রথার সঙ্গে প্রাচীন ভারতবর্ষের দাসপ্রথার মৌলিক পার্থক্য এই দুটি ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়।

তবে ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ যে অক্ষরে অক্ষরে মানা হত তা নয়। গুপ্তযুগে রচিত মৃচ্ছকটিক নাটকে যে দ্যূতকারের চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা থেকে নারদ উল্লিখিত আত্মবিক্রয়ীর সমর্থন পাওয়া যায়। দাসদের প্রতি ব্যবহার, আইন যাই বলুক না কেন, মালিকের মানসিকতার উপর যে নির্ভরশীল ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় স্থাবরক ও মদনিকার চরিত্রে। প্রথম জন ছিল নির্মম উৎপীড়নের শিকার, পক্ষান্তরে দ্বিতীয় জন অতি আদর্শ ব্যবহার পেয়েছিল। অবশ্য স্থাবরকের প্রতি তার প্রভু যে অন্যায় আচরণ করেছিল দুর্জন রাজশ্যালক তার

প্রতিবিধান করেন এবং পরিণামে সে দাসত্বমুক্ত হয়। গুপ্তোত্তর যুগের দাস-প্রথা সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায় না। মনু ৮।২৯৯-এর ভাষ্য প্রসঙ্গে মেধাতিথি বলেন যে মনু কদাপি দাসদের দৈহিক প্রহারের নির্দেশ দেননি (যদিও মনু বলেছেন একই দোষের জন্য স্ত্রী, পুত্র, পরিজন এবং দাসকে সম-ভাবে দেখা উচিত এবং দণ্ড হিসাবে কঞ্চি বা দড়িজাতীয় কোন জিনিস দিয়ে প্রহার করা চলতে পারে), আসলে প্রহারের অনুরূপ ফল হয় এই রকম কঠিন বাক্য প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন। লেখমালার সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে চোল আমলে বিভিন্ন মন্দির কর্তৃপক্ষ দাস ক্রয় করত এবং অনেকেই পেটের দায়ে মন্দিরে আত্মবিক্রয় করত। এই সকল দাসেরা মন্দির ও পূজাসংক্রান্ত নানা কাজ করত। উপমিতিভবপ্রপঞ্চকথা নামক গ্রন্থে একটি চিত্তাকর্ষক তথ্য পাওয়া যায় যে ভীল উপজাতি দাস-ব্যবসাতে লিপ্ত ছিল। মধ্যযুগে রচিত স্মৃতিসমূহ ও সেগুলির ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থে পূর্ববর্তী আমলের ধর্মশাস্ত্র-সমূহের বক্তব্যকেই অনুসরণ করা হয়েছে। পরাশরমাধব, বিবাদচন্দ্র, বিবাদ-চিন্তামণি এবং ব্যবহারকাণ্ড নামক গ্রন্থসমূহে দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য অনেক সহজ বিধান দেওয়া হয়েছে, যা থেকে মনে হয় যে পাকাপাকিভাবে কোন ব্যক্তিকে দাস হিসাবে রাখা গৃহকর্তার পক্ষে বিশেষ লাভজনক ছিল না, এবং সামান্য কারণেই তারা মুক্তি পেতে পারত। বিবাদরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে আগেকার নিয়মেরই পুনরাবৃত্তি করে বলা হয়েছে যে দাসীর গর্ভে প্রভু কোন সন্তান উৎপন্ন করলে মাতা ও সন্তান উভয়েই দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করবে। লেখমালা ও বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে দক্ষিণের হিন্দু-রাজ্য বিজয়নগরে দাসপ্রথা দৃশ্যমানভাবেই চালু ছিল।

ভারতে তুর্কী অধিকারের পর থেকেই দাসপ্রথার নূতন করে পুনরুজ্জীবন হয়। আমরা আগেই বলেছি যে প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথার যে সকল নজীর পাওয়া যায় তা ভারতীয় সমাজ কাঠামোয় দাসপ্রথার গৌণত্বকেই প্রমাণ করে; কেননা ভারতে প্রচলিত সুবিস্তৃত জাতিপ্রথা— যেখানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের নানা প্রয়োজন মেটানোর জন্য ও নানাভাবে সেবা করার জন্য অসংখ্য পেশাদার জাতি রয়েছে—পৃথকভাবে সুবিস্তৃত দাসপ্রথা গড়ে তোলার পক্ষে অনুকূল নয়। একমাত্র গৃহকর্ম ছাড়া এখানকার দাসদের কোন বৃহৎ কর্মক্ষেত্র ছিল না। কিন্তু এদেশের তুর্কী শাসক ও পদস্থ কর্মচারীরা তাদের স্বদেশে দাসপ্রথার সঙ্গে ভালভাবেই পরিচিত ছিল। পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার সকল শহরেই খোলাবাজারে দাসদাসী কেনাবেচা হত। সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলেমেয়েদেরও

দাস হিসাবে প্রকাশ্যভাবে বিক্রয় করা হত। এক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীকে পরাজিত করে বিজিত গোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের ধরে নিয়ে এসে বিক্রয় করত। দিল্লীর মামেলুক সুলতানরা প্রত্যেকেই একে অপরের দাস ছিলেন এবং তাঁদের প্রকাশ্য বাজার থেকেই কেনা হয়েছিল। সেমেটিক ঐতিহ্যে দাসপ্রথা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাইবেলের পুরাতন নিয়ম অংশে দাস সংগ্রহের এবং দাসত্ব স্বীকারের বহু কাহিনী আছে। ইসলামী আইনকানুনেও দাসদের সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য সুবিস্তৃত নিয়মাবলী বর্তমান। বিশেষ করে বিজিত রাজ্যের প্রজাদের ও বিধর্মীদের দাসে পরিণত করা ভারতবর্ষ ও ভারতের বাইরের মুসলমান শাসকদের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত রীতি হয়ে গিয়েছিল। ভারতে তুর্কী অধিকারের পর পরাজিতদের থেকে দাস সংগ্রহের একটা সাংঘাতিক বাতিক দেখা গিয়েছিল, এবং বিশেষ করে হিন্দু মেয়েরা এই প্রথার শিকার হয়েছিল। এই সকল মেয়েদের মনোরঞ্জনের কাজে ব্যবহার করা হত, ক্ষমতাশালী লোক অথবা বন্ধুবান্ধবের নিকট ভেট হিসাবে পাঠানো হত। কিভাবে হিন্দু মেয়েদের ধরে নিয়ে এসে দাসীতে পরিণত করা হত তার বিবরণ ইবন বতুতা দিয়েছেন। সুলতান মুহম্মদ ইবন তুঘলক চীন সম্রাটকে একশো জন দাস ও একশো জন দাসী উপহার দিয়েছিলেন যারা "ভারতীয় বিধর্মীদের" থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। ফিরুজ তুঘলকের দাস ছিল অগণ্য, বরং তাঁকে দাস-বিলাসী বলা যেতে পারে। তুর্কী সুলতান ও পদস্থ ব্যক্তিরা এইভাবে এদেশে একটি ভিন্ন ধরনের দাসপ্রথা গড়ে তোলেন, এবং তা মুঘল যুগেও অনুসৃত হয়।

মুঘল আমলে, বিশেষ করে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে পোর্তুগীজরা খোলাখুলিভাবেই দাস ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়। বাংলাদেশ ছিল তাদের দাস-বাণিজ্যের ক্ষেত্র। তারা বলপূর্বক নারী, পুরুষ ও শিশুদের ধরে নিয়ে গিয়ে অন্যত্র বিক্রয় করত। দেশের অভ্যন্তরেও দাস কেনাবেচা হত। মগরাও দাস ব্যবসা করত। আরাকানের অভ্যন্তর অঞ্চলে কাজ করার জন্য সেখানে বাংলাদেশ থেকে দাস চালান দেওয়া হত, যার ফলে আরাকানের জনসংখ্যার মধ্যে বঙ্গদেশীয় উপাদান প্রবল হয়ে গিয়েছিল। সপ্তদশ শতকে ডাচ ও ইংরাজরাও সুরাট, মাদ্রাজ ও মসুলিপতমে দাস ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকে মানরিক লিখেছেন যে প্রাদেশিক শাসকেরা রাজস্ব প্রদানে অক্ষম কৃষকদের স্ত্রী ও সন্তানাদি সহ গ্রেপ্তার করে প্রকাশ্য বাজারে নীলামে বিক্রয় করত। হ্যামিলটন লিখেছেন তট্টা অঞ্চলে তিনি স্বয়ং এই কাজ করেছেন। এছাড়া দুর্ভিক্ষ

উচেছদ ও মড়কের জন্য স্বেচ্ছায় অনেকে দাস হিসাবে নিজেদের বিক্রয় করত। ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দের একটি বাংলা দলিলে দেখা যায় যে মাত্র এগারো টাকার বিনিময়ে একজন তার স্ত্রী, সন্তানাদি ও অনাগত বংশধরদের সহ নিজেকে বিক্রয় করেছে। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে দেখা যায় যে কলকাতায় বিভিন্ন কাছারীতে দাস বিক্রয়ের বিষয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে মাথা পিছু চার টাকা শুল্ক দিয়ে রেজিস্ট্রেসন করার রীতি প্রচলিত হয়েছে। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে স্যার উইলিয়ম জোন্স কলকাতায় গ্র্যাণ্ড জুরির সামনে বলেন, এই জনবহুল শহরে এমন পুরুষ বা নারী খুব কমই আছে (এক্ষেত্রে তিনি ইউরোপীয়দের কথাই ইঙ্গিত করেছেন) যাদের অন্তত একজন করেও দাসবালক নেই। এদের যৎসামান্য মূল্যে কেনা হয়েছে অথবা এমন কোন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার বিনিময়ে দাস করা হয়েছে যে মৃত্যু তাদের বর্তমান শোচনীয় জীবনের চেয়ে অনেক ভাল ছিল ; এই সকল হতভাগ্য ছেলেমেয়েদের বড় বড় নৌকায় বোঝাই করে নদীপথ দিয়ে নিয়ে আসা হয় কলকাতা শহরে প্রকাশ্যে বিক্রয়ের জন্য। এদের অধিকাংশই হয় তাদের বাপ-মায়ের কাছ থেকে চুরি করে আনা, অথবা আকালের সময় কিছু চালের বিনিময়ে।

জলপথে এভাবে দাসদের নিয়ে আসা ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের একটি ঘোষণাপত্রের দ্বারা নিষিদ্ধ হলেও সারা ভারত জুড়েই দাসপ্রথা চালু ছিল এবং কৃষির ক্ষেত্রে আমেরিকার মত দাসদের ব্যবহার করা শুরু হয়েছিল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে বুকানন দক্ষিণ ভারতে ভূমিতে দাসশ্রমের বিস্তৃত ব্যবহারের উল্লেখ করেছেন। মূলত পারিয়ার, হালুয়ান, শেকলিয়ার, তাতি, বুল্লম, কানাকুম, এয়ারলে প্রভৃতি নিম্নবর্গের জাতি থেকেই দাস ক্রয় করা হত। অবশ্য এই কেনাবেচার নানা শর্ত ছিল, একেবারে সারাজীবনের জন্য, অথবা কয়েক বছরের জন্য অথবা চাষের একটা মরশুমের জন্য। মুসলমান চাষীরাও দাস নিয়োগ করত। ব্যক্তি হিসাবেই দাসদের বিক্রয় করা হত, তবে স্বামী-স্ত্রীকে পৃথকভাবে বিক্রয় করা চলত না। একজন যুবক ও তার স্ত্রীকে ক্রয় করতে ২৫০ থেকে ৩০০ ফনাম ব্যয় করতে হত, এদের সঙ্গে দু'তিনটি ছেলেমেয়ে থাকলে আরও ১০০ ফনাম দিতে হত। এক বছরের জন্য হলে পুরুষ পিছু ৮ ফনাম এবং নারী পিছু ৪ ফনাম লাগত। এককভাবে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একজন ভাল দাসের মূল্য ছিল ৪ গিনি পরিমাণ, তবে সাধারণ দাসদের বিক্রয় করা হত ২০ থেকে ৬০ ফনামের মধ্যে (দশ টাকা থেকে পঁচিশ টাকার মত)। দাসের মালিক দাসকে খাদ্য ও পরিচ্ছদ দিতে বাধ্য থাকত, তবে যখন চাষের কাজ থাকত না

এই দাসদের অন্যত্র কিছু কাজকর্ম যোগাড় করে নিজেদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করে নিতে হত। বুকানন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দাসদের সঙ্গে মালাবার অঞ্চলের দাসদের অবস্থার তুলনা করে দেখিয়েছেন যে শেষোক্ত ক্ষেত্রে সচরাচর দাসদের পারিবারিক জীবন বিপন্ন করা হত না, এবং দাস ছেলেমেয়েরা নিজেদের জাতির মধ্যে বিবাহ করার ও বিবাহিত জীবনযাপন করার অধিকারী ছিল।

উত্তরবঙ্গে, বুকানন দেখিয়েছেন যে, উনিশ শতকের গোড়ার দিকে গৃহকর্মের জন্য দাস রাখার প্রথা খুবই ব্যাপক ছিল। প্রায় প্রতিটি সম্পন্ন মুসলমানের ঘরেই ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী থাকত। যারা রাখত তাদের যুক্তি ছিল যে প্রথমত এটা মর্যাদার দ্যোতক এবং দ্বিতীয়ত এই ব্যবস্থা ধর্মশাস্ত্র অনুমোদিত। বঙ্গদেশেও চাষের প্রয়োজনে দাসশ্রমের ব্যবহার করা হত। তাদের পরিধানের জন্য ছিল এক টুকরো মোটা কাপড় এবং খাদ্যের জন্য ১৫ মন শস্য। চাষের কাজের জন্য ধানুক, চামার, রাওয়ারি প্রভৃতি নিম্নজাতীয়রা নিজেদের সন্তানদের বিক্রয় করত। সাবালক দাসের দাম ছিল ১৫ থেকে ২০ টাকার মধ্যে, ষোল বছরের বালকের দাম ছিল ১২ থেকে ২০ টাকার মধ্যে, আট-দশ বছরের বালিকার দাম ছিল ৫ থেকে ১৫ টাকার মধ্যে। পূর্ণিয়া, গয়া, সাহাবাদ ও ভাগলপুর জেলা থেকে প্রচুর দাস রপ্তানী হত। বুকাননের মতে অসমীয়ারা দাস ব্যবসায়ে সুদক্ষ ছিল। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের একটি হিসাবে দেখা যায় যে শিলেট জেলায় জনসংখ্যার ছয় ভাগের একভাগই ছিল দাস। কামরূপে ব্রিটিশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে বারো হাজার দাসকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু আসাম ও উত্তরবঙ্গে চা-চাষ ও চা-শিল্পের প্রসারের ফলে ইংরাজ চা-বাগানের মালিকরা একটি নূতন ধরনের দাসপ্রথার প্রচলন করে। ভারতের নানা স্থান থেকে বিশেষ করে উপজাতীয় মানুষদের লোভ দেখিয়ে চা-বাগানের কুলি হিসাবে নিয়ে আসা হয়, এবং পাইকারী হারে এই রকম মানুষের যোগান দিয়ে আড়কাঠি হিসাবে পরিচিত একটি দালাল শ্রেণী অনেক পয়সার মালিক হয়। কাগজে-কলমে এই লোকগুলিকে দাস না বলে মজুর বলা হলেও দাসপ্রথার প্রতিটি নিয়মই এদের উপর প্রযোজ্য হত, এমনকি পারিবারিক জীবনের বিশুদ্ধি বজায় রাখার জন্য বুকানন দাক্ষিণী ব্যবস্থার যে প্রশংসা করেছেন, চা-বাগানের কুলিদের ক্ষেত্রে সে অধিকারটুকুও ছিল না।

বস্তুত উনিশ শতকের প্রথম দিকে ভারতবর্ষে দাস ব্যবসা এমনই জমজমাট হয়েছিল যে এখান থেকে দলে দলে মানুষকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ পর্যন্ত নিয়ে

যাওয়া হয়েছিল ভূমিতে কাজকর্মের জন্য, যাদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল ভোজপুরী। ম্যালকম জানিয়েছেন যে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে মধ্য ভারতের প্রায় প্রতিটি সম্ভ্রান্ত রাজপুত ও ব্রাহ্মণ পরিবারে ক্রীতদাস রাখা সামাজিক রীতিতে পর্যবসিত হয়েছিল। তিনি দেখিয়েছেন যে এদের মধ্যে অধিকাংশই দুর্ভিক্ষ ও আকালের কালে পিতামাতা কর্তৃক বিক্রীত, বাকিরা বাঞ্জারাগণ কর্তৃক অপহৃত। দাসীদের দাম ছিল চেহারা অনুযায়ী ৪০ থেকে ৫০ টাকার মধ্যে। মালব, রাজস্থান, গুজরাত ও দাক্ষিণাত্যে তাদের বিবাহ করার অনুমতি দেওয়া হত না এবং তাদের যৌন পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হত।৮ মধ্যভারতের অধিকাংশ দাসদাসী মারবার এবং গুজরাত থেকে আগত। প্রধানত মারাঠা হামলা এবং দুর্ভিক্ষের জন্যই পিতামাতারা সন্তানদের দাস হিসাবে নিরাপদ অঞ্চলে বিক্রয় করত। ম্যালকম জানিয়েছেন যে ১৮১৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় আমীর খান মারবার অঞ্চলে দাসদের নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করেছিলেন। পরবর্তীকালে আইনের দ্বারা দাসপ্রথার অবসান সত্ত্বেও বাস্তবে দাসপ্রথা এখনও বর্তমান, এমনকি ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার ৩৫ বছর পরেও। বর্তমানে যাদের বলা হয় বণ্ডেড-লেবার, এবং যারা পর্যাপ্ত সংখ্যায় বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের নানা এলাকায় বর্তমান, তারা আসলে আঠারো-উনিশ শতকের চুক্তিবদ্ধ দাসদেরই উত্তরাধিকারী। এদের সংখ্যা কত তা এখনও সুনিশ্চিতভাবে জানার চেষ্টা হয়নি, এবং সাম্প্রতিক নানা তথ্য উদ্‌ঘাটনের ফলে দেখা যাচ্ছে যে শুধু কয়েকটি বিশেষ এলাকাতেই নয় ভারতের সর্বত্রই তারা আছে, এমনকি কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজের মত আধুনিক শহরেরও কাছাকাছি, যারা আজও তাদের মালিকদের অধীন, যারা ভূমি বা অন্যান্য উৎপাদনক্ষেত্রে শ্রমদান করতে বাধ্য, এবং মালিকের ইচ্ছা ছাড়া যারা এমনকি নিজস্ব পরিবার গঠনের অধিকার থেকেও বঞ্চিত।

আমরা মোটামুটি অতি স্বল্প পরিসরে ভারতে দাসপ্রথার একটি ঐতিহাসিক রূপরেখা এখানে পেশ করলাম। এই রূপরেখা থেকে যে সিদ্ধান্তগুলি টানা যেতে পারে তা হচ্ছে এই যে প্রাচীন ভারতে কোন-না-কোন ধরনের দাসপ্রথা থাকলেও, আমরা প্রকৃত অর্থে দাসপ্রথা বলতে যা বুঝি, সেই রকম কোন ব্যবস্থা এখানে ছিল না, কেননা এখানকার প্রচলিত জাতিবর্ণের আদর্শের সঙ্গে দাসপ্রথার আদর্শের খাপ খায় না। প্রাচীন ভারতের দাসপ্রথার উপর দেবরাজ চানানা খুব ভাল বই লিখেছেন। এই প্রথার গুরুত্ব প্রতিপাদন করাই তাঁর

উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সেই উদ্দেশ্য খুব সার্থক হয়েছে বলে আমাদের মনে হয় না। এদেশে দাসপ্রথার ব্যাপ্তি প্রদর্শন করার জন্য তিনি এমন নানা সামাজিক শ্রেণীর ব্যাপার টেনে নিয়ে এসেছেন যারা অবদমিত ও উৎপীড়িত হলেও দাস নয়। রাজা মিনোসের দরবারে আথেনীয় যুবক-যুবতীদের দাস হিসাবে বাৎসরিক ভেট দেওয়ার যে পৌরাণিক কাহিনী বর্তমান আছে সে রকম কোন কাহিনীর নিদর্শন ভারতীয় ঐতিহ্যে নেই। এদেশে কোন অ্যাকিলিস বেহাত হয়ে যাওয়া দাসীর শোকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রতিনিবৃত্ত হয়নি। এদেশে প্লেটোর মত কোন মহাজ্ঞানী দার্শনিক দাসপ্রথার ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করার জন্য কলম ধরেননি। এদেশে বিজাতীয় লোকেদের ম্লেচ্ছ বলা হয়েছে বটে, কিন্তু কোন বিজিত তরফের বিদেশী বিদ্বান গলায় দাসত্বের নিদর্শন ঝুলিয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন—যে দৃশ্য প্রাচীন রোমে খুবই সাধারণ ছিল—এরকম ব্যাপার কল্পনা করা যেত না। তবে ভারতের বাইরে যে দাসপ্রথা ছিল সে খবর প্রাচীন ভারতীয়দের অজানা ছিল না, যা আমরা পূর্বে আস্সলায়ন সুত্তের উল্লেখকালে দেখিয়েছি। মৌর্যসম্রাট বিন্দুসার দু'চারজন গ্রীক দার্শনিককে কিনতে চেয়েছিলেন। হয়ত গ্রীকদের চক্ষুলজ্জা রোমকদের চেযে বেশি ছিল তাই গ্রীক কর্তৃপক্ষ তাঁকে সবিনয়ে জানিয়েছিলেন যে তাঁদের দেশে দার্শনিক বিক্রয় আইনত নিষিদ্ধ। দাসপ্রথার বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র ভারতবর্ষ না হওয়া সত্ত্বেও নানা কারণে কিছু কিছু লোক দাসে পরিণত হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তারা এদেশের বিরাট জনসংখ্যার তুলনায় অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ-স্বরূপ ছিল। তৎসত্ত্বেও তাদের নিয়ে ধর্মশাস্ত্রকাররা মাথা ঘামিয়েছেন, এবং তাদের প্রতি কিরকম আচরণ করতে হবে সে বিষয়েও নির্দেশ দিয়েছেন। এই সকল নির্দেশের মধ্যে মানবিকতার অভাব ছিল না। এক্ষেত্রেও লক্ষণীয় যে অন্যান্য জাতিবর্ণের সম্পর্কে শাস্ত্রকারেরা যে দায়িত্ব ও কর্তব্যের তালিকা দিতে কার্পণ্য করেন নি, দাসদের ক্ষেত্রে তাঁরা কিন্তু দায়িত্ব-কর্তব্যের বদলে মুক্তির রাস্তার সন্ধানই দিয়েছেন বেশি। প্রাচীন সাহিত্য থেকে দাসদের সম্পর্কে যে সকল তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে দেখা যায় যে মোটামুটিভাবে গৃহস্থালী কাজকর্মের জন্য তাদের নিয়োগ করা হত। দাসদের প্রতি দুর্ব্যবহারের নিদর্শন যে পাওয়া যায় না তা নয়, কিন্তু তা অনেকটা নিয়োগকারীর মানসিকতার উপর নির্ভরশীল, কেননা দাস নয়, এমন নিম্নবর্ণের বহু মানুষও যে অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হত তার প্রমাণ আছে।

প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথার ভূমিকা যে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না তার

প্রধান কারণ উৎপাদনমূলক ব্যাপারে তাদের শ্রমের ততটা প্রয়োজনীয়তা ছিল না। এদেশে কৃষিজীবী জাতি-শাখাজাতি অজস্র ছিল। এছাড়া উৎপাদনের এক একটি ক্ষেত্র এক বা একাধিক জাতির একচেটিয়া ছিল, এবং এই সকল জাতি তাদের কৌলিক বিদ্যা অপরকে শেখাত না। ফলে কোন বৃত্তিমূলক কর্মে দাসদের নিয়োগ করা যেত না। এমনকি আবর্জনা-পরিষ্কারের মত কাজের জন্যও নির্দিষ্ট জাতি ছিল। তবে ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে কোথাও কোথাও স্থানীয়ভাবে এই প্রথার বিকাশ হওয়া অসম্ভব ছিল না। সে যাই হোক এদেশে তুর্কী অধিকারের পর থেকেই দাসপ্রথার পশ্চিমী আদর্শের আমদানী শুরু হয়। বস্তুত ত্রয়োদশ শতকের পর থেকে আজ পর্যন্ত দাস-প্রথার যে পরিচয় পাওয়া যায় তার উৎস সম্পূর্ণভাবেই বৈদেশিক। এদেশের মুসলমান শাসক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এখানে আসার পূর্বে তাঁদের নিজ নিজ দেশে দাসপ্রথার আওতায় মানুষ হয়েছিলেন। বাগদাদ, বসরা, দামাস্কাস প্রভৃতি শহর দাস কেনাবেচার কেন্দ্র ছিল। আরব্য রজনীর অজস্র কাহিনী থেকে তিনটি সামাজিক শ্রেণীর পরিচয় পাওয়া যায়—শাসক, বণিক ও দাস। ভারত-বর্ষের তুর্কী ও মুঘল শাসকেরা তাঁদের মূল অঞ্চলের দাসপ্রথাকে এদেশের মাটিতে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। মুঘল আমলের মাঝামাঝি সময় থেকেই ইউরোপীয় বণিকরা দাসপ্রথার পশ্চিমী ধরনটি এখানে খোলাখুলিভাবে আমদানী করে, এবং অন্যত্র তারা যেমন দাস-ব্যবসা চালিয়েছিল এখানেও তারা তার সূচনা করে। তারা যে শুধু একদিকে অন্যান্য দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় খাটবার জন্য এদেশ থেকে মানুষ রপ্তানী করত তাই নয়, অপরদিকে ভারত-বর্ষের মধ্যেও তারা ক্রীতদাসদের চাহিদা বাড়িয়ে তুলতে সমর্থ হয়। কাজেই সিদ্ধান্ত করতে অসুবিধা নেই যে এদেশে দাসপ্রথার ব্যাপ্তির মূলে যথেষ্ট পরিমাণেই বাইরের প্রভাব বর্তমান।

পরিশিষ্ট—২

সংক্ষিপ্ত জাতি পরিচয়

অওয়ান ঃ পাঞ্জাব অঞ্চলের মুসলমান কৃষিজীবী জাতি যাদের উপজাতীয় পটভূমি খুবই স্পষ্ট। এরা নিজেদের আরব-উদ্ভূত এবং হজরত আলির বংশধর বলে দাবি করে।

অগ্নিকুল ঃ রাজপুতদের একটি শাখার নাম, যারা নিজেদের অগ্নি থেকে উদ্ভূত বা অগ্নিশুদ্ধ মনে করে। সম্ভবত এরা শক, হূণ প্রভৃতি বৈদেশিক নৃগোষ্ঠী থেকে আগত এবং হিন্দুসমাজে পরিগৃহীত হয়েছে। এই কারণেই এদের নামকরণের সঙ্গে অগ্নিশুদ্ধির ধারণা সম্পর্কিত।

অগ্রদানী ঃ বঙ্গদেশের একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ যারা শ্রাদ্ধোপলক্ষে মৃত আত্মার সন্তুষ্টির জন্য সর্বাগ্রে দান গ্রহণ করে।

অগ্রহারী ঃ উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বাণিজ্যজীবী জাতি, যাদের মূল কেন্দ্র বারাণসী অঞ্চল। এরা নিরামিষাশী ও উপবীতধারী। আরা জেলাতেও অগ্রহারীদের ব্যাপক বসতি বিদ্যমান। এদের একটা অংশ শিখধর্মে দীক্ষিত হয়েছে।

অত্তু-এডিয়ার ঃ তামিল পশুপালক জাতি।

অথর্ববেদী ঃ একশ্রেণীর ওড়িয়া ব্রাহ্মণ যাদের সামাজিক মর্যাদা খুব বেশি নয়। কারো কারো মতে অথর্ববেদী ও মহাস্থানী ব্রাহ্মণরা অভিন্ন, কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়।

অনাবলা ঃ ভাতেলা নামেও পরিচিত পশ্চিম উপকূলবাসী একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ যাদের বৃত্তি কৃষি ও বাণিজ্য। ব্রোচ ও দামনের মধ্যবর্তী এলাকায় এই জাতির নিবাস।

অম্বাট্টন ঃ তামিল ও দক্ষিণ দেশীয় নাপিত জাতি যারা প্রাচীন আমলের অম্বষ্ঠ উপজাতির দাক্ষিণী শাখা।

অম্বলবাসী ঃ মালাবার অঞ্চলের মন্দিরসেবক জাতিদের সাধারণ নাম। কখনও কখনও এই জাতিনামটি নম্বিসন নামক একটি শাখাজাতিকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। কথিত আছে যে তারা নাম্বুদিরিদের অধঃপতিত শাখা।

অম্বষ্ঠ : উত্তরপশ্চিম ভারতের প্রাচীন উপজাতি যারা গ্রীক রচনাসমূহে আম্বাস্টানাই প্রভৃতি নামে উল্লিখিত হয়েছে এবং পরে যাদের উপজাতি থেকে জাতিতে উত্তরণ ঘটেছে। মনুস্মৃতি অনুযায়ী অম্বষ্ঠরা উত্তম-সংকর জাতি, বঙ্গদেশে যারা বৈদ্য হিসাবে পরিচিত, বিহারে যারা একশ্রেণীর কায়স্থ, দক্ষিণে নাপিত এবং অন্যত্র অন্য পেশাধারী।

অম্মা-কোড়াগা : কুর্গ অঞ্চলের পুরোহিত শ্রেণী যারা কাবেরী ব্রাহ্মণ নামেও পরিচিত। এদের কোন নির্দিষ্ট বেদ নেই এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য থেকেও এরা বঞ্চিত। আসলে এরা উপজাতিভুক্ত মানুষ ছিল এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ব্রাহ্মণের ধরনধারণ গ্রহণ করেছে।

অরবত্তা ভোক্কালু : একশ্রেণীর কন্নড় ব্রাহ্মণ যারা ধর্মনিরপেক্ষ পেশা অবলম্বী এবং বিশ্বাসের দিক থেকে মধ্বপন্থী।

অরবেলু : তেলুগু ব্রাহ্মণ, স্মার্ত শাখা ও নিয়োগী উপশাখার অন্তর্গত। এরা প্রধানত ধর্মনিরপেক্ষ পেশায় নিযুক্ত।

অরোরা : পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম ভারতের বাণিজ্যজীবী যাদের সঙ্গে ক্ষত্রিদের সম্পর্ক আছে। পূর্বে মিষ্টান্ন প্রস্তুত ও মিষ্টান্নের ব্যবসায়ে এদের বিশেষ দক্ষতা ছিল। শিখ ধর্মাবলম্বীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এই অরোরাদের থেকে এসেছে।

অসোপা : রাজস্থানর মারবার অঞ্চলের একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

অষ্টমা, অস্থানা : উত্তর ভারতের একশ্রেণীর কায়স্থ যারা আগ্রা, বালিয়া ও গাজীপুর জেলায় কেন্দ্রীভূত।

অষ্টবংশ : পাঞ্জাব অঞ্চলের সারস্বত ব্রাহ্মণদের তিনটি শাখার একটি।

অষ্টসহস্র : দ্রাবিড় স্মার্ত ব্রাহ্মণদের শাখার নাম। এরা শক্তি উপাসক এবং কপালে শ্বেতচন্দন অথবা কৃষ্ণবর্ণের গোলাকার চিহ্ন অংকিত করে।

অহার : রোহিলখন্ড অঞ্চলের পশুপালক জাতি।

আগরওয়াল : উত্তর ভারতের বাণিজ্যজীবী জাতি যারা নিজেদের নাগবংশীয় অথবা বৈশ্য বলে দাবি করে। এদের মধ্যে কেউ কেউ উপবীত ধারণও করে। রাজস্থান ও গুজরাতের আগরওয়ালদের একাংশ জৈনধর্মাবলম্বী হলেও অধিকাংশই হিন্দু ও বৈষ্ণব ভাবাপন্ন। এদের মধ্যে আঠারোটি গোত্র আছে এবং স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। সম্ভবত অগ্রবাল বা আগরওয়ালরা অগ্র নামক উপজাতি-উদ্ভূত।

আগাশাল : অর্কশাল বা অক্কশাল নামেও পরিচিত কর্ণাটকের স্বর্ণকার জাতি। এরা পঞ্চবল নামক পাঁচটি কারিগর জাতিগোষ্ঠীর একটি একক।

আগারিয়া : মধ্যভারতের উপজাতি-সম্ভূত জাতি যারা লোহার কাজ করে। বিহারেও আগারিয়াদের দেখা যায়। এদের উপজাতি থেকে জাতি পর্যায়ে উত্তরণ সাম্প্রতিক।

আগাসা, আগাসিয়া : কর্ণাটক অঞ্চলের রজক জাতি।

আগুরি : পশ্চিমবঙ্গের কৃষিজীবী জাতি যারা প্রধানত বর্ধমান জেলায় কেন্দ্রীভূত। আগুরিরা নিজেদের মনুস্মৃতি বর্ণিত উগ্র বা উগ্রক্ষত্রিয় নামক সংকর জাতিভুক্ত বলে গণ্য করে। সম্ভবত এরা ছোটনাগপুর অঞ্চলের আখরি নামক উপজাতি সম্ভূত। পূর্ববঙ্গেও কিছু আগুরি আছে তবে বর্ধমানের আগুরিদের সামাজিক মর্যাদা বেশি। আগুরিদের দুটি উপবিভাগ, সুত এবং জানা। তাদের মধ্যে একধরনের কৌলিন্য প্রথাও বর্তমান।

আচার্য : পশ্চিম ভারতের ব্রাহ্মণ যারা উত্তর ভারতের মহাব্রাহ্মণ বা বঙ্গদেশের অগ্রদানী ব্রাহ্মণদের মত শ্রাদ্ধে দান গ্রহণ করার কারণে নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ হিসাবে বিবেচিত। বঙ্গদেশে জ্যোতিষী পেশার ব্রাহ্মণরা আচার্য ব্রাহ্মণ হিসাবে পরিচিত।

আদি-গৌড় : কুরুক্ষেত্র অঞ্চলের ব্রাহ্মণ যাদের মূল বৃত্তি কৃষি। তবে আদি-গৌড়দের অনেকেই আগরওয়ালদের পৌরোহিত্য করে। গৌড় শব্দটির অর্থ পুরোহিত।

আন্দে কোরাগা : কোরাগা দ্রষ্টব্য।

আভীর : উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বহুব্যাপ্ত গোপজাতি, সুপ্রাচীনকাল থেকেই যাদের অস্তিত্ব বর্তমান। সুপ্রাচীনকালেই আভীরদের উপজাতি থেকে জাতি পর্যায়ে উত্তরণ ঘটেছিল। প্রাচীন সাহিত্য ও লেখমালায় আভীরদের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। এমনকি একটি আভীর রাজ-বংশেরও সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমানে আভীররা আহির, অহার প্রভৃতি নামে পরিচিত যাদের তিনটি শাখা বর্তমান—গঙ্গাযমুনা দোয়াবের উত্তর পশ্চিমে যদুবংশী, মধ্যাঞ্চলে নন্দবংশী এবং পূর্বাঞ্চলে গোয়ালবংশী। যে সকল রাজপুত নিজেদের যদুবংশীয় ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দেয়, তারাও আসলে আহির।

আভীর-গোর : এক ধরনের দক্ষিণী ব্রাহ্মণ যারা আভীরদের পৌরহিত্য করে।

আরাধ্য : অন্ধ্র-কর্ণাটক অঞ্চলের ব্রাহ্মণ যারা লিঙ্গায়ৎদের ধর্মকর্মে সহায়তা করে।

আহির : আভীর দ্রষ্টব্য।

আয়র : ইড়ইয়ান দ্রষ্টব্য।

ইঝাবান : ইঝুবান, ইলবান, ইরাবান, ইলুবান, ইরুবার প্রভৃতি নামে কথিত মালাবার উপকূলের তাড়ি-সংগ্রাহক জাতি যারা তিয়ান বা তিয়ানদের সমগোত্রীয় এবং সিংহল অথবা ইন্দোনেশিয়া থেকে আগত বলে কথিত। ত্রিবাংকুর ও দক্ষিণ কোচিনে ইঝাবানদের মধ্যে মাতৃপ্রাধান্য বর্তমান, উত্তর কোচিন ও দক্ষিণ মালাবারে পিতৃপ্রাধান্য।

ইদিগা : অন্ধ্র-কর্ণাটক অঞ্চলের তাড়ি-সংগ্রাহক জাতি যারা সৎ-শূদ্র হিসাবে পরিচিত। এরা পূর্বে স্থানীয় পালিগারদের অধীনে শস্ত্রজীবী ছিল।

ইরুলা : নীলগিরি অঞ্চলের উপজাতি যাদের একটি শাখা সমভূমি অঞ্চলে জাতিতে পরিণত হয়েছে। সচরাচর এরা জমিতে দিনমজুরের কাজ করে।

ইরুবান : ইঝাবান দ্রষ্টব্য।

ইল্লাওয়ার : দক্ষিণ ভারতের তাড়ি-সংগ্রাহক জাতি, যারা সুদূর দক্ষিণে শানার এবং কর্ণাটক অঞ্চলে বিল্লবার নামে পরিচিত।

ইড়ইয়ন : তামিল গোপজাতি যারা ইড়য়ার নামেও পরিচিত এবং আহির, অহার, গোল্ল, গোয়ালা, গোপ প্রভৃতির সগোত্র যারা বর্তমানে একত্রে যাদব হিসাবে নিজেদের গণ্য করে।

উনাই : উত্তর ভারতের লালা-কায়স্থদের একটি শাখা যারা উনাও-কায়স্থ নামেও পরিচিত। এরা নিজেদের নিগম শ্রেণীভুক্ত বলে গণ্য করে।

উত্তর-রাঢ়ী : বঙ্গীয় কায়স্থদের একটি শাখা যারা কুলীন, সম্মৌলিক ও একপোয়া এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত।

উপ্পর : তেলুগু লবণ-প্রস্তুত কারক জাতি যাদের কন্নড় স্বজাতি উপ্পার এবং অন্যান্য দক্ষিণী স্বজাতিরা উপ্পিলিয়ন, উপলিগা প্রভৃতি নামেও পরিচিত।

উপ্পরব : দক্ষিণ ভারতের কৃষিজীবী জাতি। তারা সোরা ও লবণও উৎপন্ন করে।

উমর : উত্তর ভারতের বানিয়া জাতি, আগ্রা থেকে গোরখপুর পর্যন্ত অঞ্চলে

যাদের বেশি দেখা যায়। এদের কর্মকেন্দ্র প্রধানত কানপুর শহর। উমররা নিজেদের বৈশ্য বলে মনে করে এবং পিতার মৃত্যুর পর উপবীত ধারণ করে।

উরালি : তামিলনাড়ুর মাদুরা ও ত্রিচিনোপলী জেলার ভূমিশ্রমিক জাতি। একই নামের একটি পার্বত্য উপজাতির পরিচয় ত্রিবাংকুরে পাওয়া যায়।

উরুগোল্ল : কর্ণাটকের গোল্ল বা গোয়ালা জাতির একটি শাখা, অপরটি কাদু-গোল্ল নামে পরিচিত। এদের অধিকাংশই বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী।

উর বল : গুজরাতী বানিযাদের একটি শাখা।

উসচ কাম্মে : কর্ণাটক অঞ্চলের কাম্মে শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। কাম্মে নামটি স্থান-নাম থেকে উদ্ভূত।

এরনাদন : মালাবার অঞ্চলের পার্বত্য উপজাতি যাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যাকে দ্বিতীয়া পত্নী হিসাবে গ্রহণের রীতি আছে।

এলেদু : মালাবার উপকূলের বর্ণব্রাহ্মণ যারা নায়ারদের পৌরোহিত্য করে।

ওকালিগা : বর্ণাটক অঞ্চলের কৃষিজীবী জাতিগোষ্ঠী। অন্ধ্রের কাম্মাদের মত তাদের মধ্যে একটি উপকথা প্রচলিত আছে যে যাতে তারা অন্যান্য জাতিদের কাছ থেকে নিগ্রহ ভোগ না করে সেই জন্য দেবতারা একটি নদীকে দুভাগ করে দিয়ে তাদের জন্য পৃথক এলাকা নির্দিষ্ট করে দেন।

ওচ্চন : দক্ষিণ ভারতের গ্রাম্য পুরোহিত জাতি। পশ্চিমবঙ্গে দেয়াসিদের মত এরাও ব্রাহ্মণ নয়।

ওঝা : চিকিৎসা ও ঝাড়ফুকের বৃত্তি অবলম্বনকারী নানা জাতি। মধ্যভারতের গোন্দদের একটি শাখাও ওঝা নামে পরিচিত। উত্তর প্রদেশে ওঝা-লোহার নামেও একটি জাতি আছে যারা কামারের কাজ করে। উপাধ্যায় শব্দটির অপভ্রংশ হিসাবেও ওঝা শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

ওড্ডার : তামিলনাড়ুর কৃষিজীবী জাতি যারা ওয়াদ্দাবা নামেও পরিচিত। এদের উপজাতি থেকে জাতি পর্যায়ে উত্তরণ সাম্প্রতিক। এরা বিষ্ণু উপাসক অথচ শূকর ও ইঁদুর ভক্ষণ করে।

ওড়ে : ভ্রাম্যমান কুম্ভকার জাতি যাদের উৎস সম্ভবত উড়িষ্যা। ওধ, ওর, বন্দর প্রভৃতি নামেও পরিচিত।

ওর-খন্দাইত : উড়িষ্যার খন্দাইতদের একটি শাখা।

ওসবাল : রাজস্থানের মেবার অঞ্চল থেকে উদ্ভূত বানিয়া জাতি, যাদের মধ্যে হিন্দু ও জৈন উভয় ধর্মাবলম্বীই বর্তমান। ওসবালদের কর্মক্ষেত্র সারা

ভারতবর্ষ জুড়ে। আগরওয়ালদের মত ওসবালদের সমাজও অবৈধ সন্তানের স্বীকৃতি আছে যারা দাসা-ওসবাল নামে পরিচিত। বৈধ সন্তানদের বিশা-ওসবাল বলা হয়।

ঔদীচ্য : গুজরাতী ব্রাহ্মণদের একটি শাখা যারা উত্তরাঞ্চল থেকে আগত। তাদের উদ্ভবের কাহিনী স্কন্দপুরাণে বর্ণিত হয়েছে। ঔদীচ্য ব্রাহ্মণরা তিন শ্রেণীর—তোলক্য, সিদ্ধপুরীয় এবং শিহোর।

কদব-কুনবি : পশ্চিম ভারতের কৃষিজীবী কুনবিদের একটি শাখা। এদের জাতীয় কিংবদন্তী অনুযায়ী এরা পার্বতীর কটিদেশের (কেদ) ঘর্ম থেকে উৎপন্ন এবং সেই হিসাবে এরা উমিয়া মাতার উপাসক। এদের বিবাহ ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য আছে। দৈবজ্ঞের গণনার ভিত্তিতে দশ বারো বছর পর পর এদের বিবাহকাল পড়ে। এবং ওই নির্দিষ্টকালের মধ্যে ছোট বড় সকলেরই বিবাহ হয় এমন কি গর্ভস্থ শিশুরও।

কাছি : উত্তর ভারতের কৃষিজীবী জাতি, কোইরিদের সমমর্যাদার। এরা নানা শাখায় বিভক্ত যথা কনোজিয়া, শাক্যসেনী, হরদীয়া, সুরাও, কচ্ছাওসারা, সাল্লোরিয়া ও আনোয়ার। প্রধানত বায়-বেরিলী ও কনৌজ জেলায় কাছিদের বসতি।

কঠ-বানিয়া : বিহারের একশ্রেণীর বানিয়া জাতি। মৈথিলী ব্রাহ্মণরা তাদের ধর্মকর্মে সহায়তা করে। কঠ-বানিয়াদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত।

কনজর : মধ্যভারতের ভ্রাম্যমান জাতি যারা মাদুর-প্রস্তুত ও অপরাধমূলক কাজকর্মের দ্বারা জীবিকার সংস্থান করে।

কনুবি : কুনবি দ্রষ্টব্য।

কনসারা : কসেরা দ্রষ্টব্য।

কনসারি, কনসালি : কাংসকার জাতি যারা সোনা-রুপা, পিতল-কাঁসা প্রভৃতি ধাতুর কাজ করে। দক্ষিণাঞ্চলে এরা পঞ্চ-কারিগর জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্গত, যে জাতিগোষ্ঠী অন্ধ্রপ্রদেশে পঞ্চনম-বরু, কর্ণাটকে পঞ্চবল, ও তামিলনাড়ুতে কম্মলার নামে পরিচিত। পঞ্চাল (পনচাল) দ্রষ্টব্য।

কনিয়ন : মালাবার উপকূলের জাতি যাদের পেশা জ্যোতিষ গণনা ও শুভাশুভ নির্ণয়। নাম্বুদিরি ব্রাহ্মণরা কনিয়নদের স্পর্শদোষ বাঁচিয়ে চলে।

কনেত : হিমালয় অঞ্চলের কৃষিজীবী জাতি যাদের নারীদের মধ্যে বহুপতিত্ব প্রচলিত। সচরাচর কয়েক ভাই মিলে এক পত্নী গ্রহণ করে।

কনোজিয়া : উত্তরভারতের পঞ্চগৌড় পর্যায়ের ব্রাহ্মণ যাদের মূল এলাকা

কনোজ অঞ্চল। কনোজিয়া ব্রাহ্মণরা জাতিকাঠামোর বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন।

কবর্গ: কর্ণাটক অঞ্চলের একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ যারা তুলব অঞ্চল থেকে আগত বলে কথিত। ব্রাহ্মণ সমাজে এদের তেমন মর্যাদা নেই, কেননা কিংবদন্তী অনুযায়ী এদের পূর্বপুরুষদের এক ভাই-বোন স্বামী-স্ত্রী সেজে দান গ্রহণ করে পতিত হয়েছিল এবং সেই হিসাবে কুল্লু (বর্ণমালার কবর্গের প্রথম বর্ণঘটিত) বা চোরের বংশ হিসাবে প্রচারিত।

কবরাই: তামিলনাড়ু ও সন্নিহিত অঞ্চলের কৃষিজীবী জাতি। এদের আঠারোটি শাখা বর্তমান, যদিও সকল শাখাই কৃষিতে নিযুক্ত নয়। প্রধান দুটি শাখা, বালিগা ও তোত্তিয়ার (তোত্তিয়ান বা কম্বলত্তর)।

কবীর পন্থী: কবীরের ধর্মমতে বিশ্বাসী উত্তরভারতের তন্তুবায় জাতি যাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই আছে।

কম্বলত্তর: তোত্তিয়ান দ্রষ্টব্য।

কম্মবন: তেলুগু কৃষিজীবী জাতি, যদিও তাদের বিশেষ বিস্তার টিনেভেলী জেলায় দেখা যায়। এদের মধ্যে পিসীর মেয়ে, মাসীর মেয়ে ও বোনের মেয়েকে বিবাহ করার রীতি আছে।

কম্মালন: পনচাল (পঞ্চাল) দ্রষ্টব্য।

কংকনস্থ: কোংকন ও সন্নিহিত অঞ্চলের মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ যারা চিৎপাবন নামে অধিকতর পরিচিত। চিৎপাবন নামটির মধ্যে চিৎ (চিতা) এবং পাবক (পাবক বা অগ্নি) থাকলেও, সম্ভবত এই নামটির উদ্ভব হয়েছে রত্নগিরি জেলার চিপলুন নগর থেকে। কংকনস্থ ব্রাহ্মণরা ঋক্ ও কৃষ্ণ যজুর্বেদী। তাদের দুটি শাখা। নির্বাণকর এবং কেলোসকর।

কংসবণিক: পিতল, কাঁসা প্রভৃতি ধাতুর সামগ্রী ও বিক্রয়কারী বণিক জাতি যাদের নিবাস মূলত বঙ্গদেশে। চলতি ভাষায় এবং অন্যত্র কাঁসারি, কনসারি প্রভৃতি নামে পরিচিত। ভারতের অন্যত্র এদের সমতুল্য জাতিরা কসেরা, থাথেরা, তামহেরা, কাঞ্চুগোরা প্রভৃতি নামে পরিচিত। বঙ্গদেশের কাঁসারিদের অনেকগুলি শাখা বর্তমান যেগুলির মধ্যে প্রধান মোহম্মদাবাদী এবং সপ্তগ্রামী।

করণ: উড়িষ্যা ও উত্তরভারতের লেখক ও হিসাবরক্ষক জাতি, কায়স্থদের সমতুল্য। উত্তর বিহারের তিরহুত অঞ্চলের করণরা প্রধানত পাটোয়ারি বা গ্রাম্য হিসাবরক্ষকের কাজ করে। সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে

বিহারের করণরা শ্রীবৎস ও অম্বষ্ঠদের চেয়ে খাটো। উড়িষ্যা'র করণরা অবশ্য বিহারের করণদের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য। অন্ধ্রপ্রদেশে করণম নামক জাতির পরিচয় পাওয়া যায়।

করহাদে : মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। করহাদে আসলে সাতারার নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম যা ওই বিশেষ শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের নামকরণের উৎস।

কর্মকার : কামার, লৌহের সামগ্রী প্রস্তুত করা যাদের পেশা। উত্তরভারতের অন্যত্র লোহার নামে পরিচিত। বঙ্গদেশের কামাররা উচ্চ নয় শ্রেণীর শূদ্রের মধ্যে পরিগণিত।

কলতা : ভিন্ন নাম কোলতা। উড়িষ্যার কৃষিজীবী জাতি। আসামের কলিতাদের সঙ্গে নামগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

কলংকী : মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের এক শ্রেণীর পতিত ব্রাহ্মণ।

কলিঙ্গ কোমতি : তেলুগু বাণিজ্যজীবী কোমতিদের শাখা যাদের বসতি গঞ্জাম জেলা ও সন্নিহিত অঞ্চলে।

কলিতা : আসামের কৃষিজীবী ও হিসাবরক্ষক জাতি, সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের পরেই যাদের স্থান। কলিতাদের মধ্যে যারা উচ্চ-শ্রেণীর তারা বর-কলিতা নামে পরিচিত।

কলু : বঙ্গদেশের তৈল-উৎপাদক জাতি। কলুরা উচ্চস্তরের শূদ্র হিসাবে গণ্য নয়, যদিও সমবৃত্তিসম্পন্ন তেলিরা উচ্চ নয় শ্রেণীর শূদ্রের মধ্যে পরিগণিত।

কল্লান : তামিল কৃষিজীবী জাতি, অথচ চুরি-ডাকাতিতে সিদ্ধহস্ত। এরা বুমেরাং জাতীয় অস্ত্র ব্যবহার করে; কানের লতিতে বড় ধরনের গর্ত করে। এক ধরনের ষাঁড়ের লড়াই এদের মধ্যে প্রচলিত। এরা শিবপূজক এবং এদের মধ্যে লিঙ্গাগ্রের ত্বকচ্ছেদের রীতি আছে।

কষ্ট-শ্রোত্রিয় : বঙ্গদেশের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের সর্বনিম্ন শ্রেণী।

কসরওয়ানি : উত্তর প্রদেশের তৈল ব্যবসায়ী যদিও তাদের আদিবৃত্তি পিতল-কাঁসার ব্যবসা।

কস্তা : পুনা ও খান্দেশ জেলার কৃষিজীবী ব্রাহ্মণ।

কসেরা : উত্তরভারতের পিতল, কাঁসা প্রভৃতি ধাতুর সামগ্রী প্রস্তুতকারক জাতি। দ্রষ্টব্য কংসবণিক, কনসারি, কাঁসারি প্রভৃতি।

কহার : কাহার নামেও পরিচিত উত্তরভারতের সৎশূদ্র পর্যায়ে জাতি, পেশায় মৎস্যজীবী, কূপখননকারী, পানিফল প্রভৃতি জলীয় সামগ্রীর চাষী,

মালবাহক ও গৃহভৃত্য। সংস্কৃত স্কন্ধকার থেকে কহার নামের উৎপত্তি। কহারদের বহু শাখার মধ্যে রাওয়ানী এবং তুরাহু প্রধান।

কাছী : ভিন্ন নাম সাহুনাই। উত্তরভারতের উদ্যানকর্মী ও আফিম উৎপাদক জাতি।

কাঞ্চুগোরা : বোগারা নামেও পরিচিত কর্ণাটক অঞ্চলের কাঁসারি জাতি।

কাঠছওয়া : রাজপুতদের একটি শাখা জাতি।

কাটৌনি : আসামের নাথপন্থী তন্তুবায় জাতি।

কানারা-কাম্মা : অন্ধ্রপ্রদেশের স্মার্ত নিয়োগী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, কর্ণাটক থেকে আগত।

কান্দু : উত্তরভারতের সৎ-শূদ্র পর্যায়ের জাতি যারা খই, চিঁড়ে, মুড়ি প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদক ও বিক্রেতা।

কাম্পীলিয়ন : কর্ণাটকের প্রভাবশালী কৃষিজীবী জাতি।

কাপু : উচ্চ শ্রেণীর শূদ্র হিসাবে পরিগণিত অন্ধ্রপ্রদেশের প্রভাবশালী কৃষিজীবী জাতি। এদের উপাধি রেড্ডি। এরা নিজেদের রাজপুত-উদ্ভূত বলেও দাবি করে।

কাপোলা : গুজরাতী বানিয়াদের একটি শাখাজাতি।

কামরি : কর্মকার বা কামার জাতি। তেলুগু অঞ্চলের পঞ্চনম-বলুর একটি শাখা।

কামার : কর্মকার দ্রষ্টব্য।

কাম্মা : অন্ধ্রপ্রদেশের প্রভাবশালী কৃষিজীবী জাতি যারা নিজেদের ক্ষত্রিয় এবং লক্ষ্মীদেবীর কর্ণভূষণ থেকে উদ্ভূত বলে দাবি করে। কাম্মারা পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত, এবং এই পার্থক্যের পরিচয় তাদের জল বহন করার পদ্ধতি থেকেই বোঝা যায়। কাম্মাদের মধ্যে সুবিস্তৃত গোত্রব্যবস্থা বর্তমান।

কামি : নেপাল ও সন্নিহিত অঞ্চলের কর্মকার জাতি।

কারালর : নামের অর্থ 'মেঘ-শাসক'। এই নামটির দ্বারা দক্ষিণ আর্কট জেলার শিকারজীবী ও নিম্ন কৃষিজীবীদের, মালাবার অঞ্চলের বেল্লাল জাতিদের এবং সালেম জেলার সেবারয় পর্বতাঞ্চলের মালয়ালীদের বোঝায়।

কালওয়ার : উত্তরভারতের মদ্য-উৎপাদক ও মদ্যবিক্রেতা জাতি যারা বঙ্গদেশের শৌণ্ডিক বা শুঁড়িদের সমতুল্য। কালওয়ারদের প্রধান শাখাগুলির নাম

বিয়াহুত, জৈসোয়ার বা অযোধ্যাবাসী, বানোধ্যা, খল্সা, খোরিদহ ও দিসওয়ার।

কায়স্থ : বঙ্গদেশ ও উত্তরভারতের লেখক ও হিসাবরক্ষক জাতি, জাতি-কাঠামোয় যাদের স্থান যথেষ্ট মর্যাদার। বঙ্গদেশের কায়স্থরা দক্ষিণ রাঢ়ী, উত্তর রাঢ়ী, বঙ্গজ, বরেন্দ্র, শিলেটী ও গোলাম এবং উত্তরভারতীয় কায়স্থরা শ্রীবৎস, করণ, অম্বষ্ঠ, শাক্যসেনী, কুলশ্রেষ্ঠী, ভটনগরী, মাথুরী, সূর্যধ্বজ, বাল্মীকি, অষ্টমা, নিগম, গৌড়, উনাই প্রভৃতি শাখায় বিভক্ত। উড়িষ্যার করণ, মহারাষ্ট্রের প্রভু, অন্ধ্রের করণম, কর্ণাটকের কণক্কন, সানভোগ এবং তামিলনাড়ুর বেল্লালাররা সামাজিক অবস্থান ও পেশার দিক থেকে কায়স্থদের কাছাকাছি।

কিরবন্ত : মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ যারা প্রধানত কোংকন অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেকেই কৃষিজীবী।

কিরাত : শিকারজীবী উপজাতিদের প্রাচীন সাধারণ নাম। তবে পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশে কিরাত নামক কৃষিজীবী জাতির সন্ধান পাওয়া যায়।

কিরু-গাণিগা : কর্ণাটক অঞ্চলের তৈলকার গাণিগা জাতির শাখা।

কিসান : উত্তরভারতের কৃষিজীবী জাতিদের সাধারণ নাম।

কিসানধন : উত্তরপ্রদেশের বান্দা ও বস্তি জেলার বাণিজ্যজীবী জাতি যাদের মূল পেশা মহাজনী।

কুক্কুর : পশ্চিম পাঞ্জাবের ক্ষত্রিদের একটি শাখা যাদের নামকরণের ক্ষেত্রে টোটেম-বিশ্বাসের প্রভাব হয়ত আছে।

কুণ্ড-গোলক : মহারাষ্ট্রের নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

কুদুম্বি : ত্রিবাংকুর অঞ্চলের প্রাক্তন শস্যজীবী জাতি যাদের বর্তমান বৃত্তি বাজি-তৈরি ও গৃহভৃত্যের কাজ।

কুনবি : মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের সর্ববৃহৎ কৃষিজীবী জাতি, যারা উত্তরের কুর্মিদেরই নামান্তর। গুজরাতেও কুনবিদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

কুনবি গোর : যে-সকল ব্রাহ্মণ কৃষিজীবী কুনবিদের ধর্মকার্যে পৌরোহিত্য করে। জাতিগত মর্যাদার বিচারে এদের স্থান উচ্চে নয়।

কুমার, কুমহার, কুমোর : কুম্ভকার দ্রষ্টব্য।

কুম্ভকার : মৃৎপাত্র প্রস্তুতকারী জাতি যারা বঙ্গদেশে কুমার বা কুমোর, উত্তর ভারতে কুমহার ও দক্ষিণ ভারতে কুসবন নামে পরিচিত। সংস্কৃতে এদের কুম্ভকার ছাড়াও কুলাল বা কৌলাল বলা হয়। বঙ্গদেশের কুমোররা

দেবদেবীর মূর্তিও গড়ে। কুম্ভকাররা উচ্চ ধরনের শূদ্র যদিও মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা এবং উত্তরপ্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে তাদের নিম্নশ্রেণীর বলে গণ্য করা হয়।

কুরব : মালাবার অঞ্চলের ভূমিশ্রমিক জাতি।

কুর্মি : উত্তর ভারতের প্রধান কৃষিজীবী জাতি যারা নানা শাখায় বিভক্ত, যেমন বিহারে ঘমেলা, কোচাইশা, মানসূওয়ার, চন্দানি, ঘানোধিয়া, ফসফসিয়া, জৈসোয়ার, উত্তরপ্রদেশে সাইথওয়ার, আথারিয়া, চুনরওয়ার, আকোরওয়ার, পাটনাওয়ার, কেওয়াট, রেওয়াট, ঝাদন, ভার্তি, কাট্রিয়ার গুঙ্গওয়ারি, সিঙ্গরাওন, চাপোরিয়া, কণোজিয়া, ঝুনিয়া, ঘোরচোরা, মধ্যপ্রদেশে জৈসোয়ার, ঝারি, চৌরিয়া, মানোহা, চারনাও, দেরিয়েসিয়া, সিংগরোলো, তিরোলা, চন্দারিয়া প্রভৃতি।

কুরিচ্চন : মালাবার অঞ্চলের শিকারজীবী ও নিম্ন কৃষিজীবী জাতি।

কুরুব : কুরুম্ব বা কুরুমনদের স্বজাতি, দক্ষিণের বিক্ষিপ্ত জাতি, পশুপালন, বস্ত্রবয়ন ও রাজমিস্ত্রির কাজ যাদের পেশা।

কুলশ্রেষ্ঠী : উত্তরভারতের একশ্রেণীর কায়স্থ, আগ্রা ও এটা জেলায় যাদের প্রধান বসতি।

কুসবন : তামিল কুম্ভকার জাতি।

কৃষ্ণোরা : গুজরাতের নাগর ব্রাহ্মণদের একটি শাখা।

কেওট : কৈবর্তদের ভিন্ন নাম, তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত।

কেসরওয়ানি : কসরওয়ানি দ্রষ্টব্য।

কৈকোলান : তামিল তন্তুবায় জাতি। তাদের নানা শাখার মধ্যে সালিয়াররা উপবীত ধারণ করে।

কৈবর্ত : বঙ্গদেশের কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী জাতি। কৃষিজীবী কৈবর্তরা হালিয়া-কৈবর্ত বা চাষা কৈবর্ত নামে পরিচিত, মৎস্যজীবীরা জালিয়া-কৈবর্ত। সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে হালিয়াদের স্থান উচ্চে। এছাড়া তুতিয়া-কৈবর্ত নামে কৈবর্তদের আরও একটি শাখা বর্তমান যারা তুঁত গাছ ও গুটিপোকার চাষ করে।

কোচ : উত্তরবঙ্গ ও আসামের উপজাতি। উত্তরবঙ্গে কোচদের একটি শাখার রাজবংশী জাতিতে উত্তরণ ঘটেছে। আসামে কাছারি, লালুঙ্গ, মিকির প্রভৃতি হিন্দুভাবাপন্ন উপজাতিদের জাতি-অর্থে কোচ আখ্যা দেওয়া হয়।

কোটা : নীলগিরি পর্বতাঞ্চলের উপজাতি যারা নিম্নপর্যায়ের জাতি হিসাবে বিবেচিত। এদের বৃত্তি কৃষি, কারিগরি ও গানবাজনা।

কোট্টই-বেল্লাল : তামিল কৃষিজীবী বেল্লাল জাতির শাখা, টিনেভেলী জেলায় যাদের প্রধান বসতি। কোট্টই বিশেষণটি কোট্ট বা দুর্গ থেকে উদ্ভূত।

কোদাগা, কোড়াগা : কুর্গ অঞ্চলের শস্ত্রজীবী জাতি অথবা উপজাতি।

কোমতি : তেলুগু বাণিজ্যজীবী জাতি যারা নিজেদের বৈশ্য বলে দাবি করে ও উপবীত ধারণ করে। কোমতিদের নানা শাখার মধ্যে প্রধান গাবুরি-কোমতি, বেরি-কোমতি, কলিঙ্গ-কোমতি, বলজি-কোমতি ও নাগর-কোমতি। গাবুরি-কোমতিদের স্থান সর্বোচ্চে যারা নিরামিষাশী। অন্যান্যরা মাছ মাংস ভক্ষণ করে। কোমতিদের মধ্যে মাতুলকন্যাকে বিবাহ করার রীতি আছে।

কোরব : ভ্রাম্যমান তামিল জাতি, ভাগ্য গণনা, হাতুড়ে চিকিৎসা এবং সুবিধা-মত চৌর্যবৃত্তি যাদের পেশা।

কোরা : ছোটনাগপুর ও বঙ্গদেশের ভূমিশ্রমিক জাতি। পূর্বে এরা লবণ প্রস্তুতকারক ছিল।

কোরাগা : দক্ষিণ কানারা জেলার শ্রমজীবী ও ঝুড়ি-প্রস্তুতকারক জাতি। তাদের মেয়েদের মধ্যে গাছের পাতার পোশাক ব্যবহারের প্রচলন আছে। তাদের একটি শাখা আন্দে-কোরাগা নামে পরিচিত যারা গলায় ঝোলানো একটি পাত্রে থুতু ফেলে যাতে সেজন্য পথঘাট না কলুষিত হয়।

কোরি : উত্তর ভারতের তন্তুবায় জাতি।

কোলতা : কলতা দ্রষ্টব্য। উড়িষ্যা ছাড়াও মধ্যপ্রদেশে কোলতা নামক কৃষি-জীবী জাতি বর্তমান।

কোলি : মহারাষ্ট্র ও পশ্চিম ভারতের শ্রমজীবী জাতি, যাদের নাম থেকে কুলি শব্দটি উদ্ভূত। উত্তর ভারতে কোলি নামক একটি তন্তুবায় জাতি বর্তমান।

কোয়েরি, কৈরি : উত্তর ভারতের কৃষিজীবী জাতি, যাদের সঙ্গে কুর্মিদের বিশেষ পার্থক্য নেই। তবে কোয়েরিরা শস্যোৎপাদনের পরিবর্তে শাক-সব্জী, আনাজ-তরকারি উৎপন্ন করে। তারা শুদ্ধ শূদ্র হিসাবে পরিগণিত।

খাটিক : উত্তর ভারতের শ্রমজীবী, কসাই ও সবজীবিক্রেতা জাতি।

খঞ্জার : মধ্যপ্রদেশের উপজাতি-উদ্ভূত জাতি যাদের পেশা পাহারাদারী।

খাত্রি : দ্রষ্টব্য ক্ষাত্রি। কর্ণাটকে খাত্রি নামক একটি তন্তুবায় জাতি আছে।

খন্দাইত : উড়িষ্যার শ্রমজীবী জাতি যারা পরে কৃষিকেই বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছে। খন্দাইতদের নানা শ্রেণী আছে যেমন শ্রেষ্ঠ-খন্দাইত, পাইক-খন্দাইত, ওর-খন্দাইত, চাষা-খন্দাইত প্রভৃতি।

খরওয়ার : বিহারের ছোটনাগপুর ও সন্নিহিত অঞ্চলের উপজাতি-উদ্ভূত কৃষিজীবী জাতি।

খাণ্ডেলবাল : জয়পুর ও মারবার অঞ্চলের ব্রাহ্মণ। একই অঞ্চলের একটি বানিয়া জাতিও এই নামে পরিচিত। খাণ্ডেলবালদের মধ্যে জৈন ধর্মাবলম্বীও বর্তমান।

খাতি : পাঞ্জাব ও রাজস্থানের ছুতার জাতি যারা প্রধানত গোশকট নির্মাণ করে।

খাদায়াতা : গুজরাতের খেদা, আমেদাবাদ ও ব্রোচ জেলার ব্রাহ্মণ যারা পৌরোহিত্য ও গুরুগিরি করে। এই অঞ্চলের একটি বানিয়া জাতিও এই নামে পরিচিত।

খারবা : পশ্চিম ভারতের নুনিয়া জাতি।

খোজা : পশ্চিমভারতের মুসলমান বাণিজ্যজীবী জাতি। পাঞ্জাব অঞ্চলেও খোজা আছে যারা ধর্মমতের দিক থেকে সুন্নি এবং হিন্দু ক্ষত্রি জাতি থেকে উদ্ভূত। সিন্ধু অঞ্চলের খোজারা ধর্মমতের দিক থেকে শিয়া এবং তারা হিন্দু লোহনা জাতি থেকে ধর্মান্তরিত।

ক্ষত্রি : ক্ষেত্রি নামেও পরিচিত বাণিজ্যজীবী জাতি যাদের এলাকা খুবই বিস্তৃত। ক্ষত্রিদের চারটি প্রধান শাখা বনজাই, শিরীন, কুকুর এবং রোরহা বা অরোরা (শেষোক্তদের ক্ষত্রি পরিচয় সন্দেহজনক)।

ক্ষত্রিয় : চাতুর্বর্ণের দ্বিতীয় বর্ণ। ইদানীং নানা প্রভাবশালী জাতি ক্ষত্রিয়ত্বের দাবিদার।

গদারিয়া : উত্তর ভারতের পশুপালক জাতি। বঙ্গদেশের নদীয়া ও ঢাকা জেলাতেও গদারিয়া জাতি বর্তমান, যাদের প্রধান পেশা ইট তৈরি করা। গদারিয়া মেয়েরা চিঁড়ে তৈরি করে।

গঙ্গাপুত্র : বারানসী অঞ্চলের একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ যারা পাণ্ডা হিসাবে কাজ করে। ব্রাহ্মণসমাজে এদের বিশেষ মর্যাদা নেই।

গণক : নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ যাদের পেশা জ্যোতিষচর্চা। বঙ্গদেশে গণক ও তাদের সমবৃত্তিসম্পন্ন আচার্য-ব্রাহ্মণ, গ্রহবিপ্র, দৈবজ্ঞ, গ্রহাচার্য প্রভৃতি বর্তমান। উড়িষ্যায় এবং আসামে এই বৃত্তিজীবী জাতিরা যথাক্রমে নক্ষত্র

ব্রাহ্মণ ও গণক নামে পরিচিত। আসামের গণকদের সামাজিক অবস্থান মোটামুটি সম্মানজনক।

গাণিগা : কর্ণাটকের তৈলকার জাতি। তাদের নানা শ্রেণী আছে। যেমন হেগ-গাণিগা, কিরু-গাণিগা, বস্তি-এন্তু-গাণিগা, সজ্জন প্রভৃতি।

গাণিসর : কর্ণাটক অঞ্চলের বয়নকারী জাতি।

গান্দি : পাঞ্জাবের পশুপালক জাতি যাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান দুইই আছে।

গান্ধর্ব : উত্তর ভারতের নিম্নশ্রেণীর জাতি, নৃত্য-গীত-বাদ্য যাদের পেশা।

গান্ধর্ব-গোর : যে সকল ব্রাহ্মণ গন্ধর্বদের পৌরোহিত্য করে।

গন্ধ-বণিক : বঙ্গদেশের সমৃদ্ধশালী বণিক জাতি, যাদের মূল বাণিজ্যসামগ্রী গন্ধদ্রব্য হলেও, নানা সামগ্রীরই বাণিজ্য তারা করে। গন্ধবণিকরা উচ্চ-শ্রেণীর শূদ্র, যাদের জলগ্রহণে ব্রাহ্মণরা আপত্তি করে না। তাদের মধ্যে অনেকে নিজেদের বৈশ্য বলে গণ্য করে।

গয়াওয়াল, গয়াল, গয়ালী : গয়ার পাণ্ডা যারা নিম্নবর্ণের ব্রাহ্মণ হিসাবে পরিগণিত।

গামাল্লা : অন্ধ্রপ্রদেশের তাড়ি-সংগ্রাহক জাতি, যাদের একটি শাখা গোনলা বা গোন্দলা নামে পরিচিত। এরা মালাবার অঞ্চলের তিয়ান বা টিয়ান, কর্ণাটকের ইদিগা প্রভৃতির স্বজাতি।

গাবুরি-কোমতি : তেলুগু কোমতিদের একটি প্রাচীন শাখা।

গির্ণার ব্রাহ্মণ : সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের ব্রাহ্মণ যারা তিনটি শাখায় বিভক্ত—জুনা-গড়ীয়া, আজক্য এবং চোরবাড়া। তিনটি শাখার নামই স্থাননাম অবলম্বনে।

গুজর : পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের পশুপালক জাতি যারা পরে কৃষি ও বাণিজ্যকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করে। কেউ কেউ মনে করেন যে এরা আগত হূণদের বংশধর। গুজরদের মধ্যে অনেকে ইসলামধর্মে দীক্ষা নিয়েছে, বিশেষ করে কাশ্মীরে। শিখদের মধ্যেও অনেক গুজর আছে। গুজরাতে ও রাজস্থানের গুজররা বাণিজ্যজীবী হওয়ায় বানিয়া জাতি রূপে গণ্য হয়। যে ব্রাহ্মণরা গুজরদের পৌরোহিত্য করে তাদের গুজর-গোর বলা হয়।

গুড়িয়া, গুরিয়া : উড়িষ্যার মোদক জাতি। গুড়িয়া নামটি গুড় থেকে নিষ্পন্ন।

গেন্ডেগোরা : কর্ণাটক অঞ্চলের কাঁসারি জাতি যারা প্রধানত ঘুঙুর তৈরি করে।

গোদো : বঙ্গদেশের গোয়ালাজাতির একটি শাখা। নিবাস প্রধানত নদীয়া জেলায়।

গোলাম-কায়স্থ : পূর্ববঙ্গের একশ্রেণীর কায়স্থ, গৃহভৃত্যের কাজ যাদের পেশা।

গোলি, গোলুতা : গোয়ালা দ্রষ্টব্য।

গোন্দ-ব্রাহ্মণ : মধ্যপ্রদেশের ব্রাহ্মণ যারা পূর্বে গন্ডোয়ানা রাজ্যের বাসিন্দা ছিল। এরা অধিকাংশই যজুর্বেদী, ঋগ্বেদীও কিছু আছে। গোন্দ ব্রাহ্মণরা নিরামিষাশী এবং অমদ্যপায়ী। চরকী, মালবী এবং নর্মদী ব্রাহ্মণরা গোন্দ-ব্রাহ্মণদেরই দূরবর্তী শাখা।

গোপ, গোয়ালা : গোপালক জাতি যারা উত্তরভারতে আভীর বা আহির, গুজর, দক্ষিণে গোল্লালু, গোল্ল, মাত্তু-এডিয়া, এবং বঙ্গদেশ, বিহার ও উড়িষ্যায় গোয়ালা নামে পরিচিত। বঙ্গদেশের গোয়ালারা পল্লব, বগুরি বা উজ্রান, বারেন্দ্র, রাঢ়ী, মঘাই, গোদো, সদ্গোপ প্রভৃতি শাখায় বিভক্ত। উড়িষ্যার গোয়ালারা তিনটি প্রধান শাখায় বিভক্ত—কৃষ্ণোত, মথুরাবংশী ও গৌরবংশী।

গোলপুরাব : আগ্রা জেলার কৃষিজীবী জাতি, যাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের সংমিশ্রণ ঘটেছে।

গোল্ল : কর্ণাটকের গোয়ালা জাতি, যারা অন্ধ্রে গোল্লালু নামে পরিচিত। গোল্লদের প্রধান দুটি শাখা উরু-গোল্ল ও কাদু-গোল্ল। অন্ধ্রের গোল্লালু-দের একটি শাখা নিজেদের যাথব (যাদব) নামে পরিচয় দেয়।

গ্রহ-বিপ্র : গণক দ্রষ্টব্য।

গেন্দলা : গামাল্লা দ্রষ্টব্য।

গৌড় : যমুনার উত্তরাঞ্চলের ব্রাহ্মণ। পঞ্চ-গৌড় বলতে সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, উৎকল ও মৈথিলী ব্রাহ্মণদের বোঝায়। হরিয়ানা অঞ্চলের এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ গৌড় নামে পরিচিত, যাদের দুইটি প্রধান শাখার নাম আদি-গৌড় এবং তাগা-গৌড়, এবং উভয় শাখাই কৃষিজীবী। গৌড় শব্দটির দ্বারা পুরোহিতশ্রেণীকেও বোঝায়, চলিত ভাষায় গোর, যেমন আভীর-গোর, মোচি-গোর প্রভৃতি।

ঘাঁচি : পশ্চিম ভারতের তৈলকার জাতি।

ঘাসিয়া : উত্তর ও মধ্যভারতের জাতি যাদের পেশা নাচ-গান-বাজনা, মাছধরা এবং পিতল কাঁসার কাজ করা।

ঘিরাচ : পাঞ্জাবের কৃষিজীবী জাতি।

ঘোষী : পাঞ্জাবের পশুপালক ও গোপজাতি, অধিকাংশই ইসলাম ধর্মাবলম্বী।

চণ্ডাল : শাস্ত্রোক্ত প্রতিলোম-সংকর জাতি, শূদ্রপুরুষ ও ব্রাহ্মণ রমণীর সংকর। বঙ্গদেশে নমঃশূদ্র জাতি হিসাবে পরিচিত যারা পেশায় কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী ও নাবিক।

চন্দ্রাল : বঙ্গদেশের মৎস্যজীবী ও নৌজীবী জাতি।

চরকী : মধ্যপ্রদেশের গোন্দ ব্রাহ্মণদের দূরবর্তী শাখা।

চাকলি : অন্ধ্রপ্রদেশের রজক জাতি।

চাক্কিলিয়ন : তামিল চর্মকার জাতি, উত্তরভারতের চামার ও অন্ধ্রপ্রদেশের মাদিগাদের সমতুল্য।

চামার : উত্তর ও মধ্যভারতের চর্মকার জাতি। চামার নামটি সংস্কৃত চর্ম-কার থেকে উদ্ভূত।

চামারগোর : রাজপুতদের একটি শাখাজাতি যাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক আছে।

চারণ : গুজরাত অঞ্চলের চারণ জাতি যারা রাজপুত-উদ্ভূত বলে দাবি করে। চারণগান, বংশাবলী কীর্তন প্রভৃতি বিষয় এদের প্রধান বৃত্তি। চারণ দর রীতিনীতি ভাটদের অনুরূপ। রাজস্থানেও চারণদের দেখা যায়। চারণরা ব্রাহ্মণদের সমান সামাজিক মর্যাদা দাবি করে।

চাষা : ব্যাপক অর্থে যে কোন কৃষিজীবীকেই বোঝায়, তবে উড়িষ্যায় চাষা নামে একটি বিশেষ কৃষিজীবী জাতি বর্তমান।

চালিয়ান : মালাবার অঞ্চলের তন্তুবায় জাতি।

চাঁড়াল : চণ্ডাল দ্রষ্টব্য।

চিৎপাবন : দ্রষ্টব্য কংকনস্থ। কোংকনী ব্রাহ্মণ, সচরাচর গৌরবর্ণ। আদি নিবাস সম্ভবত রত্নাগিরি জেলার চিপলুন।

চিত্রোদা : গুজরাতের নাগর ব্রাহ্মণদের একটি শাখা, ভবনগর ও বরোদায় যাদের বেশি দেখা যায়। চিত্রোদ নাম শহরের নাম থেকেই সম্ভবত এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের নামকরণ হয়েছে।

চিম্পিয়া : কর্ণাটকের দর্জি বা দির্জি জাতির শাখা, নামদেব নামেও পরিচিত।

চুহ্‌রা : পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের আবর্জনা পরিষ্কারক জাতি।

মুসলমান ধর্মাবলম্বী হলে তারা মুসাল্লি নামে পরিচিত হয়, শিখ ধর্মাবলম্বী হলে মাঝবি নামে পরিচিত হয়।

চেট্টি : সংস্কৃত শ্রেষ্ঠীর তামিল রূপান্তর। তামিলনাড়ুর বাণিজ্যজীবী চেট্টিরা নিজেদের বৈশ্য বলে পরিচয় দেয়। চেট্টিরা বহু শাখায় বিভক্ত। এক শাখার সঙ্গে অন্য শাখা বিবাহাদি সম্পর্ক স্থাপন করে না।

চেরুমন : দক্ষিণ কানারা ও দক্ষিণ মালাবার অঞ্চলের কৃষিশ্রমিক যারা উত্তর মালাবার, কোচিন ও ত্রিবাংকুরের পুলায়ানদেয় সঙ্গে অভিন্ন।

চেরো : উত্তরপ্রদেশের মীর্জাপুর ও সন্নিহিত জেলাসমূহের বাসিন্দা উপজাতি-উদ্ভূত কৃষিজীবী জাতি।

চোধুরা : মহারাষ্ট্রের যাযাবর পার্বত্য জাতি অথবা উপজাতি।

চোবর : নাম্বুদিরি ব্রাহ্মণদের শৈব শাখা, বৈষ্ণব শাখাটির নাম পনিয়ন।

চোবিশা : গুজরাতী ব্রাহ্মণদের একটি শাখা যাদের প্রধান অবস্থান বরোদায় এবং নর্মদার তীরবর্তী সিনোর এবং জানোর অঞ্চলে।

ছজাতি : পাঞ্জাবের বনজাই ক্ষত্রিদের ছয় গোত্র বা ঘর নিয়ে একটি শাখার নাম। ছয়টি ঘর বহেল, ধাওয়ান, বেরি, বিজ, সাইগল ও চোপরা। এই নামগুলি পদবী হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

ছত্তরখাই : উড়িষ্যার ১৮৮৬-র দুর্ভিক্ষে ছত্র বা লঙ্গরখানায় ভোজনের জন্য যারা জাতিচ্যুত হয়েছে তাদের নিয়ে গঠিত জাতি।

জনম্পন : তেলুগু জাতি যারা শনের দড়ি দিয়ে ব্যাগ তৈরি করে ও নানারকম ছোটখাট বাণিজ্য করে।

জম্বু : একশ্রেণীর গুজরাতী ব্রাহ্মণ যাদের নামকরণ হয়েছে ব্রোচ জেলার জম্বুসর নগরের নাম থেকে।

জাঠ : উত্তর ভারতের প্রভাবশালী কৃষিজীবী জাতি।

জাটিয়া : রাজস্থানের চর্মকার জাতি।

জামেয়া : উত্তর ভারতের বানিয়া জাতি যাদের মূল এলাকা উত্তরপ্রদেশের এটাওয়া জেলা। তারা নিজেদের প্রহ্লাদের বংশধর বলে দাবি করে।

জালিয়া-কৈবর্ত : বঙ্গদেশের মৎস্যজীবী জাতি।

জালুয়া : পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি জেলার মৎস্যজীবী জাতি।

জুগি : যোগী শব্দের তুচ্ছার্থে প্রয়োগ। বঙ্গদেশ ও আসামের তন্তুবায় ও বাণিজ্যজীবী জাতি যারা উত্তরভারতীয় নাথপন্থায় বিশ্বাসী।

জুরাজ : উড়িষ্যার নিম্ন-কৃষিজীবী উপজাতি যাদের জাতি পর্যায়ে রূপান্তর

বটেছে। প্রধানত ঝুড়ি-বোনা, অরণ্যজাত সামগ্রীর বিক্রয় প্রভৃতি কাজ তারা করে থাকে।

জোগ : মৈথিলী ব্রাহ্মণদের একটি শাখা। যোগী শব্দ নিষ্পন্ন।

জোতিফন, জোতিনগোরা : কর্ণাটকের তৈলকার জাতি, গণিগাদের অনুরূপ।

জোলা, জোলাহা : উত্তর ভারতের মুসলমান তন্তুবায় জাতি।

জৈওয়ার : মৈথিল ব্রাহ্মণদের পাঁচটি শাখার একটি, বাকি চারটি শ্রোত্রিয় বা সোত্র, জোগ বা যোগী, পঞ্জি-বধ এবং নাগর।

জৈসোয়ার : উত্তর ভারতের বানিয়া জাতি। উত্তরপ্রদেশের রায়বেরিলি জেলার সালোন বিভাগের অন্তর্গত জৈস বা জইস গরগনা তাদের নামকরণের হেতু। উত্তর ভারতের কালোয়ারদের একটি শাখা জৈসোয়ার বা অযোধ্যা-বাসী নামে পরিচিত এবং তারা জৈসোয়ার বণিকদের স্বজাতি বলে পরিচয় দেয়। জৈসোয়ার নামে কৃষিজীবী কুর্মি জাতির একটি শাখা উত্তর ভারতের নানাস্থানে ছড়িয়ে আছে। তবে তাদের প্রধান এলাকা বিহার।

ঝরা-ব্রাহ্মণ : গোন্দ ব্রহ্মণদের শাখা, অথবা তাদেরই ভিন্ন নাম। মূল এলাকা মধ্যপ্রদেশ।

ঝরোলা : বহু গুজরাটী বানিয়াজাতির একটি।

ঝালো : বঙ্গদেশের মৎস্যজীবী জাতি, মালো জাতির শাখা কিংবা ভিন্ন নাম।

ঝিওয়ার : পাঞ্জাব অঞ্চলের মৎস্যজীবী ও জলবাহক জাতি, যারা শুদ্ধ জাতি হিসাবে বিবেচিত।

ঝালোয়ারী : কাথিয়াবাড় অঞ্চলের ঝালোয়ার জেলার ব্রাহ্মণ, গুজরাটী, ঔদীচ্য ব্রাহ্মণদের একটি শাখা।

ঝিঝোটিয়া : বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলের ব্রাহ্মণ, যারা কনৌজ থেকে আগত বলে দাবি করে। ঝিঝোটিয়া রাজপুত এবং ঝিঝোটিয়া বানিয়া জাতিরও পরিচয় পাওয়া যায়।

টিয়ান, তিয়ান : মালাবার উপকূলের তাড়ি-সংগ্রাহক জাতি, যারা মালাবারের উত্তরাঞ্চলে মাতৃতান্ত্রিক এবং দক্ষিণাঞ্চলে পিতৃতান্ত্রিক। দক্ষিণের শানান ও ইঝাবানদের সমজাতীয়।

ডাকোট : রাজস্থানের একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ যারা শনিপুজো করে। সমাজে এদের তেমন মর্যাদা নেই।

ডোম : সম্ভবত ডোমার, ডম্বু, ডোম্বো উপজাতি-উদ্ভূত জাতি যাদের পেশা আবর্জনা পরিষ্কার, নৃত্যগীত, বাণিজ্য প্রভৃতি। কুমায়ুন ও গাড়োয়াল

অঞ্চলের ডোমরা নানা ধরনের কারিগরি কারুকর্ম করে এবং নানা পেশাদারী শাখায় বিভক্ত। তারা সমতলের ডোমদের সঙ্গে জাতিসম্বন্ধ স্বীকার করে না। ডোমদের একাংশ পূর্বে শস্ত্রজীবী ছিল।

ডোগরা ব্রাহ্মণ : কাশ্মিরী ব্রাহ্মণদের একটি শ্রেণী।

ডোগরা বানিয়া : জম্মু অঞ্চলের বাণিজ্যজীবী জাতি।

ঢালি : ঢালবহনকারী এবং সেই অর্থে শস্ত্রজীবী জাতি। বর্তমানে বঙ্গদেশের একশ্রেণীর গোয়ালার উপাধি।

তওয়াইফ : উত্তরপ্রদেশের নর্তকী-বাইজীর জাতি, যা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মেয়েদের নিয়ে গঠিত। এই জাতির পুরুষরা অন্য জাতির মেয়েকে বিবাহ করে এবং যন্ত্রসঙ্গীতের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে।

তপোধন : তাপ্তী নদীর তীরে বসবাসকারী একশ্রেণীর গুজরাতী ব্রাহ্মণ। এদের কিছু লোক পৌরোহিত্য করলেও অধিকাংশই কৃষিজীবী।

তরখান : পাঞ্জাবের ছুতার জাতি।

তলাজিয়া : গুজরাতী ব্রাহ্মণদের একটি শাখা, ভবনগরের তলাজ নগর থেকে যাদের নামকরণ হয়েছে। এদের অধিকাংশই কৃষিজীবী।

তাগা : রোহিলখণ্ড অঞ্চলের ভূম্যধিকারী জাতি যাদের উদ্ভব ব্রাহ্মণ থেকে। বর্তমানে কৃষিজীবী এবং এদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের লোকই আছে।

তাগা-গৌড় : হরিয়ানা অঞ্চলের গৌড়-ব্রাহ্মণদের একটি কৃষিজীবী শাখা। তাদের মধ্যে তাগা বা পৈতা ছাড়া ব্রাহ্মণত্বের আর কোন পরিচয় না থাকায় তাদের ওই নামে অভিহিত করা হয়।

তাতোয়া : বিহারের তন্তুবায় জাতি।

তাঁতী : বঙ্গদেশের তন্তুবায় জাতি, নবশাখ উচ্চ শূদ্রজাতির অন্তর্গত। উড়িষ্যায় তাঁতীদের তিনটি শাখা—গোলা, হংস ও মোতিবংশ। বিহারের তাঁতীরা তাতোয়া নামে পরিচিত।

তাম্বুলি : বঙ্গদেশের পান-উৎপাদক জাতি। বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্য-প্রদেশেও তাম্বুলি জাতি আছে।

তিগল : কর্ণাটকের কৃষিজীবী জাতি।

তিরহুত ব্রাহ্মণ : মৈথিলী ব্রাহ্মণদের অপর নাম।

তিলি : বঙ্গদেশের তৈলকার জাতি, যদিও তেলিদের থেকে ভিন্ন। তিলি

নামটি তিল বা তৈলবীজ থেকে এসেছে। আসলে তিলিদের ব্যবসাবাণিজ্য তেলের উপাদান নিয়ে, এবং তারা তৈলবীজ পেষণ কার্যও করে থাকে।

তির ঃ কেরলের কৃষিজীবী জাতি।

তিয়ান ঃ টিয়ান দ্রষ্টব্য।

তিয়ার ঃ বঙ্গদেশের মৎস্যজীবী ও নাবিক জাতি।

তুরাহ ঃ কাহার বা কাহারদের শাখা, পেশায় মৎস্যজীবী।

তুরি ঃ ছোটনাগপুর অঞ্চলের উপজাতি থেকে রূপান্তরিত কৃষিজীবী জাতি। তারা বাঁশের কাজকর্মও করে থাকে।

ত্রিগুল ঃ কৃষিজীবী মারাঠী ব্রাহ্মণ। মূল এলাকা কৃষ্ণা নদীর দুই তীর।

তেলগ ঃ অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গনা অঞ্চলের কৃষিজীবী ও শস্যজীবী জাতি। উচ্চস্তরের শূদ্র হিসাবে পরিগণিত।

তেলগনাড়ু ঃ তেলুগু স্মার্ত-বৈদিক ব্রাহ্মণ, হায়দ্রাবাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলবাসী।

তেলকুলু-বলু ঃ অন্ধ্রদেশের তৈলকার জাতি। এরা উপবীত ধারণ করে।

তেলি ঃ উত্তর ও পূর্বভারতের তৈলকার জাতি। বঙ্গদেশের তেলিরা নয়টি উচ্চ শূদ্র জাতির অন্তর্গত। তেলিদের প্রধান শাখাগুলির নাম একাদশ, দ্বাদশ, বেটনা, তুষকোটা এবং সপ্তগ্রামী। উত্তরভারতের তেলিদের ঘাঞ্চি বলেও অভিহিত করা হয়। ঘাঞ্চি শব্দটি ঘানি-বোধক।

তোগাতা ঃ কর্ণাটকের তেলুগুভাষী তন্তুবায় জাতি, যারা সচরাচর মোটা ধরনের কাপড় তৈরী করে। এরা সকলেই শৈব ধর্মাবলম্বী।

তোণ্ডয়ার ঃ তামিলনাড়ুর কৃষিজীবী জাতি, কম্বলত্তর নামেও পরিচিত, কবরি বা কবরাই জাতির শাখা। তোণ্ডয়াররা নয়টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। তাদের নারীদের পর্যাপ্ত যৌন-স্বাধীনতা বর্তমান, বহুপতীক হতেও অসুবিধা নেই। ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে অধিকাংশই বৈষ্ণব, কিন্তু ধর্মকর্মের ব্যাপারে তারা ব্রাহ্মণ নিয়োগ করে না। তাদের নিজস্ব একটি পুরোহিত শ্রেণী আছে যারা কোদাঙ্গ নায়কন নামে পরিচিত।

তোলক্য ঔদীচ্য ঃ গুজরাতের ঔদীচ্য ব্রাহ্মণদের একটি শাখা।

থাথেরা ঃ উত্তর ভারতের কাঁসারি জাতি।

দঙ্গর, ধঙ্গর ঃ পশ্চিম ভারতের পশুপালক জাতি।

দক্ষিণ রাঢ়ী ঃ পশ্চিমবঙ্গের কায়স্থ যারা তিনটি শাখায় বিভক্ত—কুলীন, মৌলিক ও বাহাত্তুরে।

দধীচ : গুজরাতী ব্রাহ্মণদের একটি শাখা যাদের বসতি মহী নদীর কূলে। এরা প্রধানত কৃষিজীবী।

দশহর : গুজরাতী ব্রাহ্মণদের একটি শাখা যাদের বসতি অনহিলওয়াড়া অঞ্চলে। এরা শক্তি উপাসক।

দর্জি, দির্জি : ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা একটি জাতি যাদের পেশা দর্জি-গিরি। বঙ্গদেশের দর্জিরা প্রধানত মুসলমান। পাঞ্জাবের দর্জিরা উপবীত ধারণ করে। কর্ণাটকের দর্জিরা বা দির্জিরা দুটি শাখাজাতিতে বিভক্ত—চিম্পিগা বা নামদেব এবং রঙ্গরে। উত্তরভারতে দর্জিদের পুরোহিতরা দর্জিগোর নামে পরিচিত।

দহিমা : রাজস্থানী ব্রাহ্মণদের একটি শাখা যাদের প্রধানত পাওয়া যায় মারবার ও বুন্দি অঞ্চলে।

দাক্ষিণাত্য-বৈদিক : বঙ্গদেশের বৈদিক ব্রাহ্মণদের একটি শাখা যাদের পাওয়া যায় প্রধানত মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণা জেলায়।

দিওয়াস : রাজস্থানী ব্রাহ্মণদের একটি শাখা যাদের পাওয়া যায় প্রধানত বিকানীর, মারবার ও নাথম্বারে।

দিশওয়াল : গুজরাতী বাণিয়াদের একটি শাখা।

দুগলা : চুন-উৎপাদনকারী জাতি যারা বাইতি, বাওতি, ধোলি, চুনারি, চুনিয়া প্রভৃতি নামেও পরিচিত।

দুমাল : উড়িষ্যার কৃষিজীবী জাতি, যাদের গোপালনের ঐতিহ্য আছে। বঙ্গদেশের সদ্গোপের সঙ্গে তুলনীয়।

দেবাঙ্গ : কর্ণাটক অঞ্চলের তন্তুবায় জাতি যারা কন্নড়-দেবাঙ্গ এবং তেলুগু দেবাঙ্গ এই দুই ভাগে বিভক্ত। কন্নড় দেবাঙ্গরা লিঙ্গায়ৎ। পক্ষান্তরে তেলুগু দেবাঙ্গরা বৈষ্ণব অথবা শৈব। উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহাদি সম্পর্ক নেই। অন্ধ্রপ্রদেশের তন্তুবায় জাতি দেবাঙ্গল বা দেয়ান্দ্র নামে পরিচিত। তারা এবং শালিয়াররা মাছমাংস খায়, কিন্তু অন্ধ্রের অপর তন্তুবায় জাতি পট্টশালীরা নিরামিষাশী। এরা সকলেই শুদ্ধ শূদ্র হিসাবে স্বীকৃত।

দেবাঙ্গল : দেবাঙ্গ দ্রষ্টব্য।

দেবেন্দ্রকুল-বেল্লালন : পাল্লান জাতির শৌখিন নাম। এদের উপকথা অনু-যায়ী বেল্লালদের জন্য কাজ করার প্রয়োজনে স্বয়ং দেবরাজ এদের সৃষ্টি করেছেন।

দেশস্থ : মহারাষ্ট্রের প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ জাতি। তাদের দুটি প্রধান ভাগ—লৌকিক অর্থাৎ যারা ধর্মনিরপেক্ষ পেশা গ্রহণ করে এবং ভিক্ষু যারা ধর্মীয় বৃত্তি অবলম্বন করে। শেষোক্তদের মধ্যে আবার শাস্ত্রচর্চার ক্ষেত্র হিসাবে বিভাগ আছে। কর্ণাটকেও দেশস্থ ব্রাহ্মণদের বিস্তৃতি আছে।

দেব-রুকে : মহারাষ্ট্রীয় মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ যাদের কোংকন অঞ্চলে বেশি দেখা যায়। পেশায় প্রধানত কৃষিজীবী যে কারণে চিৎপাবন ব্রাহ্মণেরা তাদের সংগে ভোজন করে না।

দেয়ল্ড : দেবাঙ্গ দ্রষ্টব্য।

ধজর : দণ্গর দ্রষ্টব্য।

ধানুক : উত্তর ভারতের ভূমিশ্রমিক জাতি।

ধীবর : মৎস্যজীবী জাতিদের সাধারণ সংস্কৃত নাম।

ধারীহ, ধাধি : উত্তর ভারতের জাতি যাদের পেশা গানবাজনা।

ধুসর, ধুনসর : উত্তর ভারতের বানিয়া জাতি, দিল্লী থেকে মীর্জাপুর পর্যন্ত যাদের প্রাধান্য খুবই বেশি। এদের মধ্যে ভূম্যধিকারীদের সংখ্যাও কম নয়। গুরগাঁও এর অন্তর্গত ধুসি নামক স্থান থেকে এদের উদ্ভব হয়েছে এমন বলা হয়।

ধেদ : পশ্চিম ভারতের শ্রমজীবী জাতি।

ধোপা, ধোবি : রজক জাতি। বঙ্গদেশে ধোপা, উত্তর ভারতে ধোবি, মধ্য-প্রদেশে ওয়ার্থি ও পোস্ত, দক্ষিণ ভারতে ভাউনান, আগাসা, চাকলি প্রভৃতি নামে পরিচিত।

ধোলি : দুগলা দ্রষ্টব্য।

নট : নৃত্যগীতবাদ্য-নির্ভর পেশাদার জাতি যাদের কোন নির্দিষ্ট এলাকা নেই। নটরা দৈহিক কলাকৌশল প্রদর্শন করে ও জীবিকা নির্বাহ করে।

নত্তুবন : যারা নটীদের শিক্ষকতা করে এবং অনুষ্ঠানের সময় যন্ত্রসঙ্গীত পরিচালনা করে। এরা কোন সুনির্দিষ্ট জাতি নয়, তবে সাধারণত দাক্ষণে কোইকোলান, দেবাঙ্গ, ওচ্ছন প্রভৃতি জাাত থেকে আসে।

নন্দবারক : অন্ধ্রপ্রদেশের স্মার্ত নিয়োগী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

নদিয়াল : আসামের মৎস্যজীবী ও নাবিক জাতি।

নবশায়ক : নয়টি ভালরকম শুদ্ধ শুদ্র জাতি যথা তাঁতি, মোদক, কুলাল (কুম্ভকার), কর্মকার, তেলি, গোপ, বারুই, মালী ও নাপিত।

নমঃশূদ্র : উপজাতি-সম্ভূত কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী জাতি। শাস্ত্রানুযায়ী

ব্রাহ্মণ নারী ও শূদ্রপুরুষের সংকর জাতি যারা চণ্ডাল নামেও পরিচিত। নমঃশূদ্রেরা নিজেদের ব্রাহ্মণজাত বলে দাবি করে, এবং একথাও বলে যে কোন কারণে তাদের প্রতি অন্যায়ভাবে নিম্ন-জাতিত্ব আরোপ করা হয়েছে। কোন কোন নৃতত্ত্ববিদ তাদের রাজমহল পর্বতাঞ্চলের মালের জাতির সঙ্গে সম্পর্কিত করেন।

নর্মদী : মধ্যপ্রদেশের ব্রাহ্মণ, গোন্দ-ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সম্পর্কিত।

নরীসপার : গুজরাতী ব্রাহ্মণদের একটি শাখা, যাদের অধিকাংশই বল্লভাচারী।

নাই, নাইন : নাপিত জাতির উত্তর ভারতীয় নাম। বঙ্গদেশ, বিহার ও উড়িষ্যায় নাপিতরা শুদ্ধ শূদ্র হিসাবে পরিগণিত। অন্ধ্রপ্রদেশে তারা মাঙ্গলি, উড়িষ্যায় ভাণ্ডারি, তামিলনাড়ুতে অম্বট্টন, কর্ণাটকে নাইন্দা প্রভৃতি নামে পরিচিত। উত্তর ভারতে তাদের হাজমও বলা হয়।

নাগ : অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষিজীবী জাতি।

নাগর-ব্রাহ্মণ : গুজরাতী ব্রাহ্মণদের প্রভাবশালী শাখা। তাদের প্রধান বিভাগ ছয়টি বড়নগর, বিশালনগর, সাথোদ্রা, প্রাসনোরা, কৃষ্ণোরা এবং চিত্রোদ। মৈথিলী ব্রাহ্মণদেরও একটি শাখা নাগর নামে পরিচিত।

নাগর-বানিয়া : গুজরাতী বানিয়া জাতির একটি শাখা, যাদের দুটি ভাগ দাসা ও বিশা। নাগর ব্রাহ্মণেরা নাগর বানিয়াদের পৌরোহিত্য করে।

নাগর-কোমতি : অন্ধ্রপ্রদেশের বাণিজ্যজীবী কোমতি জাতির একটি শাখা যারা নিজেদের বৈশ্য বলে দাবি করে।

নাগর্ত : তামিলনাড়ুর বাণিজ্যজীবী জাতি।

নাথমবাদায়ন : তামিলনাড়ুর কৃষিজীবী জাতি।

নানাগোত্রী : গাড়োয়াল অঞ্চলের ব্রাহ্মণ যারা বংশধারা মায়ের দিক থেকে নির্ণয় করে।

নাথ : ধর্মসম্প্রদায় যা জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

নাট্টুকোট্টই : মাদুরা জেলার চেট্টিদের একটি শাখাজাতি যারা প্রধানত মহাজনী কারবার করে। এরা উপবীত ধারণ করলেও ব্রাহ্মণরা এদের বৈশ্য জাতি বলে স্বীকার করে না।

নান্দোরা : গুজরাতী ব্রাহ্মণদের শাখা যাদের নামকরণ হয়েছে কর্জন নদীর তীরবর্তী নান্দোদ শহরের নামানুযায়ী।

নাম্বি-বলু : অন্ধ্রপ্রদেশের তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ যারা নিম্ন জাতিদের পৌরোহিত্য করে।

নাম্বুদীরি, নম্বুদীরি : মালাবার অঞ্চলের ব্রাহ্মণ যাদের মধ্যে বিচিত্র উত্তরাধিকার ব্যবস্থার দৌলতে জ্যেষ্ঠ পুত্ররাই স্বজাতির মেয়েদের বিবাহ করে। অপরাপর পুত্ররা নায়ার মেয়েদের বিবাহ করে।

নাপিত : নাই দ্রষ্টব্য।

নারদিক : ক্যাম্বে অঞ্চলের গুজরাতী ব্রাহ্মণ যারা প্রধানত কৃষিজীবী।

নায়াদি : মালাবার অঞ্চলের উপজাতি-সম্ভূত নিম্নস্তরের জাতি।

নায়ার : মালাবার উপকূলের অভিজাত শস্ত্রজীবী জাতি, যদিও বর্তমানে তারা সর্ব পেশাবলম্বী। নায়ারদের মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থা বর্তমান, বিশেষ করে বংশধারা, উত্তরাধিকার ও বিবাহের ক্ষেত্রে। নায়ারদের যৌথ মাতৃকেন্দ্রিক পরিবার তারওয়াদ নামে পরিচিত।

নিগম : উত্তর ভারতের একশ্রেণীর কায়স্থ। উনাও অঞ্চলের কায়স্থরা এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

নিকারী : মুসলমান মৎস্যজীবী জাতি।

নিষাদ : শিকারজীবী ও আরণ্যক উপজাতিদের প্রাচীন নাম।

নিয়তকাম : অন্ধ্রপ্রদেশের তন্তুবায় জাতিসমূহের সাধারণ নাম। এই শ্রেণীর জাতিদের তিনটি শাখা—পট্টশালী, দেবাংগল বা দেয়ন্দ্র ও শালিয়ার।

নিয়োগী : অন্ধ্রপ্রদেশের স্মার্ত ব্রাহ্মণ যারা ছয়টি শাখায় বিভক্ত যথা অরবেলুবরু, তেলিঙ্গনা-নিয়োগী, নন্দবারিক, পকুলমোতি, যাজ্ঞবল্ক্য ও কর্ণাটকামা।

নুনিয়া : লুনিয়া দ্রষ্টব্য।

নেয়িগে : কর্ণাটক অঞ্চলের তন্তুবায় জাতিসমূহের সাধারণ নাম। শাখাজাতিগুলি হল দেবাঙ্গ, তোগাতা, শালে বা শালিগা, বিলিমগ্গ, সেনিগ, পটবেগর খত্রি ও সৌরাষ্ট্রিক।

পকুলমতি : অন্ধ্রপ্রদেশের স্মার্ত নিয়োগী ব্রাহ্মণদের শাখা।

পঞ্চগৌড় : উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণদের পাঁচটি শ্রেণী যথা সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, উৎকল ও মৈথিল।

পঞ্চনন-বরুলু : তেলুগুভাষী অঞ্চলের পাঁচটি বিশেষ কারিগর শ্রেণী, যারা শিবের পাঁচটি মুখ থেকে উদ্ভূত বলে দাবি করে। এরা যথাক্রমে কনসালি বা স্বর্ণকার, কামারি বা কর্মকার, কংসারি বা কাঁসারি এবং ওয়াদ্রোঙ্গা বা দুগার। পঞ্চম শ্রেণীটি উল্লিখিত চার শ্রেণীর লোক নিয়ে গঠিত যারা পেশায় ভাস্কর। তামিলনাড়ুতে এই পঞ্চ শ্রেণীকে কম্মল্লার বলা হয়।

পঞ্চ-বল : কর্ণাটক অঞ্চলের পঞ্চনম-বন্দুর অনুরূপ।

পঞ্চাল : দ্রষ্টব্য পঞ্চনম-বন্দুর ও পঞ্চবল।

পঞ্চল্লার : মধ্যপ্রদেশের স্বর্ণকার জাতির একটি শাখা যারা বিবাহের সময় উপবীত ধারণ করে।

পঞ্চ-দ্রাবিড় : দক্ষিণী ব্রাহ্মণদের পাঁচটি শ্রেণী যথা মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, দ্রাবিড়, কর্ণাট ও গুজরাত।

পাঞ্জি-বধ : মৈথিল ব্রাহ্মণদের তৃতীয় শ্রেণী।

পনিকন : তামিলনাড়ুর মাদুরা ও টিনেভেলি জেলার নাপিত এবং তন্তুবায় জাতি।

পনওয়ার : রাজপুত অগ্নিকুল শাখার একটি জাতি।

পরব : দক্ষিণ কানারা অঞ্চলের একটি জাতি যারা ওঝার কাজ করে। এছাড়া তারা ঝুড়ি ও ছাতা তৈরি করে।

পরহিয়া : মীর্জাপুর জেলার পার্বত্য জাতি, পেশা অনির্দিষ্ট।

পরওয়ার, পরওয়াল : রাজস্থানের বাণিজ্যজীবী জাতি।

পটবেগর : কর্ণাটকের তন্তুবায় জাতি যারা রেশমের কাজ করে। তারা মিশ্র মারাঠী ভাষায় কথা বলে।

পট্টশালী : অন্ধ্রপ্রদেশের তন্তুবায় জাতি। এরা নিরামিষাশী এবং উপবীত ধারণ করে।

পরাশরিয়া : গুজরাতী ব্রাহ্মণদের একটি শাখা যাদের প্রধান বসতি কাথিয়াওয়ারের দক্ষিণ-পূর্বে।

পস্তারম : অথবা মল-পস্তারম। ত্রিবাংকুরের খাদ্য-সংগ্রাহক জাতি।

পলশে : মহারাষ্ট্রের শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ।

পল্লব-গোপ : বংগদেশের গোয়ালাদের একটি শাখা।

পল্লি : দক্ষিণ ভারতের কৃষিজীবী জাতি যারা নিজেদের বান্নিয়ান বা ক্ষত্রিয়-উদ্ভূত বলে দাবি করে।

পাল্লিবাল : একশ্রেণীর রাজপুত ব্রাহ্মণ যাদের প্রধান বসতি রাজস্থানের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে। রাজস্থানী পাল্লিবাল বণিকজাতিরও সন্ধান পাওয়া যায় যাদের প্রধান কর্মক্ষেত্র আগ্রা ও জৌনপুর অঞ্চল। এরা হয় বৈষ্ণব নাহয় জৈন।

পাইক-খন্দাইত : উড়িষ্যার খন্দাইতদের একটি শাখা, চাষা-খন্দাইত নামেও পরিচিত।

পাটনি ঃ পূর্ববংগ ও আসামের মৎস্যজীবী জাতি।

পাণ্ডারাম ঃ দাক্ষিণাত্যের স্থানীয় দেবায়তনসমূহের সংগে সম্পর্কিত নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

পাত্তরা ঃ মালাবার অঞ্চলে বসবাসকারী বিদেশী ব্রাহ্মণ।

পাতনুলকর ঃ তামিলনাড়ুর তন্তুবায় জাতি যারা রেশম বয়ন করে। কথিত আছে তাদের আদি দেশ গুজরাত।

পাতিয়াল ঃ পূর্ববংগের মাদুর-প্রস্তুতকারক জাতি যারা বিশেষ করে শীতলপাটি প্রস্তুত করে।

পাতোলিয়া ঃ গুজরাতী বানিয়াদের একটি শাখা।

পানান ঃ দ্রষ্টব্য মলায়ন বা মালায়ন।

পানিগ্র ঃ উড়িষ্যার কৃষিজীবী ব্রাহ্মণ।

পান্তা-রেড্ডিঃ অন্ধ্রের কাপু বা রেড্ডিদের একটি শাখা।

পারিক ঃ রাজস্থানী ব্রাহ্মণ, প্রধান বসতি মারবার ও বুন্দি অঞ্চলে।

পারিয়া ঃ তামিলনাড়ুর কায়িক শ্রমজীবী জাতি, জাতিকাঠামোয় যাদের স্থান অত্যন্ত নিম্নে।

পাশি ঃ উত্তর ভারতের তাড়ি সংগ্রাহক জাতি। বিহারে এদের সংখ্যা সর্বাধিক। তাড়ি সংগ্রহ ছাড়াও দড়ির ফাঁসের সাহায্যে শাখাপ্রশাখাহীন লম্বকাণ্ড যে কোন বৃক্ষে আরোহণ কার্যে তারা পটু, এবং এভাবে তারা তাল, নারিকেল প্রভৃতি ফল পেড়ে দেবার কাজ করেও জীবিকা নির্বাহ করে।

পিরালি, পীরালি ঃ বংগদেশের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের একটি শাখা, নবাবী আমলে মুসলমানদের কাছে কাজকর্ম করার জন্য যারা ব্রাহ্মণসমাজে ততটা মর্যাদার অধিকারী নয়।

পাশ্চাত্য-বৈদিক ঃ বংগদেশের বৈদিক ব্রাহ্মণদের একটি শাখা, যারা কান্যকুব্জ থেকে আগত বলে মনে করা হয়।

পুলায়ন ঃ কেরালার ভূমিশ্রমিক কৃষিজীবী জাতি, যারা তামিল পারাইয়ানদের সমতুল্য।

পুরাদ বন্নান ঃ তামিল রজক জাতি যারা নিম্নবর্গের জাতিদের জামাকাপড় কাচে।

পুয়ার ঃ মধ্যপ্রদেশের কৃষিজীবী জাতি।

প্রভু ঃ মহারাষ্ট্রের প্রভাবশালী জাতি যারা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে গণ্য করে ও

উপবীত ধারণ করে। সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে তাদের স্থান উত্তর ভারতের কায়স্থদের সমতুল্য। তাদের দুটি প্রধান শাখা চন্দ্রসেনী ও পাটনী। গোয়া অঞ্চলে তাদের একটি শাখা ডোল্ল বা দোল্ল নামে নামে পরিচিত।

প্রস্নোর : গুজরাতের নাগর ব্রাহ্মণদের একটি শাখা।

প্রয়াগওয়াল : প্রয়াগ তীর্থের ব্রাহ্মণ যারা পাণ্ডাগিরি করে।

পোরাবদর : প্রাচীন তামিল সাহিত্যে উল্লিখিত জাতি যারা সামুদ্রিক মৎস্য-জীবী, শুক্তিশিকারী ও ডুবুরি ছিল।

পোকর্ণ : রাজস্থানী ব্রাহ্মণদের একটি শাখা যাদের আদি নিবাস পোখরণ অঞ্চলে। উত্তর-পশ্চিম রাজস্থানে তাদের বিস্তৃতি দেখা যায়।

পোদ : উপজাতি উদ্ভূত জাতি, বঙ্গদেশের চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণাঞ্চলে যাদের বিস্তৃতি দেখা যায়। পেশায় প্রধানত কৃষিজীবী। নিজেদের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দেয়।

পোরাওয়াল : রাজস্থান ও গুজরাতের বানিয়া জাতি।

ফরাস : গৃহ-পরিষ্কারক এবং সাধারণভাবে যারা সাফাই-এর কাজ করে। এরা কোন সুনির্দিষ্ট জাতি নয়।

ফিরিঙ্গী : নিম্নবঙ্গের খ্রীষ্টান জাতি, পোর্তুগীজদের বংশধর।

ফুলমালী : মালী দ্রষ্টব্য।

বঙ্গজ : বঙ্গদেশের বৈদ্যদের একটি শাখা, যারা বারেন্দ্র বৈদ্য নামেও পরিচিত। বঙ্গীয় কায়স্থদের একটি শাখাও বঙ্গজ নামে পরিচিত যাদের বসতি প্রধানত পূর্ববঙ্গে। বঙ্গজ কায়স্থরা তিনটি উপশাখায় বিভক্ত।

বংশজ : বঙ্গীয় রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের একটি শাখা যাদের স্থান কুলীনদের চেয়ে নীচে।

বঞ্জার : বাহক, বণিক ও পশুপালক জাতি, অল্পবিস্তর যাযাবর, ভঞ্জার, লম্বাদি, লবানা প্রভৃতি নামেও পরিচিত। বসতি দাক্ষিণাত্যে। রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের ভীলদের সমতুল্য।

বনাজিগা : কর্ণাটকের বাণিজ্যজীবী জাতি, তেলুগু বলিজাদের সমতুল্য।

বণিক : বানিয়া দ্রষ্টব্য।

বায়িয়ন, ভায়িয়ন : পাল্ল দ্রষ্টব্য।

বাণিকন : তামিল তৈলকার জাতি।

বড়নগর : গুজরাতের নাগর ব্রাহ্মণদের একটি শাখা। অনহিলবাড়ার পূর্বে অবস্থিত বড়নগর থেকে নামকরণ। অধিকাংশই স্মার্ত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

বলজি কোমতি : অন্ধ্রপ্রদেশের বাণিজ্যজীবী কোমতিদের একটি শাখা।

বলিজা : তেলুগু বাণিজ্যজীবী জাতি।

বরনওয়াল : উত্তরভারতের বানিয়াজাতি। বরন বুলন্দশহরের আদি নাম যা তাদের নামের হেতু।

বরসোনি : মথুরা অঞ্চলের বণিকজাতি।

বরেন্দ্র : উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের প্রাচীন নাম যা বঙ্গদেশের কয়েকটি জাতির বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বঙ্গদেশে বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ, বরেন্দ্র বৈদ্য, বরেন্দ্র কায়স্থ ও বরেন্দ্র গোয়ালার পরিচয় পাওয়া যায়।

বাইতি, বাওতি : বঙ্গদেশের চুন-উৎপাদক জাতি। অন্যত্র তারা চুনারি, চুনিয়া, ধোলি দুগলা প্রভৃতি নামে পরিচিত।

বাগদি : বঙ্গদেশ ও বিহারের উপজাতি-সম্ভূত জাতি যারা কৃষি, মৎস্যশিকার ও কায়িক পরিশ্রমের কাজ করে।

বাউরি : বঙ্গদেশ ও বিহারের ভূমিশ্রমিক জাতি।

বাদাগা : নীলগিরি অঞ্চলে কৃষিজীবী জাতি যাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আগুনের উপর দিয়ে হাঁটার কলাকৌশল প্রদর্শিত হয়।

বাদিগা : উত্তর দাক্ষিণাত্যের ছুতার জাতি, যারা উত্তরের বারহিদের স্বজাতীয়।

বানিয়ন, ভানিয়ন : তামিল তৈলকার জাতি, উত্তরভারতের তেলিদের সমতুল্য।

বানিয়া : বণিকজাতির সাধারণ নাম। বণিক, বানিয়া বা বেনে শব্দটি জাতিনামের সঙ্গে বর্তমান এমন বারটি জাতির পরিচয় বঙ্গদেশে পাওয়া যায় যথা সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, কাংসবণিক ও শংখবণিক। উত্তর ভারতের প্রধান বানিয়া জাতিগুলির নাম আগরওয়াল, ওসওয়াল, খাণ্ডেলবাল, শ্রীমালী, পাল্লিওয়াল, পোরাওয়াল, ভাটিয়া, মহেশ্রী, অগ্রহারী, ধুসর, উমর, রস্তোগি, কেশরবনি, লোহিয়া, সোনিয়া, সুরসেনী, বরসেনী, বরনওয়াল, অযোধ্যাবংশী, জৈসোয়ার, মহোবিয়া, মহুরিয়া, বৈশ, কথ, রাওনিয়া, জনারিয়া, লোহনা, রেওয়ারি, কানু প্রভৃতি। গুজরাতের প্রধান বণিকজাতিগুলির নাম নাগর, দিশওয়াল, পোরাওয়াল, গুজর, মোধ, লাড়, ঝারোলা, সোরাটিয়া, থদাইত, হরসোরা, কাপোলা, উরবলা, পাতোলিয়া, বাইয়াদা প্রভৃতি। উড়িষ্যায় সোনার-বানিয়া, পুতলি-বানিয়া

ইত্যাদি। দক্ষিণে বনিজিগা, চেট্টি, নাগর্ত, কোমতি প্রভৃতি। এই সকল জাতির নানা শাখাজাতিও বর্তমান।

বান্নান, বন্নান, ভন্নান : তামিল রজকজাতি, উত্তরভারতে ধোবিদের সমতুল্য।

বাভন : বিহারে প্রভাবশালী কৃষিজীবী ভূমিহারজাতি, যারা ব্রাহ্মণ (বাভন) উদ্ভূত বলে দাবি করে।

বারহি : উত্তরভারতের ছুতার বা সূত্রধর জাতি, যারা পশ্চিমভারতে সুতার নামে পরিচিত। পাঞ্জাবে এদের তরখান বলা হয় এবং রাজস্থানে খাতি।

বারুই : বারুজীবী। বঙ্গদেশের পান চাষী জাতি।

বাবুরু-কাম্মে : কর্ণাটক অঞ্চলে একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

বাম্বি : রাজস্থানের কর্মকারজাতি।

বালোদ্রা : গুজরাতী ব্রাহ্মণদের একটি শাখা।

বায়াদা, বাইয়াদা : গুজরাতের একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এই নামের একটি বণিক-জাতিও সেখানে বর্তমান।

বিন্দ : উত্তরপ্রদেশের নিম্নশ্রেণীর জাতি যারা তাড়ি সংগ্রহ করে, মাদুর প্রস্তুত করে এবং মৎস্যশিকার ও নৌচালনা করে।

বিলিমগ্গ : কর্ণাটক অঞ্চলের তন্তুবায় জাতি যারা কুরুবিনা-বনজিগারু নামেও পরিচিত।

বিল্লভ : তামিল তাড়ি-সংগ্রাহক জাতি, দক্ষিণ কানাড়া অঞ্চলে ইল্লবর নামেও পরিচিত। সমতুল্য জাতিদের মধ্যে শানার, ভাণ্ডারি, পাশি, টিয়ান, ইদিগা, গেন্দিলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বিশালনগর : গুজরাতী নাগর ব্রাহ্মণদের একটি শাখা।

বিয়াহুত : উত্তরভারতের মদ্য প্রস্তুতকারক কালওয়ার জাতির শাখা যাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহের প্রচলন আছে।

বিষ্ণোই : রাজস্থানের জাঠ ও ক্ষত্রি উদ্ভূত একটি সাম্প্রদায়িক জাতি, অনেকটা বঙ্গদেশের বৈষ্ণবদের মত। স্থানীয়ভাবে তারা বিষ্ণোই-ব্রাহ্মণ হিসাবে পরিচিত।

বেত্তুবন : তামিল কৃষিজীবী ও শিকারজীবী জাতি।

বেদন : তামিল শিকারজীবী ও শ্রমজীবী জাতি, কন্নড় শস্ত্রজীবী বেদার জাতির সমতুল্য।

বেদার : বেদন দ্রষ্টব্য।

বেদি : পাঞ্জাবের ক্ষত্রি জাতির শাখা, অধিকাংশই বর্তমানে শিখ ধর্মাবলম্বী।

বেকানওয়ালা : শূকর-মাংসের কারবারী, খটিক জাতির শাখা।

বেন-ই-ইসরায়েল : বোম্বাই অঞ্চলের ইহুদি জাতি যারা ভারতীয় জাতিপ্রথার রীতিনীতি মেনে চলে।

বেরি-কোমতি : তেলুগু বাণিজ্যজীবী কোমতি জাতির শাখা, যাদের অধিকাংশ লিঙ্গায়ৎ ধর্মাবলম্বী। এদের মূল উদ্ভবস্থল সম্ভবত কর্ণাটক।

বেরি চেট্টি : দক্ষিণের বাণিজ্যজীবী চেট্টিদের একটি শাখা।

বেলন, ভেলন : তামিল কৃষিজীবী বেল্লারদের চলিত নাম।

বেল্লম : তেলুগু কৃষিজীবী জাতি।

বেল্লবার : মালাবার উপকূলের মৎস্যজীবী জাতি।

বেল্লবার : তামিল শূদ্রজাতি যারা উত্তরভারতীয় কায়স্থের সমমর্যাদা দাবি করে। তাদের দুটি শ্রেণী মুদালিয়র এবং পিল্লাই পদবীর দ্বারা চিহ্নিত।

বেল্লাল, ভেল্লাল, বেড়ুার : তামিল কৃষিজীবী জাতি, যারা সংখ্যায় সুপ্রচুর।

বেস্তা : কর্ণাটকের মৎস্যজীবী, নৌচালক ও পাল্কীবাহক জাতি। এদের নানা আঞ্চলিক নাম আছে যথা তোরাযা, আম্বকা, গঙ্গেমক্কালু, কালিয়ারা, ভাইস, বেল্লি, চম্মাদি, বাযর্বুত, সুর্মাকলু প্রভৃতি।

বৈশ-বানিয়া : বিহার ও কুমায়ুন অঞ্চলের বানিয়া জাতির একটি শাখা যারা নিজেদের বৈশ্য বলে দাবি করে।

বৈশ্য : প্রচলিত চাতুর্বর্ণের তৃতীয় বর্ণ। বৈশ্যরা দ্বিজজাতির অন্তর্গত এবং উপবীত ধারণ ও বেদপাঠের অধিকারী। ভারতবর্ষের বহু বণিক জাতিই নিজেদের বৈশ্য বলে দাবি করে, কিন্তু ক্ষত্রিয়দের মতই সর্বস্বীকৃত বৈশ্য জাতি বলে কোন জাতিকেই সনাক্ত করা যায় না।

বোরোসিধ : এক শ্রেণীর গুজরাতী ব্রাহ্মণ যাদের কাইরা জেলায় বেশি দেখা যায়।

বোহরা : পশ্চিমভারতের মুসলমান বাণিজ্যজীবী জাতি।

ব্যাসোক্ত : এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ যারা বঙ্গদেশের মেদিনীপুরের কৈবর্তদের পৌরোহিত্য করে।

ব্রাহ্মণ : চাতুর্বর্ণের প্রথম বর্ণ। বর্তমান অনুক্রমণীতে ব্রাহ্মণদের বিভিন্ন শাখা ও শ্রেণীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

ভটনগরী : রাজস্থানের বিকানীরের উত্তরে হনুমাননগর জেলার ভটনগর বা ভাটনগরের কায়স্থ যাদের উত্তর ভারতের সর্বত্রই দেখা যায়।

ভতেলা : ভারতের পশ্চিম উপকূলে ব্রোচ ও দামনের মধ্যবর্তী অংশের

বাসিন্দা এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এদের অনাবলা ব্রাহ্মণও বলা হয়। এরা কৃষি ও বাণিজ্য উভয় কাজই করে।

ভরবুঞ্জ : উত্তর ভারতের শুদ্ধ শূদ্র জাতি যারা শস্যজাত অপক্ক খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করে।

ভাট : চারণদের অনুরূপ জাতি, বংশাবলী কীর্তন যাদের বৃত্তি। মূলত রাজস্থানেই ভাটদের অবস্থিতি। এরা বিবাহের ঘটকের কাজও করে। এরা ব্রাহ্মণ নয় তবে ব্রাহ্মণত্বের মর্যাদা দাবি করে। ভাটদের মধ্যে কিছু মুসলমানও আছে।

ভাটিয়া : পশ্চিম ভারতের বাণিজ্যজীবী জাতি।

ভাণ্ডারী : মহারাষ্ট্রের তাড়ি-সংগ্রাহক জাতি। উড়িষ্যার নাপিত জাতি।

ভার্গব : গুজরাতী ব্রাহ্মণদের একটি শাখা, নর্মদার মোহানায় ব্রোচ অঞ্চলে যাদের প্রধান বসতি।

ভুঁইমালী : পূর্ববঙ্গ এবং শিলেট জেলার কৃষিজীবী ও কায়িক শ্রমজীবী জাতি।

ভুঁইহার, ভূমিহার : বিহারের প্রভাবশালী কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারী জাতি, যারা ব্রাহ্মণজ বলে নিজেদের গণ্য করে। দ্রষ্টব্য বাভন।

ভোক্কালিগা : কর্ণাটকের প্রভাবশালী কৃষিজীবী জাতি, যাদের শাখাগুলির নাম গঙ্গাধিকর, কুঞ্চিতিগা, মোরাসু, রেড্ডি, হল্লিকর, দাস, হালু, মুসাকু ও তেলুগু-ভোক্কালিগা।

ভোজক : রাজস্থানী ব্রাহ্মণ। ভোজকরা জৈনদের পৌরোহিত্য করে।

মংগলি : অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলুগুভাষী অঞ্চলের নাপিত জাতি যারা শুদ্ধ শূদ্র হিসাবে পরিগণিত।

মঝওয়ার : মধ্যভারতের উত্তরাঞ্চলের উপজাতি-সম্ভূত জাতি।

মঝাব : শিখ-সম্প্রদায়ভুক্ত নিম্ন জাতি। আদিতে এরা হিন্দু চুহ্‌রা বা চুরাহা জাতিভুক্ত ছিল যাদের পেশা আবর্জনা পরিষ্কার। ধর্মান্তরিত হবার ফলেও তাদের সামাজিক মর্যাদা বাড়েনি।

মড়িপোড়া : বঙ্গদেশের নিম্নমর্যাদার ব্রাহ্মণ যাদের কাজ শব-সৎকারকালে মন্ত্রপাঠ ও অনুষ্ঠানাদি করা।

মত্তু-এড়িয়া : তামিল গোপালক জাতি, যারা ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে শৈব ও বৈষ্ণব দুভাগে বিভক্ত। উভয় শাখার মধ্যে বিবাহাদি সামাজিক সম্পর্ক নেই।

মন্নান : মালাবার অঞ্চলের রজক জাতি, তামিল বন্নানদের স্বজাতি। এরা কিছুটা মাতৃতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুসরণ করে। মন্নান নামে একটি উপজাতি ত্রিবাংকুরের পার্বত্য অঞ্চলে বিদ্যমান। তারা মন্নান জাতি থেকে ভিন্ন।

মরবন : সুদূর দক্ষিণের একটি কৃষিজীবী, পশুচোর ও দস্যুজাতি যাদের সঙ্গে কল্লানদের ষাঁড়ের লড়াই ও বুমেরাং ব্যবহারের সাদৃশ্য আছে। এরা মদ্যমাংস প্রিয়। রামনাদ ও শিবগঙ্গার রাজারা মরবন জাতিভুক্ত।

মধ্যশ্রেণী : পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর অঞ্চলের একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

মল্ল : শস্ত্রজীবী জাতিজ্ঞাপক নাম যা অধুনা বহু জাতিই তাদের জাতিনামের পূর্বে ব্যবহার করে। মল্ল শব্দটির সঙ্গে ধ্বনিগত সাদৃশ্যযুক্ত কিছু জাতি-নাম পাওয়া যায়। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে উত্তর ভারতে মল্ল নামক একটি প্রসিদ্ধ উপজাতি বর্তমান ছিল।

মলয়ালি : তামিলনাড়ুর সালেম জেলার পর্বতাঞ্চলের বাসিন্দা জাতি যারা বেল্লালদের সমজাতীয়।

মলায়ন : মালাবার অঞ্চলের উপজাতি-সম্ভূত জাতি যারা পানান নামেও পরিচিত। ঝাড়ফুঁক ও জাদু-অনুষ্ঠানের দ্বারা রোগের চিকিৎসা এরা করে থাকে।

মস্থানী : উড়িষ্যা ও গুজরাত অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর কৃষিজীবী ব্রাহ্মণ।

মহর : সিন্ধু অঞ্চলের জাতি, সম্ভবত হুণদের থেকে উৎপন্ন। কহার বা কাহারদের একটি শাখাও মহর নামে পরিচিত।

মহার, মাহার : পশ্চিম ও মধ্যভারতের ভূমিশ্রমিক ও কায়িক-শ্রমজীবী জাতি।

মহয়া : শিলেট অঞ্চলের কহার বা কাহার-সদৃশ জাতি।

মহাব্রাহ্মণ : নিম্নমর্যাদার ব্রাহ্মণ যারা মৃত-ব্যক্তির পারলৌকিক কল্যাণার্থে তার জীবনকালের ব্যবহৃত নানা সামগ্রী দান হিসাবে গ্রহণ করে। দ্রষ্টব্য অগ্রদানী। এরা উড়িষ্যায় অগ্র-ভিক্ষু এবং পশ্চিম ভারতে আচার্য নামে পরিচিত।

মহাজনপন্থী : পানিগিরি নামেও পরিচিত উড়িষ্যার একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ যারা ধর্মনিরপেক্ষ পেশায় নিযুক্ত।

মহুরিয়া : বিহার ও উত্তরপ্রদেশের বানিয়া জাতি, প্রধানত চিনির ব্যবসায়ী। শিখদের মত এরা ধূমপান বিরোধী।

মহোবিয়া : হমীরপুর জেলার মহোব নগরজাত বানিয়া জাতি।

মহেশ্রী ঃ উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান ও বিহারের বানিয়া জাতি যাদের প্রধান পেশা মহাজনী। ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে এরা বৈষ্ণব, এবং এরা উপবীত ধারণ করে। মহেশ্রীদের মধ্যে কিছু জৈনও বর্তমান।

ময়রা ঃ মোদক বা মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারী জাতি।

মাদিগ ঃ তেলুগু চর্মকার জাতি। উত্তরভারতের চামার ও তামিলনাড়ুর চাক্কিলিয়নদের স্বজাতি। এদের দুটি শাখা, একটি দেশভাগ নামে নির্দিষ্ট, অপরটি অনির্দিষ্ট। ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে এরা বৈষ্ণব, শৈব অথবা শাক্ত।

মাড়োয়ারী ঃ প্রকৃত অর্থে রাজস্থানের মারবার অঞ্চলের যে কোন অধিবাসী, তবে চলিত অর্থে ওই অঞ্চলের বণিকজাতির সাধারণ নাম। মাড়োয়ারীদের মধ্যে নানা জাতি ও সম্প্রদায় বর্তমান।

মাব্রক ঃ হালে-কর্ণাটক ব্রাহ্মণদের প্রচলিত নাম। লোকশ্রুতি অনুযায়ী তারা শংকরাচার্যের অধঃপতিত শিষ্যদের বংশধর।

মারাকান ঃ মালাবার উপকূলের সামুদ্রিক মৎস্যজীবী জাতি।

মারায়ান, মারান ঃ মালাবার অঞ্চলের বাদক, মন্দিরভৃত্য ও নাপিত জাতি যারা নায়ার ও অন্যান্য উচ্চবর্ণের জাতিদের সেবা করে। মালাবার উপকূলের উত্তর ও দক্ষিণে তাদের সামাজিক মর্যাদা ভিন্ন।

মাল ঃ তেলুগু ভূমিশ্রমিক ও কায়িক শ্রমজীবী জাতি, পুলায়নদের সমতুল্য।

মালবী ঃ মধ্যভারতের মালব অঞ্চলের ব্রাহ্মণ।

মালি ঃ উত্তর ভারতের উদ্যানকর্মী জাতি। এদের মধ্যে যারা বিশেষভাবে পুষ্প উৎপাদন ও বিক্রয়ের কাজে লিপ্ত তাদের ফুলমালি বলা হয়। মধ্য প্রদেশ ও নাগপুর অঞ্চলে মালি নামক একটি কৃষিজীবী জাতি বর্তমান।

মালো ঃ বঙ্গদেশের মৎস্যজীবী ও নৌচালক জাতি।

মাহুলি ঃ মধ্যভারতের কায়িক শ্রমজীবী ও ঝুড় প্রস্তুতকারক জাতি যাদের সঙ্গে সাঁওতাল, হো এবং মুণ্ডা উপজাতিদের সম্পর্ক আছে।

মাহিষ্য ঃ পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর অঞ্চলের কৃষিজীবী জাতি। ইদানিং চাষা বা হালিয়া কৈবর্তরাও নিজেদের মাহিষ্য বলে।

মিরাশী ঃ পাঞ্জাব ও সন্নিহিত অঞ্চলের মুসলমান জাতি যাদের বৃত্তি বংশাবলী কীর্তন এবং গীতবাদ্য।

মুক্কুবন ঃ মালাবার অঞ্চলের মৎস্যজীবী ও নৌচালক জাতি।

মুচি, মোচি ঃ উত্তরভারতের চর্মকার জাতি যাদের সমতুল্য জাতি চামার, মাদিগ, চাক্কিলিয়ন, বাম্বি, জাতিয়া, সরগরা প্রভৃতি।

মুলুকি-নাড়ু, মুরকনাড়ু ঃ তেলুগু স্মার্ত বৈদিক ব্রাহ্মণদের একটি শাখা যাদের নিবাস কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণাঞ্চলে।

মুশহর ঃ কোল-উপজাতি উদ্ভূত জাতি যাদের নিবাস বিহার ও উত্তরপ্রদেশে।

মুসাল্লি ঃ মুসলমান সমাজের নীচজাতিবোধক শব্দ।

মেও ঃ রাজস্থান ও উত্তরভারতের উপজাতি-সম্ভূত জাতি, যাদের মধ্যে হিন্দুরা মেও এবং মুসলমানেরা মেওয়াটি নামে পরিচিত।

মেওয়াফরোশ ঃ সব্জী ও ফলবিক্রেতা জাতি, খটিকদের শাখা।

মেমান ঃ সিন্ধুপ্রদেশের লোহানা জাতির মুসলমান শাখা।

মের, মেরাট ঃ রাজস্থানের মেরওয়ারা অঞ্চলের জাতি যাদের মধ্যে হিন্দুরা মের বা মাযের এবং মুসলমানেরা মেরাট নামে পরিচিত।

মেবার ঃ রাজস্থানের মেবার অঞ্চলের ব্রাহ্মণ।

মেথর ঃ আবর্জনা পরিষ্কারক জাতি, উপজাতিসম্ভূত।

মৈথিলী-ব্রাহ্মণ ঃ উত্তর বিহারের মিথিলা অঞ্চলের ব্রাহ্মণ যারা শ্রোত্রিয়, জোগ, পঞ্জি-বন্ধ, নাগর ও জৈসোয়ার এই পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত।

মোইলার ঃ দক্ষিণের তুলব অঞ্চলের মন্দিরসেবী নিম্ন ধরনের ব্রাহ্মণ।

মোধ ঃ গুজরাতী বানিয়া জাতি।

মোধা ঃ গুজরাতের আমেদাবাদ ও খেড় জেলায় ব্রাহ্মণ যারা মোধ বানিয়াদের পৌরোহিত্য করে।

মোপলা, মাপিলা ঃ মালাবার উপকুলের মুসলমান উপজাতি-সম্ভূত জাতি যারা নিজেদের আরব উপজাত বলে দাবি করে। উত্তর মালাবার অঞ্চলে এদের সমাজ মাতৃতান্ত্রিক ধরনের, দক্ষিণে পিতৃতান্ত্রিক।

মোমিন ঃ মুসলমান তন্তুবায় জাতি।

মোরাসু ঃ তেলুগু কাপু বা রেড্ডি জাতির একটি শাখা।

মোয়াল ঃ সারস্বত ব্রাহ্মণদের একটি শাখা।

যজুর্বেদী ঃ মারাঠী ব্রাহ্মণদের একটি শাখা।

যদুবংশী ঃ যাদব দ্রষ্টব্য।

যাদব ঃ প্রাচীন রাজপুত উপজাতি। নামটি কালক্রমে সার্বিকভাবে গোপালক জাতিসমূহকে বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

রংরি ঃ কর্ণাটক অঞ্চলের দির্জি বা দার্জিদের একটি শাখা যারা কাপড়চোপড় রং করার কাজও করে থাকে।

রাওনিয়া ঃ গোরক্ষপুর এবং ত্রিরহুত জেলার বানিয়া জাতি যারা নোনিয়া

নামেও পরিচিত। এদের মধ্যে বিধবাবিবাহের চল আছে। ধর্ম বিশ্বাসের দিক থেকে এরা প্রধানত শৈব, যদিও লক্ষ্মীদেবীর পূজাও করে থাকে।

রাওয়ানি কাহার : কহার বা কাহার জাতির একটি শাখা যাদের মূল এলাকা গয়া জেলা।

রাইকোয়ার : গুজরাতের কচ্ছ ও খেড় অঞ্চলের শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ।

রাজন্য : বৈদিক চাতুর্বর্ণের দ্বিতীয় বর্ণ যারা পরবর্তীকালে ক্ষত্রিয় হিসাবে কথিত হয়েছে।

রাজগর : স্থপতি। খটিকদের একটি শাখাজাতি।

রাজ-গোর : রাজস্থানী ব্রাহ্মণদের একটি শাখা।

রাজপুত : উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য ভারতের প্রভাবশালী জাতি, প্রধানত কৃষিজীবী যদিও শস্ত্রজীবীদের বংশধর বলে পরিচয় দেয় ও ক্ষত্রিয়ত্বের মর্যাদা দাবি করে।

রাজবংশী : কোচ-উপজাতিসম্ভূত জাতি যাদের উত্তরবঙ্গ ও আসামে বিপুল সংখ্যায় দেখা যায়।

রাঢ়ী : রাঢ় বা পশ্চিমবঙ্গের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ শাখাজাতি।

রাস্তোগী : উত্তর প্রদেশের বানিয়া জাতি যারা বল্লভ-পন্থী ও উপবীত ধারণকারী। এদের তিনটি শাখা—আমেথ, ইন্দ্রপতি ও মানহারিয়া। এরা সাধারণভাবে বেশ ধনী।

রাবুলো : উড়িষ্যার মন্দির সেবী নিম্ন পর্যায়ের জাতি।

রেওয়ারি : উত্তর ভারতের বানিয়া জাতি যাদের নামকরণ সম্ভবত গুরগাঁও জেলার রেওয়ারি নামক স্থান থেকে হয়েছে।

রেড্ডি : কাপু দ্রষ্টব্য।

রেহ্গর : উত্তর ভারতের লবন ও সোরা উৎপাদক জাতি। অনুরূপ জাতি-সমূহের মধ্যে লুনিয়া বা নুনিয়া, বেলদার, কোরা, উপ্পিলিয়ন, উপ্পর, উপলিগ, সোরাগর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

লম্বাদি : বঞ্জার দ্রষ্টব্য।

লালবেগী : উত্তর ভারতের আবর্জনা-পরিষ্কারক জাতি, ভাঙ্গিদের শাখা যাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধরনের রীতিনীতিই প্রচলিত।

লাধ : গুজরাতী বনিয়া শাখাজাতি।

লিঙ্গায়ৎ : কর্ণাটকের বীরশৈব ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় যারা লৌকিকভাবে জাতি হিসাবে পরিচিত।

লুনিয়া : উত্তর ভারতের লবণ-উৎপাদক জাতি যাদের মধ্যে শূকর মাংস ভক্ষণ ও মদ্য পানের রীতি আছে। লুনিয়া সমাজে বিধবা বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ বহুল প্রচলিত।

লেট : পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার বাগ্দিদের শাখাজাতি।

লোধা : উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের কৃষিজীবী জাতি যারা নিজেদের রাজপুত-উদ্ভূত বলে দাবি করে। তবে কুর্মিদের তুলনায় তাদের সামাজিক মর্যাদা কম।

লোধি : উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের কৃষিজীবী জাতি যারা লোধাদের চেয়ে ভিন্ন। লোধিরা দামোহ্ জেলার প্রধান ভূম্যধিকারী জাতি।

লোহান, লোহানা : সিন্ধুপ্রদেশের বানিয়াজাতি।

লোহার : কর্মকার দ্রষ্টব্য।

লোহিয়া : উত্তর ভারতের বানিয়াজাতি যারা মূলত লোহার কারবারে নিযুক্ত। এদের অধিকাংশই বৈষ্ণব, তবে কিছু জৈনও আছে।

শাকদ্বীপী : বিহারের শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ যারা পৌরোহিত্য, চিকিৎসা ও গ্রহবিপ্রের কাজ করে। এরা কতকগুলি পুর বা শাখায় বিভক্ত। প্রতিটি শাখা বা পুরের মধ্যে সগোত্র বিবাহ হয়।

শাওরা : সংস্কৃত শবর থেকে নিষ্পন্ন উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের উপজাতি, যারা জগন্নাথের সেবক হিসাবে উড়িষ্যায় একটি স্বতন্ত্র জাতি-সত্তা লাভ করেছে।

শনিচর : রাজস্থান ও সন্নিহিত অঞ্চলের একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ যারা শনিপূজা, গ্রহশান্তি প্রভৃতি কাজ করে এবং সেই হিসাবে নিম্নবর্ণের ব্রাহ্মণ হিসাবে চিহ্নিত।

শানান, শানার : দক্ষিণভারতের তাড়ি-সংগ্রাহক জাতি, তামিলভাষী। সমতুল্য জাতি দক্ষিণে ইল্লবার বা বিল্লবার, তিয়ান, ইদিগা, গৌন্দলা, মহারাষ্ট্রের ভাণ্ডারি ও বিহারের পাশি। শানানদের সমাজে কিছুটা মাতৃতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে।

শংখবণিক : বঙ্গদেশের শংখজাত পণ্যের উৎপাদক ও বিক্রেতা বণিকজাতি, যাদের সামাজিক মর্যাদা গন্ধ ও কংসবণিকদের তুল্য।

শাক্যসেনী : উত্তরভারতের কায়স্থদের একটি শাখা। তিনটি শাখায় বিভক্ত যথা আইল, দুসরি ও খোরি। শ্রীবৎস কায়স্থদের তুলনায় নিম্নমর্যাদার জাতি।

সাহু-ক্ষৌত্র : যে সকল ক্ষৌত্র নিজেদের নির্ভেজাল ক্ষৌত্র বলে মনে করে।

শালিয়ার : তেলুগু ভাষী তন্তুবায় জাতি, শুদ্ধ শূদ্র হিসাবে পরিগণিত।

শাসনী-ব্রাহ্মণ : উড়িষ্যার বৈদিক ব্রাহ্মণ যারা কুলীন এবং ষোলটি বিশেষ শাসন বা অঞ্চলের অন্তর্গত।

শিখাওয়াল : রাজস্থানের ব্রাহ্মণ যাদের মূল এলাকা জয়পুর অঞ্চল।

শিষ্যবর্গ : কর্ণাটক অঞ্চলের একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

শিরিণ-ক্ষৌত্র : পাঞ্জাব অঞ্চলের ক্ষৌত্র যারা অন্যূন পঞ্চান্নটি উপশাখাজাতিতে বিভক্ত। শিরিণ শব্দের অর্থ কৃষক।

শিহোর-ঔদীচ্য : গুজরাতী ঔদীচ্য ব্রাহ্মণদের একটি শাখা।

শুঁড়ি, শৌণ্ডিক : বঙ্গদেশ, বিহার, আসাম ও পূর্বাঞ্চলের মদ্য-প্রস্তুত-কারক জাতি, যাদের উত্তরভারতীয় স্বজাতি কালোয়ার নামে পরিচিত। বঙ্গ-বিহারে শুঁড়িরা সমৃদ্ধিশালী জাতি এবং প্রধানত বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী।

শূদ্র : চাতুবর্ণের চতুর্থবর্ণ। ভারতবর্ষের অধিকাংশ বৃত্তিজীবী জাতিই শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত। শূদ্রেরা দ্বিজাতির অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তাদের উপ-নয়নাদি সংস্কার নেই। তাদের বেদপাঠ ও যাগযজ্ঞে অধিকার নেই।

শূদ্রযাজক : যে সকল ব্রাহ্মণ শূদ্রদের পৌরোহিত্য করে এবং সেই হিসাবে নিম্ন সামাজিক মর্যাদার অধিকারী।

শূরসেনী : উত্তরভারতের বানিয়া জাতি যাদের মূল এলাকা শূরসেন বা মথুরা অঞ্চল।

শেতপল : সিন্ধুপ্রদেশের একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

শেনবি : কোংকন অঞ্চলের একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ যারা সাধারণত ধর্মনিরপেক্ষ বৃত্তির অনুসারী।

শ্রীকর : সিন্ধুপ্রদেশের সারস্বত ব্রাহ্মণদের একটি শাখা।

শ্রীমাল, শ্রীমালী : উত্তরভারতের বানিয়া জাতি যাদের মূল এলাকা রাজস্থানের ঝালোরের নিকট ভিনাল শহর। শ্রীমাল বা শ্রীমালী বানিয়ারা উত্তর ও পশ্চিম ভারতে ব্যাপ্ত। শ্রীমালী নামক একশ্রেণীর ব্রাহ্মণও এই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান যারা শ্রীমালী বানিয়াদের পৌরোহিত্য করে।

শ্রীবৎস : উত্তরভারতের কায়স্থ জাতি যাদের নামকরণের উৎস প্রাচীন বৎসদেশ, বর্তমান উত্তরপ্রদেশের গোণ্ডা জেলা।

শ্রেষ্ঠ-খন্দাইত : উড়িষ্যার খন্দাইত জাতির উচ্চ শ্রেণী।

শ্রোত্রিয় : আক্ষরিক অর্থে বেদপাঠক। বঙ্গদেশের রাঢ়ীয়, বিহারের মৈথিল ও

উড়িষ্যার ব্রাহ্মণদের একটি বিশেষ শাখা এই নামে পরিচিত। শ্রোত্রিয়রা কুলীনদের তুলনায় মর্যাদার দিক থেকে নিম্নপর্যায়ের।

সংকেত : দক্ষিণী ব্রাহ্মণ, প্রধান বসতি কর্ণাটক অঞ্চলে। এদের দুটি শাখা বর্তমান যথা কৌশিক সংকেত এবং বেত্তদপারা সংকেত। সংকেত ব্রাহ্মণরা যেমন একদিকে শাস্ত্রনির্দিষ্ট জীবনচর্যা অনুসরণ করে, অপরদিকে তেমনি স্বহস্তে কৃষিকাজ করে।

সচোর, সঞ্চোর : গুজরাতী ব্রাহ্মণ, বল্লভাচারী।

সখোদ্রা : গুজরাতী কৃষিজীবী ব্রাহ্মণ, ব্রোচের নিকটবর্তী সখোধ নামক স্থানে যাদের প্রধান বসতি।

সদ্গোপ : বঙ্গদেশের কৃষিজীবী জাতি যাদের বর্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী, বাঁকুড়া, নদীয়া ও চব্বিশ পরগনা জেলায় পাওয়া যায়। সদগোপদের মধ্যে কুলীন ও মৌলিক এই দুই ভাগ আছে। কুলীনরা পশ্চিমকুলীয় ও পূর্বকুলীয় এই দুই ভাগে বিভক্ত।

সনাঢ্য : উত্তরভারতের ব্রাহ্মণদের একটি প্রধান শাখা যাদের প্রধান বিকাশক্ষেত্র গঙ্গাযমুনা দোয়াব অঞ্চলের জেলাসমূহ।

সপ্তগ্রামী : বঙ্গদেশের সুবর্ণবণিকদের একটি শাখার নাম। কংসবণিক ও কাঁসারিদের একটি শাখাও সপ্তগ্রামী নামে পরিচিত।

সনুভোগ : কর্ণাটক ও সন্নিহিত অঞ্চলের লেখক ও হিসাবরক্ষক জাতি, অনেকটা কায়স্থদের কাছাকাছি।

সরাক, সারাক : পূর্ব-দক্ষিণ বিহারের কৃষিজীবী, তন্তুবায় ও বণিক জাতি যারা আদিতে জৈন ছিল কিন্তু বর্তমানে জৈন-উপাদান মিশ্রিত লৌকিক হিন্দুধর্মের অনুসারী। সরাক বা সারাক শব্দটি শ্রাবক শব্দজাত।

সরযূপারিয়া : উত্তরভারতের কনৌজীয়া ব্রাহ্মণদের শাখা যায়া সাওরিয়া নামেও পরিচিত।

সাগীরদপেশা : উড়িষ্যার একটি জাতি যারা গৃহভৃত্যের কাজ করে।

সারস্বত : পাঞ্জাব ও সিন্ধু অঞ্চলের ব্রাহ্মণ যাদের নামকরণ সরস্বতী নদীর নামে হয়েছে। সারস্বতদের দুটি প্রধান শাখা বনজাই এবং মোহুয়াল। এদের মধ্যে সগোত্র বিবাহ প্রচলিত।

সাবাশে : মহারাষ্ট্রের মধ্যশ্রেণীর বাণিজ্যজীবী ব্রাহ্মণ যাদের জাতিনাম সংস্কৃত সহবাসী থেকে উদ্ভূত। দক্ষিণ মহারাষ্ট্র অঞ্চলে এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের অধিক সংখ্যায় দেখা যায়।

সালে,সালিগ ঃ কর্ণাটক অঞ্চলের তন্তুবায় জাতি যারা দুটি শাখায় বিভক্ত, পদ্ম-সালে এবং শকুন-সালে।

সিত্তিগদু ঃ তেলুগুভাষী তাড়ি-সংগ্রাহক জাতি।

সিদ্ধপুরিয়া ঔদীচ্য ঃ গুজরাতী ঔদিচ্য ব্রাহ্মণদের একটি শাখা যাদের মূল বসতি বরোদার অন্তর্গত সিদ্ধপুর অঞ্চলে।

সুত ঃ আসামের কৃষিজীবী জাতি, যারা ব্রাহ্মণী-উদ্ভূত প্রতিলোম সংকর-জাতি হিসাবে নিজেদের পরিচিত করে।

সুতার ঃ উত্তরভারতের কাঠের কারিগরদের জাতি নাম। উত্তরভারতে সুতার বা ছুতাররা বারহি নামে পরিচিত। উত্তর-দাক্ষিণাত্যে সুতাররা বাদিগ বা বাদিগা, পাঞ্জাব ও রাজস্থানে তর্কন বা তরখান এবং খাতি নামে পরিচিত। মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমভারতে, তথা বঙ্গদেশে, তাদের সুতার আখ্যাই দেওয়া হয়। সুতারদের জাতিগত মর্যাদা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার।

সূত্রধর ঃ সুতার দ্রষ্টব্য।

সুবর্ণবণিক ঃ বঙ্গদেশের স্বর্ণ-ব্যবসায়ী জাতি, যাদের মধ্যে দুটি বিভাগ বর্তমান, সপ্তগ্রামী ও বঙ্গজ। ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে প্রধানত চৈতন্য-পন্থী বৈষ্ণব। জাতিকাঠামোয় সুবর্ণবণিকদের স্থান বেশ নীচে অথচ জীবনযাত্রা ও ব্যবহারের মান তাদের খুবই উঁচু। তাদের দৈহিক গঠন রীতিমত ভাল।

সূর্যধ্বজ ঃ উত্তরভারতের একশ্রেণীর কায়স্থ।

সেকরা ঃ বঙ্গদেশের স্বর্ণকার জাতি, যারা উত্তরভারতে সোনার নামে পরিচিত। তামিল অঞ্চলে তারা কম্মল্লার, তেলুগু অঞ্চলে পঞ্চনম-বলু এবং কন্নড় অঞ্চলে পঞ্চবল শ্রেণীভুক্ত। কর্ণাটকের সেকরারা অর্কশাল, অক্কশাল বা আগাসাল নামে পরিচিত। সেকরা বা সোনারদের জাতিমর্যাদা সর্বক্ষেত্রে সমান নয়। পাঞ্জাব অঞ্চলে তারা উপবীত ধারণ করে। বঙ্গদেশে তারা শুদ্ধ শূদ্র হিসাবে পরিগণিত।

সেনিগ ঃ নিম্ন-কর্ণাটক অঞ্চলের তন্তুবায় জাতি। এদেরই কোন কোন শাখা দক্ষিণের অন্যত্র সেনিয়ন নামে পরিচিত।

সেপারি ঃ বিহারের নিম্নমর্যাদার গোপজাতি।

সোনার ঃ সেকরা দ্রষ্টব্য।

সোনার বানিয়া ঃ সুবর্ণবণিক দ্রষ্টব্য।

সোনি ঃ সোনার বা সেকরাদের পশ্চিমভারতীয় নাম।

সোম্বত্ত ঃ দড়ি-প্রস্তুতকারক জাতি, খটিকদের শাখা।

সোপারা ঃ বোম্বাই-এর বেসিন অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

সোরাগর ঃ উত্তরভারতের লবণ ও সোরা উৎপাদক জাতি। দ্রষ্টব্য লুনিয়া।

সোরাঠিয়া ঃ সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের গুজরাতী ব্রাহ্মণ।

হলদিয়া, হরদিয়া ঃ উত্তরভারতের আগরওয়ালা বানিয়াদের শাখাজাতি যাদের নামকরণ হলুদ বা হলদি থেকে হয়েছে। উত্তরভারতের কাছি নামক কৃষিজীবী জাতির একটি শাখা হরদিয়া নামে পরিচিত যারা বিশেষভাবে হরিদ্রা বা হলুদ চাষ করে।

হলবক্কি-বক্কল ঃ কর্ণাটক অঞ্চলের কৃষিজীবী জাতি।

হলালখোর ঃ আবর্জনা-পরিষ্কারক ভাঙ্গিদের একটি শাখাজাতি।

হবিক ঃ একশ্রেণীর কন্নড় ব্রাহ্মণ। হবিক নামটি হইগ থেকে এসেছে যা উত্তর কানাড়া অঞ্চলের প্রাচীন নাম। হব্য থেকে হবিক নামটির উদ্ভব হতে পারে।

হরসোরা ঃ গুজরাতী বানিয়াদের শাখাজাতি।

হসাল ঃ কর্ণাটক সীমান্ত অঞ্চলের ভূমিশ্রমিক ও অরণ্যসামগ্রীজীবী জাতি।

হান্ড-যোগী ঃ দক্ষিণ ভারতের নিম্নজাতি যাদের পেশা শূকরপালন, ঝাড়-ফুঁক এবং সাপুড়ের বৃত্তি।

হাড়ি ঃ পূর্বভারতের আবর্জনা-পরিষ্কারক জাতি, অনেকটা পাঞ্জাব অঞ্চলের চুহ্রাদের অনুরূপ। তবে বঙ্গদেশে তাদের একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে কেননা এই জাতির নারীরা সন্তান প্রসব করানোর কাজ করে।

হালওয়াই ঃ উত্তরভারতের মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারী জাতি, পূর্বাঞ্চলের ময়রা বা মোদকের অনুরূপ।

হালিয়া-কৈবর্ত ঃ কৈবর্তদের শাখা যারা প্রধানত কৃষিজীবী এবং সেই কারণে চাষা-কৈবর্ত নামেও পরিচিত। এদের মধ্যে অনেকেই মাহিষ্য বলে নিজেদের পরিচয় দেয়।

হালে-কর্ণাটক ঃ কর্ণাটক অঞ্চলের কৃষিজীবী ব্রাহ্মণ, কিন্তু অতি নিম্ন সামাজিক মর্যাদার অধিকারী। ব্যঙ্গ করে এদের মারক বা খুনী বলা হয়।

হীরা ঃ চণ্ডালদের শাখাজাতি যারা ধাতব সামগ্রী প্রস্তুত করে এবং যাদের বসতি আসাম অঞ্চলে।

হুবু ঃ উত্তর কানাড়া অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ যারা সাধারণত মন্দিরে

গৌরোহিত্য এবং জ্যোতিষ গণনার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে।

হুসাইনি : মহারাষ্ট্রের পতিত ব্রাহ্মণ, প্রধান বসতি আহমদনগর। এদের অধিকাংশই ইসলাম ধর্মাবলম্বী কিন্তু তৎসত্ত্বেও তারা ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় বর্জন করেনি।

হেগ-গানিগ : কর্ণাটকের তৈলকার গণিগদের শাখাজাতি।

হৈসঙ্গ : কর্ণাটকের হাসন জেলার ব্রাহ্মণ। মাধবাচার্য এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন।

হোলেয় : কর্ণাটকের ভূমিশ্রমিক ও কৃষিজীবী জাতি। তামিল পরইয়নদের অনুরূপ।

জাতিপ্রথা সংক্রান্ত কিছু উল্লেখযোগ্য রচনার তালিকা

Abott J., *The Key of Power : A Study of Indian Ritual and Belief*, London 1932, Aggarwal P.C., *Caste, Religion and Power : An Indian Case Study*, New Delhi 1971, "The Meos of Rajasthan and Haryana" in Imtiaz 1973, 21-44, "Caste Hierarchy in a Meo Village in Rajasthan" in Imtiaz 1973, 73-78 ; Ahmad Imtiaz (ed), *Caste and Social Stratification among the Muslims*, New Delhi 1973, "Endogamy and Status Mobility among the Siddique Sheiks of Allahabad" in *ibid* 157-194 ; "The Ashraf-Ajlaf Dichotomy in Muslim Social Structure of India" in *Indian Economic and Social History Review*, III (3), 1960, 268-78 ; Ahmad Zarina, "Muslim Caste in Uttar Pradesh" in *Economic Weekly*, XIV (17), 1962, 325-337 ; Aiyappan A, *Iruvas and Culture Change*, Madras Govt. Museum Bulletin V (1), 1942 ; *Anthropology of the Nayadis* in *ibid* N.S. II (4) Madras 1937 ; *Social Change in a Kerala Village*, Bombay 1965 ; Aiyappan A and Bala Ratnam L.K. (ed), *Society in India*, Madras 1956 ; Aiyangar M.S. *Tamil Studies*, Madras 1914 ; Altekar A S., *A History of Village Communities in Western India*, Bombay 1927 ; Ansari Ghaus, *Muslim Caste in Uttar Pradesh : A Study in Culture Contact*, Lucknow 1959 ; "Muslim Caste in India" in *Eastern Anthropologist* IX (2), 104-11, 1956 ; Asraf K.M., *Life and Condition of the People of Hindustan*, rep. Delhi 1959 ; Baden-Powell B.H, *The Indian Village Community*, London 1896 ; Baily F.G., *Caste and Economic Frontier*, Manchester 1957 ; *Tribe, Caste and Nation*, London 1960 ; *Politics and Social Change*, London 1963 ; Barbosa D., *A Description of the Coasts of East Africa and Malabar in the Beginning of the Sixteenth Century*, Hakluyt Society, London 1866 ; Barth F., "Father's Brother's Daughter's Marriage in Kurdistan" in *South-western Journal of Anthropology*, XVI (2) 1954, 167-71 ; "The System of Social Stratification

in Surat" in E.R. Leech 1962 , Bartlett F.C., *Anthropology in Reconstruction*, London 1943 ; Barton W., *India's North-West Frontier*, London 193) , Basu D., *The Problems of Indian Society* ; Beals A.R. "Change in the Leadership of the Mysore Village" in M.N. S inivas 1960 : Bernier F., *Travels in the Moghul Empire*, trans. A Constable, London 1916 ; Berrman G D. "Caste in India and the United States" in *American Journal of Sociolagy*, LXVI (2), 1960, 102-107 ; Beleille A., *Caste, Class and Power : Changing Patt rns of Stratification in a Tanjore Village*, Bombay 1966 , "Race, Caste and Ethnic Identity" in *International Science Journal* XXIII (4), 1971, 519-33 , Beveridge A.S., *Baburnama*, trans. rep. New Delhi 1976 , Bhattacharyya J.N., Hindu Castes and Sects, Calcutta 1986 , Bhattacharyya N.N., *Indian Puberiy Rites*, Calcutta 1969, New Delhi 1980 , *Indian Mother Coddess*, Calcutta 1971, New Delhi and Columbia 1977 , *Ancient Indian Rituals and Their Social Contents*, New Delhi and London 1975 ; *History of thk Tantric Religion* New Delhi 1982 , Bnattacharyya R.K , "The Concept and Ideology of Caste among the Muslims of Rural West Bengal" in Imtiaz 1973, 102-132 , Bhatty Zarina, "Status and Power in a Muslim Dominated Village of Uttar Pradesh" in Imtiaz 1973, 89-106 ; Biddulph J., *Tribes of the Hindu Koosh*, Calcutta 1880 , Bloch M., *Feudal Society*, London 1861 ; Blunt E.A.H., *Report of the Census of the United Provinces of Agra and Oudh* 1911, Allahabad 1912 , *The Caste System of Northun India* Madras 1931 , Bonnerjea B, "Possible Origin of the Caste System in India" in *Indian Antiquary*, March-May 1931 ; Bose N,K., "Some Aspeets of Castes in Bengal" in *Man-in India* XXXVIII, 1985, 73-97 ; Bose P.N., *History of Hindu Civilization during British Rule*, 2 Vols. London 1894 Bose S.C., *The Hindus as They Are*, London 1881 ; Bougle C., *Essais sur le Regeme des Castes*, Paris 1908 : Bray D., *Report on the Census of Baluchistan* 1911, Calcutta 1913 ; Brough J., *The Early Brahmanical System of Gotra and Pravara : A Translation of the Gotrapravaramanjari of Purusottama*, Cambridge 1953 ; Buchanan F., *Journey through Mysore, Canara and Malabar*,

London 1807, rev. ed. Madras 1870 ; Buhler G., *Sacred Laws of the Aryas as Taught in the Schools of Apastamba, Gautama, Vasistha and Baudhayana*, Sacred Books of the East Series, Vol. II, Oxford 1879 ; *The Laws of Manu*, SBE, XXV, Oxford 1886 ; Burton R.F., *Sindh and the Races that Inhabit the Valley of the Indus*, London 1851 ; Campbell J.M., *Gezetteer of the Bombay Presidency*, Vol. IX, Gujarat Population : Hindus: Bombay 1901 , Cappieri M., *Le Caste degli Intoccabili in India* in "Rivista di Anthropologia"°, XXXV, Rome 1947 ; Carre l'Abbe, *The Travels of Abbe Carre in India and the Near East*, trans. Lady Fawcett, ed. Sir Charles Fawcett and Sir Richard Burn, Hakluyt Society, London 1947-48 ; Carstains G.M., *The Twice Born*, London 1957 ; Chanana D.R., *Slavery in Ancient India*, New Delhi 1960 ; Chanda R.P., *Indo-Aryan Races*, Rajsahi 1916, ed N.N. Bhattacharyya, Calcutta 1968 ; "Intercaste Marriage in Buddhist India" in *Modern Review*, 1919,595 ff. ; Chandrika M.D , *Nayar Tārwads through Generations*, Unpublished Dissertation 1971, Dept. of Anthropology and Sociology, University of Saugar ; Chapekar N.G., *Chitpavan*, Bombay 1966 ; Cole B.L., *Report on the Census of the Rajputana Agency* 1931, Meerat 1932 ; Colebrooke H.T., "Enumeration of Indian Classes" in *Asiatic Researches* V, 1788 ; Cox O.C., *Caste, Class and Race*, London 1948 ; Crooke W., *Religion and Folklore of Northern India*, Oxford 1926 ; *Tribes and Castes of North Western Provinces and Oudh*, Calcutta 1896 ; *The Natives of* Worthern *India*, London 1907 ; *Things Indian* ; London 1906 ; ed. *Tod's Annals and Antiquities of Rajasthan*, Oxford 1926 ; Datta K.K., *Survey of India's Social Life and Economic Condition in the Eighteenth Century*, Calcutta 1961 ; Dalton E.T., *Descriptive Ethnology of Bengal*, Calcutta 1872 ; Dasgupta T.C., *Aspects of Bengali Society*, Calcutta 1935 ; Devis K.. *The Population of India and Pakistan*, Princetion 1951 ; Day F., *The Land of the Perumals or Cochin, Its Past and Present*, Madras 1893 Desai G.H., *A Glussary of the Castes, Tribes and Races in the Baroda State*, Bombay 1912 ; D'Souza V.S., *The Navayats of Kanara : A Study in Culture Contact*, Dharwar 1953 ; "Mother-

right in Transition" in *Sociological Bulletin* II (2), 1955, 135-152, "Social Organisation and Marriage Customs of the Moplas" in *Anthropos* LIV, 1959, 487-516; "Status Groups among the Moplas of South West Coast of India" in Imtiaz 1973, 45-60, Dube Leela, *Matriliny and Islam*, Delhi 1969; "Caste Analogues among the Laccadive Muslims," in Imtiaz 1973, 195-234, Dube S.C., *The Kamar*, Lucknow 1951, *Indian Village*, London 1955, "Caste Dominance and Factionalism', in *Contributions to Indian Sociology*, N.S. II, 1968, 58-81; Dubois J.A, *A Description of the People of India*, London 1817, Madras 1879; Dumont L., *Homo Hierarchicus ; The Caste System : Its Implication*, Delhi and London 1970, Dumont L, and Pocock D, *Contributions to Indian Sociology*, Nos. 1 and 2, Paris and Hague 1957; Duncun J., "Historical Remarks on the Coast of Malabar', *Asiatic Researches.* V, 1788; Dutt N K., *Aryanization in India*, Calcutta 1925, *Origin ane Growth of Caste in India*, 2, Vols Calcutta 1931, 1933, Ehrenfels O.R, *Mother-right in India*, Hyderabad 1941; Elwin V., *The Bagia*, London 1939, *The Agaria*, Bombay 1942; *Maria Murder and Suicide*, Bombay 943; *The Muria and thcir Ghotul*, Bombay 1947; Enthoven R.E., *The Tribes and Castes of Bombay*, Bombay 1920-22, Fick R, *The Social Organisation of North-East India in Buddha's Time*, Calcutta 1920, Forbes A K, *Ras Mala or Hindu Annals of the Province of Gujarat*, 2. Vols. London 1856, rep. London 1924; Frykenberg R E. (ed), *Land Control and Social Structure in Indian History*, Medison 1969, Fuchs S., *The Gond and Bhumia of Eastern Mandla*, Bombay 1960; Furer-Haimendorf C. Von., *The Raj Gonds of Adilabed*, London 1984; Furnivall J.S, *Netherlands India : A Study of Plural Economy*, Cambridge 1939, Gait E.A., *Census of India* 1901 Vol. VI, *Bengal, Bihar, Orissa, Sikkim*, Calcutta 1903, *Report on the Census of India* 1911, Calcutta 1913; *History of Assam*, Calcutta 1906; Ghosh A., *The Original Inhabitants of the United Provinces*, Allahabed 1935; Ghosh G.C., *Brahmanism and Sudra*, Calcutta 1902; Ghurye G. S., "Ethnic Theory of Caste", in *Man in India*, IV, 1924, 209-271; *Caste and Race*

in India, London 1932, Bombay 1969 ; *Caste and Class in India*, Bombay 1950 ; *After a Century and a Quarter*, Bombay 1960 ; *Caste, Class and Occupation*, Bombay 1961 ; *The Scheduled Tribes*, Bombay 1963 ; *Social Tensions in India*, 1968 ; Gilbert W.H., *Peoples of India*, Washington 1944, Gough E.K., "Criteria and Caste Ranking in South India" in *Man in India* XXXIX (2), 1959, 115 ff., "Caste in a Tanjore Village" in E.R. Leach 1962 ; "Nayars : Central Kerala" in Schneider and Gough, *Matrilineal Kinship* 1962 ; "Tiyyans : North Kerala" in *ibid* ; Grey E. (ed). *The Travels of Pietro Della in India*, London 1892 ; Guha Uma, "Caste among Rural Bengali Muslims" in *Man in India* XLV, 1965 167-169 ; Gupta C, *Brahmanas in India : A Study Based on Inscriptions*, Delhi 1983 ; Gupta R, "Caste-ranking and Inter-caste Relations among the Muslims of a Village in North-Western U.P." in *Eastern Anthropologist* X (1). 1956, 30-42 ; Gurdon P.R.T., *The Khasis*, London 1907 ; Hill S.C., "Origin of the Caste System in India" in *Indian Antiquary*, Mar-Oct. 1930 ; Hillebrandt A., "Brahmanen und Sudras" in *Festschrift fur Karl Weinhold*, Breslaw 1896 ; Hivale S., *The Pradhans of the Upper Narbada Valley*, Bombay 1946, Hocart A.M. *Les Castes*, Paris 1938 ; *Caste ; A Comparative Study*, London. 1950 ; "The Basis of Caste in India" in *Acta Orientalia*, XIV, Leiden 1936 ; Hodson T C., *The Meitheis*, London 1908 ; *The Naga Tribes of Manipur*, London 1911 ; Holdich T.H., *India*, ed. H.J. Maekinder, London 1904 ; Hollister J.N. *The Shi'a of India* London 1953 ; Hopkins E.W., *The Social and Military Position of the Ruling Caste in Ancient India*, New Haven 1889 ; *Mutual Relation of the the Four Castes in Manu*; Leipzig 1881 ; Hoyland S. and Banerjee S.N. (trans), *The Commentary of Father Monserrate*, London 1922 ; Hunter W.W., *Annals of Rural Bengal*, London 1868 ; Hutton J.H., *Caste in India*, Oxford 1969 ed ; *The Angami Nagas*, London 1921 ; *The Sema Nagas*, London 1921 ; *Report on the Census of India 1931*. Delhi 1933 ; Ibbetson D.C., *Punjab Castes*, Lahore 1916 ; *Report on the Punjab Census of 1881*, Lahore 1882 ; Ilyin G.F., "Sudras und Sklaven in den

altendischen Gestzbuchren" in *Sowjetwissenschaft*, 1952, No 2, Innes C.A., *Gazetter of the Malabar and Anjingo District*, ed. F.B. Evans, Madras 1908, Irving B.A., *The Theory and Practice of Caste*, London 1853 ; Iyer L.A.K., *The Travancore Tribes and Castes*, Trivandrum 1937-41 ; Iyer L.K.A.K., *The Cochin Tribes and Castes*, Madras 1909-12, *Coorg Tribes and Castes*, Madras 1948 ; Jackson A.M.T., "Note on the History of the Caste system" *JASB* III (7) 1907 ; Jaiswal S., "Studies in Early Indian Society : Trends and Possibilities" in *Indian Historical Review*, VI, 1979-80, 1-63 ; Jolly. J, *The Institutes of Visnu*, SBE VII, Oxford 1886, Kane P.V. *History of Dharmasastra*, Vols. I-V Bhandarkar Institute, Poona, rep. 1974 ; Karandikar S.V., *Hindu Exogamy*, Bombay 1929 ; Karim Nazmal, *Changing Society in India and Pakistan*, Daccca 1957. Kapadia K.M., *Marriage and Family in India*, Bombay 1955, Oxford 1958 ; *Hindu Kinship*, Bombay 1947 ; ed. *Ghurye Felicitation Volume*, Bombay 1955 ; Karve I., *Kinship Organisation in India*, Poona 1953 ; *Caste in Modern Times and Some Measures to Combat Its Evils*, Report of the Seminar on Casteism and Removal of Untouchability, Bombay 1955 : *Hindu Society*: *An Interpretation*, Poona 1961 ; *Changing India : Aspects of Caste Society*, Bombay 1961 ; Kaul H., *Report on the Census of the Punjab 1911*, Lahore 1912 ; Ketkar S.V., *History of Caste in India*, 2 vols. New York 1909, London 1911 ; *An Essay on Hinduism*, London 1911, *Maharashtriya Jnanakosha*, Poona 1920-23 ; Khan F.R., "Caste System of the Village Community of Dhulundi in the District of Dacca" in Owen 1962 ; Khan Q. H., *South Indian Musalmans*, Madras 1910 : Khan Z., Caste and Muslim Pesantry in India and Pakistan" in *Man in India*, XIV, 1968, 138-148 ; Kikani L.T., *Caste in Court*, Bombay 1912 ; Masselos J.C., "The Khojas of Bombay" in Imtiaz 1973, 1-19 ; Mayer A.C., *Caste and Kinship in Central India*, London 1960 ; "Some Hierarchical Aspects of Caste" in *Southwestern Journal of Anthropology* XII (2) 1956, 3-17 ; "The Dominant Caste in a Region of Central India" in *ibid* XIV (4), 407-27 ; *Land and Labour in Malabar*, London 1952 ; Mayne J.D. *A Treatise of*

Hindu Law and Usage, ed. London 1914 ; Mead P.G. and Mac Gregor G. *Report on the Census of Bombay* 1911, Bombay 1912 ; Menon C.A., *Report on Census of Cochin State 1911*, Ernakulam 1912 ; Miller E., "Village Structure in North Kerala" in M.N. Srinivas 1961 ; Mills J.P., *The Lhota Nagas*, London 1922 ; *The Ao Nagas*, London 1926 ; Mines M., Social Stratification among the Muslim Tamils in Tamilnadu" in Imtiaz 1973, 61-72 ; Misra B.B., *The Indian Middle Classes : Their Growth in Modern Times*. Bombay 1961 ; Misra S.C., *Muslim Communities in Gujarat*, Bombay 1964 ; Mitra R., *The Indo Aryans*, Calcutta 1881 ; Molony J.C., *Report on the Censns of Madras 1911*, Madras 1912 ; Mukherjee R.K., *The Dynamics of a Rural Society*, Berlin 1957 ; Mulla D.F., *Jurisdiction of Courts in Matters relating to Rights and Powers of Castes*, Bombay 1901 ; Nadel S.F., "Caste and Government in Primitive Society" in *Journal of the Royal Anthropological Society* 19:4, 16 ff. ; Nanjundayya H.V. and Iyer L.K.A.K., *The Mysore Tribes and Castes*, Bangalore 1928-35 ; Natarajan S., *A Century of Social Reform in India*, Bombay 1959 ; Nesfield J.C., *A Brief Review of the Caste System of the North Western Provinces and Oudh*, Allahabad 1885 ; Newell W H., "The Brahman and Caste Isogamy in North India" in *Journal of the Royal Anthropological Institute*, LXXXV, 1955, 101-110 ; Oddie G.A., "Protestant Missions : Caste and Social Changes in India 1850-1914", in *Indian Economic and Social History Review*, VI, 1969, 264 ff. ; Oldenberg H., "Zur Geschichte, des indischen Kastenwesens" in *ZDMG*, LI (2), 1897 ; O Malley L.S.S.. *Indian Caste Customs*, Cambridge 1932 ; *Popular Hinduism*, London 1935 ; ed. *Modern India and the West*, London 1941 ; *India's Social Heritage*, London 1934 ; Kirkpatrick W., "Primitive Endogamy and the Caste System" in *Proceedings of the ASB*, VII (3), Calcutta 1912 ; Kitts E.J., *A Compendium of the Castes and Tribes found in India*, Bombay 1885 ; Kosambi D.D., *Culture and Civilization of India in Historical Outline*, London 1965 ; Kroeber "Caste" in *Encyclopaedia of Social Sciences* III-IV ; Kumar D., *Land and Caste in South India*, Cambridge 1965 ;

Kutty A.R., *Marriage and Kinship in an Island Society*, Delhi, 1972 ; Lehmann E.A., *It began at Tranquebar*, Madras 19⁵6 ; Latowrette K.S., *History of the Expansion of Christianity*, New York and London 1939 ; Latthe A.B., *Memoirs of His Highness Sri Sahu Chatrapati*, Kolhapur 1924 ; Leech E.R. (ed)., *Aspect of Castes in South India, Ceylon and North West Pakistan*, Cambridge Papers of Social Anthropology II, 1962 : Levy R, *Social Structure of Islam*, Cambridge 1962 ; Lewis O., *Village Life in Northern India*, Urbana 1958 Lokhandwalla S.T., "Islamic Law and Islamic Communities" in *The Indian Social and Economic History Review*, IV (2) 1967, 162-66 ; Mahar M., "A Multiple Scaling Technique for Caste Ranking" in *Man in India* XXXIX (2), 1959, 127 ff. ; Maine H.S, *Ancient Law*, London 1861 ; Majumdar D N, *Caste and Communication in an Indian Village*, Bombay 1958 ; "Pseudo-Rajputs" in *Man in India* VI (3) 1926 ; Majumdar D.N. and Kishen K, Race Relations in Central Gujarat ; Majumdar R.C, *Corporate Life in Ancient India*, Calcutta 1922 ; Malenbaum W., "Capital Formation in Newly Independent Countries" in B.N. Varma 1964 ; Manickam S., "Missionary Attitude towards Observance of Caste in the Churches of Tamil Nadu" in *Quarterly Review of Historical Studies*, XXII (4) 1983, 53-60 ; Manucci N., *Storia de Mogor*, trans. W. Irvine, rep. Calcutta 1966 ; Marriott Mckim, ed. *Village India : Studies in the Little Community*, Chicago 1955 : *Caste-ranking and Community Structure in Five Regions of India and Pakistan*, Poona 1960 ; "Interactional and Attributional Theories of Caste Ranking" in *Man in India* 1959, 92 ff. ; "Caste Ranking and Food Transactions" in Singer and Cohn 1968 ; Ooman M.A., *Land Reform and Socio Economic Changes in Kerala*, Madras 1971 ; Oppert G., *On the Original Inhabitants of Bharatavarsa or India*, Westminister 1893 ; Owen J.E. (ed)., *Sociology in East Pakistan*, New York 1962 ; Panchanadikar K.C. and J., *Determinants of Social Structure and Social Change in India*, Bombay 1970 ; Panikkar K.M.. *Problems of Indian Defence*, Bombay 1960 ; Park R.L.

and Tinker I (ed), *Leadership and Political Institutions of India*, Madras 1966 ; Parry N.E. *The Lakhers*, London 1932 ; Pate H.R., *Tinnevelly* (Madras Dist Gazetteer), Madras 1917 ; Paul S. Rev., "Caste in the Tinnevelly Church" *The Harvest Field*, Sept. 1893, 82 ff., Pant S.D., *The Social Economy of the Himalayans based on a Survey in the Kumaon Himalayas*, London 1935 ; Playfair A, *The Garos*, London 1909 ; Pocock D.F., "Inclusion and Exclusion : A Process in the Caste Systems of Gujarat", *Southwestern Journal of Anthropology*, XIII (1) 1956 ; Prabhu P.H., *Hindu Social Organisation*, Bombay 1958 ; Rajkhowa B, *Short Account of Assam*, Dibrugarh 1915 ; Rao H.V., *Indian Caste System*, Bangalore 1931 ; Rao M.S.A., *Social Changes in Malabar*, Bombay 1957 ; Rhys Davids T.W., *Buddhist India*, London 1913 ; Rice S., *Hindu Customs and Their Origins*, London 1937 ; "The Origin of Caste" in *Asiatic Review*, XXV. 1929 , Richter E., *Manual of Coorg*, Mangalore 1870, Risley H. H., *Tribes and Castes of Bengal*, 2 vols. Calcutta 1891, *Report on Census of India 1901*, vol. 1, Calcutta 1903 ; *Peoples of India*, Calcutta 1908 ; Rivers W. H. R. *The Todas*, London 1906 ; "The Origin of Hypergamy" in *JBORS*. 1921, Robertson G. S., *The Kaffirs of Hindu Kush*, London 1896 ; Rodriguez E. A., *The Hindoo Castes* 1846 ; Rose H. A., *A Glossary of the Tribes and Castes of the Punjab and North West Frontier Province*, 3 vols. Lahore 1911- 19 ; Rowney H. B. *The Wild Tribes of India* London 1882 ; Roy S. C., "Caste, Race and Religion" in Man in India IX (4), 1929 ; *The Oraons of Chotanagpur*, Ranchi 1915 ; *The Hill Bhuiyas of Orissa*, Ranchi 1905 ; *The Kherias*, Ranchi 1937 ; Russell R. V. and Lal H., *The Tribes and Castes of the Central Provinces of India*, 4 vols, London 1916 ; Ryan B., *Caste in Modern Ceylon*, New Jersey 1953 ; Sarkar B. K. "Varnasrama Dharma and Race Fusion in India" in *Modern Review*, Feb 1917:; *Hindu Sociology*, Allahabad 1920 ; Sarkar B. K. and Rakshit H. K., *Folk Element in Hindu Culture*, London 1907 ; Sarkar D. C , ed. *Land system and Feudalism in Arcient India*, Calcutta 1965 ; *Landlordism and Tenancy in Ancient and*

Medieval India, Lucknw 1969 ; Sircar S. S. et. al, *A Physical Survey of the Kadars of Kerala*, Calcutta 1961 ; Sastri A. M., *India as seen in the Brhatsamhlta*, Delhi 1969 ; Schneider D. M. and Gough E. K. eds. *Matrilineal Kinship*, Berkeley and Los Angels 1962 ; Schoebel C., *L'Historie des Origines et du development des Caste de l'Inde*, Paris 1884 ; Schwartz B, M., ed. *Caste in Overseas Indian Communities*, San Fransisco 1967 : Schwartzberg J., "Caste Regions in the North Indian Plains", in Singer and Cohn 1968 ; Sedgwick L., *Report on the Census of Bombay Presidency 1921*, Bombay 1922 ; Segal R., *The Crisis of India*, London 1965 ; Sen S. N. ed., *Indian Travels of Thevenot and Careri*, New Delhi 1949 ; Senart E., *Les Castes dans l'Inde*, Paris 1896, trans. Sir Denison Ross, *Caste in India*, London 1930 ; Shakespear J., *Lusai Kuki Clans*, Calcutta 1912 ; Sharma R. C., "Occupational Castes in Uttar Predesh during the Moghal Period" in *Quarterly Review of Historical Studies*, XXII (4) 1983, 67-73 ; "Caste in North India during the Medieval Period" in *Agra University Journal of Rescerch* (2) XXII, 1975 ff. ; Sharma R. S., *Some Economic Aspects of the Caste System in Ancient India*, Patna 1952 ; *Sudras in Ancient India*, Delhi 1958 ; *Indian Feudalism*, Calcutta 1965, ed. *Indian Society : Historical Problems*, New Delhi 1974 ; *Perspective of the Social and Economic History of Early India*, Delhi 1983 ; Sherring M. A., *Hindu Tribes and Castes*, 3 vol. Calcutta 1872-81 ; Shils E., *The Intellectual between Tradition a d Modernity : The Indian Situation*. The Hague 1961 ; Siddiqui M. K. A., "Caste among the Muslims in Calcutta" in Imtiaz 133-156 ; Singer M. and Cohn B. S. (ed.), *Structure and Change in Indian Society*, Chicago 1968 ; Singer P., "Caste and Identity in Guyana" in B, M. Schwartz 1967 ; Sinha S., *Caste in India : Its Structural Pattern of Socio-Cultural Integration*, London 1967 ; Sinha S. and Bhattacharyya R. K., "Bhadralok and Chotalok in Rural Areas of Bengal" *in Soiological Bulletin* XVIII (1), 1969, 50-56 ; Slater G., *The Dravidian Element in Indian Culture*,

London 1924 ; Srinivas M. N., *Religion and Society among the Coorgs of South India*, Oxford 1952 ; *Caste : A Trend Report and Bibliography*, (with others) in *Current Sociology* VIII (3), 1959, 135-185 ; "Mobility in the Caste System" in Singer and Cohn 1968 ; "The Dominant Caste in Rampura" in *The American Anthropologist*; LXI (1), 1959, 1-16 ; ed. *India's Village*, Bombay 1960 ; *Caste in Modern India and other Essays*, Bombay 1962 ; "Social Structure" in *Gezetters of India*, Vol 1, Delhi 1964 ; *Social Changes in Modern India*. Berkeley and Los Angels 1967 ; Steele A. *Law and Custom of Hindoo Castes within the Dekhun Provinces*, Bombay 1827, London, 1868 ; Stevenson H. N. C. "Status Evaluation in the Hindu Caste Systeem" in *Journal of the Royal Anthropological Institute* 1954, LXXXIV, 45 ff., Stevenson S. *The Rites of the Twice Born*, Oxford 1920 ; Tevernier J. B. *Travels in India*, Trans. V. Ball, London 1889 ; Temple R. C. (ed), *The Travels of Peter Mundy*, London 1914 ; Thurston E. and Rangachari K., *Castes and Tribes of Southern India*, 7 Vols. Madras 1909 ; Thapar R., *Ancient Indian Social History*, Delhi 1978 ; "Social Mobility in Ancient India" in R. S. Sharma 1974, 87 ff. ; Thomas P., *Churches of India*, rep. New Delhi 1969 ; *Christians and Christianity in India and Pakistan*, London 1954 ; Tod J., *Annals and Antiquities of Rajasthan*, ed. W. Crooke, Oxford 1920 ; Turner A. C., *Census Report of the United Provinces of Agra and Oudh 1931*, Allahabad 1933 ; Upadhyay G. P., *Brahmanas in Ancient India*, New Delhi 1979 ; Varma B. N. (ed), *Contemporary India*, Bombay 1964 ; Vrude-de-Staurs C., *Parda : A Study of North Indian Muslim Women*, New York 1969 ; Wagle N. K., *Society at the Time of the Buddha*, Bombay 1966 ; Weber Max, *The Pilgrim of India*, Glencoe, Illinois 1958 ; Weiner M., *Party Politics in India*, Princeton 1957 ; Wilson J. *Indian Castes*, 2 Vols. London 1887 ; Wise J., *Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal*, London 1883 ; Wiser W. H:, *The Hindu Jajmani System*, Lucknow 1939 ; Yadava B. N. S., *Society and Culture in Northern India in the Twelfth Century*,

Allahabad 1973 ; Yalman N., "The Flexibility of Caste Principles in a Kandyan Community" in E. R. Leech 1962 ; "On the Purity of Women in the Castes of Ceylon and Malabar" in *Journal of the Royal Anthropological Institute*, XCIII (I), 1963, 25-58 , Yeatts M. W. M. *Report on Census of Madras 1931*, Madras 1932 ; Yule H. and Burnell A. C., *Hobson-Jobson*, London 1886, ed. W. Crooke, London 1903 ; Zinkin T., *Caste Today*, London 1962.

অনুক্রমণিকা